WORLD WAR II : PROMPT AND UTTER DESTRUCTION

প্রোপাগান্ডা ও সাংবাদিকতা

আমেরিকা, ইরাক ও আফগানিস্তান

প্রোপাগান্ডা কী ??

ইতিহাস

WORLD WAR



প্রোপাগান্ডা

সাজিদ হাসান

সন্দীপন

সূচিপত্র

লেখকের কথা ৭

অধ্যায় ১ : প্রোপাগান্ডা কী ৯
প্রোপাগান্ডার প্রকারভেদ ১৪
প্রোপাগান্ডা ও প্ররোচনা ২০
প্রোপাগান্ডা ও প্ররোচনা : পার্থক্য ২২

অধ্যায় ২ : প্রোপাগান্ডার ইতিহাস, উৎপত্তি, বিকাশ ২৭
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ | প্রোপাগান্ডার এক্সপেরিমেন্ট ২৭
যুদ্ধোত্তর জনপ্রতিক্রিয়া ৩৬

অধ্যায় ৩ : প্রোপাগান্ডার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ৪১
পাবলিক রিলেশনের সূচনা ৪২
পাবলিক রিলেশন ও প্রোপাগান্ডার সম্পর্ক ও পার্থক্য ৪৮
পাবলিক রিলেশন ও সাংবাদিকতা ৪৯

অধ্যায় ৪ : সাংবাদিকতা বনাম প্রোপাগান্ডা ৫৪
হারম্যান ও চমস্কির 'প্রোপাগান্ডা মডেল' ৫৬
অ্যামেরিকায় ফ্ল্যাক : ইসরায়েলি লবিং ৬১

অধ্যায় ৫ : প্রোপাগান্ডা মডেলের কার্যকারিতা যাচাই ৬৮

অধ্যায় ৬ : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ : নারকীয় ধ্বংসলীলা ৮৬
হিরোশিমাতে আর্তনাদ ১০০

অধ্যায় ৭ : ভিয়েতনাম যুদ্ধ : উপনিবেশ বনাম স্বাধীনতা ১১৪
যুদ্ধে ক্ষয়ক্ষতির পরিসংখ্যান ১৩২

অধ্যায় ৮ : অ্যামেরিকা, ইরাক ও আফগানিস্তান ১৪২
৯/১১ ..... ১৫১
সাদ্দাম হোসেন ও গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্র ১৫৫
ইরাকের নিউক্লিয়ার প্রোগ্রাম ১৫৮
সশস্ত্র সংগঠনের সম্পৃক্ততা ১৬১
ইরাক যুদ্ধে বৈশ্বিক 'জনসমর্থন' ১৬৪

যুদ্ধ শুরুর পরবর্তী পর্যায়ে প্রোপাগান্ডা ১৬৬
অ্যামেরিকার ফেরি করা স্বাধীনতার প্রকৃত রূপ ১৭২
আফগানিস্তান যুদ্ধ ১৭৩
ইরাক যুদ্ধ ১৮০
আবু গারিব, গুয়ান্তানামো | অসভ্যতার সীমা কোথায় ১৮৬
নির্যাতনের স্বরূপ ১৮৮
লাশের দীর্ঘ মিছিল ২০৭

অধ্যায় ৯ : বাংলাদেশে প্রোপাগান্ডা ২২০
'সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প' এবং মিডিয়ার মিথ্যাচার ২৩১
মুক্তিবাহিনীদের বিজয়ে সেক্যুলার মিডিয়ার মৃগীরোগ ২৩৮
বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা ২৪৩

অধ্যায় ১০ : প্রোপাগান্ডার কমন কিছু পদ্ধতি ২৮১

অধ্যায় ১১ : প্রোপাগান্ডা বিশ্লেষণ এবং আত্মরক্ষার উপায় ২৯৩
প্রোপাগান্ডা কিভাবে প্রতিরোধ করব ৩০১
শেষ কথা ৩১৫

ইটটার জবাব পাটকেলেও হয় ৩১৫

অভিমত ৩১৯

লেখকের কথা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর, যিনি আসমান ও জমিনে থাকা সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা। দরুদ ও সালাম পেশ করছি সেই মহান রাসূলের প্রতি, যাঁর আগমনে উদ্ভাসিত হয়েছে বিশ্ব মানবতা। দূরীভূত হয়েছে সকল তাগুতের কালিমা। মানুষ আবারও খুঁজে পেয়েছে মহান আল্লাহকে পাওয়ার সরল পথ। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

প্রোপাগান্ডা বহির্বিশ্বে বেশ জনপ্রিয় শব্দ হলেও আমাদের দেশে আম পর্যায়ে শব্দটির তেমন প্রচলন নেই। তবে, শব্দের পরিচিতি কম থাকলেও আমাদের দেশে যে এর প্রয়োগ নেই, তেমনটি ভাবা বোকামি হবে। ডিজিটাল ডিভাইসের এই শতাব্দীতে বহির্বিশ্বের বহু সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে প্রোপাগান্ডাও আমাদের দেশে সয়লাব হয়ে পড়েছে। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সুবিধাবাদী নানা গ্রুপ ইসলাম, মুসলিম ও এই অঞ্চলের অধিবাসীদের বিপক্ষে নিত্যনতুন প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে। এসবের বিপরীতে আমাদের অগ্রজ আলিম ও অন্যান্য শুভাকাঙ্ক্ষীরা সবসময়ই সঠিক বিষয়টি তুলে ধরার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। আলহামদু-লিল্লাহ।

তবে, মৌলিকভাবে প্রোপাগান্ডা কী, কীভাবে এর প্রয়োগ হয়, প্রোপাগান্ডা কীভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে মুসলিমদের বিরুদ্ধে এর কার্যকারিতা হ্রাস করা যায়, সেসকল বিষয়ে লেখালেখির দায়বদ্ধতার বিষয়টা হুট করেই আমার চিন্তায় আসে। আর সেখান থেকেই মূলত এই বিষয়ে লেখালেখির শুরু। শুরুতে শুধুই প্রতিবেদন লেখার ইচ্ছা থাকলেও পরবর্তী সময়ে দেখতে পাই, প্রোপাগান্ডার পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত। তাই, লিখতে লিখতে এক সময়ে চিন্তাটা প্রতিবেদনের বদলে মলাটে ঢোকার পরিকল্পনায় রূপান্তরিত হয়।

প্রোপাগান্ডার ব্যাপারে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের তথ্য জোগাড় করতে আমি মূলত পশ্চিমা সোর্সের ওপর নির্ভর করেছি। পশ্চিমা শিক্ষক, পণ্ডিত, গবেষকদের দেওয়া তথ্য থেকে যাচাই-বাছাই করে বইটিতে সকল তথ্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে। বিষয়টি এ জন্য করা হয়েছে, যেন দেশীয় কাণ্ডজ্ঞানহীন সেক্যুলাররা কোনো সোর্সের বিপক্ষে এ কথা বলতে না পারে—সেক্যুলারদের ছড়ানো প্রোপাগান্ডা শুধু ইসলামি সোর্স দিয়ে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়!

এ বইটি লিখতে গিয়ে আমার অনুপ্রেরণা ছিল এ দেশের সবচেয়ে বড় ইন্টেলেকচুয়াল লেখক (আমার দৃষ্টিতে) ডাক্তার শামসুল আরেফীন শক্তি ভাই। উনার যে চিন্তাধারা, যে কর্মময় জীবন, তা থেকে যে সুবাসিত জ্ঞানের আলোকোজ্জ্বল ধারা প্রতিফলিত হয়ে চারপাশ মাতোয়ারা করে রেখেছে গত দশক। তা-ই আমার জন্য শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। যদিও আমি বা আমার কাজ ভাইয়ের পদতলে স্থান পাবারও যোগ্যতা রাখে না, তবুও নানা সময়ে শক্তি ভাইয়ের পরামর্শ আমাকে উজ্জীবিত রেখেছে। এমনিতে কাজটা সহজ হলেও আমার মতো অধমের জন্য তা বেশ কঠিন ছিল। শুধুমাত্র শক্তি ভাইয়ের কাজগুলো দেখেই আমি দৃঢ়পদ ছিলাম। তাছাড়া করোনা-কালীন বইটা লেখার সময় আমার পরিবারের সদস্যদের সাপোর্টের কথাও অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। আল্লাহ তাদেরকে যথাযথ প্রতিদান দিন।

লেখাগুলো ছাপানোর যোগ্য কি না, সে বিষয়ে আমি সন্দিহান থাকলেও সন্দীপন প্রকাশনীর শ্রদ্ধেয় ও অগ্রজ প্রকাশক ভাই নিজ অনুগ্রহে এ ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এছাড়াও দেশের তরুণ সমাজের অন্যতম প্রিয় ব্যক্তিত্ব মুহতারাম জাকারিয়া মাসুদ ভাইও লেখাগুলোকে ছাপার যোগ্য করে তুলতে ব্যাপক খাটাখাটুনি করেন। প্রিয় শক্তি ভাই, শ্রদ্ধেয় প্রকাশক ও জাকারিয়া মাসুদ ভাই ছাড়াও আরও অনেকে আমাকে লেখাগুলো বই আকারে আনতে উৎসাহ দেন। তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম কথাটি উচ্চারণ করেছিলেন আমারই প্রিয় জুনিয়র মোহাম্মদ হোসাইন। এছাড়াও মুহাম্মদ নাফিস নাওয়ার ভাইয়ের অনুগ্রহের কথা হয়তো লিখে প্রকাশ করা যাবে না। তাই সে চেষ্টা আর নাই-বা করলাম। আল্লাহ তাআলা আমার প্রিয় এই মানুষগুলোকে কবুল করে নিন। এই দুআই মহান রবের দরবারে করে যাই বারবার।

আমি খুবই সাধারণ একজন মানুষ। প্রোপাগান্ডা বিশ্লেষণে সামান্য কিছু তথ্য জানলেও ইলমের দিক দিয়ে আমি নিতান্তই মূর্খ। তাই কোনো ভুল পেলে তা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ এবং তা সরাসরি আমাকে জানালে সর্বোত্তম অনুগ্রহ হয়।

বিনীত নিবেদক
অধম বান্দা
সাজিদ হাসান

অধ্যায় ১

প্রোপাগান্ডা কী

সাল ২০১৩, ফেব্রুয়ারি মাসের পাঁচ তারিখ। দিনটি ছিল অন্যান্য দিনের মতোই সাধারণ একটি দিন। কিন্তু, সেদিনের ইতিহাস বদলে দেয় বাংলাদেশের রাজনীতির সাম্প্রতিক সব প্রেক্ষাপট। ঐ দিন হঠাৎ করেই শাহবাগে কিছু সংখ্যক ব্লগার ও অনলাইন এক্টিভিস্ট একত্রিত হয়ে একটি রাজনৈতিক দলের নেতার ফাঁসির দাবিতে প্ল্যাকার্ড হাতে জড়ো হন। উপস্থিত সকলেই ছিলেন যুদ্ধাপরাধের বিচারের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ। এরপর থেকে দিনে দিনে শাহবাগে মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকে। একই সঙ্গে বাড়তে থাকে মিডিয়ার ফলোআপ। দেশীয় মিডিয়ায় সেই জমায়েতকে 'পবিত্র' থেকে 'পবিত্রতম' সব ভূষণে ভূষিত করা শুরু হয়। এ যেন দেশকে 'পরিশুদ্ধ' করার অভূতপূর্ব এক আন্দোলন। সৌভাগ্যজনকভাবে, তৎকালীন রাষ্ট্রযন্ত্রও তাদের জন্য সকল প্রকার সাহায্য-সহায়তা নিশ্চিত করে। সমাবেশের নেতৃত্ব কাদের হাতে—সেটি তখনো জনতার সামনে স্পষ্ট হয়নি। এভাবেই অভূতপূর্ব এক ঘটনার মুখোমুখি হয় বাংলাদেশ। বলা যায়, অধিকাংশ মানুষই তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। ঘটনার ঘনঘটায় তারা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না—পর্দার আড়ালে কারা কলকাঠি নেড়ে চলেছে।

চরম বিশৃঙ্খলার তাৎক্ষণিক ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠে ধাতস্থ হতে দেশবাসীর অনেকটাই সময় লেগে যায়। আর তারপরই দেশের মুসলিম জনগণ সবিস্ময়ে আবিষ্কার করে, আন্দোলনে ক্রমেই ফুটে উঠছে ইসলাম-বিদ্বেষী আচরণ। ইসলামের সুন্নাহ ও ফরয বিধানগুলোকে অবমাননা করার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ, রাসূল ﷺ ও তাঁর সম্মানিত স্ত্রীদের নিয়ে সমাবেশটির নেতৃবৃন্দদের মিথ্যা ও চরমতম নোংরা কথা প্রচারের তথ্য ক্রমেই প্রকাশ্যে চলে আসতে শুরু করে। দেখা গেল, রাষ্ট্রীয় ছত্রছায়ায় বসে ব্লগাররা নির্বিঘ্নে ইসলামের ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ প্রচার করে যাচ্ছে। শাহবাগের জমায়েতে সকলের দৃষ্টি পতিত হবার পরই কেবল সেই তথ্যগুলো সবার নজরে পড়ে। যে সেক্যুলার দলগুলো সমাবেশের নেতৃত্ব দিচ্ছিল, তাদের কর্মীরা ইসলামের মৌলিক বিধানগুলো নিয়ে মিথ্যা তথ্য আর সন্দেহজনক কথাবার্তা নিরবচ্ছিন্নভাবে অনলাইনে ছড়িয়ে যাচ্ছিল। আর ইসলামের মৌলিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত জেনারেল কারিকুলামের কিশোর-তরুণরা সেগুলো পড়ে নিজের দ্বীন নিয়ে সংশয়ের সম্মুখীন

হচ্ছিল। কেউ কেউ ইসলামের মৌলিক বিধানগুলো পালনে কাঁচুমাচু করছিল, কেউ কেউ দ্বীনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে জুটছিল নাস্তিকদের দলে।

উত্তাল ওই সময়টাতে রাষ্ট্রীয় মদদ-প্রাপ্ত সেক্যুলার নাস্তিকরা শাহবাগে অনেক অপকর্মই করেছে। তবে, অনলাইনে 'মুক্তচিন্তা'র নামে শাহবাগীরা যেসব 'আদর্শ' ও 'তথ্যে'র প্রচার ও প্রসার করেছিল, সেই কার্যক্রম তথা সিস্টেমকে ব্যাপক অর্থে আমরা অভিহিত করতে পারি 'প্রোপাগান্ডা' বা 'অপপ্রচার' হিসেবে। তথ্য-প্রযুক্তির এই যুগে পত্রিকা, টেলিভিশন, বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনো জটিল ও বিবদমান বিষয়ে আলোচনা-সমালোচনায় প্রোপাগান্ডা খুবই সহজলভ্য একটি উপাদান। সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে বিপক্ষ দলীয় যেকোনো সমালোচনা, অভিযোগকে মিথ্যা হিসেবে অভিহিত করতেও মিডিয়ায় এই শব্দের বহুল ব্যবহার প্রচলিত। আমাদের দেশে আমজনতার মাঝে এই শব্দটার প্রচলন এখনো তেমনভাবে শুরু হয়নি, তথাপি 'প্রোপাগান্ডা' বলতে যা বোঝায়, সেটি এখানে দুর্লভ নয়। ধোঁকা আর মিথ্যার চর্চা বহুকাল ধরেই বাংলাদেশে চলমান। পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোতে ক্রমাগত চলমান এক্সপেরিমেন্টের ফলে বর্তমান সময়কার প্রোপাগান্ডার পদ্ধতিগুলো হয়ে উঠেছে আরও তীক্ষ্ণ-সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এক সাইকোলজিকাল অস্ত্র। যেগুলো বিশ্বায়নের যুগে অতি দ্রুতই ছড়িয়ে পড়ছে এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে। আর প্রভাবিত করছে সকল শ্রেণির মানুষের জীবন ও কর্মপ্রক্রিয়া। তাই, প্রোপাগান্ডা সম্পর্কে মুসলিমদের বিস্তারিত ধারণা রাখাটা বেশ জরুরি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা অতীব প্রয়োজনীয়ও বটে।

প্রোপাগান্ডা বা অপপ্রচার বলতে আসলে কী বোঝায়? এটি মূলত একটি বিমূর্ত বিষয়; হাতে ধরা বা ছোঁয়া যায় না। প্রোপাগান্ডার এমন কোনো সংজ্ঞা নির্ধারণ করা কঠিন যা এর সকল দিক সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করতে পারবে। তবে, এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মতামত জানলে বিষয়টি অনুধাবন আমাদের জন্য অনেকটাই সহজ হবে। মিশিগান স্টেট ইউনিভার্সিটির রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এমিরেটাস প্রফেসর ব্রুস স্মিথের মতে, 'প্রোপাগান্ডা হলো একটি পরিকল্পিত প্রচেষ্টা—যা জনগণের বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি ও আচার-আচরণকে যেকোনো উপায়ে বদলে নিজেদের পক্ষে আনতে সচেষ্ট হয়' (Smith B. L., 2021)। তিনি বলেন, 'সাধারণ আলাপচারিতা ও স্বাভাবিক ভাব-বিনিময়ের সাথে প্রোপাগান্ডার পার্থক্য হলো—সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সুদৃঢ় পরিকল্পনা আর সুচিন্তিত উপায়ে প্রয়োগ।'

ফিলোসফির কানাডিয়ান প্রফেসর র‍্যান্ডাল মার্লিন অপপ্রচারের সংজ্ঞায়নে বলেন, 'প্রোপাগান্ডা হলো যোগাযোগের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক শ্রোতার (বা দর্শক/পাঠকের) বিশ্বাস-আচরণকে প্রভাবিত করা বা (কোনো) আচরণ (এমন উপায়ে) বদ্ধমূল করে দেওয়া, যা ব্যক্তির যথাযথভাবে অবহিত, যুক্তিসংগত, চিন্তাশীল সিদ্ধান্তকে বোকা বানায় বা দমন করে' (Marlin, 2013, p. 12)।

ইয়েল ইউনিভার্সিটির প্রয়াত অধ্যাপক ও বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হ্যারল্ড ল্যাসওয়েল বলেন, 'কোনো ব্যক্তি বা দল যখন অন্য কোনো দল বা ব্যক্তির মতামত অথবা কর্মপ্রক্রিয়াকে মনস্তাত্ত্বিক প্ররোচনার মাধ্যমে নিজেদের অভিব্যক্তি ও কর্মপ্রক্রিয়ার দ্বারা প্রভাবিত করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে চায়, সেসব কর্মপ্রক্রিয়া বা মতামতই প্রোপাগান্ডা' (Ellul, 1965/1973, pp. x-xi)।

ইয়েল ইউনিভার্সিটির দর্শনের অপর এক প্রফেসর জ্যাসন স্ট্যানলির ভাষায়, 'প্রোপাগান্ডা হলো এমন কৌশলের অংশ, যার মাধ্যমে জনগণ তাদের উদ্দেশ্য নিরূপণের সর্বোত্তম উপায় সম্পর্কে প্রতারিত হয়। ফলে কীসে তাদের নিজেদের কল্যাণ রয়েছে, সেটি সম্পর্কেও তারা প্রতারিত হয়' (Stanley, 2015, p. 01)।

নিউ সাউথ ওয়েলসের প্রয়াত প্রফেসর ও মনস্তত্ত্ববিদ[১] অ্যালেক্স কেরি কর্পোরেট জগতের প্রোপাগান্ডাকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেন, 'প্রোপাগান্ডা হলো (এক প্রকার) যোগাযোগ—যার গঠন ও বিষয়বস্তু এমনভাবে নির্ধারিত হয়, যেন তা টার্গেটিকৃত কিছু দর্শক-শ্রোতাকে এমনসব বিশ্বাস ও আচরণ গ্রহণ করায়, যা (সেই) যোগাযোগ-ব্যবস্থার স্পন্সররা আগেই নির্ধারিত করে রেখেছে।'

তিনি আরও বলেন, 'বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন আর জনসংযোগ—প্রোপাগান্ডার এই প্রকরণ দুটি গণতন্ত্রে বেশ প্রচলিত... জনগণের মতামত গঠনে কমার্শিয়াল প্রোপাগান্ডা সফল কি না—এ নিয়ে বেশ তর্ক হয়। তথাপি "আমরা প্রোপাগান্ডার প্রভাব থেকে মুক্ত"—দিনশেষে এই কথাটিই বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে সফল প্রোপাগান্ডাগুলোর মধ্যে একটি' (Carey, 1995, pp. 20-21)।

প্রোপাগান্ডা পরিভাষাটির ব্যাখ্যায় কমিউনিকেশানের বিখ্যাত দুই প্রফেসর জোয়েট এবং ওডনেল বলেন, 'প্রোপাগান্ডা একটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও সুশৃঙ্খল, সিস্টেমেটিক প্রচেষ্টা, যা টার্গেট-করা ব্যক্তির উপলব্ধিকে নির্দিষ্ট ছাঁচে পুনর্গঠিত করে। তার চিন্তাধারাকে ব্যবহার করে ও তার কর্মপ্রক্রিয়াকে নিপুণভাবে পরিচালনা করে' (Jowett & O'Donnell, 1986/2012)।

অপপ্রচারের সবচেয়ে সুন্দর ও সহজবোধ্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন পাবলিক রিলেশনের জনক এডওয়ার্ড বার্নেইস। তার মতে, 'মডার্ন প্রোপাগান্ডা হচ্ছে কোনো দল, প্রতিষ্ঠান, মতবাদ কিংবা দর্শনের সাথে জনগণের সম্পর্ক প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত ঘটনাবলী বাস্তবায়ন ও তা রূপায়ন করার দীর্ঘস্থায়ী ও নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস' (Bernays, 1928)।

বার্নেইস বলেন, 'প্রোপাগান্ডা ল্যাবরেটরিতে গবেষণার ফলস্বরূপ পাওয়া কোনো

[১] Psychologist

বৈজ্ঞানিক সত্য নয়, তবে জনতার মনস্তত্ত্ব[১] নিয়ে গবেষণার অগ্রগতির আগ পর্যন্ত প্রোপাগান্ডাকে যেরকম অবাস্তব ব্যাপার ভাবা হতো, পরবর্তীকালে সেই ধারণাটি আর ঘোপে টেকে না। প্রোপাগান্ডার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চাইলে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার যে যথার্থতা প্রয়োজন, সেটি কখনোই পাওয়া সম্ভব নয়। তাই আমরা বলতে পারি, সমাজ বিজ্ঞান, অর্থনীতি কিংবা সাইকোলজির মতো প্রোপাগান্ডাও এমন একটি বিষয়, যা কখনোই নির্ভুল বৈজ্ঞানিক সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না; উপরিউক্ত উদাহরণগুলোর মতো প্রোপাগান্ডাও মানবসত্তা নিয়ে কাজ করে।

প্রোপাগান্ডার প্রতিশব্দ হিসেবে আরও একটি শব্দ ব্যবহৃত হয়—গুজব (Disinformation)। সাধারণত ব্ল্যাক প্রোপাগান্ডাকে[২] Disinformation হিসেবে গণ্য করা হয়। কারণ, এই টাইপের প্রোপাগান্ডা নিজের সম্পর্কে তথ্য গোপন করে ভুলভাল তথ্য প্রচার করে। এই শব্দটি রাশিয়ান Dezinformesta শব্দের সমগোত্রীয়, যা 'কেজিবি'র[৩] গুজব প্রচারের কাজে নিয়োজিত একটি শাখার নাম থেকে নেওয়া হয়েছে। 'গুজব' বলতে এমন সব মিথ্যা, অসম্পূর্ণ অথবা বিভ্রান্তিকর তথ্যকে বোঝানো হয়, যা উদ্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দেশের জনগণের উদ্দেশ্যে প্রচার করা হয় (Shultz & Godson, 1984, p. 37)

অনেকেই এই পরিকল্পিত গুজবকে ভুল-তথ্যের (Misinformation) সাথে গুলিয়ে ফেলেন। ভুল তথ্যের উদ্ভব শুধুমাত্র অনিচ্ছাকৃত ভুলের কারণে হয়ে থাকে। অন্যদিকে গুজব তৈরি করা হয় স্বেচ্ছায়, প্রতিপক্ষকে দুর্বল করতে।

গুজব বিভিন্ন উপায়ে ছড়ানো যায়। সরাসরি গুজব তো রয়েছেই, এছাড়াও সূক্ষ্ম বিভিন্ন উপায়ে গুজবের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। দুটো উদাহরণ দিই। ধরুন, বাংলাদেশের কোনো প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ক্ষমতাসীন সরকার তার অভ্যন্তরে থাকা মুসলিমদেরকে দমন করার উদ্দেশ্যে কোনো মিথ্যা সংবাদ রাষ্ট্রের প্রধান সব সংবাদ-মাধ্যমে গোপনে পাঠায়। এরপর সংবাদমাধ্যমগুলো উক্ত সংবাদ প্রচার করে। ফলাফল, রাষ্ট্রটির অমুসলিম নাগরিকরা সেই সংবাদকে মিডিয়াকর্মীদের সংগৃহীত 'নির্ভরযোগ্য' তথ্য মনে করে[৪] এবং দেশ জুড়ে মুসলিমদের বিপক্ষে আরম্ভ হয় গণহত্যা।

অথবা ধরুন, সরকারের কর্তাব্যক্তিরা ঐ দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় পত্রিকা

---

[১] Mass Psychology, এর অর্থ হলো সাধারণ জনগণের মনস্তাত্ত্বিক চিন্তা ও কর্মের প্যাটার্ন
[২] পরবর্তীকালে বিশ্লেষণ করা হয়েছে
[৩] সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন নিরাপত্তা সংস্থা
[৪] মূল মডেলটি এরকম : কোনো প্রোপাগান্ডিস্ট (a) তার তথ্য গোপনে অন্য একটি সোর্সে (b) পাঠায় এবং সেখান থেকে তা প্রচারিত হয়। গ্রাহক (c) দ্বিতীয় সোর্স থেকে তথ্য গ্রহণ করে, ফলে সে ঐ সংবাদকে আসল প্রোপাগান্ডিস্ট-এর (a) সাথে সম্পৃক্ত না করে বরং দ্বিতীয় সোর্সের (b) সাথে সম্পৃক্ত করে।

ও টিভি চ্যানেলগুলোতে সরকারের ইমেজ বৃদ্ধিতে সহায়ক মিথ্যা সংবাদ পাঠায়। তারপর সেই তথ্য ঐ সকল টিভি চ্যানেল ও পত্রিকাগুলো সম্পাদনা করে নিজেদের 'সংগৃহীত' তথ্য হিসেবে প্রচার করে। পরবর্তীকালে সরকার সেই সংবাদটি বিভিন্ন পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করে এই বলে প্রচার করে যে, 'অমুক পত্রিকা মুসলিমদের অপকর্মের এই সংবাদটি ফাঁস করেছে'। সাধারণ জনগণ কিন্তু তখনো জানে না যে, এই তথ্যটি সরকারপক্ষই মিডিয়াকে সাপ্লাই দিয়েছে।[১]

এই জটিল প্রক্রিয়ার মারপ্যাঁচে সেই সংবাদ বিশ্বাসযোগ্যতা লাভ করে। একইসাথে তা প্রকৃত প্রোপাগান্ডিস্ট বা অপপ্রচারকের[২] সাথে সংবাদের সংযোগসূত্রও বিচ্ছিন্ন করে। উভয়ক্ষেত্রেই অপপ্রচারের মূল হোতাদের প্রধান লক্ষ্য হলো—তথ্যের যোগানদাতার পরিচয় গোপন করা, সেইসাথে সংবাদ এবং সংবাদের উৎসের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানো (Jowett & O'Donnell, 1986/2012, p. 26)। বলে রাখা ভালো, উভয়ক্ষেত্রেই প্রচারিত সংবাদ থাকে মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর ও অন্যান্য ত্রুটিপূর্ণ।

যাই হোক, প্রোপাগান্ডার এরকম আরও অনেকগুলো সংজ্ঞা রয়েছে (Marlin, 2013, pp. 04-13)। তাই, প্রধানতম ও গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যাগুলো বিশ্লেষণ করার পর আমরা বলতে পারি যে, কোনো ব্যক্তি, দল বা গোষ্ঠী অপর কোনো টার্গেটকৃত জনবলের চিন্তা, কথা ও কর্মকে প্রভাবিত করার প্রচেষ্টাকেই সচরাচর প্রোপাগান্ডা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এক্ষেত্রে একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, অধিকাংশ স্কলারই সচরাচর নৈতিকতার বিষয়টি প্রোপাগান্ডার সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করেন না। প্রোপাগান্ডা ও নৈতিকতার সংশ্লিষ্টতা নিয়ে বেশ মতভেদও বিদ্যমান। যেমন : প্রফেসর ফিলিপ টেইলরের মতে এটি অন্যান্য যোগাযোগ-পদ্ধতির মতোই একটি পদ্ধতি (Taylor, 1990/2003, p. 321)। তিনি মনে করতেন, প্রোপাগান্ডা ভালো বা মন্দ হয় না, প্রকৃতপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ হলো প্রোপাগান্ডা পরিচালনার পেছনের উদ্দেশ্য।

তবে, এখানে কিছু কথা থেকে যায়। প্রোপাগান্ডা শব্দটির উৎপত্তি মূলত ইউরোপে; সেখানে-সহ সারা পৃথিবীতে আজ প্রধানত গর্হিত সব কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নেই প্রোপাগান্ডা ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও, মুসলিম হিসেবে আমাদের চিন্তা পৃথিবীর বাকি সকল জাতির মানুষদের থেকে ভিন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ, ইসলামে হালাল-হারাম বা নীতি-নৈতিকতার যেরকম গুরুত্ব দেওয়া হয়, অন্যকোনো জাতি

[১] প্রোপাগান্ডিস্ট (a) তার তথ্য কোনো বিশ্বাসযোগ্য সোর্সে (b) পাঠায়। পরবর্তীকালে সে তথ্য ঐ সোর্স (b) থেকে সরাসরি বা সম্পাদনা করে প্রচার করা হয় এবং প্রোপাগান্ডিস্ট (a) সেই তথ্যটি দ্বিতীয় সোর্স (b) থেকে সংগ্রহ করে টার্গেটকৃত দর্শকদের (c) উদ্দেশ্যে প্রচার করে। দর্শক/তথ্যের গ্রাহক (c) ভেবে নেয় যে, তথ্যটি মূলত দ্বিতীয় সোর্স (b) থেকে উৎসারিত হয়ে প্রথম জনের (a) কাছে এসেছে; যদিও বিষয়টি তার উলটো।

[২] প্রোপাগান্ডিস্ট বলতে তাদেরকে বোঝানো হয় যারা প্রোপাগান্ডা প্রচার ও প্রসার করে।

সচরাচর তেমনটা করে না। তাই, পশ্চিমাদের সংজ্ঞায় প্রোপাগান্ডা সংজ্ঞায়িত করলে এ সংজ্ঞায় কিছুটা ফাঁক রয়ে যায়। ইসলামের নৈতিকতার বিধান দিয়ে পরীক্ষা না করে কোনো কর্মপদ্ধতি নির্দ্বিধায় গ্রহণ করা আমাদের জন্য সমীচীন নয়।

একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। পশ্চিমা বিশ্বে অনেক মুসলিম দাঈ তাবলীগের কাজ করে যাচ্ছেন—মানুষের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিচ্ছেন; অপরদিকে সমগ্র পৃথিবীতে সেক্যুলাররা সেক্যুলারিজমের এবং খ্রিষ্টান মিশনারিরা খ্রিষ্টধর্মের প্রচার করছেন। এখন ইসলাম ও ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা[১] প্রচার করাটা কট্টর সেক্যুলার ও খ্রিষ্টান মিশনারিদের কাছে প্রোপাগান্ডা। অপর দিকে, ইসলামকে 'সেকেল' দাবি করে নতুন প্রজন্মকে লিবারেল সেক্যুলারিজম ও নাস্তিক্যবাদের দিকে আহ্বান করা কিংবা অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে দরিদ্র মুসলিমদেরকে খ্রিষ্টধর্মের প্রতি আহ্বান—উভয় প্রকার কাজই প্রতিটি সচেতন মুসলিমের কাছে একটি নিকৃষ্ট প্রোপাগান্ডা। কারণ, মুসলিম মাত্রই ইসলামে বিশ্বাসী। আর আমরা জানি, কোনো মুসলিমের ইসলাম ত্যাগের অর্থ—সে চিরস্থায়ী জাহান্নামি (যদি তাওবা করে পুনরায় ইসলামে না ফিরে আসে)।

তাই, এমনটা বলা অস্বাভাবিক নয় যে, প্রোপাগান্ডা ব্যক্তি-নিরপেক্ষ[২] নয়, বরং ব্যক্তি-নির্ভর[৩] (একেক জনের জন্য একেক বিধান)। সেই জন্য প্রোপাগান্ডার সংজ্ঞায়ন ও চিহ্নিতকরণের পূর্বে আমাদের নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা রাখা প্রয়োজন। আমরা মুসলিম। মহান আল্লাহ তাআলাকেই আমরা আমাদের রব হিসেবে মানি ও তাঁর ইবাদত করি। তাঁর দেওয়া জীবন-বিধানকে শাশ্বত ও চিরন্তন হিসেবে বিশ্বাস করি। সেহেতু, প্রোপাগান্ডার সংজ্ঞার আওতাভুক্ত এবং ইসলামের সাথে সংশ্লিষ্ট সেসব চিন্তা ও কর্মকেই আমরা প্রোপাগান্ডা হিসেবে চিহ্নিত করব, যেগুলো ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শের বিপরীত। ইসলামি শিক্ষার সাথে সুস্পষ্টরূপে সাংঘর্ষিক। অপরপক্ষে, যেসকল ঘটনা কাফির-মুশরিকদের অভ্যন্তরীণ বিষয়, সেগুলো তাদের মানদণ্ডেই প্রোপাগান্ডা হিসেবে চিহ্নিত করব ইন-শা-আল্লাহ।

প্রোপাগান্ডার প্রকারভেদ

প্রোপাগান্ডা প্রক্রিয়া সম্পাদনের অনেক প্রকার উপায় রয়েছে। তথাপি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, সেটি কিছু পদ্ধতিকে বেশি অনুসরণ করে কিংবা সেই পদ্ধতির

[১] ইসলামে নারীদের ভূমিকা, নারী ও পুরুষের মাঝে ইসলামের নির্দিষ্ট করে দেওয়া কিছু পার্থক্য, ইসলামি শারীয়াত, ইসলামি শাসনব্যবস্থা, ইসলামি অর্থনীতি ইত্যাদি।

[২] Objective

[৩] Subjective

সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখে। যেকোনো প্রোপাগান্ডার ভেতরের তথ্য, তথ্যের যথার্থতা এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট উৎসের ওপর ভিত্তি করে প্রোপাগান্ডাকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়—

- ১. হোয়াইট প্রোপাগান্ডা
- ২. গ্রে প্রোপাগান্ডা
- ৩. ব্ল্যাক প্রোপাগান্ডা

❁ ১. হোয়াইট প্রোপাগান্ডা

এর উৎপত্তি এমন উৎস থেকে হয়ে থাকে, যে উৎস সঠিকভাবে শনাক্ত করা যায়। পাশাপাশি প্রোপাগান্ডামূলক বার্তাটি যে 'তথ্য' সরবরাহ করে, সেটিও আপাতদৃষ্টিতে নির্ভুল বলেই মনে হয়। জরুরি অবস্থা ব্যতীত তথ্যের বিশুদ্ধতা বজায় রেখে সংবাদমাধ্যম যেসব বিকৃত মতবাদ (যেমন : সেক্যুলারিজম, লিবারেলিজম) প্রচার-প্রসার করে, সেটাই হোয়াইট প্রোপাগান্ডা। তারা এই শ্রেণির যেসব সংবাদ পরিবেশন করে, সেসব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সত্যি। তবে তাতে অনেক সূক্ষ্ম অপপ্রচার মিশে থাকে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ব্যতীত তা চিহ্নিত করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। অনেক সময় বিজ্ঞ ব্যক্তিও এ শ্রেণির প্রোপাগান্ডা শনাক্ত করতে ব্যর্থ হয়।

প্রোপাগান্ডা এমনভাবে উপস্থাপন করা হয় যে, সংবাদ সরবরাহকারীরা নিজেদেরকে সেরা রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অধিকারী 'নিরপেক্ষ ও সৎ' ব্যক্তি হিসেবে দর্শকদের কাছে উপস্থাপন করে। সাধারণত, জনগণের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের জন্য হোয়াইট প্রোপাগান্ডা পরিচালনা করা হয়। যেন পরবর্তী সময়ে সে 'বিশ্বাসযোগ্যতা' অন্য কোনো কাজে লাগানো যায় (Jowett & O'Donnell, 1986/2012, p. 17) হোয়াইট প্রোপাগান্ডার ক্ষেত্রে সঠিক তথ্য প্রচার করা জরুরি। তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখতে এটি অপরিহার্য একটি বিষয়। কোনো নির্দিষ্ট দল বা মতবাদের যথার্থতা প্রতিষ্ঠা করাই এই ধরনের প্রোপাগান্ডার উদ্দেশ্য (Cull et al., 2003, p. 426)।

❁ ২. গ্রে প্রোপাগান্ডা

অবস্থান ব্ল্যাক ও হোয়াইট প্রোপাগান্ডার মাঝামাঝি। এই ধরনের প্রোপাগান্ডার ক্ষেত্রে সংবাদের যথার্থতা সঠিকভাবে নির্ণয় করা বেশ কঠিন, এবং তথ্যের উৎস-ও সহজে চিহ্নিত করা যায় না। যেমন : নাইন ইলেভেনের পরবর্তী সময়ে আফগানিস্তানের জনগণকে মার্কিন আগ্রাসন সম্পর্কে 'সচেতন' করতে অ্যামেরিকা ফুড কন্টেইনার ও কেবলমাত্র একটি সিগনাল ধরতে সক্ষম, এমন রেডিও আকাশপথে ড্রপ করে। আর সেই সিঙ্গেল সিগনালে মার্কিনীদের পরিচালিত রেডিও স্টেশন নিজেদের পরিচয়

অফিসিয়ালি প্রকাশ না করে চ্যানেলটিকে আফগান এফএম হিসেবে উল্লেখ করে। চ্যানেলটিতে আফগান সঙ্গীত সম্প্রচারের ফাঁকে ফাঁকে 'আফগানিস্তানের মহান জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণে' একটি বিবৃতি সম্প্রচারিত হয়। বার্তাঘোষক তাতে ঘোষণা করত : 'মার্কিন বাহিনী তাদের এলাকা অতিক্রম করবে এবং উসামা বিন লাদেন ও তাঁর সমর্থকদের গ্রেফতার করা ব্যতীত সাধারণ জনগণের ক্ষতি করার কোনো উদ্দেশ্য তাদের নেই' (Cull et al., 2003, p. 153)। গ্রে প্রোপাগান্ডার পরিধি যদিও আরও বিস্তৃত। কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানের অর্জনসমূহের বার্ষিক রিপোর্টে মিথ্যা বিবরণ, প্রোডাক্টের বিজ্ঞাপনে এমন দাবি করা, যে দাবি পূরণে উক্ত প্রোডাক্টটি অক্ষম—এ সবই গ্রে প্রোপাগান্ডার অন্তর্ভুক্ত।

❁ ৩. ব্ল্যাক প্রোপাগান্ডা

কোনো তথ্যের উৎস যখন গোপন করা হয় কিংবা কোনো অস্তিত্বহীন কর্তৃপক্ষের সাথে জুড়ে দিয়ে জালিয়াতি আর মিথ্যার প্রচারণা করা হয়—তখন তা ব্ল্যাক প্রোপাগান্ডা হিসেবে বিবেচিত হয়। নির্দিষ্ট সাধনের উদ্দেশ্যে অপপ্রচারকদের জন্য সোর্স গোপন করাটা জরুরি হয়ে পড়ে (Cull et al., 2003, p. 41)। আর্জেন্টিনা ও ব্রিটেনের মাঝে হওয়া ফকল্যান্ড যুদ্ধের সময়ে BBC আর্জেন্টাইন রেডিও ষ্টেশনে নতুন আদলে প্রোগ্রাম সম্প্রচার শুরু করে। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট বিবিসির চার্টারে একটি অস্পষ্ট শর্ত জুড়ে দিয়েছিল। যার ফলে তারা এই অধিকার লাভ করে যে, 'সংকটকালীন' সময়ে *বিবিসির* ট্রান্সমিটার দখলে নিতে পারবে সরকার। *বিবিসির* প্রোগ্রামগুলোর মধ্যে একটির শিরোনাম ছিল 'Ascension Alice', যেখানে একজন নারী ফকল্যান্ডে অবস্থানরত সৈন্যদের মনোবল বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে আবেদনময়ী কণ্ঠে প্রোগ্রাম পরিচালনা করত। উপস্থাপিকা উক্ত প্রোগ্রামে রিপোর্ট পেশ করে, 'আর্জেন্টাইন প্রেসিডেন্ট জেনারেল লিওপোল্ডো এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ফকল্যান্ড আইল্যান্ডের জন্য তিনি তার ৪০,০০০ সৈন্য বলি দিতে প্রস্তুত।' *অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস* (AP) দাবি করে, 'বিবিসি আর্জেন্টিনার সৈন্যদের উদ্দেশ্যে তাদের মায়ের আকুতিভরা আরজ নিবেদন করে, যেটি স্পষ্টতই মিথ্যা।' *বিবিসির* কাছে সৈন্যদের মায়ের অনুরোধগুলো কিভাবে পৌঁছেছিল, সেটাও তারা তখন খোলাসা করেনি (Jowett & O'Donnell, 1986/2012, p. 304)। যুদ্ধ যখন সমাপ্ত হয়, তখন *বিবিসির* নিরপেক্ষ আর যথার্থ সম্প্রচারের জনপ্রিয়তাকে ভিন্ন কাজে লাগানোর জন্য ব্রিটিশ সরকার বেশ সমালোচনার শিকার হয় (Cull et al., 2003, p. 42)।

ব্ল্যাক প্রোপাগান্ডা তার বৈশিষ্ট্য অনুসারে সর্বদাই ধোঁকা দিতে চেষ্টা করে। এটি ধোঁকাবাজির সকল মাধ্যমকে প্রোপাগান্ডা দিয়ে পরিবেষ্টিত করে ফেলে। যেমন :

পোস্টার, লিফলেট, স্ট্যাম্প, রেডিও, টিভি, হাল আমলের ইন্টারনেট ইত্যাদি। এই ধরনের প্রোপাগান্ডার স্বরূপ যখন উন্মোচিত হয়, তখন সেটা উল্লেখযোগ্য মানুষের দৃষ্টি আকর্ষিত করে। ব্ল্যাক প্রোপাগান্ডার সফলতা-ব্যর্থতা প্রধানত প্রেরকের বিশ্বাসযোগ্যতা এবং গ্রাহকের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করে (Cull et al., 2003)।

এ তো গেল তথ্যের উৎসের ওপর ভিত্তি করে প্রোপাগান্ডার শ্রেণিবিন্যাস। ফ্রান্সের সমাজবিজ্ঞানী প্রফেসর জ্যাক এলিউল প্রোপাগান্ডাকে চারটি স্পেশাল ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করেন। প্রোপাগান্ডা যে বিশাল ক্ষেত্র জুড়ে বিস্তৃত, সেটি অনুধাবন করতে প্রফেসর ইললের ক্যাটাগরিগুলো বেশ সহায়ক ভূমিকা পালন করে—

❁ ১. রাজনৈতিক বনাম সামাজিক প্রোপাগান্ডা

পলিটিকাল প্রোপাগান্ডা একটি কেন্দ্রীয় কাঠামো দ্বারা গঠিত ও নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। সরকার, রাজনৈতিক অথবা স্বার্থবাদী দল এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। এ ধরনের প্রোপাগান্ডার সাথে সম্পৃক্ত যে রাজনৈতিক এজেন্ডা, তার মাধ্যমে একে সহজেই অন্য কোনো সংগঠনের সামাজিক প্রচারণা থেকে আলাদা করা যায়। অন্য দিকে, সামাজিক প্রোপাগান্ডা শনাক্ত করাটা বেশ কঠিন। মূলত এর মাধ্যমেই কোনো সমাজের সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে নতুন কোনো মতবাদকে ঐ সমাজে প্রবেশ করানো হয়। সচরাচর রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডা হয়ে থাকে—গণমাধ্যম ও অন্যান্য উপকরণ ব্যবহার করে জনগণকে কোনো রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক মতবাদ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা। কিন্তু সামাজিক প্রোপাগান্ডা তার থেকে আলাদা। বিজ্ঞাপন, চলচ্চিত্র, প্রযুক্তি, শিক্ষা উপকরণ ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এই ধরনের প্রোপাগান্ডা ফ্যাশন, ট্রেন্ড, মূল্যবোধ আর নৈতিকতার সংজ্ঞা নির্ধারণ করে (Ellul, 1965/1973, pp. 62-64)।

উল্লিখিত উভয় শ্রেণির প্রোপাগান্ডার মধ্যে পারস্পরিক সম্পৃক্ততাও লক্ষ্যণীয়। যেমন : জাতি-রাষ্ট্র, পশ্চিমা গণতন্ত্র ইত্যাদি রাজনৈতিক মতবাদ স্বাধীনতার নামে পৃথিবীর মানুষের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। অপরদিকে, আজকের বস্তুবাদী 'সভ্যতা' শিক্ষাব্যবস্থাকে করেছে সমন্বিত। যেখানে বালেগ হওয়ার পরও অনেকগুলো বছর ছেলে-মেয়েদের একত্রে সময় ব্যয় করতে হয়। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নামে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে ছেলে-মেয়েদের বিয়ের বয়স, সেই সাথে আর্ট আর কালচারের নামে প্রচার করছে নগ্নতা আর অসভ্যতা। সমাজের ফ্যাশন, ট্রেন্ড পরিবর্তন করার মহান দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে কতিপয় অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। তারা নারী স্বাধীনতার জয়গান গায়, অথচ পোশাক পাল্টানোর মতো জীবনসঙ্গী পরিবর্তন তাদের নিত্যদিনের অভ্যাস। এই উভয় পক্ষের মাঝে মোটা দাগে তেমন

কোনো স্বার্থের দ্বন্দ্ব নেই। ফলে প্রায়শই দেখা যায়, সামাজিক প্রোপাগান্ডা চালানো এই ব্যক্তি বা সংগঠনগুলোকে বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থা পোষা কুকুর হিসেবে গ্রহণ করে। অপরদিকে, সামাজিক অপপ্রচারকরা আত্মনিয়োগ করে রাষ্ট্রব্যবস্থার তোষামোদিতে। নগ্ন দালালিতে লিপ্ত হয়ে তারা সময় অতিবাহিত করে জনগণের স্বার্থ-বিরোধী কাজে।

❁ ২. উত্তেজিতকারী[১] বনাম একীভূতকারী[২] প্রোপাগান্ডা

উত্তেজিতকারী প্রোপাগান্ডা পরিচালিত হয় প্রকাশ্যে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এর ফলাফল হয় ধ্বংসাত্মক। কোনো সরকার বা প্রতিষ্ঠিত সিস্টেমকে বদলে দিতে এর প্রয়োজন হয়। এই ধরনের প্রোপাগান্ডা সর্বশক্তি ব্যবহার করে এর পক্ষে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে। ক্রুসেড, বিপ্লব (বলশেভিক, ফ্রেঞ্চ) কিংবা আচমকা রাজনৈতিক বা আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে এই ধরনের প্রোপাগান্ডা ব্যবহৃত হয়।

অপরদিকে, একীভূতকারী প্রোপাগান্ডা ব্যবহৃত হয় ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত কোনো সিস্টেমের সাথে নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের খাপ খাইয়ে তোলার উদ্দেশ্যে। সমাজ চায়—এর অভ্যন্তরে বসবাসকারী প্রতিটি ব্যক্তি নিজেকে ঐ সমাজের ক্ষুদ্র অংশ হিসেবে চিন্তা করুক। যেন সে ঐ সমাজের সকল প্রথা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ আর প্রভাব বিস্তারকারী আচরণের সাথে সম্পূর্ণরূপে ঐকমত্য পোষণ করে। সমাজের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক কর্মকাণ্ডকে সানন্দে, বিনা-প্রশ্নে গ্রহণ করে। প্রায়ই তাদেরকে মনে করিয়ে দেওয়া হয় যে, সকলের সাথে একীভূত হয়েই কেবল তারা নিজেদের 'পরিপূর্ণ' করতে সক্ষম হবে।

উসমানি সালতানাত ধ্বংস হবার পর উপনিবেশবাদীরা প্রায় প্রতিটি মুসলিম জনপদ দখল করে নেয়। তখন ফিলিস্তিন, সিরিয়া, ইরাক-সহ প্রায় সকল জনপদেই তাদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা চাপিয়ে দিতে শুরু করে। কালের আবর্তে পশ্চিমা উপনিবেশবাদীরা তাদের তাঁবেদার গোষ্ঠীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে। তখন হাকিম বদলালেও হুকুমের কোনো নড়চড় হয়নি। উল্টো হুকুমত আরও শক্তিশালী হয়েছে। উপনিবেশবাদীরা পর্যন্ত যেখানে পারিবারিক আইনে হাত দেয়নি, সেখানে তাঁবেদার গোষ্ঠী পারিবারিক আইনেও রদবদল করেছে। ওয়েস্টার্ন কালচারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলছে। একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত শক্তি অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধগুলোকেও তাদের নিজস্ব এজেন্ডার সাথে একীভূত করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করে। এছাড়াও (বর্তমানে) মৃতপ্রায় কমিউনিজমও তার জন্মলগ্নে উত্তেজক প্রোপাগান্ডা ছড়িয়েছিল, পরবর্তীকালে কোনো ভূখণ্ড কমিউনিস্টদের দখলে আসলে এর অনুসারীরা সেখানে একীভূতকারী প্রোপাগান্ডা প্রচার করত।

---

[১] Agitation
[২] Integration

❁ ৩. উলম্ব[১] বনাম আনুভূমিক[২] প্রোপাগান্ডা

উলম্ব প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে সাধারণত কোনো দল বা গোষ্ঠীর ঊর্ধ্বতন পদাধারী কোনো ব্যক্তি তার অধস্তন ব্যক্তিদের প্রভাবিত করতে চেষ্টা করে। যারা উক্ত প্রোপাগান্ডার সম্মুখীন হয়, তাদের নিষ্ক্রিয়তা এই শ্রেণির প্রোপাগান্ডা সফল করতে বড় ভূমিকা রাখে। যদিও তারা নিজেদের বিচার-বুদ্ধি ও আবেগ সঠিক উপায়ে ব্যবহার করে, তথাপি অনেক সময়ই তারা নেতার ইচ্ছার কাছে নিজেদের মতামত বিলীন করে দেয় বা দিতে বাধ্য হয়।

অপরদিকে আনুভূমিক প্রোপাগান্ডা কোনো দল বা গোষ্ঠীর অভ্যন্তরে পরিচালিত হয়—যেখানে প্রকৃত অর্থে কোনো নেতা নেই। পৃথক পৃথক ব্যক্তি একে অপরের স্পর্শে থাকে, প্রত্যেকেই দলের প্রতি 'সচেতন আনুগত্য' প্রদর্শন করে। উক্ত দলের ছোট ছোট প্যাকের ভিতর অনেক উপদল থাকতে পারে। প্রত্যেক গ্রুপই বৃহৎ দলটির জন্য কাজ করে। বাংলাদেশে এলজিবিটি প্রোমোশনে যারা কাজ করছে, তাদের দলকে এই প্রোপাগান্ডার কাতারে ফেলা যায়। এখানে অবশ্য বিভিন্ন ধরনের গ্রুপ একত্র হয়ে এই প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে।

❁ ৪. যৌক্তিক বনাম অযৌক্তিক প্রোপাগান্ডা

বেশিরভাগ সময়ই আমরা প্রোপাগান্ডাকে অযৌক্তিক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত করে থাকি। প্রোপাগান্ডা শুধুই ভুল, ত্রুটিপূর্ণ তথ্য এবং আবেগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—এই ধারণা পুরোপুরি সঠিক নয়। ফ্যাক্ট, পরিসংখ্যান ও বিশেষ তথ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রোপাগান্ডা পরিচালনা করা সম্ভব (Ellul, 1965/1973, p. 84)। যৌক্তিক প্রোপাগান্ডা দাবি করে, সে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এটা শুনতে হয়তো সঠিক মনে হতে পারে। অথচ এই প্রোপাগান্ডার ভিত্তিসমূহ সচরাচর সিলেক্টিভ, বিকৃত আর বিভ্রান্তিকর হয়ে থাকে (Soules, 2015, p. 08), যেমন ধরুন: পরিবেশ বিপর্যয় অস্বীকার, LGBTQ+ এর প্রচার।

ওয়েস্টার্ন প্রোপাগান্ডাগুলো অনেকাংশেই তাদের বৈজ্ঞানিক তথ্যের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়। যদিও পশ্চিমাদের বৈজ্ঞানিক গবেষণার পেছনের দর্শন অলৌকিক ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে অক্ষম, এবং তাদের বহু গবেষণার সঠিক ফলাফল তাদের আমজনতার বিশ্বাস ও কর্মের বিপরীত। তারপরও, সংকীর্ণ যুক্তি আর নির্দিষ্ট ও পক্ষপাতদুষ্ট কিছু গবেষণার ফলাফল প্রচার করে ওরা ওদের প্রোপাগান্ডা চালিয়ে যায়। মানুষের অন্তর্দৃষ্টি সীমাহীন নয়, তার কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যুক্তি দিয়ে সে জীবনের সব পথ অতিক্রম করতে পারবে না। যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, সেই

---

[১] Vertical
[২] Horizontal

আল্লাহ তাআলা আমাদের এই দুর্বলতা জানেন বিধায় আমাদের গাইডলাইন হিসেবে কুরআন নাযিল করেছেন। আল্লাহর আনুগত্য বাদ দিয়ে নিজেদের বুদ্ধিতে সমাধান খুঁজলে কেউ কেউ হয়তো দুনিয়ার জীবনটা জাঁকজমকের সাথে পাড়ি দিতে সক্ষম হবে। কিন্তু আখিরাতে সে অভূতপূর্ব বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে বাধ্য।

বর্তমান সময়ে শিক্ষিত ব্যক্তিরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যুক্তির ওপর ভরসা করে চলতে চায়। তারা 'কারণ' আর 'অভিজ্ঞতা-লব্ধ' তথ্যের অনুসন্ধান করে। তাই, তথ্য-সমৃদ্ধ প্রোপাগান্ডা বর্তমান সময়ে অধিক কার্যকর। প্রোপাগান্ডাতে যত বেশি সিলেক্টিভ তথ্য প্রবেশ করানো যায়, টার্গেটকৃত ব্যক্তিদের প্রোপাগান্ডার সমালোচনা করার প্রবণতা, ক্ষমতা এবং প্রতিরোধ শক্তি ততই হ্রাস পায়। তবে, এই 'যৌক্তিকতা'র মানে কী? যুক্তির পাশাপাশি আরও একটি বিষয় আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন—গ্রাহক। সকল গ্রাহক কি 'তথ্য' পর্যবেক্ষণ ও যাচাই করার যোগ্যতা রাখেন? ধরুন, আপনার সন্তানদের স্কুলে শেখানো হচ্ছে : তোমার যা মনে হবে, তুমি তাই। তোমার যদি মনে হয় তুমি ভুল দেহে এসেছ, সেটাই ঠিক। তুমি আসলে মেয়ে, কিন্তু ভুলক্রমে ছেলের দেহে জন্ম নিয়েছ। সাইন্সও তাই বলে। এসব শুনতে শুনতে আপনার ছেলের মনে হলো সে আসলেই মেয়ে, তার দেহ ভুল। সে এখন জেন্ডার চেঞ্জ করতে চায়। তার এ সিদ্ধান্ত কি সঠিক? আপনি কি তার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাবেন?

এটাই যৌক্তিক প্রোপাগান্ডা। 'বৈজ্ঞানিক' শব্দটা শুনতে বেশ শ্রুতিমধুর মনে হয়। প্রোপাগান্ডা যখন সফল হয়, তখন তা টার্গেটকৃত দর্শকদের হৃদয়ে অযৌক্তিক এক প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করে, আর সেটাই প্রোপাগান্ডার সফলতা। এই ভুল প্রতিচ্ছবিটি এমন সব ভুল যুক্তি আর তথ্যের ওপর নির্ভরশীল যে, প্রকৃত সত্য, বাস্তবতা, চিন্তার সক্ষমতা সবকিছুই এটি ভুলিয়ে দেয় (Ellul, 1965/1968, p. 86)।

প্রোপাগান্ডা ও প্ররোচনা

'প্রোপাগান্ডা' পরিভাষাটির সাথে 'প্ররোচনা'র ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। প্ররোচনা পরিভাষাটি এক বিশেষ প্রকারের যোগাযোগ পদ্ধতি, যেখানে অন্যদের প্রভাবিত করতে পরস্পর তথ্য আদান-প্রদান করা হয়। প্ররোচনা শব্দটি Persuasion-এর কাছাকাছি অর্থ ধারণ করে। অ্যামেরিকান সাইকোলজিক্যাল এ্যাসোসিয়েশন (APA)-এর দেওয়া সংজ্ঞানুসারে প্ররোচনা হচ্ছে—'কোনো বিষয়, ব্যক্তি, মতবাদ বা বস্তু সম্পর্কে কোনো ব্যক্তির বিশ্বাস, মনোভাব অথবা অনুভূতি বদলানোর জন্য কারও সক্রিয় প্রচেষ্টা' (APA, 2020)।

প্রোপাগান্ডার আবির্ভাবের কয়েক দশক পর 'মিডিয়া থিওরি'র পথিকৃৎ দার্শনিক

মার্শাল ম্যাকলুহান জনগণকে মিডিয়া সম্পর্কে সচেতন করার চেষ্টা করেছিলেন। তৎকালীন সময়ে তুমুল জনপ্রিয় মিডিয়া ও বিজ্ঞাপন জনগণকে কিভাবে বিভ্রান্ত করত, ম্যাকলুহান তা সুনিপুণ ভাষায় ফুটিয়ে তোলেন। তার ভাষায়,

'আমাদের যুগটিই অভূতপূর্ব—যেখানে হাজারও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা জনগণের চিন্তার অভ্যন্তরে প্রবেশ করাকেই তাদের ব্যবসা হিসেবে বেছে নিয়েছে। জনগণের চিন্তার গভীরে প্রবেশ করে তাদের চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রণপূর্বক নিজেদের কাজে লাগানোর জন্য প্ররোচিত করাই এখন তাদের প্রধান লক্ষ্য। আর (জনগণের হৃদয়ে) আলোর পরিবর্তে কামনা সৃষ্টিই (ঐসকল ব্যক্তিদের) অভিলাস' (McLuhan, 1951/2011)।

১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে অ্যামেরিকান সাংবাদিক ভ্যান্স প্যাকর্ড বলেন, 'বিজ্ঞাপনদাতা এবং অন্যান্য সমগোত্রীয় পেশাজীবী ব্যক্তিগণ মোটিভেশনাল সাইকোলজি ব্যবহার করতে শুরু করেছে।' বর্তমান সময়ে এসে হয়তো তার এ কথাগুলো বেশ পুরোনো মনে হতে পারে, তথাপি তৎকালীন সময়ের জন্য প্যাকর্ডের দেওয়া তথ্য ছিল বেশ চমকপ্রদ। তিনি মন্তব্য করেন, 'আমাদের অমনোযোগী থাকার (চিরাচরিত) অভ্যাস, ক্রয় করার সিদ্ধান্ত এবং চিন্তার পদ্ধতিকে মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান থেকে উৎসারিত তথ্য ব্যবহার করে (নির্দিষ্ট) গতিপথে আনতে বেশ বড় ধরনের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে, যা প্রায়শই চোখ ধাঁধানো সফলতা অর্জন করে। এই ধরনের প্রচেষ্টা সমূহ সচরাচর আমাদের বোধশক্তির আড়ালেই থেকে যায়' (Packard, 1957/2007, p. 31)।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যখন তার উৎকর্ষতার সোনালি সময় পার করছিল, তখন পুরো সমাজটাই যেন ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ, প্রোপাগান্ডিস্ট, বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য এক বিশাল ল্যাবরেটরিতে রূপান্তরিত হলো (Soules, 2015, p. 96)। মার্কেট রিসার্চ, জরিপ, মানুষের ব্যয় করার অভ্যাসের ওপর গবেষণা—ট্রেন্ড, ডাটা বিশ্লেষণ—এসব বিষয় যেকোনো কাজের পিছনে মানুষের প্রেরণার উৎস আর তার স্বভাবগত ধর্ম অনুধাবনে উপরিউক্ত পেশাজীবী ব্যক্তিদের সহায়তা করল।

প্রফেসর গ্যাস এবং সেইটার[১] (১৯৯৮/২০১৮) বলেন, 'প্ররোচনা হলো বিশ্বাস, মনোভাব, উদ্দেশ্য, প্রেরণা অথবা আচরণকে একটি নির্দিষ্ট যোগাযোগ সীমার মধ্যে সৃষ্টি, শক্তিশালী, পরিবর্তিত বা প্রশমিত করার পদ্ধতি'। উক্ত সংজ্ঞা থেকে ধারণা লাভ করা যায় যে, প্ররোচনার পরিধি বেশ ব্যাপক।

প্ররোচনার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো,

---

[১] Gass & Seiter

- এটি বিশুদ্ধ বা অন্যান্য উদ্দেশ্যের সঙ্গে পাশাপাশি[১] অবস্থায় থাকতে পারে,
- ব্যক্তি-থেকে-ব্যক্তি[২] হতে পারে বা ব্যক্তির নিজস্ব ও[৩] হতে পারে,
- উদ্দেশ্যমূলক বা অনিচ্ছাকৃত,
- সফল বা ব্যর্থ,
- জবরদস্তিমূলক[৪] বা কোমল[৫],
- প্রতীকী[৬] কিংবা অপ্রতীকী[৭],
- মিডিয়া এবং কনটেক্সট দ্বারা প্রভাবিত হয়,
- সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ফ্যাক্টর দ্বারা প্রভাবিত হয় (Gass & Seiter, 1998/2018)।

প্ররোচনা ব্যক্তির মনোভাব, মূল্যবোধ, বিশ্বাস আর আচরণ এমন উপায়ে পরিবর্তন করতে চায় যে, সেখানে উভয়পক্ষই যেন সন্তুষ্ট হয়। কিন্তু যখন কোনো সংবাদ এমনভাবে প্রস্তুত করা হয়, যার আদান-প্রদানে শুধুমাত্র সংবাদদাতাই তার ফায়দা ভোগ করে, তখন তা পরিণত হয় প্রোপাগান্ডাতে। প্রফেসর এলিউল বলেন, 'প্রোপাগান্ডা (পরিকল্পিত গল্পের সাহায্য নিয়ে) একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য হিসেবে আচরণ করে ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ দখলে নিতে চায়। এটি যে মিথটি তৈরি করে, তা এমন এক স্ব-প্রণোদিত ধারণা আপনার ওপর চাপিয়ে দেয়, যা শুধুমাত্র একটি ব্যাখ্যাই দিতে সক্ষম—যে ব্যাখ্যা প্রোপাগান্ডিস্ট-এর মনঃপূত' (Ellul, 1965/1973, p. 11)।

প্রোপাগান্ডা ও প্ররোচনা : পার্থক্য

প্রোপাগান্ডাকে অনেকেই স্বাভাবিক যোগাযোগ পদ্ধতি হিসেবে মনে করে। যার মাধ্যমে বিভিন্ন মতামত প্রকাশ, কোনোকিছুর ব্যাখ্যা প্রদান বা কোনোকিছুর নির্দেশনা দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে যেসকল তথ্য সরবরাহ করা হয়, সেগুলো বাস্তব ও নির্ভুল বলেও মনে হওয়া স্বাভাবিক। কেবল প্রোপাগান্ডিস্টরাই জানে যে, এর মধ্যে ভিন্ন হেতু লুকিয়ে আছে। বিশেষ ফায়দা হাসিলের উদ্দেশ্যেই তা করা হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, ওদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট। কিন্তু আসল হাকিকত টার্গেটিকৃত জনগণের

[১] Borderline
[২] Interpersonal
[৩] Intrapersonal
[৪] Coercive
[৫] Non-coercive
[৬] Symbolic
[৭] Non-symbolic

আড়ালেই থাকে (Jowett & O'Donnell, pp. 45-48)। যাই হোক, প্রোপাগান্ডা ও প্ররোচনা[১]—উভয়েরই কিছু নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন :

❁ চূড়ান্ত লক্ষ্য :

প্রোপাগান্ডিস্টরা তাদের ভাসাভাসা উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে যা প্ররোচনাকারীর[২] ন্যায় উভয়পক্ষের জন্যই লাভজনক হবে। প্রকৃতপক্ষে, প্রোপাগান্ডিস্টরা শুধুমাত্র তাদের নিজস্ব স্বার্থ উদ্ধার করতে চেষ্টা করে। গ্রাহকের লাভ-ক্ষতি সেখানে মুখ্য বিষয় নয়। তারা গ্রাহকের ব্যাপারে ভ্রূক্ষেপই করে না। আবার যে তথ্য তারা প্রচার করে, অধিকাংশ সময় নিজেরাই তাতে বিশ্বাস করে না।

❁ পরিচয় :

কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে স্বীয় পরিচয় গোপন করাটা প্রোপাগান্ডিস্টদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রোপাগান্ডিস্টরা তাদের প্রকৃত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য গোপন রাখতে সচেষ্ট থাকে। তাই তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে টার্গেটকৃত ব্যক্তি বা দলের জনমত নিয়ন্ত্রণ ও উক্ত ব্যক্তি বা দলের আচরণের প্যাটার্ন (নকশা) পরিবর্তন করে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগাতে চেষ্টা করে। প্ররোচনাকারীদের জন্য এরূপ করা অতীব প্রয়োজনীয় নয়। যদি প্রোপাগান্ডিস্টদের প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রকাশিত হয়ে পড়ে কিংবা তথ্যের আসল উৎস উদঘাটিত হয়, সেক্ষেত্রে তাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন কঠিন হয়ে যায়।

প্রকৃতপক্ষে, কোনো সুপরিকল্পিত কাজকে তখনই প্রোপাগান্ডা হিসেবে গণ্য করা হয়, যখন তা বিশেষ গোষ্ঠীর ফায়দা হাসিলে ব্যবহার করা হয়। অনেক ক্ষেত্রেই জনগণ এই বিভ্রান্তিকর তথ্য বিশ্বাস করে বা সেসব তথ্যের সাথে নিজেদের মানিয়ে নেয়। যেমন তথাকথিত 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের'[৩] ক্ষেত্রে জনগণ এমনটি করেছিল (Soules, 2015, p. 04)।

প্ররোচনার ক্ষেত্রে তথ্যদাতার উদ্দেশ্য যেমন সফল হয়, তেমনিভাবে তথ্যগ্রহীতাও তার ইচ্ছা বা প্রয়োজন পূরণ করতে পারে। যেহেতু উভয়পক্ষই এখানে লাভবান হচ্ছে, সেহেতু প্রোপাগান্ডার চেয়ে প্ররোচনা তথ্যগ্রহীতার জন্য অধিক লাভজনক (Jowett & O'Donnell, 1986/2012)।

উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাপারটা স্পষ্ট করা যাক। ধরুন, আপনার বন্ধুরা আপনার বাবা-মা'কে বলছেন, তাদের সাথে ফুটবল খেলতে গেলে আপনার বখে যাওয়ার সম্ভাবনা কম। কারণ আপনারা খেলতে গিয়ে সালাত ছাড়েন না। তাদের এই রাজি

[১] সচরাচর প্রভাবিত করার যেকোনো প্রচেষ্টাকেই প্ররোচনা হিসেবে উল্লেখ করা হয়।
[২] Persuader
[৩] War on Terror

করানোর প্রক্রিয়াকে বলা যায় প্ররোচনা। অপরদিকে, কোনো অপ্রয়োজনীয় যুদ্ধে যোগদানের জন্যে দেশের জনগণকে উৎসাহিত করা এবং এর পিছনে যুক্তি-প্রমাণ ফলাও করে প্রচার করা—এটিকে প্ররোচনা না বলে প্রোপাগান্ডা বলাই বাঞ্ছনীয়। এখানেই প্ররোচনা আর প্রোপাগান্ডার মূল পার্থক্য। প্রোপাগান্ডা প্ররোচনার পন্থাগুলো কাজে লাগায়, কিন্তু দুটি বিষয়ের কর্ম পরিকল্পনার চূড়ান্ত লক্ষ্য ও ফলাফল কিছুটা ভিন্ন।

স্বীয় লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও পরিচয় গোপন করতে প্রোপাগান্ডিস্টরা তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা গ্রহণ করে—তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ, জনমত নিয়ন্ত্রণ এবং আচরণের প্যাটার্ন বা নকশাকে পরিবর্তন। প্রোপাগান্ডা কী—সেটি গভীরভাবে অনুধাবন করতে চাইলে টার্মগুলো বিস্তারিত ব্যাখ্যার দাবি রাখে।

❁ ১. তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ

তথ্য সরবরাহে বাধা সৃষ্টি, সুবিধাজনক সময়ে তা প্রকাশ করা, অন্য কোনো তথ্যের সাথে মিশিয়ে জনমত প্রভাবিত করা ইত্যাদি হলো তথ্যের অবাধ প্রবাহের নিয়ন্ত্রণ। প্রোপাগান্ডিস্টরা সাধারণত দুটি উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে :

- ক) তথ্য সরবরাহের মাধ্যম হিসেবে মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ
- খ) নির্ভরযোগ্য মিডিয়াকে ব্যবহার করে বিকৃত তথ্য উপস্থাপন

সাংবাদিকদের ব্যবহার করে মিডিয়াতে অনুপ্রবেশ, অতঃপর গুজব ও মিথ্যা সংবাদ প্রচার তথ্য বিকৃত করার অন্যতম উপায়। মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের যুগ্মসচিব ভিক্টোরিয়া ক্লার্ক দ্বিতীয় ইরাক যুদ্ধের সময় (২০০৩) পেন্টাগনের মিডিয়া অপারেশনকে সম্প্রসারিত করেন। তখন একটি রুল এমন ছিল যে, প্রতিটি সাংবাদিককে অবশ্যই মার্কিন সৈন্যদের সাথে অবস্থান করে সংবাদ সংগ্রহ করতে হবে (Kelley, 2003)। এর মাধ্যমে তারা এমনভাবে যুদ্ধের দৃশ্য ফুটিয়ে তুলেছিল যেন দর্শকরা মনে করতে বাধ্য হয়—ইরাকিরা মার্কিন সৈন্যদের সাদরে গ্রহণ করে নিয়েছে। অত্যাধুনিক অস্ত্রের সাহায্যে অতি দ্রুতই তারা ইরাক জয় করবে। অথচ পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত (Donvan, 2006)।

❁ ২. জনমত গঠন

'জনমত গঠন' প্রোপাগান্ডার মৌলিক উপাদানসমূহের একটি হিসেবে সক্রিয় থাকে। জনমত বলতে কী বোঝায়? কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটির এমিরেটাস প্রফেসর ফিলিপ্স ডেভিসন বলেন, 'কোনো নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে যেকোনো সম্প্রদায়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশ কর্তৃক প্রকাশিত পৃথক পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি, মনোভাব এবং বিশ্বাসের সমষ্টিই (হলো জনমত)' (Davison, 2020)।

জনমত পরিভাষাটিকে বিভিন্ন শাখার একাডেমিকরা বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা যেখানে জনমতকে প্রধানত রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত বিষয় হিসেবে গণ্য করেন, সেখানে সমাজবিজ্ঞানীরা জনমত বলতে সামাজিক মিথস্ক্রিয়া[১] ও যোগাযোগকেই বুঝিয়ে থাকেন। তবে, প্রোপাগান্ডিস্টদের কাছে জনমতের সংজ্ঞা নির্ধারণের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এটিকে কিভাবে প্রভাবিত করা যায়, সেই কায়দা রপ্ত করা (Davison, 2020)।

৩. জনতার আচরণ পরিবর্তন

প্রোপাগান্ডার সর্বশেষ ও চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো, জনগণের আচরণ এবং তার প্যাটার্নকে প্রভাবিত করে নিজেদের কাজে ব্যবহার করা। ভোট প্রদান, দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়, যুদ্ধে অংশগ্রহণ, প্রতীক[২] বেছে নেওয়া, গ্রুপে যোগদান—প্রোপাগান্ডিস্টরা তাদের টার্গেটকৃত জনগণের কাছ থেকে এ ধরনের সক্রিয় সাড়া লাভে আগ্রহী। কিন্তু, জনগণের আচরণ পরিবর্তন সহজ কোনো বিষয় নয়। তাই, প্রোপাগান্ডিস্টদের এ সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল থাকতে হয়, এবং সে অনুযায়ী তারা তাদের কর্ম-পরিকল্পনা সাজায়।

প্রোপাগান্ডা একই সঙ্গে যোগাযোগ ও প্ররোচনা—উভয় প্রক্রিয়াকেই কাজে লাগায়। কিন্তু প্রোপাগান্ডার প্রকৃত উদ্দেশ্য উল্লিখিত প্রক্রিয়াদ্বয়কে ছাড়িয়ে যায়। তবে, এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, একাডেমিক এই সংজ্ঞা সাধারণত কার্যক্ষেত্রে পুরোপুরি প্রয়োগ করা হয় না। দেখা যায়, বলার সুবিধার্থে কাউকে যেকোনো বিষয়ে প্রভাবিত করার চেষ্টাকেই সাধারণত প্ররোচনা হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

---

[১] Interaction
[২] Sign

Bibliography

APA. (2020). persuasion - APA Dictionary of Psychology. Retrieved from https://dictionary.apa.org/persuasion

Bernays, E. (1928). Propaganda. New York : H. Liveright.

Carey, A. (1995). Taking the Risk Out of Democracy: Corporate Propaganda versus Freedom and Liberty. University of Illinois Press.

Cull, N. J., Culbert, D., & Welch, D. (2003). Propaganda and Mass Persuasion: A Historical Encyclopedia, 1500 to the Present. ABC-CLIO.

Davison, W. P. (2020, November 13). public opinion. Retrieved from Encyclopedia Britannica: https://www.britannica.com/topic/public-opinion

Donvan, J. (2006, January 7). War Coverage: 'Unilateral' or 'Embed'? Retrieved from ABC News: https://abcnews.go.com/US/story?id=90743&page=1

Ellul, J. (1965/1973). Propaganda: The Formation of Men's Attitudes. Vintage.

Gass, R. H., & Seiter, J. S. (1998/2018). Persuasion: Social Influence and Compliance Gaining. Routledge.

Jowett, G. S., & O'Donnell, V. J. (1986/2012). Propaganda & Persuasion. SAGE Publications.

Kelley, M. (2003, June 18). Pentagon Considers Keeping Embedded Plan. Retrieved from AP NEWS: https://apnews.com/article/171de3dc969b8e4d7480acf30d653876

Marlin, R. (2013). Propaganda and the Ethics of Persuasion. Broadview Press.

McLuhan, M. (1951/2011). The Mechanical Bride : Folklore of Industrial Man. Duckworth Overlook.

Packard, V. (1957/2007). The Hidden Persuaders. Ig Publishing.

Shultz, R. H., & Godson, R. (1984). Dezinformatsia: Active Measures in Soviet Strategy. pergamon-brassey's.

Smith, B. L. (2021). propaganda. Encyclopedia Britannica. Retrieved from https://www.britannica.com/topic/propaganda.

Soules, M. (2015). Media, Persuasion and Propaganda. Edinburgh University Press.

Stanley, J. (2015). How Propaganda Works. Princeton University Press.

Taylor, P. M. (1990/2003). Munitions of the mind: A history of propaganda. Manchester University Press.

অধ্যায় ২

প্রোপাগান্ডার ইতিহাস, উৎপত্তি, বিকাশ

প্রোপাগান্ডা শব্দটির উৎপত্তি ল্যাটিন ভাষা থেকে, বাংলায় এর পরিপূর্ণ অর্থ প্রকাশে সক্ষম কোনো শব্দ নেই। তবে এর মর্মার্থের সবচেয়ে কাছাকাছি অর্থ হলো (অ) পপ্রচার করা। ১৬২২ খ্রিষ্টাব্দে ক্যাথলিক চার্চের তৎকালীন পাদ্রি পোপ গ্রেগরি[১] রোমান ক্যাথলিক বিশ্বাস প্রচারের উদ্দেশ্যে 'বিশ্বাস প্রচারের জন্য ধর্মসভা'[২] নামক দফতর প্রতিষ্ঠা করেন (O'Connor & Weatherall, 2019, p. 97; Soules, 2015, p. 04)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রোপাগান্ডার প্রথম সফল বৈশ্বিক প্রয়োগ হয়। সেই সাথে গণমাধ্যমের জন্ম পৃথিবীর সেই সময়ের বাসিন্দাদেরকে প্রোপাগান্ডার উৎকর্ষের সাক্ষী করে। তৎকালীন গণমাধ্যমের প্রতিটি উপকরণ প্রোপাগান্ডার নতুন সব পদ্ধতিকে অধিক কার্যকর করে তোলা অব্যাহত রাখে (Jowett & O'Donnell, p. 97)।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ | প্রোপাগান্ডার এক্সপেরিমেন্ট

যুদ্ধের তীব্রতা, হিংস্রতা আর ভয়াবহতার কারণে যুদ্ধকালীন প্রোপাগান্ডার কার্যকারিতা সর্বাধিক হয়ে থাকে। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সর্বপ্রথম আধুনিক উপায়ে প্রোপাগান্ডা পরিচালনা করা হয়। জনমতকে পাল্টে স্বীয় স্বার্থে ব্যবহারের[৩] প্রথম সুচিন্তিত ও অফিসিয়াল প্রচেষ্টা হিসেবে। এর সফলতার হারও ছিল বিশাল (Kingsbury, 2010, p. 06)। বিশ্বব্যাপী এই যুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে লেখা একটি বইয়ের (১৯৩৮) ভূমিকায় হ্যারল্ড লাসওয়েল বলেন,

'এটি বললে অত্যুক্তি হবে না যে, (প্রথম) বিশ্বযুদ্ধ সাধারণ থেকে শিক্ষিত—সব ধরনের মানুষকেই প্রোপাগান্ডার সাথে পরিচিত করেছে' (Bruntz, 1938)।

পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে নিজেদের ভেতর এক ভয়াবহ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ১৯১৪ সালের জুন মাসের ১৮ তারিখে অস্ট্রিয়ার

---

[১] Pope Gregory XV
[২] Sacra Congregatio de Propaganda Fide
[৩] Manipulate– দুঃখজনকভাবে এটিরও সঠিক অর্থ প্রকাশে সক্ষম কোনো বাংলা প্রতিশব্দ নেই।

যুবরাজ ফ্রানয ফার্ডিনান্ড বসনিয়ার রাজধানী সারায়েভোতে এক সার্বের গুলিতে নিহত হন। তৎকালীন অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি সাম্রাজ্য এই হত্যাকাণ্ডের জন্য সার্বিয়াকে দায়ী করে এবং ২৮ জুলাই সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। পরবর্তীকালে দুই রাষ্ট্রের সহযোগী রাষ্ট্রসমূহ ধীরে ধীরে নিজেরাও এই যুদ্ধে জড়িয়ে যায়। যুদ্ধে দুটি পক্ষের সৃষ্টি হয়। একদিকে অক্ষ শক্তি (Central Powers) অপর পক্ষে মিত্র শক্তি (Allied Powers)। অক্ষ শক্তি গঠিত হয় মূলত জার্মানি, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি, উসমানী সালতানাত ও বুলগেরিয়ার সমন্বয়ে। অপর পক্ষে মিত্র শক্তির উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্রসমূহ ছিল : বেলজিয়াম, ফ্রান্স, রাশিয়া, জাপান, ইতালি, রোমানিয়া-সহ আরও কিছু দেশ।

১৯১৪-এ ইউরোপ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল। তখন যুদ্ধে নেতৃত্ব দেয়া প্রতিটি জাতিই তখন দাবি করে—তারা মহৎ উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করতে যাচ্ছে। অথচ নিজেদের সাম্রাজ্য বিস্তার ছাড়া আর কিছুই তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। অক্ষ শক্তির অন্তর্ভুক্ত সাম্রাজ্যগুলোর মধ্যে সবচে উচ্চাভিলাষী ছিল জার্মানি। এর অন্য দুটি সাম্রাজ্য অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি ও উসমানীয় সালতানাত তখন লিপ্ত ছিল নিজেদের রাজ্য রক্ষার সংগ্রামে।

আগস্টের শুরুতে জার্মানি বেলজিয়াম আক্রমণ করে বসে। তখন ক্ষমতাসীন লেবার পার্টি অনিচ্ছা সত্ত্বেও বেলজিয়াম ও ব্রিটেনের পারস্পরিক সহযোগিতার চুক্তি রক্ষার্থে ব্রিটেন জার্মানির বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করে। জার্মানির নেতৃবৃন্দ ভেবেছিল ব্রিটেন যুদ্ধে যোগদান করবে না। কিন্তু বেলজিয়াম যখন ব্রিটেনের সাহায্য চাইল, তখন ব্রিটেন তাকে সহায়তা করার সিদ্ধান্ত নিল।

জার্মানি যখন বেলজিয়াম আক্রমণ করে বসে, তখন জার্মানদের নির্যাতনের সংবাদ ব্রিটেনের জনগণের মাঝে বেলজিয়ামদের প্রতি সহমর্মিতা তৈরি করে। সেপ্টেম্বর ২, ১৯১৪, লিবারেল পার্লামেন্ট মেম্বার চার্লস মাস্টারম্যান ব্রিটিশ সিনিয়র লেখকদের নিয়ে একটি বৈঠক করেন। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুজন হলেন আর্থার কোনান ডয়েল এবং এইচ. জি. ওয়েলস। সেপ্টেম্বর ০৭, সিনিয়র লেখক ও জনপ্রিয় ব্রিটিশ পত্রিকাগুলোর সম্পাদকদের নিয়ে দ্বিতীয় বৈঠকের পর চার্লস মাস্টারম্যান লন্ডনে ওয়েলিংটন হাউসে War Propaganda Bureau প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত সংগঠনের প্রধান মিশন ছিল হাঙ্গেরি ব্যতীত অন্যান্য মিত্র ও নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহে ব্রিটেনের পক্ষে সহমর্মিতা তৈরি করা। ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দের জুনের মধ্যে প্রোপাগান্ডা ব্যুরো ২৫ লক্ষ কপি পুস্তিকা ও অফিশিয়াল বক্তব্য প্রকাশ করে (Rankin, 2009, p. 35)। ১৯১৭ পর্যন্ত এই দফতরটি ব্রিটেনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন হিসেবে কাজ করে। এর কার্যক্রম এতটাই গোপনীয় ছিল যে, অধিকাংশ পার্লামেন্ট সদস্য পর্যন্ত এটি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না (Taylor, 1990/2003, p. 177)।

যুদ্ধের শুরুতে অ্যামেরিকার ভূমিকা ছিল নিরপেক্ষ। তবে মার্কিন কোম্পানিসমূহ

যুদ্ধে লড়াইরত উভয়পক্ষের কাছেই বিলিয়ন ডলারের খাদ্য, জ্বালানী আর অস্ত্র বিক্রয় করেত। ঐ সময়ে অ্যামেরিকার কেউই ভাবেনি, মার্কিনিদের যুদ্ধে যোগদান করা উচিত। তৎকালীন প্রেসিডেন্ট উড্রো ইউলসন মন্তব্য করেন, 'এটি এমন একটি যুদ্ধ, যার ব্যাপারে আমাদের কিছুই করার নেই। এটির কারণগুলো আমাদের স্পর্শ করে না।... ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অ্যামেরিকাকে বিশ্বের "সৌভাগ্যশালী" জাতি হিসেবে দেখবে। কারণ এটি শান্তির জন্য কাজ করে এবং যুদ্ধবিগ্রহ থেকে দূরে থাকে।'

তার ভাষায়, জাতি হিসেবে 'অ্যামেরিকান হওয়াটা এতটাই গৌরবের যে, ইউরোপের যুদ্ধে লড়াই করা তাদের শোভা পায় না। মানে ওরা আমাদের লেভেলের না আরকি। তবে যুদ্ধ করা শোভা না পেলেও উভয়পক্ষের সাথে বাণিজ্য করার ক্ষেত্রে অ্যামেরিকার গৌরব কাজ করেনি। বিশ্বায়নের যুগে অন্যান্য শিল্পায়িত রাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যের ওপরই অ্যামেরিকার অর্থনীতি নির্ভরশীল ছিল। ঐ সময়ে শিল্পায়িত পৃথিবী এতটাই আন্তঃসম্পর্কিত ছিল যে, খুব কমসংখ্যক এলাকাই টিকে ছিল যার (দ্রব্য) মূল্য ভিনদেশের বাজার কর্তৃক প্রভাবিত হতো না।' বিশ্বায়নের প্রথম বিস্ফোরণের যুগে অ্যামেরিকার পুরো অর্থনীতিই বৈদেশিক শ্রম ও পুঁজির অন্তঃপ্রবাহের দ্বারা নির্ধারিত হতো (Olmsted, 2009)।

১৯১৫, ইউলসন কোনো সাড়াশব্দ ছাড়াই নিরবে যুদ্ধরত দেশকে ঋণ প্রদানের ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন। ১৯১৫ থেকে ১৯১৭, এই সময়ের ভেতর অ্যামেরিকান ব্যাংকগুলো মিত্র পক্ষকে $২.৫ বিলিয়ন ঋণ প্রদান করে। অন্যদিকে এর মাত্র এক-দশমাংশ অর্থ দেয় অক্ষ শক্তিকে। ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের নিকট বাৎসরিক $৩ বিলিয়ন মূল্যের পণ্য বিক্রয় শুরু করে অ্যামেরিকা। অন্যদিকে সেসময়ে তারা অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি ও জার্মানির কাছে মাত্র $১ বিলিয়ন মূল্যের পণ্য বিক্রয় করত।

যুদ্ধের প্রারম্ভেই ব্রিটিশ ক্যাবলশিপ জার্মানি ও অ্যামেরিকার মধ্যকার ভূগর্ভস্থ ক্যাবল সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ফলে অ্যামেরিকানরা যুদ্ধের সংবাদ পেতে পুরোপুরি ব্রিটিশ সোর্সের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এ সময় ব্রিটেন অ্যামেরিকাতে তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়নের মিশন নিয়ে মাঠে নেমে পড়ে। আর জার্মানি চেয়েছিল অ্যামেরিকাকে নিরপেক্ষ অবস্থানে স্থির রাখতে। তবে জার্মানদের বোঝাপড়ায় কিছুটা ফাঁক রয়ে যায়; ওরা মূলত জার্মান বংশোদ্ভূত মার্কিনীদের উদ্দেশ্যে নিরপেক্ষ থাকার আহ্বান জানিয়ে প্রোপাগান্ডা পরিচালনা করে। তথাপি ভাষার পার্থক্যও সেখানে বড় একটি বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। অপরদিকে ব্রিটেন তার প্রোপাগান্ডার টার্গেট হিসেবে অ্যামেরিকান প্রেস, ব্যবসায়ী, বিশ্ববিদ্যালয় প্রফেসর-সহ প্রভাবশালী ব্যক্তি ও সংগঠনগুলোকে বেছে নেয় (Brewer, 2009, p. 51; Sanders & Taylor, 1982, p. 204)।

ঐ সময়ে ব্রিটিশরা যুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা অতিরঞ্জিত করে অ্যামেরিকাতে প্রচার করা শুরু করে, পরবর্তীকালে যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছিল অ্যামেরিকান প্রোপাগান্ডিস্টরা। প্রাথমিক পর্যায়ে ব্রিটিশ প্রোপাগান্ডার বিষয় ছিল বেলজিয়ামে জার্মানদের নৃশংসতা প্রচার। ফ্রান্স, ব্রিটেন, বেলজিয়াম থেকে জার্মানদের নির্মমতার অসংখ্য গুজব প্রতিনিয়ত ছড়িয়ে পড়ে; যদিও সেসব গুজব তখনো পর্যন্ত কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে—অর্থাৎ অ্যামেরিকাকে যুদ্ধে শামিল করা—পৌঁছাতে পারেনি। অতঃপর ১৯১৫ এর মে ৭-এ জার্মান সাবমেরিন ব্রিটিশদের একটি বিলাসবহুল জাহাজ আরএমএস লুসিতানিয়া[১] আক্রমণ করে ডুবিয়ে দেয়। এই আক্রমণে মৃত্যু হয় হাজারও মানুষের, যাদের মধ্যে ১২৮ জন মার্কিন নাগরিকও ছিল। যদিও জাহাজটিতে তখন অস্ত্র বহন করা হচ্ছিল, তথাপি ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত অ্যামেরিকান সেক্রেটারি অব স্টেট ব্রায়ান-কে বলেন, জাহাজটিতে কোনো অস্ত্র ছিল না। মূলত এ ঘটনার পর থেকেই মার্কিন নাগরিকদের মৃত্যুর ফলে ব্রিটিশদের অ্যান্টি-জার্মান প্রোপাগান্ডা অ্যামেরিকাতে সফলতা লাভ করতে আরম্ভ করে (Manning & Romerstein, 2004, p. 175)।

এ ঘটনার পাঁচদিন পর ওয়েলিংটন হাউস বেলজিয়ামে জার্মান নৃশংসতা নিয়ে 'দ্যা রিপোর্ট অব দ্য কমিটি অন অ্যালেজড জার্মান আউটরেজেস'[২] নামক একটি রিপোর্ট পাবলিশ করে, ইতিহাসে যেটি ব্রাইস রিপোর্ট[৩] নামে অধিক জনপ্রিয়। রিপোর্টটির প্রণয়ন করেন সাবেক ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত লর্ড ব্রাইস, যিনি অ্যামেরিকাতে অত্যন্ত সম্মানিত একজন কূটনৈতিক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। রিপোর্টটিতে বেলজিয়ান বেসামরিক নাগরিকদের ওপর জার্মান সৈন্যদের নির্যাতন, নারী ধর্ষণ, শিশু হত্যা ও শিশুদের অঙ্গচ্ছেদের মতো ঘটনাসমূহের বিবরণ অ্যামেরিকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে দেয়। যদিও জার্মানরা ব্রাইস রিপোর্টে বর্ণিত মিথ্যা আর গুজব মিশ্রিত দাবিগুলোর প্রতিবাদ করে, কিন্তু তাদের প্রতিবাদ এই রিপোর্টের বিপরীতে তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি (Sanders & Taylor, 1982, p. 144)।

ইডিথ ক্যাভেল[৪] ছিলেন একজন ব্রিটিশ নার্স, যিনি ১৯১৫-এর অক্টোবরে জার্মানদের দখলকৃত ব্রাসেলসে গ্রেফতার হওয়া আহত ফ্রেঞ্চ ও ব্রিটিশ সৈন্যদের হাসপাতাল থেকে পালাতে সহায়তা করেন। এই অপরাধে তিনি মৃত্যুদণ্ডের সাজাপ্রাপ্তা হন। যদিও ক্যাভেল তার অপরাধের কথা অস্বীকার করেননি—যে অপরাধ চিকিৎসা বিভাগের নিরপেক্ষতার আইন ভঙ্গ করে—তথাপি ব্রিটেন তার মৃত্যুকে মহিমান্বিত করে প্রচার করতে আরম্ভ করে। ব্রিটেন ও অ্যামেরিকায় ক্যাভেলের 'নারী' ও 'সেবিকা' পরিচয়কে ফুটিয়ে তুলে পুস্তিকা প্রকাশিত হয়, সেই সাথে তার গোয়েন্দা

[১] RMS Lusitania
[২] The Report of the Committee on Alleged German Outrages
[৩] Bryce Report
[৪] Edith Cavell

পরিচয়কেও সম্পূর্ণরূপে গোপন করা হয় (Rankin, 2009, pp. 36-37)।

জার্মানদের 'বর্বরতার' সংবাদসমূহের বাহুল্যতায় অ্যামেরিকায় সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণের দাবি উঠে। যদিও সে দাবি যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য নয়, বরং ভবিষ্যতের পরিকল্পনা হিসেবেই উত্থিত হয়। অপরদিকে শান্তিবাদীরা[১] এ ধরনের পরিকল্পনার বিরোধিতা করেন; সমাজতান্ত্রিক দলগুলো চলমান যুদ্ধকে 'পুঁজিবাদী যুদ্ধ' হিসেবে আখ্যায়িত করে।

১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনে উড্রো ইউলসন দ্বিতীয়বারের মতো অ্যামেরিকান প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ইউলসনের পুনঃনির্বাচন ক্যাম্পেইনের স্লোগান ছিল—'তিনি আমাদের যুদ্ধ থেকে বিরত রেখেছেন[২]'। তখন পর্যন্ত অ্যামেরিকার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ যুদ্ধ-বিরোধী মনোভাব লালন করত; কোনো প্রয়োজন ছাড়া এক রক্তক্ষয়ী ইউরোপীয় যুদ্ধে জড়ানোর কোনো তাগিদই তারা অনুভব করেনি (Chomsky, 1991/1997)। কিন্তু, উইলসনের অভিপ্রায় ছিল অন্য রকম। ১৯১৫-১৯১৬-এর শীত মৌসুমেই উইলসন প্রশাসন যুদ্ধে যোগদানের সংকল্প বিবেচনা করতে শুরু করে (Peterson, 1939, p. 210)। ১৯১৭-এর জানুয়ারিতে জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর্থার যিমারম্যান[৩] অ্যামেরিকা যুদ্ধে জড়ানোর পূর্বেই অক্ষ শক্তির ক্ষমতা বৃদ্ধি করার নিমিত্তে মেক্সিকোকে যুদ্ধে আহ্বান করে একটি টেলিগ্রাম পাঠান এবং প্রস্তাব রাখেন অ্যামেরিকাকে যুদ্ধে হারিয়ে টেক্সাস, নিউ মেক্সিকো ও অ্যারিজোনা পুনর্দখল করতে। ঘটনাক্রমে ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স টেলিগ্রামটি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়; তারা সেটিকে অ্যামেরিকায় পাঠানোর পর ফেব্রুয়ারির ২৪ তারিখে সেটি হোয়াইট হাউসে পৌঁছে (Peterson, 1939, p. 315)। সংকেতলিপিটির পাঠোদ্ধারের পর ০১ মার্চ তা অ্যামেরিকান সংবাদপত্রগুলোতে প্রকাশিত হয়। বলাই বাহুল্য, প্রচারের পরপরই সেটি অ্যামেরিকার জনগণকে প্রবলভাবে উত্তেজিত করে তোলে।

অ্যামেরিকান অর্থের ওপর মিত্রশক্তির নির্ভরতা, লুসিতানিয়ার ঘটনা-সহ অন্যান্য জাহাজডুবির ঘটনা, ওয়েলিংটন হাউসের বহুল প্রচারিত ব্রাইস রিপোর্ট এবং সর্বশেষ যিমারম্যান টেলিগ্রাম এর ঘটনা ইউলসনকে যুদ্ধবিরোধী সিনেটরদের পাশ কাটিয়ে যেতে সহায়তা করে। যদিও সেসময় অনেক যুদ্ধবিরোধী সিনেটর দাবি করেন যে, ব্রিটেনে বিনিয়োগকারী অনেক ব্যাংকার ও শিল্পপতি অ্যামেরিকাকে অহেতুক রক্তস্নাতের দিকে ধাবিত করছে। অবশেষে এপ্রিলের ৬ তারিখ, ১৯১৭, অ্যামেরিকা জার্মানির বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এ ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট ইউলসনের বক্তব্য ছিল,

---

[১] Pacifist
[২] He Kept Us Out of War
[৩] Arthur Zimmermann

অ্যামেরিকা যুদ্ধ করবে গণতন্ত্রের জন্য, কিন্তু সিনেটর লাফলেট[১] তার বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, 'অ্যামেরিকাকে যদি গণতন্ত্রের জন্য যুদ্ধ করতেই হয়, তাহলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভেঙে উপনিবেশগুলোর স্বায়ত্বশাসনের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য কেন তারা যুদ্ধ করছে না?' (Brewer, 2009, p. 55)। কিন্তু তার কথায় কেউ ভ্রূক্ষেপ করেনি। ঐ সময়ে লাফলেট যে কথাটি বলেছিলেন, তা ছিল বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু এরপরও বহুবার যুক্তিসঙ্গত এই প্রশ্নকে পাশ কাটিয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা সেই একই পদ্ধতিতে মানবতা, মানবাধিকার আর গণতন্ত্রের মিথ্যা দোহাই দিয়ে দুর্বল জাতির ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়, যার বিস্তারিত সামনে আসবে ইন-শা-আল্লাহ।

অ্যামেরিকা যখন যুদ্ধ ঘোষণা করেই ফেলল, তখন সেখানে ব্রিটিশদের প্রোপাগান্ডা চালানোর আর কোনো প্রয়োজন রইল না। অ্যামেরিকার ইতিহাসে প্রথম ড্রাফটিং[২]-এর ফলে ইচ্ছুক-অনিচ্ছুক সকলকেই মৃত্যুপুরীর উদ্দেশ্যে রওনা দিতে হলো, সিদ্ধান্ত গ্রহণের 'স্বাধীনতা' হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। প্রেসিডেন্ট উইলসন জার্মানদের বিরুদ্ধে অ্যামেরিকার অভ্যন্তরে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ তুললেন। গুপ্তচরবৃত্তি[৩] ও রাষ্ট্রদ্রোহ[৪] আইনের মাধ্যমে মার্কিন সরকার অ্যামেরিকার প্রেসিডেন্ট, যুদ্ধ ও সরকারবিরোধী সমালোচনাকে—তথা যুদ্ধ-বিরোধিতাকে অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করে। সরকার শত শত ব্যক্তিকে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে গ্রেফতার করে। সমাজতান্ত্রিক নেতা ইউজিন[৫] বলেন, এই যুদ্ধ গরিবরা ধনীদের জন্য লড়ছে; আর সে কারণে তাকে জেলে পাঠানো হয়। যদিও যুদ্ধ শেষে মিলিয়ন অ্যামেরিকান নাগরিক উক্ত দাবির সঙ্গে একমত পোষণ করেছিল, কিন্তু ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে কেউ এই দাবি করলে সে নিজেকে আবিষ্কার করত কারাগারে। যুদ্ধ ঘোষণার এক সপ্তাহ পর উইলসন তার বিশেষ আদেশে অ্যামেরিকার নিজস্ব প্রোপাগান্ডা অর্গানাইজেশন *কমিটি অন পাবলিক ইনফরমেশন*[৬]বা CPI প্রতিষ্ঠা করেন, যেটি মূলত ক্রিল কমিশন[৭] হিসেবেই ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে। এই সংগঠনের লক্ষ্য ছিল, যুদ্ধে মার্কিনীরা কিভাবে সর্বোত্তম পন্থায় সহায়তা করতে পারে, সে ব্যাপারে অ্যামেরিকার প্রতিটি নাগরিকের কাছে তাদের দেশপ্রেম-নির্ভর বার্তাসমূহ একাধিক বার পৌঁছে দেওয়া। ক্রিল কমিশন নিজেদের কার্যক্রম দুটি অংশে বিভক্ত করে নেয়। একটি অংশ অ্যামেরিকাতে জার্মান বিরোধী প্রোপাগান্ডা পরিচালনা করে, অপর অংশটি কমপক্ষে ত্রিশটি দেশে তাদের প্রোপাগান্ডা কার্যক্রম আরম্ভ করে (Taylor, 1990/2003,

[১] LaFollette
[২] সেনাবাহিনীতে বাধ্যতামূলক অংশগ্রহণ
[৩] Espionage
[৪] Sedition
[৫] Eugene V. Debs
[৬] Committee on Public Information
[৭] Creel Commission

pp. 183-185)। সিপিআই-এর চেয়ারম্যান জর্জ ক্রিল[১] তার সংগঠনে যে শুধুমাত্র প্রথিতযশা লেখকদেরই সন্নিবেশ ঘটান তা-ই নয়, বরং এছাড়াও হাজার হাজার লোককে তিনি প্রোপাগান্ডা প্রচারে নিয়োগ করেন (Bruntz, 1938, p. 32)। তারা অ্যামেরিকার মিত্ররাষ্ট্র-সমূহের প্রশংসা সংবলিত মুদ্রিত রচনা বিলি করে, পোস্টার ছাপায়, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয় এবং টার্গেটকৃত রাষ্ট্রে তাদের এজেন্ট পাঠায়। (Manning & Romerstein, 2004, pp. 65-66)। সিপিআই সংবাদ বিভাগ চব্বিশ ঘণ্টা চালু রাখে; সাংবাদিকগণ সেখান থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে প্রচার করত। এটি 'অফিসিয়াল বুলেটিন' শীর্ষক নিজেদের একটি দৈনিক সংবাদ পত্র-ও পাবলিশ করে, যেখানে সরকারি বিভাগসমূহের গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞপ্তি ছাপা হতো[২]।

প্রেসিডেন্ট উইলসন তার সেনাবাহিনীকে ৩ মিলিয়নে উন্নীত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তরুণদেরকে বাহিনীতে যোগদান করার জন্য উৎসাহিত করতে সিপিআই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সবচেয়ে বিখ্যাত পোস্টারটি—আঙ্কেল স্যাম[৩]-এর '**I WANT YOU**'—৫ মিলিয়ন কপি প্রিন্ট করে। সিপিআই এর আর্টিস্টরা ২৫০০ টি ভিন্ন ভিন্ন চিত্তাকর্ষক ও দর্শনীয় ডিজাইন তৈরি করে, যেগুলো সর্বমোট ২০ মিলিয়ন (দুই কোটি) কপি প্রিন্ট করা হয়; যা যুদ্ধরত বাকি সবগুলো রাষ্ট্রের করা প্রিন্টিং-এর মোট সংখ্যা থেকেও বেশি (Brewer, 2009, p. 60)।



Figure 1 : I Want You Poster (Flagg, 1917)

---

[১] George Creel

[২] বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে (১৯১০-১৯১৯) সবচেয়ে জনপ্রিয় গণমাধ্যম ছিল সংবাদপত্র, মাসিক, ষাণ্মাসিক পত্রিকা ইত্যাদি। তখন পর্যন্ত রেডিও প্রযুক্তির ততটা অগ্রগতি হয়নি, আর রেডিও এতটা সহজলভ্যও ছিল না। সেই সাথে সাদাকালো নির্বাক চলচ্চিত্র ছিল জনগণের বিনোদনের অন্যতম উৎস। উপরিউক্ত দুটি সেক্টর এবং পোস্টার প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

[৩] Uncle Sam, কাল্পনিক চরিত্র

১৯১৭ এর ২৫ সেপ্টেম্বর সিপিআই-এর একটি অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় দ্যা ডিভিশন অব ফিল্মস (Ward, 1985, p. 48)। এই বিভাগের মাধ্যমে সিপিআই, মোশন পিকচার বা চলচ্চিত্র বিতরণ করতে শুরু করে। অপরদিকে, মোশন পিকচার ইন্ডাস্ট্রি স্বেচ্ছায় তাদের চলচ্চিত্রে সিপিআই প্রদর্শিত মিত্রশক্তির 'বীরত্ব' ও 'মহানুভবতা' এবং জার্মানদের 'নৃশংসতা', 'নির্মমতা'র চিত্র ফুটিয়ে তোলার পদ্ধতি অনুসরণ করতে আরম্ভ করে। এছাড়াও সিপিআই 'ফোর মিনিট ম্যান' নামে ভলান্টিয়ারদের একটি দল প্রস্তুত করে, ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে যাদের সংখ্যা ৪০,০০০-এ পৌঁছায়। এসব ভলান্টিয়াররা নিয়মিত যুদ্ধের সমর্থনে মুভি থিয়েটারে বিরতি চলাকালীন চার মিনিট বক্তব্য প্রদান করত। ধারণা করা হয়, তাদের বক্তব্য প্রায় ত্রিশ কোটি বার শোনা হয় (Manning & Romerstein, 2004, p. 110)। থিয়েটার মালিকরাও ভলান্টিয়ারদের এই কাজে আন্তরিকভাবে সহায়তা করেন। পরবর্তীকালে জার্মান-বিরোধী বা হিংসাত্মক চলচ্চিত্রগুলো অ্যামেরিকার জনগণের মনে জার্মান জনগণ ও তাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে এক কুৎসিত চিত্র ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়[১]। এসকল চলচ্চিত্রে দেখা যায়, জার্মান সৈন্যরা নিষ্ঠুর যান্ত্রিক খুনির মতো হামলা করছে, কিংবা জার্মান অফিসারগণ পাশবিকতার রুদ্রমূর্তি ধারণ করে বেলজিয়ান নারীদের ধর্ষণ করছে, শিশুদের জানালা দিয়ে ছুড়ে ফেলছে, বৃদ্ধা নারীদেরকে হত্যা করছে। একই সাথে, এই চলচ্চিত্রগুলোতে যুদ্ধবিরোধী নাগরিকদের কাপুরুষ বা ভীতু হিসেবে অভিহিত করা হয়; তাদের দেশপ্রেম নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হয় (see Ward, 1985, for more details)। চার্লি চ্যাপলিন ও অন্যান্য বিখ্যাত চলচ্চিত্র তারকারা তাদের জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে জনগণকে লিবার্টি বন্ড ক্রয় করতে উৎসাহিত করে।

বলা চলে, সিপিআই ও অন্যান্য যুদ্ধপন্থী অর্গানাইজেশনগুলো শুধুমাত্র প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে যুদ্ধবিরোধী পেসিফিস্ট অ্যামেরিকানদের এতটাই জার্মান-বিরোধী করে তুলতে সক্ষম হয় যে, ১৯১৮-এর এপ্রিলে রবার্ট প্রেগার নামের এক জার্মান অভিবাসী ব্যক্তিকে উত্তেজিত জনতার একটি দল অ্যামেরিকার পতাকা দিয়ে মুড়িয়ে ফেলে তাকে হত্যা করে। যেসব খনির সত্ত্বাধিকারী কোম্পানিগুলো মন্ট্যানার[২] স্টেটভিত্তিক রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করত, যারা যুদ্ধকে সমর্থন জানিয়েছিল। কিন্তু সেসময় খনিগুলোর বাসিন্দা অভিবাসী কর্মীরা—যারা তখনো মার্কিন নাগরিকত্ব লাভ করেনি অথচ বাধ্যতামূলক ড্রাফ্ট-এর শিকার—যুদ্ধের বিরোধিতা করে। যুদ্ধবিরোধী ব্যক্তিদের ভারী দল দেখে মার্কিনীরা মন্ট্যানাতে ষড়যন্ত্র 'খুঁজে' পেতে শুরু করল। অতি উৎসাহী নাগরিকরা রিপোর্ট পেশ করল, তারা রাস্তাগুলোতে

[১] উদাহরণ : 'The Kaiser', 'The Beast of Berlin' etc.
[২] Montana, অ্যামেরিকার একটি অঙ্গরাজ্য

জার্মান স্পাই দেখতে পেয়েছে, আকাশে জার্মান 'এয়ারশিপ' তাদের নজরে এসেছে। ড্রাফ্‌ট নিয়ে হাঙ্গামা চরমে পৌঁছুলে মন্ট্যানার যুদ্ধপন্থি নাগরিকরা ভিন্ন মতাবলম্বীদের ওয়ার বন্ড[১] কেনা এবং জনসম্মুখে দেশপ্রেমের পরিচায়ক কাজ—যেমন : পতাকায় চুম্বন—করতে বাধ্য করে। তাদেরকে আলকাতরা মেখে গায়ে পালক ঢেলে দেওয়া হয়, পেটানো হয়, এমনকি অনেককে জনসম্মুখে হত্যা করা হয়। এই শ্রেণির কিছু ব্যক্তি ইউনিয়ন লিডার ফ্র্যাঙ্ক লিটল-কে বিছানা থেকে ধরে নিয়ে ফাঁসিতে ঝোলায়। অ্যামেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট উচ্ছৃঙ্খল জনতার প্রশংসা করে বলেন, এই ফাঁসির 'উপকারী প্রভাব' রয়েছে।

পরবর্তীকালে আদালত এই ঘটনাকে 'দেশের জন্য হত্যা'[২] হিসেবে অভিহিত করে হত্যাকারীদের নেতৃত্ব দানকারী ব্যক্তিদের নির্দোষ ঘোষণা করে (Stehman, 2018)। অথচ সেই সময়ে মার্কিন অভিবাসীদের মধ্যে জার্মানরাই অ্যামেরিকাতে সবচেয়ে সম্মানিত অভিবাসী হিসেবে অভিহিত ছিল।

১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে ঘোষিত দেশদ্রোহ আইন অনুযায়ী পাবলিক অফিসিয়ালরা সরকার সম্পর্কে যেকোনো 'অননুগত, অবজ্ঞাকারী, অমার্জিত, ঘৃণাপূর্ণ বা অবমাননাকর কথা' বলা বা প্রকাশ করা ব্যক্তিকে—অর্থাৎ, যেকোনো ব্যক্তি, যে যুদ্ধ বিরোধী কোনো কথা বলবে—গ্রেফতার করার অনুমোদন লাভ করে। সরকার যেকোনো ব্যক্তিকে যুদ্ধে ড্রাফট করতে পারত, যুদ্ধ-বিরোধী যে কাউকে জেলে বন্দি করতে পারত, ভিন্নমত পোষণকারীদের দমন করতে পারত (Olmsted, 2009)।

মোটকথা, যুদ্ধবিরোধী অ্যামেরিকান জনগণকে মাত্র এক বছরের ব্যবধানে জার্মানদের হত্যা করতে উন্মাদ এক জাতিতে পরিণত করার যে কৃতিত্ব, তার একটা বড় অংশই ক্রিল ও তার পরিচালিত সিপিআই-র প্রাপ্য। ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটলে বারো অগাস্ট সিপিআই ভেঙে দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে জর্জ ক্রিল তার যুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা 'How We Advertised America' শীর্ষক বইতে বলেন,

'এই বৃহৎ যুদ্ধের এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যা আমরা স্পর্শ করিনি, এমন কোনো মাধ্যম নেই যা আমরা ব্যবহার করিনি। ছাপার অক্ষর, কথা, চলচ্চিত্র, টেলিগ্রাফ, ক্যাবল, ওয়্যারলেস, পোস্টার, সাইনবোর্ড—এই সবগুলো উপকরণই অ্যামেরিকা কেন যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছে, জনগণকে তার কারণ বোঝাতে আমরা আমাদের ক্যাম্পেইনে ব্যবহার করেছি।' (Creel, 1920, p. 05)।

---

[১] যুদ্ধে সামরিক আক্রমণের অর্থায়নের জন্য জনগণ কতৃক সরকারকে 'ঋণ' দেওয়ার একটি উপায়। ক্রয়কৃত বন্ড পরবর্তীকালে বিক্রয় করা যায়, তবে এতে আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। তাই বন্ড বিক্রয় করতে 'দেশপ্রেম'-এর বিজ্ঞাপন প্রচারের প্রয়োজন পড়ে।

[২] Patriotic Murder

মজার বিষয় হলো, বিংশ শতাব্দীর আলোচিত-সমালোচিত মনোবিজ্ঞানী সিগমান্ড ফ্রয়েডের একই সঙ্গে ভাতিজা ও ভাগিনা[১], জনসংযোগ-এর জনক এডওয়ার্ড বার্নেইস ছিলেন এই বিখ্যাত সিপিআই-এরই একজন গ্র্যাজুয়েট (Manning & Romerstein, 2004, p. xxix)। বার্নেইস সিপিআই-এর লাতিন আমেরিকা ডিপার্টমেন্টে কাজ করেন (Tye, 1998; Osgood & Frank, 2010)। পরবর্তীকালে সিপিআইতে থাকাকালীন অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তিনি 'সম্মতির প্রকৌশলবিদ্যা'[২] নামক পরিভাষাটির বিকাশ ঘটান।

যাই হোক, স্বীয় রাষ্ট্রের জনগণের মতামত পরিবর্তনের যে দায়িত্ব প্রেসিডেন্ট উইলসন তার অনুগত ক্রিলের ওপর অর্পণ করেছিলেন, সেই দায়িত্ব তিনি সফলতার সাথে পালন করতে সক্ষম হন। যুদ্ধের পুরোটা সময় সিপিআই ও ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি অ্যামেরিকানদেরকে যুদ্ধে সমর্থন অব্যাহত ও বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। ব্রিটেনই সর্বপ্রথম ভিন্ন কোনো রাষ্ট্রে যুদ্ধকালীন প্রোপাগান্ডার সফল এক্সপেরিমেন্ট পরিচালনা করলেও অ্যামেরিকা, বিশেষ করে বললে জর্জ ক্রিল প্রোপাগান্ডাকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যান। সিপিআই-এর সফলতা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রোপাগান্ডিস্টদের জন্য মাইলফলক হিসেবে কাজ করে, সেই সঙ্গে প্রোপাগান্ডার প্রাথমিক যুগের রথী-মহারথীদের জন্য আদর্শ একটি উদাহরণ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

যুদ্ধোত্তর জনপ্রতিক্রিয়া

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জয়লাভ করে মিত্র পক্ষ; যুদ্ধ জয়ের পর যুদ্ধের সূচনা ঘটানো ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের অপরাধে জার্মানিকে বিশাল অঙ্কের জরিমানা করা হয়। মুসলিমদের শেষ ভরসা ও ঐক্যের প্রতীক উসমানীয় সালতানাত ভেঙে মিত্রশক্তি নিজেদের মাঝে ভাগ করে নেয়[৩]। পশ্চিমাদের সাম্রাজ্য বৃদ্ধির নেশায় শুরু করা গৃহযুদ্ধে প্রাণ হারায় ০৮ মিলিয়ন মানুষ, যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নাগরিক ছিল বেসামরিক (Howard, 2002, Appendix-II)। যুদ্ধ চলাকালীন প্রেসিডেন্ট

[১] Double Nephew
[২] Engineering Consent'
[৩] উসমানীয় সালতানাত ভাঙার পর থেকেই মুসলিমদের চূড়ান্ত দুর্দশার সূচনা। মুসলিমরা হতাশার সাগরে হাবুডুবু খেয়ে উত্তরণের কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছিল না। অতঃপর কেউ মুক্তির উপায় হিসেবে বিজয়ীদের অনুসরণ করে পশ্চিমা সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে খাপ খাওয়াতে শুরু করল, কেউ-বা অন্য আরেক ভ্রান্ত মতবাদ সমাজতন্ত্রকে বেছে নিল, কেউ বা জাতীয়তাবাদ, আবার কেউ-বা দুটি মতবাদের মিশেলে নব্য বিপ্লব ঘটাতে চাইল। খুব কম সংখ্যক মুসলিম জনগোষ্ঠীই ইসলামের আদি বৈশিষ্ট্য আঁকড়ে ধরে রাখার দুঃসাহস দেখিয়েছিল। পরবর্তীকালে জাতীয়তাবাদের পতাকার আশ্রয়ে স্বায়ত্বশাসন লাভ করলেও ইসলামি শাসন আর কেউ ফিরিয়ে আনতে পারেনি, একমাত্র তালিবান ব্যতীত।

Wilson এর স্লোগান ছিল, 'এই যুদ্ধ সকল যুদ্ধের সমাপ্তির জন্য যুদ্ধ', এবং 'গণতন্ত্রের জন্য পৃথিবীকে নিরাপদ করার যুদ্ধ'।

যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে যখন সিপিআই-এর কর্মকাণ্ডের প্রকৃত উদ্দেশ্য জনসম্মুখে উন্মোচিত হয়ে গেল, তখন চারদিক থেকে শুরু হলো এর তীব্র সমালোচনা। অ্যামেরিকায় 'যাইহোক, এটা শুধুই একটা প্রোপাগান্ডা' পরিণত হয় জনপ্রিয় একটি প্রবাদে (Manning & Romerstein, 2004)। সেই সময় সর্বপ্রথম প্রোপাগান্ডা শব্দটিকে সকলেই নেতিবাচক অর্থে ব্যবহার করতে শুরু করে। প্রোপাগান্ডা শব্দের প্রতিশব্দ হয়ে গেল প্রতারণা, ধোঁকা ইত্যাদি। জার্মানদের নির্মমতার যে কাহিনী অ্যামেরিকাতে ছড়িয়েছিল, অধিকাংশ তদন্তে দেখা গেল, ওইসব কাহিনিতে সত্য আর মিথ্যা মিলে একাকার। ফলস্বরূপ, জনমনে ধারণা তৈরি হয়ে গেল, প্রোপাগান্ডা মানেই মিথ্যা আর প্রবঞ্চনা।

যুদ্ধ শেষে যারা প্রকৃত ইতিহাস জানতে চাচ্ছিল, তাদের জন্য বিরাট এক বিস্ময় লুকিয়ে ছিল রাশিয়ার সিজারের গোপন আর্কাইভে। বলশেভিক বিপ্লবীরা পশ্চিমা স্কলারদের সেখানে থাকা মিত্রপক্ষের গোপন চুক্তির কপি যাচাই করার অনুমতি প্রদান করে। এই চুক্তিগুলোতে দেখা যায়, যুদ্ধ সমাপ্ত হবার আগেই মিত্রপক্ষ পরিকল্পনা করে রেখেছিল যে, যুদ্ধের পর তারা উত্তর ইউরোপ দখল করবে। এতসব বিতর্কের কোনো সমাধান হলো না; তাই যুদ্ধ পরবর্তী বিশ বছর যাবৎ অ্যামেরিকানরা WWI[১]-এ তাদের অংশগ্রহণের কারণ নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত থাকল। অ্যামেরিকা আসলে কীসের জন্য যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল? জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণ, স্বর্ণ, স্বাধীনতা, ব্রিটেন, গণতন্ত্র নাকি এলিট শ্রেণির স্বার্থের জন্য? (Olmsted, 2009)।

এই যুদ্ধ শেষ হবার এক দশকেরও বেশি সময় পর, ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে মার্কিন সিনেট প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অস্ত্রশিল্পের সম্পৃক্ততা অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নেয় এবং কমিটি গঠন করে। গঠিত কমিটি পরবর্তী দু বছর ধরে প্রায় মার্কিন সরকারের দুই দশক পূর্বে করা ক্রটিসমূহ তদন্তের কাজ হাতে নেয়। কমিটির চেয়ারম্যান সিনেটর জেরাল্ড নাই-এর তদন্ত কর্মকর্তারা দেখতে পান যে, যুদ্ধের সময়ে অস্ত্র বাণিজ্যের স্বত্বাধিকারীগণ স্টেট ডিপার্টমেন্ট-এর শান্তি আলোচনার প্রচেষ্টাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করত। অনেকেই যুদ্ধে করা বাণিজ্য থেকে বিশাল সৌভাগ্যশালী বনে যায়, আর অন্যান্য ব্যবসায়ীরা যুদ্ধকে দক্ষিণ অ্যামেরিকা পর্যন্ত সম্প্রসারিত করার চেষ্টা করে। নাই-কমিটির তদন্ত জনগণকে এ ব্যাপারে নিশ্চিত করে যে, 'মৃত্যু বণিক'[২] তথা অস্ত্র-ব্যবসায়ীগণ যুদ্ধে যোগদানের সিদ্ধান্তে ভূমিকা রেখেছে। যদিও 'নাই' কমিটি এই অভিযোগ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয় যে, অস্ত্র ব্যবসায়ীগণ প্রেসিডেন্টকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করেছে

[১] প্রথম বিশ্বযুদ্ধ
[২] cath merchants

কি না।

আঠারো মাস তদন্তের পর যুদ্ধের সঙ্গে অস্ত্র-ব্যবসায়ীদের প্রত্যক্ষ 'অনৈতিক' সম্পৃক্ততা খুঁজে বের করতে ব্যর্থ হয়ে নাই-কমিটি যুদ্ধের পর যাদের দিকে প্রথম অভিযোগের তীর ছোঁড়া হয়েছিল, সেই ব্যাংকারদের দিকে ফোকাস করে। ইউরোপে যুদ্ধ শুরুর পর উইলসন প্রশাসন মিত্রপক্ষকে অধিক ঋণ প্রদান করতে ব্যাংকারদের অনুমোদন দেয়, এজন্য তাদের পলিসিতেও পরিবর্তন নিয়ে আসে। আর এসব ব্যাংকের মধ্যে সর্বপ্রথম অবস্থানে ছিল 'হাউস অব মরগান'। ১৯১৫ থেকে ১৯১৭-এর মধ্যে অ্যামেরিকা থেকে কেনা মিত্রপক্ষের যুদ্ধোপকরণের ৮৪% লেনদেন হয় মরগান ব্যাংক-এর মাধ্যমে। ব্রিটিশদের যখন অস্ত্র ক্রয়ের সক্ষমতা শেষ হয়ে যায়, তখন মরগান ব্যাংক তাদেরকে শত শত মিলিয়ন ডলার ধার দেয়। ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে ওয়াল স্ট্রীট-এর বিনিয়োগকারী ব্যাংকারদের ওপর এক তদন্তে বেরিয়ে এল যে, আগের দু বছর ব্যাংকটির সত্ত্বাধিকারী মরগান কোনো আয়কর পরিশোধ করেননি। কিন্তু তার বিরুদ্ধেও নাই-কমিটি প্রমাণ করার মতো কিছু খুঁজে পেল না। নাই-কমিটি একটি প্রশ্নের উত্তর বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বের করার চেষ্টা করছিল, মার্কিন সরকার কেন প্রথমে অক্টোবর, ১৯১৪-এ এবং আগস্ট, ১৯১৫-এ পুনরায় মিত্রপক্ষকে ঋণ প্রদানের অনুমোদন দেয়। যেখানে যুদ্ধের শুরুতে অ্যামেরিকায় উভয়পক্ষকেই ঋণ প্রদান নিষিদ্ধ ছিল।

যাইহোক, কমিটির তদন্ত কর্মকর্তারা নিশ্চিত হয় যে, আগস্ট, ১৯১৫-এ প্রেসিডেন্ট কর্তৃক দ্বিতীয় দফায় লোন অনুমোদনের সময় গুরুতর কিছু ঘটে। ১৯১৫-এ ব্রিটেন অ্যামেরিকার সঙ্গে বিশাল আকারের পণ্য লেনদেন করছিল, যা বাণিজ্যের ভারসাম্য নষ্ট করে দেয়। ডলারের বিপরীতে পাউন্ড-এর মূল্য পতন ঘটে; উভয়পক্ষই বুঝতে পারে যে, ডলারের মূল্যবৃদ্ধির কারণে ব্রিটেনকে অ্যামেরিকান পণ্য ক্রয় বন্ধ করে দেওয়া লাগতে পারে। মার্কিন কোষাগার এর সেক্রেটারি, ইউলিয়াম ম্যাকএডু এবং সেক্রেটারি অব স্টেট রবার্ট ল্যানসিং দাবি করে যে, পাউন্ড-এর দরপতন অ্যামেরিকারও অর্থনৈতিক ধ্বংসের কারণ হতে পারে। ম্যাকএডু প্রেসিডেন্টের কাছে লিখল, অ্যামেরিকার সমৃদ্ধি চলমান ও বিশাল বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীল; তাই এই সমৃদ্ধি সুরক্ষিত রাখতে তাদের অবশ্যই তাদের ক্রেতাকে ক্রয় করতে সর্বপ্রকার সহায়তা করা উচিত। তার মতে, গ্রেট ব্রিটেন সবসময়ই তাদের সেরা ক্রেতা ছিল এবং আছে। ল্যানসিং আরও এক ধাপ এগিয়ে ধারণা করলেন, অ্যামেরিকা যদি ব্রিটেনকে ক্রয় করার ব্যাপারে সহায়তা না করে, তাহলে শিল্পক্ষেত্রে মন্দা, অলস পুঁজি আর শ্রম, অসংখ্য ঘাটতি, আর্থিক শৃঙ্খলাভঙ্গ, জনসাধারণের মাঝে অস্থিরতা এবং শ্রমিক শ্রেণির মাঝে ভোগান্তি নেমে আসবে।

এই বিপর্যয় ঠেকাতে দুজন মিলে ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ডকে তাদের লোন

প্রদানের নীতি শিথিল করতে প্ররোচিত করেন, যা ব্রিটেনকে অধিক অস্ত্র কেনার অনুমোদন দেবে। কমিটির কয়েকজন সদস্যের মতে, তারা দুজন ব্যাংকসমূহের এজেন্ট হিসেবে কাজ করেছেন। এই তথ্যের উন্মোচনের ফলে তদন্ত কর্মকর্তাদের বিশ্বাস এ ব্যাপারে আরও দৃঢ় হচ্ছিল যে, ব্যাংকাররা মার্কিন পলিসিকে যুদ্ধের দিকে ধাবিত করেছে। দুজন ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ড মেম্বার—পল ওয়ারবার্গ ও অ্যাডলফ মিলার, দুজনেই জার্মান বংশোদ্ভূত—ঐ সময়ে আইনে পরিবর্তন আনার ব্যাপারে বিরোধিতা করেন। ওয়ারবার্গ ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ডের গভর্নরকে লিখিত মন্তব্য করেন যে, বাণিজ্য চলমান রাখতে এই যুদ্ধ চলমান রাখতে হবে—এ ধরনের চিন্তা কদর্যতা ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু ম্যাকএডু প্রেসিডেন্টকে বলেন, তারা দুজন তাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি টান থেকে এই বিরোধিতা করছে।

১৯১৫, ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ড আইন শিথিল করে, অতঃপর হাউস অব মরগান ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে দ্রুতই বিশাল লোন প্রদান করল। যদিও কমিটি আলাদাভাবে কোনো ব্যাংককে দোষী সাব্যস্ত করতে ব্যর্থ হয়, তথাপি তারা আবিষ্কার করে, অ্যামেরিকান সরকারের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র ও স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। লোন প্রদানের বিতর্ক কংগ্রেসে না হয়ে হয়েছিল ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের গোপন মিটিং-এ । সবচেয়ে বিস্ফোরক যে তথ্য তারা আবিষ্কার করে, সেটি হচ্ছে—প্রেসিডেন্ট উইলসন অ্যামেরিকান নাগরিকদেরকে ও কংগ্রেসকে যুদ্ধে মিত্রপক্ষের প্রকৃত লক্ষ্যের ব্যাপারে মিথ্যা বলেছেন। তদন্তের শেষ দিকে গোপন ডকুমেন্ট থেকে কমিটি জানতে পারে যে, ১৯১৭-এর এপ্রিলে অ্যামেরিকার আক্রমণের পরপরই প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারি অব স্টেট মি. ল্যানসিং জানতে পারেন যে, মিত্রপক্ষ যুদ্ধে বিজয় অর্জন করার পর রাজ্যাংশ ভাগাভাগির ব্যাপারে গোপন চুক্তি করে, কিন্তু তিনি সে বিষয়টি অস্বীকার করেছিলেন। ল্যানসিং-এর ডায়েরি আর অন্যান্য পূর্ববর্তী গোপন ডকুমেন্ট প্রমাণ করে যে, প্রেসিডেন্ট ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকেই গোপন চুক্তির কথা জানতেন (Olmsted, 2009)।

নাই-কমিটি তাদের তদন্তে প্রমাণ করে দেয় যে, বিশ-এর দশকে যুদ্ধবিরোধীরা যে দাবি করত, সেটি সঠিক ছিল—প্রেসিডেন্ট সত্য লুকিয়েছিলেন। কমিটির চেয়ারম্যান নাই তাই সরাসরিই মন্তব্য করেন, উইলসন জাতির কাছে মিথ্যা বলেছে।

পরবর্তীকালে বার্নেইস মন্তব্য করেন, ঐ সময়টাতে প্রোপাগান্ডা এতটাই নেতিবাচক শব্দ হিসেবে প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল যে, তিনি এটিকে পাবলিক রিলেশন দিয়ে প্রতিস্থাপিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আর এভাবেই বার্নেইস সূচনা করেন নতুন এক ইন্ডাস্ট্রির—পাবলিক রিলেশন।

❁ Bibliography

Brewer, S. A. (2009). Why America Fights: Patriotism and War Propaganda from the Philippines to Iraq. Oxford University Press.

Bruntz, G. G. (1938). Allied propaganda and the collapse of the German Empire in 1918. Stanford University Press.

Chomsky, N. (1991/1997). Media Control. Seven Stories Press.

Creel, G. (1920). How We Advertised America: The First Telling of the Amazing Story of the Committee on Public Information That Carried the Gospel of Americanism to Every Corner of the Globe. Harper & brothers.

Flagg, J. M. (1917). I want you for U.S. Army: nearest recruiting station / James Montgomery Flagg [online image]. Retrieved from Library of Congress: https://www.loc.gov/item/96507165/

Howard, M. (2002). The First World War: A Very Short Introduction. Oxford University Press.

Jowett, G. S., & O'Donnell, V. J. (1986/2012). Propaganda & Persuasion. SAGE Publications.

Kingsbury, C. M. (2010). For Home and Country: World War I Propaganda on the Home Front. University of Nebraska Press.

Manning, M. J., & Romerstein, H. (2004). Historical Dictionary of American Propaganda. Greenwood.

O'Connor, C., & Weatherall, J. O. (2019). The Misinformation Age: How False Beliefs Spread. Yale University Press.

Olmsted, K. S. (2009). Real Enemies: Conspiracy Theories and American Democracy, World War I to 9/11. Oxford University Press.

Osgood, K., & Frank, A. K. (2010). Selling War in a Media Age: The Presidency and Public Opinion in the American Century. University Press of Florida.

Peterson, H. C. (1939). Propaganda for War: The Campaign Against American Neutrality, 1914–1917. University of Oklahoma Press.

Rankin, N. (2009). A Genius for Deception: How Cunning Helped the British Win Two World Wars. Oxford University Press.

Sanders, M. L., & Taylor, P. M. (1982). British Propaganda during the First World War, 1914–18. Palgrave Macmillan.

Soules, M. (2015). Media, Persuasion and Propaganda. Edinburgh University Press.

Stehman, P. (2018). Patriotic Murder: A World War I Hate Crime for Uncle Sam. Potomac Books.

Taylor, P. M. (1990/2003). Munitions of the mind: A history of propaganda. Manchester University Press.

Tye, L. (1998). The Father of Spin: Edward L. Bernays and The Birth of Public Relations. Picador.

Ward, L. W. (1985). The motion picture goes to war: The U.S. government film effort during World War I. UMI Research Press.

অধ্যায় ৩

প্রোপাগান্ডার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেন ও অ্যামেরিকার রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত প্রোপাগান্ডা লাভ করে এক অভূতপূর্ব সফলতা। আর সেই সফলতা এলিট শ্রেণির জন্য রেখে যায় এক বিরাট শিক্ষা—রাষ্ট্রীয় প্রোপাগান্ডা যখন শিক্ষিত শ্রেণির সমর্থন পায়, তখন তা বেশ গুরুতর প্রভাব ফেলতে সক্ষম। আর এই স্পেশাল শিক্ষাটি এডওয়ার্ড বার্নেইস, হিটলারের মতো অনেকেই আত্মস্থ করে নেন, যার ফলাফল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে শুরু হয়ে আজ অবধি সমগ্র পৃথিবী জুড়ে দৃশ্যমান (Chomsky, 1991/1997)।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইতালিয়ান কমিউনিস্ট অ্যান্তোনিও গ্রামসি দাবি করেন, যেকোনো সমাজব্যবস্থা ও ঐতিহাসিক প্রভাবশালী গোষ্ঠী কেবল জোরজবরদস্তি ও সহিংসতা নয়, বরং 'সাংস্কৃতিক আধিপত্য' বিস্তারের ওপরও নির্ভর করে; যার ফলে অধস্তন শ্রেণিসমূহ ক্ষমতাসীন শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি আর স্বার্থের সাথে একাত্ম হয় (Gramsci, 1947/1992)। আশ্চর্যজনকভাবে, মার্কিন মিডিয়া ও যোগাযোগ বিষয়ক অধ্যয়নের-এর প্রাথমিক যুগের কতিপয় অগ্রগামী চিন্তাবিদও প্রায় অনুরূপ চিন্তাধারার বিকাশ ঘটান। এডওয়ার্ড বার্নেইস, জর্জ ক্রিল, হ্যারল্ড লাসওয়েল, ওয়াল্টার লিপম্যানদের মতে, সাধারণ জনগণকে কর্তৃত্বশালী শ্রেণির স্বার্থসমূহের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য প্ররোচিত করতে একটি বাস্তবধর্মী প্রোপাগান্ডা সিস্টেম কার্যকরী। তারা তাদের এ চিন্তাকে প্রকাশ করতে বিভিন্ন পরিভাষা ব্যবহার করেছেন, যেমন: 'সম্মতির প্রকৌশলবিদ্যা'[১], 'জনমত ঘনীভূত করণ[২]', 'জনসংযোগ[৩]' কিংবা 'গণ-মনস্তত্ত্বের ব্যবস্থাপনা'[৪]। তাদের মতে, সমাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন মৌলিক বিষয়াদি রয়েছে, যেগুলো স্পষ্টতই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এবং তাদের চোখে 'নির্বোধ জনসাধারণ'-এর জন্য সেগুলো অত্যন্ত জটিল; তাই ক্রমবর্ধমান এই জটিল সমাজব্যবস্থায় আধিপত্য বজায় রাখতে শাসক শ্রেণির প্রয়োজন 'কার্যকরী আদর্শিক সরঞ্জামাদি'।

---

[১] Engineering of Consent
[২] Crystallization of Public Opinion
[৩] Public Relation
[৪] Management of the Public Mind

পাবলিক রিলেশনের সূচনা

ঊনিশ শতকে উপনিবেশগুলো থেকে ডাকাতি করা সম্পদে ইউরোপে ঘটে যায় শিল্প বিপ্লব। এবং পরবর্তীকালে অ্যামেরিকায় পুঁজিবাদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রিন্টিং মেশিনের উন্নতির সুবাদে পত্রিকা, বই, টেলিগ্রাম, সাময়িকী বা ম্যাগাজিনের সংখ্যা বেশ দ্রুত বৃদ্ধি পায়। একই সঙ্গে ঐ সময়টাতে অনেকগুলো কোম্পানি স্বল্প সময়েই অগ্রগতি লাভ করে; সেগুলোর মধ্যে একটি হলো 'স্ট্যান্ডার্ড অয়েল কম্পানি'; তেল বাণিজ্যে যে প্রতিষ্ঠানটির দুর্নীতি নিয়ে ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে আইডা টারবেল 'হিস্ট্রি অব দ্যা স্ট্যান্ডার্ড অয়েল কম্পানি' শীর্ষক বইটি প্রকাশ করেন। ১৯১৪ সালে কয়লা খনি শ্রমিকদের ধর্মঘট ভণ্ডুল করতে এ কোম্পানির অধীনস্থ কলরাডো ফুয়েল এন্ড আয়রন কম্পানির গার্ডদের আক্রমণে ১৪ জন খনি-শ্রমিক নিহত হয়—ইতিহাসে যা লুডলো ম্যাসাকার হিসেবে খ্যাত—যার পেছনের কলকাঠি নাড়ার অভিযোগ উঠে স্ট্যান্ডার্ড এর প্রতিষ্ঠাকারী রকফেলার পরিবারের জন রকফেলার জুনিয়রের বিরুদ্ধে (Colorado Coal Field War Project, n.d.)। এতে করে তার এবং তার কোম্পানির ভাবমূর্তি যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্থ হয়। পরবর্তীকালে তিনি তার 'পারিবারিক ভাবমূর্তি' পুনরায় মশৃণ করতে আইভি লি-কে নিয়োগ করেন। আইভি লি ছিলেন পাবলিক রিলেশন নিয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে কাজ করা ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম। তিনি রকফেলার জুনিয়রকে পরামর্শ দেন, তিনি যেন তার লজ্জা ভুলে হত্যাকাণ্ডের ঘটনাস্থলে গিয়ে খনি-শ্রমিক ও তার পরিবারের লোকজনদের সাথে কথা বলেন, তাদের দুঃখ আর দুর্দশার কথা শোনেন, এমনকি লি তাদেরকে নিয়ে সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজনের পরামর্শও প্রদান করেন (Heath, 2013)। এটা সেই সময়ের গল্প, যেসময় এই ধরনের পরিকল্পনা কেউ চিন্তাও করত না[১]। অতঃপর রকফেলার জুনিয়রকে যখন তার পরামর্শ অনুসারে কাজ করলেন, কিছুদিন পূর্বেই তার মুণ্ডুপাত করা পত্রিকাগুলো তখন তার 'মানবতা'র প্রশংসা করতে শুরু করল।

পাবলিক রিলেশন নিয়ে কাজ করা ব্যক্তিদের মধ্যে আইভি লি, জর্জ ক্রিল, ওয়াল্টার লিপম্যান এবং এডওয়ার্ড বার্নেইস ছিলেন অন্যতম। উপরিউক্ত ঘটনার মাত্র কয়েক বছর পর প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ক্রিল তার যুগান্তকারী সিপিআই-এর সুপরিকল্পিত প্রোপাগান্ডা পরিচালনা আরম্ভ করেন। মজার ব্যাপার হলো, লিপম্যান

[১] এই ঘটনার সাথে রাসূল ﷺ এর শিক্ষার তুলনা করে দেখুন; ১৪০০ বছর পূর্বেই তিনি আমাদের শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যেতে, তাকে সান্ত্বনা দিতে, তার জন্য দুআ করতে। রাসূল ﷺ এর চাচাতো ভাই জাফর রা. যখন শহীদ হলেন, তিনি নিজেই তার পরিবারকে সান্ত্বনা দিতে গিয়েছিলেন। তিনি আমাদেরকে শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন শহীদদের পরিবারকে সান্ত্বনা দেওয়ার, কিন্তু এ সবই মুসলিমরা করে থাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, অপর মুসলিম ভাইয়ের জন্য। কিন্তু সেই কাজ Lee করতে বললেন দুর্নীতিগ্রস্থ এক কোম্পানির ভাবমূর্তি উদ্ধারের উদ্দেশ্যে—মার্কেটিং পলিসির যেই পরিক্রমাটি পশ্চিমা সভ্যতার কর্ণধাররা আজও ধরে রেখেছে।

ও বার্নেইস দুজনেই এই সংগঠনের অধীনে কাজ করেছিলেন। যুদ্ধের অব্যবহিত কাল পর লিপম্যান তার যুগান্তকারী *Public Opinion* (১৯২২) বইটি পাবলিশ করেন। লিপম্যানের ভাষায়, আধুনিক (পশ্চিমা) সমাজ ক্রমেই জাতীয়, আন্তর্জাতিক স্বার্থের প্রতিযোগিতা, প্রতিনিয়ত অগ্রগতি লাভ করা উদীয়মান মিডিয়া আর সংবাদ-মতামতের নতুন সব উৎসের মতো জটিল হয়ে উঠেছে। এই জটিলতা এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যে, সমাজের শিক্ষিত শ্রেণি পর্যন্ত বিজ্ঞতাপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক, রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু সম্পর্কে পর্যাপ্ত পরিমাণে জ্ঞান রাখে না ও উপলব্ধি করে না। বিভ্রান্তিকর এই আধুনিক পৃথিবীতে সব বিষয়ে সম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রায় অসম্ভব ব্যাপার, তাই আমরা বেছে নিই 'শর্টকাট'। আমাদের সমাজ আমাদের জন্য পূর্ব থেকেই যে বাঁধাধরা সংজ্ঞা নির্ধারণ করে রেখেছে সেগুলোই গ্রহণ করে নিই বিনা বাক্য ব্যয়ে। লিপম্যানের মতে, সমাজের অধিপতিদের দায়িত্ব হলো, তারা কিছু প্রতীক ব্যবহার করে বিশাল চিন্তাহীন এই দলকে যৌক্তিক কর্মপ্রক্রিয়ার দিকে ধাবিত করবে (Soules, 2015, pp. 61-62), যদিও তার সেই পরামর্শ পরবর্তীকালে বহু জননেতা ও প্রভাব বিস্তারকারীগণ গ্রহণ করেছেন, তবে তাদের উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন।

এডওয়ার্ড বার্নেইস লিপম্যানের পাবলিক অপিনিয়ন দ্বারা প্রভাবিত হন, সেই সঙ্গে তার আংকেল ফ্রয়েডের 'গণ মনস্তত্ত্ব' তত্ত্বও তাকে প্রভাবিত করে। ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত তার বিখ্যাত বই *Propaganda*-তে তিনি শিল্পপতি ও শাসকদের উদ্দেশ্যে প্রোপাগান্ডা ও পাবলিক রিলেশন পরিচালনা করার পন্থা সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করেন। তার মতে,

> 'জনগণের সংগঠিত সকল অভ্যাস ও মতামতকে সচেতন ও বুদ্ধিমত্তার সাথে বশে নিয়ে আসা গণতান্ত্রিক সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। যারা সমাজের এই অদেখা পদ্ধতিকে প্রভাবিত করে তারা এক অদৃশ্য শাসন প্রতিষ্ঠা করে, আর সেটাই আমাদের রাষ্ট্রের সত্যিকারের ক্ষমতাসীন শক্তি' (Bernays, 1928, p. 9)।

এইসকল ব্যক্তিগণ জনসাধারণকে কিভাবে প্রভাবিত করে? বার্নেইসের ভাষায়,

'তারা তাদের নেতৃত্বের প্রাকৃতিক গুণাবলি, প্রয়োজনীয় আইডিয়া দেওয়ার যোগ্যতা আর সামাজিক কাঠামোতে তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের মাধ্যমে আমাদের পরিচালিত করে।' (Bernays, 1928)।

তার মতে, পাবলিক রিলেশনের উপদেষ্টাগণ জনগণের চিন্তাভাবনার ধরন সম্পর্কে জানে, আর এটাও জানে কিভাবে তাকে প্রভাবিত করতে হয়। তাদের কাজ হলো, 'অদৃশ্য শাসক' আর জনগণের মাঝে মধ্যস্থতা করা। যেমন ধরুন, বিংশ

শতাব্দীর শুরুর দিকে অ্যামেরিকাতে শর্ট স্কার্ট পরার ফ্যাশন ছিল না। ঐ সময়ে যদি কেউ শর্ট স্কার্ট পরত, তাহলে নিউ ইয়র্কের পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে জেলে পুরত (Bernays, 1928, p. 34)। পরবর্তীকালে প্যারিসে ফ্যাশন লিডাররা শর্ট স্কার্টকে 'ফ্যাশন' হিসেবে জনপ্রিয় করে, সেখান থেকে প্রভাবিত হয়েই অ্যামেরিকাতে ধীরে ধীরে এটি জনপ্রিয় হয়[১]।

বিংশ শতাব্দীর পূর্বেও ধূমপানের অভ্যাস নারীদের জন্য অনৈতিক ও বেমানান হিসেবে ধর্তব্য ছিল। উনিশ শতকে নারী ধূমপায়ীদের ভাবা হতো 'নষ্টা মেয়ে' হিসেবে, ঐ সময়ে ধূমপান ছিল পতিতাবৃত্তির পেশাগত সিম্বল–প্রতীক। তখন নারীদের ধূমপান এতটাই বাজে কাজ হিসেবে গণ্য হতো যে, ১৯০৮ সালে নিউ ইয়র্কে প্রকাশ্যে ধূমপান করার অপরাধে এক নারীকে গ্রেফতার করা হয় (Amanda Amos, 2000)।

কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নারীরা যখন পুরুষদের রেখে যাওয়া কর্মক্ষেত্র সচল রাখতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, তখন পুরুষদের সংস্পর্শে এসে তাদের অনেক অভ্যাসের মতো ধূমপানের অভ্যাসটাও নারীদের মাঝে ছড়িয়ে পড়লো। যুদ্ধের পর, ত্রিশের দশকে মার্কিন নারীদের—বিশেষ করে তরুণীদের—মাঝে ধূমপানের হার ব্যাপক হারে বেড়ে যায়[২] (Waldron, 1991)। ঐ সময় থেকেই পাশ্চাত্যে নারীদের ধূমপানের প্রতি সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ধীরে ধীরে সংবেদনশীলতা হারিয়ে ফেলতে শুরু করে। আর সিগারেট কোম্পানিসমূহ তাদের মার্কেটে ক্রেতার সংখ্যা দ্বিগুণ করার স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করে। কিন্তু এই লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে চাইলে পতিতাদের প্রতীক ধূমপানকে শুধু সম্মানজনক হিসেবে উপস্থাপন করলেই চলবে না; সেই সাথে বিষয়টিকে সামাজিক, ফ্যাশনেবল, স্টাইলিশ আর নারীসুলভ(!) হিসেবেও ফুটিয়ে তুলতে হবে।

অ্যামেরিকান টোব্যাকো কোম্পানির প্রেসিডেন্ট তার প্রতিষ্ঠানের প্রচারণার জন্য এডওয়ার্ড বার্নেইসকে উনার প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ করলেন। এর ফলাফল দাঁড়ায়, বার্নেইসের সহযোগিতায় অ্যামেরিকান টোব্যাকো পরবর্তী দু বছরের মধ্যে

[১] দেশীয় সেক্যুলাররা প্রায়ই বলে, 'ফ্রান্স হলো সভ্যতার সূতিকাগার।' তবে তারা 'অসভ্য' শব্দটা বলতে ভুলে যায়। পোশাক খুলে জনসম্মুখে দেহপ্রদর্শনে পশুদের সাথে প্রতিযোগিতা করার দৌড়ে তারাই বাকিদের পথ দেখিয়েছে।

[২] অর্থাৎ, তখনকার সময়ে নারী সম্প্রদায়ের মধ্যে কেবল পতিতাদের ভিতর ধূমপান করার অভ্যাস পরিলক্ষিত হতো। লক্ষ্য করুন, এখনকার ফেমিনিস্টরা একে দাবি করে অধিকার হিসেবে! অথচ যেকোনো সুবিবেচক ব্যক্তি বা দলের কর্তব্য হলো, ক্ষতিকর বিষয়কে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করা। পুরুষরা ধূমপান করায় সেটির ক্ষতিকর দিক কখনোই হ্রাস পায়নি যে, এটাকে অধিকার হিসেবে দাবি করতে হবে। তারা যদি সত্যিই সঠিক পথে থাকত, তাহলে তারা বরং পুরুষদের ধূমপানকে নিষিদ্ধ করার আন্দোলন করত। সব ক্ষেত্রে বিজ্ঞান নিয়ে আসা বঙ্গীয় সেক্যুলার-ফেমিনিস্টরা মাদক দ্রব্যের ক্ষেত্রে 'বিজ্ঞান' শব্দটা কেন ভুলে যায়, সেই রহস্য আর কখনোই উন্মোচিত হবে না।

বেস্ট সেলিং ব্র্যান্ডের স্বীকৃতি পায়, আর চল্লিশের দশকের শুরুতে অ্যামেরিকায় সবচেয়ে বেশি বিক্রিত সিগারেট কোম্পানিতে পরিণত হয় (Brandt, 2007, p. 75)। প্রোপাগান্ডা বইটি প্রকাশিত হবার পরের বছর বার্নেইসের পরামর্শে—১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে—অ্যামেরিকান টোব্যাকো ইস্টার সানডে প্যারেডে[১] নারী ভাড়া করে আনে যারা সেখানে প্রকাশ্যে অ্যামেরিকান টোব্যাকো'র 'Lucky Strike' সিগারেট দিয়ে ধূমপান করে, যেটাকে তারা ভূষিত করেছিল স্বাধীনতার মশাল[২] হিসেবে, তারা ধূমপানকে নারীর স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে প্রচার করে। সেই সময়ে এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা বেশ বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল, অবশ্য একই সঙ্গে সেটি প্রচুর মিডিয়া কভারেজও লাভ করে[৩]। ধীরে ধীরে নারীদের ধূমপান অ্যামেরিকাতে স্বাভাবিক একটি বিষয়ে পরিণত হয়। দেখা গেলো, ১৯২৯ সালে বার্নেইস যে পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিলেন, মাত্র কয়েক দশকেই সেটি অ্যামেরিকায় বাস্তব সত্যে পরিণত হয়[৪]।





ত্রিশের দশকের শেষ দিকে অ্যামেরিকান টোব্যাকোর বিজ্ঞাপনগুলো এতটাই চমকপ্রদ ছিল যে, সেগুলো উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যক্তিকে প্রভাবিত করার মতো শক্তিশালী ছিল। যেমন : Lucky Strike সিগারেটের বিজ্ঞাপনগুলোতে দাবি করা হতো, এই সিগারেট নারীদের দেহ স্লিম রাখতে সাহায্য করবে! ঐ সময়ে সিগারেটের

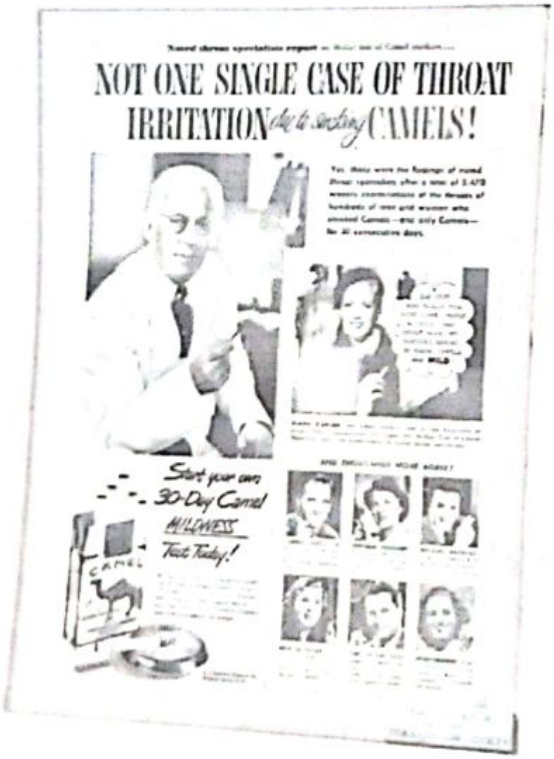
---

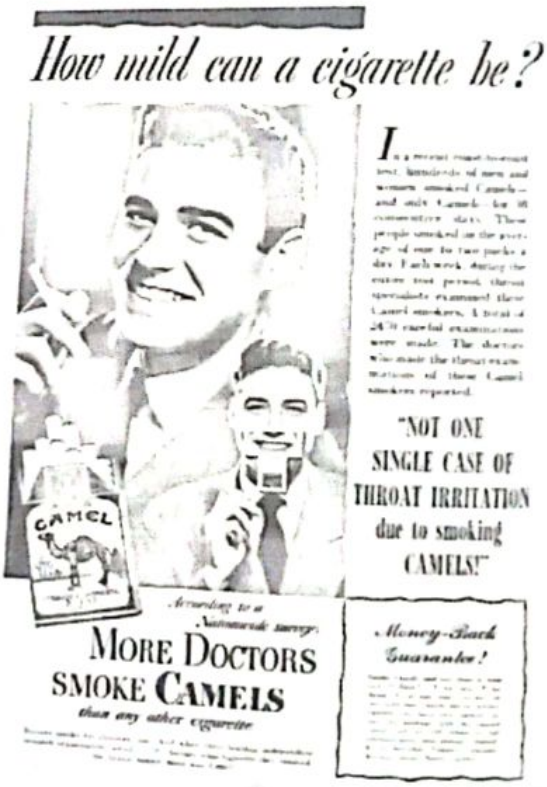
[১] Easter Sunday 'Parade'
[২] Torches of Freedom
[৩] বার্নেইসের টার্গেটই ছিল মিডিয়া আকর্ষণ করা
[৪] যদিও এতে বিজ্ঞাপনদাতাদের পাশাপাশি অ্যামেরিকান সংস্কৃতি, দর্শনের ভূমিকা সমানভাবে উল্লেখযোগ্য। কেননা, মুসলিম সমাজে এ ধরনের প্রচেষ্টা যতটা প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়, লিবারেল-সেক্যুলার সমাজে ততটা হয়নি।

বিজ্ঞাপনে ডাক্তারদেরকেও অহরহ বিরামহীনভাবে ব্যবহার করা হতো। যেমন : 'অধিকাংশ ডাক্তার ক্যামেলস সিগারেট ফুঁকে'[১] (see Brandt, 2007 for more details)। অর্থাৎ, ডাক্তাররা যখন সিগারেট খাচ্ছে, সেহেতু ধূমপান নিশ্চয়ই এত খারাপ কিছু না[২]!









[১] 'More doctors smoke Camels' (Camels একটি সিগারেট ব্র্যান্ডের নাম)
[২] Example of Testimonial Propaganda, coming later in the books.

a free carton of Camel cigarettes, and then asking what brand they smoked.



According to a recent Nationwide survey:

MORE DOCTORS SMOKE CAMELS THAN ANY OTHER CIGARETTE



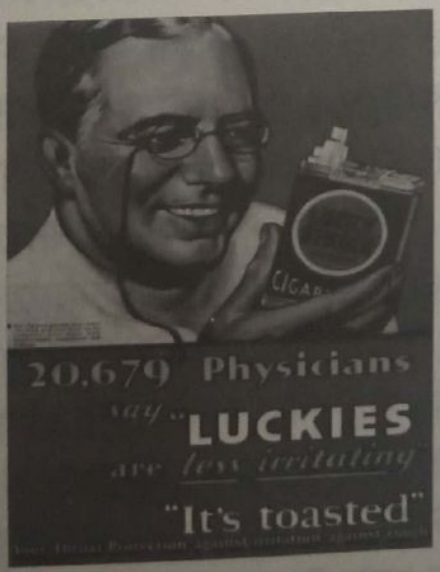
CAMELS Costlier Tobaccos

1946 cigarette advertisement launched by R.J. Reynolds Tobacco Company.









সেখান থেকে ধীরে ধীরে শুরু হলো বিজ্ঞাপনের স্বর্ণযুগ; কর্পোরেশন কর্ণধাররা

অর্থের জন্য ভালো-খারাপ যাচাই-বাছাই না করে কেবল পণ্য ভোগ করাকেই স্বাধীনতা হিসেবে প্রচারণা শুরু করলেন। কর্পোরেট জগত মাঠে নেমে পড়ল ভোগবাদী ক্রেতা 'সৃষ্টি'র কাজে। সেই সঙ্গে জনসংযোগের সেই শিক্ষাকে যুদ্ধ ছাড়াও কিভাবে শান্তিপূর্ণ সময়ে কাজে লাগানো যেতে পারে, সে বিষয়ে পাবলিক রিলেশন্স কর্মকর্তারা হাতে-কলমে দক্ষতা অর্জন করতে শুরু করলেন।

পাবলিক রিলেশন ও প্রোপাগান্ডার সম্পর্ক ও পার্থক্য

তথ্য-প্রযুক্তি ও যোগাযোগ-ব্যবস্থার উন্নয়নের শতাব্দীতে জনসংযোগ পরিণত হয়েছে কমার্শিয়াল সাইট, গণমাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যমগুলোর অবিচ্ছেদ্য এক অংশে। জনসংযোগের সাথে প্রোপাগান্ডার ঘনিষ্ঠ যোগসূত্রও রয়েছে। জনসংযোগ কর্মীরা তাদের মক্কেল বা খদ্দেরদের স্বার্থ চরিতার্থ করার দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে সামনে এগিয়ে যান। এক্ষেত্রে খদ্দেরদের স্বার্থ উদ্ধারই তাদের প্রধানতম কর্তব্য। উক্ত স্বার্থোদ্ধারের কর্মপদ্ধতিও অনেকাংশে তারাই ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করেন। বার্নেইস (১৯২৮) উভয়ের পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, জনসংযোগ যেখানে শেষ, প্রোপাগান্ডার সেখানে শুরু। যদিও তিনি তার অনেক অনৈতিক কাজকেই প্রোপাগান্ডা হিসেবে চিহ্নিত করতে নারাজ ছিলেন, তার কাছে সেগুলো শুধুই জনসংযোগ। প্রকৃতপক্ষে, জনসংযোগ কর্মীরা যেহেতু শুধুমাত্র ক্লায়েন্টদের দেওয়া দায়িত্ব বাস্তবায়ন করেন, সেহেতু এটি সর্বদাই প্রোপাগান্ডাতে রূপান্তরিত হবার সম্ভাবনা রাখে না।

ধরুন, কোনো কমার্শিয়াল অথবা অলাভজনক সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের জনসংযোগ টিম তাদের শিক্ষা বিষয়ক বা সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের জন্য সংবাদমাধ্যমে গুরুত্বের সঙ্গে প্রচারণা করল কিংবা কোনো সাইটে তাদের পণ্যের প্রচারণা করল। আপনি তাদের এই কর্মকাণ্ডকে প্রোপাগান্ডা বলতে পারবেন না, যতক্ষণ না তাদের 'সামাজিক' কর্মকাণ্ড LGBTQ+ টাইপের কোনো 'সামাজিক' কর্মকাণ্ডের প্রচারণা হয়, যা ইসলাম-বিরোধী। সাধারণত পাবলিক রিলেশন প্রোপাগান্ডা ছড়ায় না, বরং তা ক্লায়েন্টের স্বার্থ রক্ষার্থে চেষ্টা চালায়। কিন্তু, ঐ জনসংযোগ টিম যদি LGBTQ+ এর পরোক্ষ প্রচারণা করে? কিংবা ধরুন, কোনো আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ক[১] প্রোমোটকারী দাতব্য সংগঠন সব ধর্মের অনুসারীদের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে তার 'নির্দিষ্ট' একটা অংশ দুঃস্থদের জন্য ব্যয় করে। হঠাৎ একদিন আপনি দেখতে পেলেন, সংগঠনটি মুসলিমদের যাকাতের টাকা নিয়ে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত যাকাতের আটটি খাতের বাইরে যথেচ্ছভাবে অন্য ধর্মের উৎসবে ব্যয় করছে। এ বিষয়ে জনরোষের সৃষ্টি হলে

[১] Interfaith Relation

তারা তাদের জনসংযোগ টিমকে দিয়ে দুঃস্থ মুসলিমদের খাদ্যসামগ্রী প্রদান, মাদরাসার ছেলেদের খাবার খাওয়ানোর ছবি প্রচার করতে শুরু করল, তাদের সমালোচনা করা ব্যক্তিদের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করল, আবেগি বক্তব্য দিয়ে সহমর্মিতা অর্জন করতে লাগলো; কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগের কোনো সন্তোষজনক জবাব তারা দিচ্ছে না। তখন সেটা আর শুধুই জনসংযোগ থাকে না, সেখানে প্রোপাগান্ডাও যুক্ত হয়ে গেছে। কারণ, ঐ সংগঠনের ইসলাম-বিরোধী কর্মকাণ্ড 'ন্যায়সঙ্গত' করতে তারা তাদের জঘন্য কর্মকাণ্ডের জবাবদিহি না করে এর পরিবর্তে অন্য একটি বিষয় তুলে এনে জনসংযোগ এক্টিভিটি পরিচালনা করছে।

মূলত, জনসংযোগ বিষয়ক কার্যক্রম তার সীমানা ছাড়িয়ে প্রোপাগান্ডার গণ্ডিতে পা দিয়েছে কি না, এটি নির্ভর করবে দুটি বিষয়ের ওপর। এক, খদ্দেরের উদ্দেশ্য; দুই, জনসংযোগ কর্মপ্রক্রিয়ার ধরন। অনেক সময় দেখা যায়, স্বয়ং প্রোপাগান্ডিস্টরাই জনসংযোগ টিম নিয়োগ করে, সেক্ষেত্রে প্রোপাগান্ডা আর জনসংযোগ একে অপরের সাথে এমনভাবে মিশে যায়, যেভাবে স্বচ্ছ জলে গলে যায় লবণ। তাই, দুটির মধ্যে যেকোনো একটি বিষয় ইসলামের বিপক্ষে চলে গেলে, তখন সেটি প্রোপাগান্ডা হিসেবে বিবেচিত হবে, এটি ছাড়া ঢালাওভাবে জনসংযোগ ইন্ডাস্ট্রিকে প্রোপাগান্ডা ইন্ডাস্ট্রি বলার কোনো যৌক্তিকতা নেই।

পাবলিক রিলেশন ও সাংবাদিকতা

সংবাদমাধ্যমের নিজস্ব 'মূল্যবোধ'সমূহ যদি বিবেচনা করা হয়, তাহলে সাংবাদিকতা ও পাবলিক রিলেশন বিষয়ক কার্যক্রমের মধ্যে একটি কল্পিত নিরপেক্ষতার দেয়াল দাঁড়িয়ে আছে। সাংবাদিকদের কাছে জনগণ যে প্রত্যাশা করে, জনসংযোগ কর্মীদের নিকট তারা সেই আশা করে না। এই দুটি প্রফেশন যখন তাদের মধ্যকার ব্যবধান দূর করে ফেলে, তখন ক্ষতিটা হয় মূলত জনসাধারণের; তারা তাদের আকাঙ্ক্ষিত ও প্রত্যাশিত সত্য, নিরপেক্ষ, ভারসাম্যপূর্ণ, প্রয়োজনীয় ও তাৎক্ষনিক জরুরি তথ্য পাবার সুযোগটুকু হারিয়ে ফেলে।

পঞ্চাশের দশকে ভ্যান্স প্যাকার্ড আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, মিডিয়া-রিসার্চ এবং 'ইমেজ' বিল্ডিং প্রসেস ব্যবহার করে মিডিয়া মানুষকে প্রভাবিত করার কাজে লাগাতে পারে। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ অনুসন্ধানী সাংবাদিক নিক ডেভিয়েস দাবি করেন যে, সাংবাদিকতা নামক পেশাটি ক্রমেই পাবলিক রিলেশন ও স্পিন পদ্ধতির অব্যাহত প্রসারণের ফলে সংকুচিত হয়ে আসছে। তার মতে, পাবলিক রিলেশন বলতে—

'...শুধু প্রেস কনফারেন্স আর প্রেস রিলিজ প্রদানই নয়, বরং মিথ্যা ঘটনা

সাজিয়ে মিডিয়া কভারেজের ব্যবস্থা করা, নকল 'ফ্রন্ট গ্রুপ'[১] তৈরি করে নির্দিষ্ট ইস্যুতে সংবাদ সৃষ্টি করা, আপাতদৃষ্টিতে নিরপেক্ষ 'বিশেষজ্ঞ' সরবরাহ করা—যারা গোপন কোনো জনসংযোগ এজেন্ডা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কথা বলবে—এবং বিভিন্ন মিডিয়া কভারেজ ক্যাম্পেইনের সঙ্গে লবিং ও সমন্বয় করে সরকারি পলিসিতে রদবদল ঘটানো' (২০০৮)-ও পাবলিক রিলেশনের আওতাধীন হয়ে পড়েছে।

১৯২৮ সালে জনসংযোগের যে বীজ বার্নেইস রোপণ করেছিলেন, প্রায় এক শতাব্দী ধরে অভিযোজিত হয়ে আজ তা এক বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে সাংবাদিক এবং জনসংযোগ বিষয়ক পরামর্শদাতারা নিয়মিতই সংবাদ 'তৈরি' করতে একত্রে কাজ করে থাকেন। ফলাফলে সাংবাদিকতা পরিণত হয়েছে বাণিজ্যে; সংগৃহীত সংবাদের পরিবর্তে প্রচারিত হয় প্রেস রিলিজ, নিউজ এজেন্সি কর্তৃক প্রদানকৃত ও অন্যান্য পূর্ব-প্রস্তুতকৃত সংবাদ। সংবাদের পরিবর্তে জনসংযোগধর্মী আর্টিকেল প্রচারের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় পশ্চিমে প্রতিনিয়তই হ্রাস পাচ্ছে সংবাদপত্রের সংখ্যা।

অ্যামেরিকাতে ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে প্রতি এক লক্ষ নাগরিকের বিপরীতে কাজ করত ৩৬ জন সাংবাদিক এবং ৪৫ জন জনসংযোগ কর্মকর্তা। ২০০৯ সালে এসে প্রতি এক লক্ষ নাগরিকের বিপরীতে সাংবাদিকের সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ২৫ জনে, অপরদিকে জনসংযোগ কর্মীদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৯০ জন। অর্থাৎ, প্রতি ১ জন সাংবাদিকের পরিবর্তে ৩ জনেরও বেশি জনসংযোগ কর্মী কর্মরত (McChesney & Nichols, 2009, chapter 1, chart 6), যারা সাংবাদিকদের থেকেও বেশি অর্থের যোগান প্রাপ্ত (Sullivan, 2011)। ১৯৯৭ থেকে ২০০৭ সালের মধ্যে জনসংযোগ সেক্টরের আয় $৩.৫ বিলিয়ন থেকে $৮,৭৫ বিলিয়নে উন্নীত হয়। অপরদিকে একই সময়ের ভিতর পত্রিকার বিজ্ঞাপন প্রদানের মাধ্যমে আয় হ্রাস পেয়েছে অর্ধেকেরও বেশি (Barthel, 2017)।

মার্গারেট থ্যাচার যখন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী[২] নির্বাচিত হলেন, তখন ব্রিটিশ সরকার-এর সেন্ট্রাল অফিস অব ইনফরমেশন-এর বার্ষিক ব্যয় ছিল £২৭ মিলিয়ন। ব্রিটিশ জনসংযোগ বিভাগ এই সেন্ট্রাল অফিস অব ইনফরমেশন-এর অধীনে কাজ করত। দশ বছর পর[৩] তাদের বাজেট বৃদ্ধি পেয়ে পৌঁছায় £১৫০ মিলিয়নে। টনি ব্লেয়ার প্রধানমন্ত্রী হবার প্রথম দু বছরে ৩১০ জন প্রেস অফিসার নিয়োগ প্রদান করেন, সেই সাথে জনগণের মিলিয়ন মিলিয়ন ইউরো ব্যয় করতে শুরু করেন

[১] ফ্রন্ট গ্রুপ হলো এমন একটি সংস্থা, যা একটি এজেন্ডাকে প্রতিনিধিত্ব করার অভিপ্রায় প্রকাশ করে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে এটি অন্য কোনো পক্ষ বা স্বার্থের জন্য কাজ করে, যে পক্ষের অর্থায়ন হয়তো লুকানো থাকে বা খুব কমই উল্লেখ করা হয়।
[২] ১৯৭৯
[৩] ১৯৮৮

প্রাইভেট জনসংযোগ এজেন্সির পিছনে। অ্যামেরিকার কথাই ধরুন; ফেডারেল সরকার ২০০৬-২০১৭, এই এক দশকে জনসংযোগ ও বিজ্ঞাপনের পেছনে বার্ষিক $১ বিলিয়ন হারে ব্যয় করেছে! ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দে ফেডারেল পাবলিক রিলেশন অফিসারের সংখ্যা ছিল ৫০৮৬ জন, যা মার্কিন শিক্ষা বিভাগের কর্মীদের সংখ্যা[১] থেকেও বেশি (Boehm, 2016)। বাস্তবিক অর্থে, এই সেক্টরে অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ কখনোই স্তিমিত হয়নি, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পেয়েছে (Davies, 2008)।

নিক ডেভিয়েস ২০০৮ সালে ইংল্যান্ডের পাঁচটি জনপ্রিয় দৈনিক পত্রিকার সংবাদের উৎস নিয়ে কার্ডিফ ইউনিভার্সিটির সাংবাদিকতা বিভাগের স্পেশালিস্ট গবেষকদের সঙ্গে নিয়ে একটি জরিপ পরিচালনা করেন। পত্রিকা পাঁচটি হলো দ্যা টাইমস, দ্যা গার্ডিয়ান, দ্যা ইন্ডিপেন্ডেন্ট, দ্যা টেলিগ্রাফ এবং দ্যা ডেইলি মেইল[২]।পরপর দু' সপ্তাহ এই পত্রিকাগুলোর (ইংল্যান্ডের অভ্যন্তরীণ) সবগুলো দেশীয় সংবাদ (২২০৭টি) চিহ্নিত করে তারা 'গার্ডিয়ান' পত্রিকার নিউজ ডেস্কের সাহায্য নিয়ে ঐ দু সপ্তাহে সবগুলো সংবাদ সংগ্রহ করে। কোনো সংবাদ বা তথ্য সম্পর্কে সন্দেহ থাকলে তারা সংশ্লিষ্ট পত্রিকার রিপোর্টারদের সাক্ষাৎকার নিয়ে ঐ তথ্যের একেবারে গোড়া পর্যন্ত পৌঁছে যান।

দু সপ্তাহের তদন্ত শেষে তারা যে ফলাফল হাতে পেলেন, তাতে তারা বিস্মিত-ই হলেন—দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও মর্যাদাশালী পত্রিকাগুলো প্রতিনিয়ত যাচাই-বাছাই ছাড়াই সেকেন্ড-হ্যান্ড সংবাদ পরিবেশন করে যাচ্ছে। আর এই ধরনের খবরগুলো প্রধানত দুই ধরনের প্রাথমিক সোর্স থেকে আসে : ওয়্যার এজেন্সি-সমূহ[৩] ও পাবলিক রিলেশন ফার্মসমূহ, যারা প্রধানত বিশেষ কোনো কমার্শিয়াল বা পলিটিকাল উদ্দেশ্যে কাজ করে। সংবাদগুলোর ৬০%-ই সম্পূর্ণ বা প্রধানত কোনো তারবার্তা বা জনসংযোগ বিষয়ক পেপার। ২০% সংবাদ তারবার্তা বা জনসংযোগ মেটারিয়ালের সাথে কম-বেশি তথ্য যোগ করে প্রস্তুত করা হয়। ৮% তথ্যের ক্ষেত্রে রিসার্চারদের দল কোনো উৎস নির্ধারণ করতে সক্ষম হননি। কেবল মাত্র ১২% সংবাদের ক্ষেত্রেই রিসার্চারগণ নিশ্চিতভাবে বলতে সক্ষম হন যে, আর্টিকেলগুলো রিপোর্টারদের নিজেদের প্রস্তুতকৃত।

কিন্তু, দুঃখের বিষয় হলো—পত্রিকাগুলো এ কথা বেমালুম অস্বীকার করে। কার্ডিফের রিসার্চাররা দেখতে পেলেন, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এগুলো 'স্টাফ

---

[১] ৪৫০০

[২] The Times, The Guardian, The independent, The Telegraph এবং The Daily Mail.

[৩] ওয়্যার এজেন্সি বা নিউজ এজেন্সি হলো সেসব ব্যবসায়ী সংগঠন, যেগুলো সংবাদ সংগ্রহ করে পত্রিকা, ম্যাগাজিন, রেডিও, টিভি, বা অন্যান্য সংবাদ-মাধ্যমের কাছে বিক্রয় করে।

রিপোর্টার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত'[১] টাইপের বিভ্রান্তিকর তথ্য দেওয়া থাকত। অপরদিকে, জনসংযোগ কর্মীরা সচরাচর সংবাদের নিরপেক্ষতা প্রমাণ করতে নিজেদের আইডেন্টিটি প্রকাশ করতে চান না, যার ফলে সাংবাদিকরা তাদের প্রদানকৃত তথ্য নিজেদের নামে চালিয়ে দিলে সেটা বরং দু'পক্ষের জন্যই লাভজনক হয়। পরিশেষে জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণ করে কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চারগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, প্রকাশনা সংস্থা কর্তৃক কোনো অর্থবহ স্বাধীন সাংবাদিকতা সংশ্লিষ্ট কর্মপ্রক্রিয়া এখন আর বিধিবিধান হিসেবে বিদ্যমান নেই, বরং তা 'ব্যতিক্রম' হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও বা প্রতিটি সাংবাদিকই যে নিজেদের মূল্যবোধ বিকিয়ে দিয়েছেন, বিষয়টা তেমন নয়। কিন্তু, এখন আর সেটি 'স্বাভাবিক' কোনো ঘটনা নয়।

[১] 'Prepared by Stuff Reporter' বা নির্দিষ্ট কোনো রিপোর্টারের নাম যিনি এজেন্সি কপিটি নিজের ভাষায় পুনর্লিখন করেন।

❁ Bibliography

Colorado Coal Field War Project. (n.d.). A History of the Colorado Coal Field War. Retrieved from University of Denver: https://www.du.edu/ludlow/cfhist3.html

Amanda Amos, M. H. (2000). From social taboo to "torch of freedom": the. Tobacco Control, 9(1), 03-08. https://doi.org/10.1136/tc.9.1.3

Barthel, M. (2017, June 1). Despite subscription surges for largest U.S. newspapers, circulation and revenue fall for industry overall. Retrieved from Pew Research Center: https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/06/01/circulation-and-revenue-fall-for-newspaper-industry/?fbclid=IwAR13xbtBukwwOXw1qEMf8XzLJPHDVOa-8xCihYwDGALQjQtyLcX5PK_zz8A

Bernays, E. (1928). Propaganda. New York : H. Liveright.

Boehm, E. (2016, October 10). The Pentagon Accounts for More Than Half of the Federal Government's $1 Billion PR Budget. Retrieved from Reason.com: https://reason.com/2016/10/10/the-pentagon-accounts-for-more-than-half/

Brandt, A. M. (2007). The Cigarette Century: The Rise, Fall, and Deadly Persistence of the Product That Defined America. Basic Books.

Chomsky, N. (1991/1997). Media Control. Seven Stories Press.

Davies, N. (2008). Flat Earth News. Chatto & Windus.

Gramsci, A. (1947/1992). Prison Notebooks, Volume 1. Columbia University Press.

Heath, R. L. (2013). Encyclopedia of Public Relations. SAGE Publications.

Lippmann, W. (1922). Public Opinion. Harcourt, Brace & Co.

McChesney, R. W., & Nichols, J. (2009). The Death and Life of American Journalism: The Media Revolution that Will Begin the World Again. Nation Books.

Soules, M. (2015). Media, Persuasion and Propaganda. Edinburgh University Press.

Sullivan, J. (2011). True Enough. Retrieved November 14, 2021, from Columbia Journalism Review: https://archives.cjr.org/feature/true_enough.php?fbclid=IwAR29Shge7xTjMem7ue38nqQpL0949QGSU378sXNGCJB-qGPFA3z3ifG7CLA

Waldron, I. (1991). Patterns and causes of gender differences in smoking. National Library of Medicine.

অধ্যায় ৪

সাংবাদিকতা বনাম প্রোপাগান্ডা

উনিশ শতকে মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কার ও এর উৎকর্ষ সাধিত হয়। এরপর সংবাদপত্রের জগতে ঘটে যায় এক মহাবিপ্লব। সময়ের পরিক্রমায় সংবাদ-মাধ্যম আজ পরিণত হয়েছে দৈনন্দিন জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশে। আর এই সংবাদ পরিবেশনের পেছনের কারিগর যে সাংবাদিক, তার পেশাটিও সংবাদপত্রের গুণগত মানের ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রেখে এসেছে। বর্তমান সময়ে অত্যন্ত প্রভাবশালী এই পেশায় কর্মরত সাংবাদিকদের পরিবেশিত সংবাদের ক্ষেত্রে বেশ কিছু আবশ্যকীয় বিষয়ের উপস্থিতি লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়। যেমন :

- সত্যতা : তথ্যের সত্যতা না থাকলে তার কোনো মূল্য নেই।
- যথার্থতা : সংবাদ হতে হয় যথার্থ, কোনো লুকোচুরি ব্যতীত।
- প্রয়োজনীয়তা : অপ্রয়োজনীয় সংবাদ জনগণের উদ্দেশ্যে পরিবেশিত করা মানে তাদের সময় ও মনোযোগ নষ্ট করা।
- প্রভাব-মুক্ত সংবাদ : কোনো প্রভাবশালী বা বিত্তশালী ব্যক্তি/দল কিংবা প্রতিষ্ঠানের অবৈধ প্রভাবমুক্ত সংবাদ।
- সংবাদের মান : সংবাদ হতে হবে প্রাসঙ্গিক, রুচিশীল, সুন্দর, পরিচ্ছন্ন।

এগুলো ছাড়াও সচেতন নাগরিকগণ সাংবাদিকদের কাছ থেকে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও আশা করে থাকে। কিন্তু, চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ফারাকটা কতটুকু? সাধারণ জনগণ তাদের কাজের ওপর কতটুকু সন্তুষ্ট? চলুন, ইউরোপের অভিজাত প্রতিনিধি হিসেবে (অ)সভ্য ব্রিটেনে সাংবাদিকতা পেশাটির জনপ্রিয়তা যাচাই করি।

২০১৩ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ মার্কেট রিসার্চ অর্গানাইজেশন Ipsos MORI-এর (২০১৩) পরিচালিত পোলের ফলাফলে দেখা যায়, সেখানকার মাত্র ২১% নাগরিক সাংবাদিকতা পেশাটির ওপর আস্থা রাখে। শতকরা মাত্র একুশ জন! তবে, জনগণের বিশ্বাসের লিস্টের তলানিতে থাকা পেশাটি কিন্তু সাংবাদিকতা নয়। তলানির পজিশন সগর্বে দখল করেছেন রাজনীতিবিদরা, শতকরা মাত্র ১৮ জন নাগরিক তাদেরকে বিশ্বাস করে।

পরস্পর সম্পৃক্ত এই দুই পেশার তলানিতে থাকার কারণগুলো বেশ সহজ। অধিকাংশ সময়ই দেখা যায়, কোনো অসৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে রাজনীতিবিদ ও মূলধারার মিডিয়াগুলো পরস্পর সঙ্গী হয়ে কাজ সম্পাদন করে। প্রায়শই জরুরি সংবাদগুলো সঠিক উপায়ে পরিবেশন করতে সংবাদ-মাধ্যম অনীহা প্রকাশ করে। কিংবা দেশের অর্থনীতি ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সংবাদ ফ্রেম বদলে প্রচার করা হয়। ইতিহাসের প্রাসঙ্গিক বিষয় বাদ দিয়ে অপ্রয়োজনীয় ইতিহাস হাইলাইট করা হয়। আর এভাবেই প্রতিনিয়ত সত্যকে বিকৃত করে জনগণের উদ্দেশ্যে তারা প্রচার করে থাকে। কোনো রাষ্ট্রে বিদ্যমান শাসন-ব্যবস্থা নিরবচ্ছিন্নভাবে সংবাদ-মাধ্যমগুলোর সমর্থন[১] পায়। তারা তাদের পছন্দনীয় শাসনব্যবস্থাকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে বৈধতা দান করার প্রয়াস চালায়। এভাবে নিউজ মিডিয়াগুলো সরকারি জুলুমের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে।

সংবাদ-মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মতামত সংগ্রহ ও প্রচার করা হয়। জনগণের চিন্তার বিষয়গুলো তারাই নির্ধারিত করে দেওয়ার চেষ্টা করে। আর এ সকল বিশেষজ্ঞরা কথা বলে পূর্বনির্ধারিত স্বার্থ-নির্ভর সিদ্ধান্ত মোতাবেক। লিবারেল মতাদর্শী মিডিয়া স্ট্রাকচার এমন এক নিয়ন্ত্রকের ন্যায় আচরণ করে, যা গুরুত্বপূর্ণ আইডিয়া এবং পরিভাষাগুলোর সংজ্ঞার ওপর নিজেদের কঠোর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। বর্তমান শাসন-ব্যবস্থা সিলেক্টেড এলিট শ্রেণিকে পরিভাষাসমূহ ও মৌলিক বিষয়াদির সঠিক ব্যাখ্যা ও জনগণের বিতর্কের গ্রহণযোগ্য সীমা নির্ধারণের ব্যাপারে একচেটিয়া আধিপত্য কায়েমের অনুমতি প্রদান করেছে। এই সিস্টেম সাধারণ জনগণের ওপর কর্পোরেট, পলিটিকাল ও মিলিটারি এলিটদের ইচ্ছা জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয়। ক্ষমতাসীন সিস্টেমের সাথে দ্বিমতকারীদেরকে তারা সংবিধান-বিরোধী কিংবা রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে ঘোষণা করে শাস্তি প্রদান করে (Broudy & Tanji, 2018)। এভাবে মিডিয়া জনগণকে বিকল্প কোনো সামাজিক, অর্থনৈতিক সমাধান ও বাস্তবতার কথা চিন্তা করার পথই বন্ধ করে দেয় (Schiller, 1999)। গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের মিডিয়া গ্রুপ নিরপেক্ষ সংবাদের ক্ষেত্রে টিভি নিউজের ভূমিকা সম্পর্কে খুবই যথার্থ একটি মন্তব্য করে। তাদের ভাষায়,

'সংবাদ কোনো নিরপেক্ষ বা অকৃত্রিম বিষয় নয়; বরং সেটি হচ্ছে কোনো মতবাদের পক্ষে উদ্ভাবিত পণ্য' (Curtis, 2003)।

অর্থাৎ, নিরপেক্ষ সংবাদ বলে পশ্চিমা মতাদর্শে বিশ্বাসী মিডিয়াগুলো যেগুলো প্রচার করে, সেগুলোর অধিকাংশই পক্ষপাতদুষ্ট। তারা পশ্চিমাদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিই কেবল প্রচার করে। তাই, কেউ যদি বিনা-প্রশ্নে বর্তমান মিডিয়ার ওপর ভরসা রাখে এবং নিজেদের ও পরিবারের মূল্যবোধ ও চিন্তা-কর্মকে তাদের প্রচারিত মতবাদের

[১] একটি নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত, রাষ্ট্রভেদে তাতে পার্থক্য রয়েছে

সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়, তাহলে তাদের চিন্তা ও কর্মে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে বাধ্য।

হারম্যান ও চমস্কির 'প্রোপাগান্ডা মডেল'

প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থার পক্ষে নিউজ মিডিয়ার পক্ষপাতিত্ব সঠিকভাবে অনুধাবন করতে চাইলে বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক নোয়াম চমস্কির করা কাজগুলো বেশ উপকারী। এডওয়ার্ড হারম্যানের সঙ্গে চমস্কি[১] সম্মিলিতভাবে ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দে একটি প্রোপাগান্ডা মডেল[২] প্রণয়ন করেন। এই মডেলটির মাধ্যমে লেখকদ্বয় অ্যামেরিকার পক্ষপাতদুষ্ট কর্পোরেট নিউজ রিপোর্টিং-এর কর্মপ্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করেছেন (Herman & Chomsky, 1988/2002)।

প্রোপাগান্ডা মডেলের নিয়মানুগ বিশ্লেষণ[৩] মিডিয়ার দুটি পারস্পরিক সম্পর্কিত বিষয় বিশ্লেষণে সহায়তা করে।

- **প্রথমত**, প্রোপাগান্ডা মডেলের ফিল্টারসমূহ মিডিয়া সিস্টেমের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আদর্শিক অবস্থান ব্যাখ্যা করে। ফলস্বরূপ, মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রি 'কেন' সমাজে প্রতিষ্ঠিত পুঁজিবাদী, যুদ্ধাসক্ত রাষ্ট্রব্যবস্থার স্থায়িত্ব ও সম্প্রসারণ নিশ্চিত করতে প্রোপাগান্ডা ছড়ানোর দায়িত্ব আপন কাঁধে তুলে নেয়, তা অনুধাবন করা সহজ হয়।
- দ্বিতীয়ত, মূলধারার মিডিয়া 'কিভাবে' পাঠকদের জন্য প্রকাশিত তথ্যাদি এবং তাদের আলোচনা, বিশ্লেষণের মাধ্যমে তার ভূমিকা পালন করে, প্রোপাগান্ডা মডেল সেটি যথাযথভাবে নিরীক্ষণের পথ উন্মোচন করে (Pedro-Carañana et al., 2018)।

প্রোপাগান্ডা মডেলটিতে 'গণতান্ত্রিক সমাজে চিন্তা নিয়ন্ত্রণ'-এর লক্ষ্যে সংবাদ-মাধ্যমসমূহে বিদ্যমান পরিবেশ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। মডেলটিতে মোটা দাগে পাঁচটি ফিল্টার রয়েছে, যেগুলোর মাধ্যমে নিউজ রিপোর্টের কাঠামো প্রস্তুত করা হয়। সেই সঙ্গে জনগণের আলোচ্য বিষয়বস্তুসমূহও এই ফিল্টারগুলোর মাধ্যমেই নির্ধারণ করে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালানো হয়। উল্লিখিত পাঁচটি ফিল্টার হচ্ছে,

১. মালিকানা
২. বিজ্ঞাপন
৩. উৎস (Source)

[১] যার ভাষায় অ্যামেরিকা এক 'ব্যর্থ রাষ্ট্র'।
[২] Propaganda Model বা PM
[৩] Systematic analysis

৪. কড়া সমালোচনা (Flak)

৫. মতাদর্শ

প্রোপাগান্ডা মডেলের প্রথম দুটি ফিল্টার মূলধারার মার্কিন সংবাদমাধ্যমের কার্যক্রমের ওপর সংবাদমাধ্যমের অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রভাব বিশ্লেষণ করে। সংবাদমাধ্যমের মুনাফা-নির্ভর আচরণের ফলে গণমাধ্যমের কার্যক্রম প্রধানত এলিটদের দৃষ্টিভঙ্গিকেই প্রতিফলিত করে। অর্থাৎ, সংবাদমাধ্যমের মালিকানা ও অর্থায়ন সংবাদকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখে।

❁ ১. মালিকানা :

অধিকাংশ মিডিয়াগুলো কোনো কর্পোরেট গ্রুপের প্রতিষ্ঠান। সেই সুবাদে এসব সংস্থায় কর্পোরেশনগুলোর স্বার্থরক্ষার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। মালিকদের অধিকাংশই ধনাঢ্য ব্যক্তি, রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা রাখে এবং রাজনীতিতে প্রভাব খাটাতে সক্ষম। মূলত স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদকগণ সংবাদ-সংস্থাগুলোর রুলস তৈরি ও রদবদল করে থাকে। ২০০১ খ্রিষ্টাব্দে ৯৭টি দেশের মিডিয়ার ওপর জরিপ চালিয়ে দেখা যায় যে, সেসব দেশের সবচেয়ে বড় মিডিয়াগুলো সরকার কিংবা ব্যক্তিগত পরিবার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত (Djankov et al., 2003)। অর্থাৎ, প্রভাবশালী সংবাদপত্রের ওপর তাদের প্রভাব খাটানোর যথেষ্ট সক্ষমতা রয়েছে।

❁ ২. বিজ্ঞাপন :

বিজ্ঞাপনের প্রচলন হবার পূর্বে সংবাদপত্রগুলোকে শুধুমাত্র পত্রিকা বিক্রয় করেই খরচ পোষাতে হতো। এছাড়া অন্য কোনো পন্থা তাদের কাছে ছিল না। যখন থেকে বিজ্ঞাপনের প্রচলন শুরু হলো, সেই সময় থেকেই পত্রিকার মালিকগণ প্রতিটি সংবাদপত্রের বিক্রয়মূল্য সেটির উৎপাদনব্যয় থেকেও কম নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়।[১] ফলে যেসকল পত্রিকা বিজ্ঞাপনদাতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারত না, তারা টিকে থাকার প্রতিযোগিতায় নিস্তেজ হয়ে পড়ে। বর্তমানে মিডিয়াগুলোর নিজেদের মধ্যে বিজ্ঞাপনের প্রতিযোগিতা অধিক। ফলে সংবাদমাধ্যমগুলো বিজ্ঞাপনের ওপর আরও অধিক নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। অপরদিকে বিজ্ঞাপনের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে বিজ্ঞাপনদাতাদের খায়েশও প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে (An & Bergen, 2007)। তাই বিজ্ঞাপনদাতা ব্যক্তি/দল/প্রতিষ্ঠান সংবাদ প্রচারের ওপর প্রভাব বিস্তার করছে। প্রয়োজনে চাপও প্রয়োগ করছে। যদিও সাধারণ জনগণ এই শ্রেণির চাপ প্রয়োগের

[১] উদাহরণস্বরূপ ধরুন, কোনো রঙিন পত্রিকার প্রতি কপি বিশ (২০) পৃষ্ঠা ছাপানোর জন্য সর্বমোট খরচ পনেরো (১৫) টাকা। বিজ্ঞাপন প্রচারের ফলে প্রাপ্ত প্রচুর পরিমাণ অর্থের বদৌলতে প্রতি কপি পত্রিকা দশ (১০) টাকা মূল্যে বিক্রয় করলেও তাদের লভ্যাংশ রয়ে যায়। ফলে, বাকি পত্রিকাগুলোও প্রতি কপির মূল্য হ্রাস করতে বাধ্য।

ঘটনা সম্পর্কে ততটা অবগত নয়[১] (An & Bergen, 2007)।

অ্যামেরিকার ১৪৭ জন সম্পাদকদের ওপর একটি জরিপ পরিচালনা করা হয় (Craig & Soley, 1992)। সেখানে প্রায় ৯০% পত্রিকার সম্পাদক বলেন যে, বিজ্ঞাপনদাতা তাদের নিউজের উপাদান প্রভাবিত করতে চেয়েছেন। ৭০% সম্পাদক স্বীকার করেছেন, বিজ্ঞাপনদাতা সংবাদপত্রের কোনো সংবাদ উধাও করে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। শতকরা ৯২ শতাংশেরও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনদাতা কোনো সংবাদের বিষয়বস্তুর কারণে বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন। শতকরা ৮৯ জন সম্পাদকের ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনদাতারা সংবাদের বিষয়বস্তুর কারণে বিজ্ঞাপন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।

ওয়েভার এবং ইউলট[২] (1996, as cited in Price, 2003) পুরো দেশজুড়ে বিভিন্ন টিভি সাংবাদিকদের নিয়ে একটি জরিপ করে। তারা তাদের জরিপের ফলাফলে দেখতে পান, জরিপে অংশগ্রহণকৃত সাংবাদিকদের মধ্যে শতকরা ৩৪ জনই মনে করে, কারও বল প্রয়োগ সাংবাদিকদের কাজের স্বাধীনতায় গুরুতর বাধা সৃষ্টি করেছে। যেমন : প্রভাবশালী ব্যক্তি, সরকার কিংবা অন্যান্য বিজ্ঞাপনদাতা।

সংবাদদাতা, প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী ও বিজ্ঞাপনদাতাদের মধ্যকার সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ে এবিসি, সিবিএস, এনবিসি, সিএনএন ও পিবিসি নিউজ সংস্থাসমূহের ১৩২ জন সংবাদদাতাদের[৩] নিয়ে একটি জরিপ পরিচালনা করেন (২০০৩)। দেখা গেল, শতকরা বিশ (২০%) জন সাংবাদিক বলেছেন যে, তারা তাদের মালিকপক্ষ থেকে রিপোর্ট করা এবং রিপোর্ট না-করার ব্যাপারে চাপ প্রয়োগের শিকার হয়েছেন। অপরদিকে শতকরা সাত জন রিপোর্টার উল্লেখ করেছেন, বিজ্ঞাপনদাতারা তাদেরকে কোনো বিশেষ রিপোর্ট করতে কিংবা কোনো ঘটনা রিপোর্ট না করতে চাপ প্রয়োগ করেছে। এসব নিউজ চ্যানেলগুলোর মধ্যে সিএনএনের অবস্থা সবচেয়ে জঘন্য, সংস্থাটির শতকরা এক-তৃতীয়াংশ সাংবাদিকই স্বত্বাধিকারীদের চাপের শিকার হন।

অর্থাৎ, সংবাদ আর বিজ্ঞাপনের মধ্যকার দেয়াল প্রতিনিয়ত অদৃশ্য হয়ে উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান যে পার্থক্যসমূহ রয়েছে, তা প্রতিনিয়ত দূরীভূত হয়ে পড়ছে। আর তার প্রভাব পড়ছে সংবাদের গুণগত মানের ওপর।

❁ ৩. সংবাদের উৎস :

প্রোপাগান্ডা মডেলের তৃতীয় ফিল্টারটি সাংবাদিক ও সংবাদের উৎসের গভীর

[১] বর্তমানে পরিস্থিতি ইন্টারনেটের বদৌলতে তিন দশক আগের পরিস্থিতি থেকে কিছুটা বদলেছে, বিশেষ করে বাংলাদেশে।

[২] Weaver and Wilhoit

[৩] সংবাদদাতা বা Correspondent বলতে শুধু তাদেরকেই বোঝানো হয়েছে ,যারা সংবাদ প্রস্তুত করে এবং সংবাদের সঙ্গে তাদের নাম সংযুক্ত থাকে।

সম্পর্কের ওপর আলোকপাত করে। প্রথমত, সরকার সংবাদমাধ্যমকে রাষ্ট্রের উচ্চতর পর্যায়ের তথ্যাদি দিয়ে সহায়তা করে। অপরদিকে স্বয়ং সরকার প্রকৃত সংবাদকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

যেকোনো গণমাধ্যম-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের সচল থাকার জন্য প্রয়োজন সংবাদের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ। প্রতিনিয়তই সংবাদমাধ্যমে তৈরি হয় নতুন ও তরতাজা সংবাদের চাহিদা। আর সংবাদ-সূচী পূরণ করা তাদের জন্য অপরিহার্য একটি দায়িত্ব। এই চাহিদা পূরণে তারা ঐ সকল স্থানে মনোযোগ প্রদান করে, যেখানে প্রায়শই গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ উপকরণ পাওয়া যায়। যেমন : পার্লামেন্ট, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রেসক্লাব ইত্যাদি। বিভিন্ন কর্পোরেশন এবং ব্যবসা-কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোও মিডিয়ার নিয়মিত সংবাদের উৎস (Herman & Chomsky, 1988/2002, p. 19)।

সরকার ও কর্পোরেট সোর্সগুলো তাদের পদমর্যাদা, প্রভাব ও প্রতিপত্তির ফলে বিশ্বাসযোগ্য হিসেবে জনসাধারণের নিকট গৃহীত হয়। মার্ক ফিশম্যানের (1980, as cited in Herman & Chomsky, 1988/2002, p. 31) মতে, সংবাদপত্রগুলো এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোকে যাচাই করার পূর্বেই নিশ্চিতরূপে প্রকৃত তথ্যের উৎস হিসেবে গ্রহণ করে। কারণ সংবাদ-কর্মীগণ সমাজে প্রতিষ্ঠিত সিস্টেম অনুযায়ী ক্ষমতাসীনদের পৃষ্ঠপোষণ করে থাকে। সংবাদ-কর্মীরা সরকারি ও প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠানের দাবিকে শুধু একটি দাবি হিসেবেই নয়, বরং তাকে নির্ভরযোগ্য হিসেবেও গ্রহণ করে।

২০০৩ খ্রিষ্টাব্দে লিভিংস্টোন এবং বেনেট সিএনএনের ১৯৯৪-২০০১ সাল পর্যন্ত ১২০০ নিউজ সেগমেন্ট পর্যবেক্ষণ করেন। তাদের লক্ষ্য ছিল, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পরিচালিত[১] সংবাদের বিপরীতে ঘটনা-নির্ভর[২] সংবাদের হার বৃদ্ধি পেয়েছে কি না, সেটি যাচাই করা। সেগমেন্টসমূহ পর্যবেক্ষণ শেষে তারা সিদ্ধান্তে আসেন, ঘটনা-নির্ভর সংবাদের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই সঙ্গে সংবাদের অংশ হিসেবে সরকারি দায়িত্বশীলগণ পূর্বের যেকোনো সময়ের চাইতে অধিক হারে উপস্থিত (Bennett & Livingston, 2003)।

প্রকৃতপক্ষে, আমলাতন্ত্রের কর্মকর্তারা গণমাধ্যমের নিয়মিত চাহিদা পূরণের একটি বড় মাধ্যম। সংবাদের এর নিয়মিত উৎসগুলো সংবাদ-মাধ্যমের সংবাদ আহরণের পেছনে ব্যয় অনেকটাই কমিয়ে দেয়। সেই সঙ্গে এগুলো সংবাদের কাঁচামাল ও রেডিমেড সংবাদ নিয়মিত সরবরাহ করে। অ্যামেরিকার অন্যতম বৃহত্তম ব্রডকাস্ট কোম্পানি সিংকলেয়ার গ্রুপের ওপর ডিসেম্বর ২০১৭ থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত এক সমীক্ষা পরিচালিত হয়। সেখানে দেখা যায়, উল্লিখিত সময়ে জাতীয় ও

[১] Institutionally driven
[২] Event driven

আন্তর্জাতিক বিষয়ে প্রচারিত ৫৩০টি সংবাদের ৪০.২% সংবাদই ছিল সরকার, রাজনীতি বিষয়ক। লক্ষণীয় ব্যাপার, ৫৩০টি ভিন্ন ভিন্ন সংবাদের সোর্স হিসেবে ২৩.৪% এর সোর্স নির্বাচিত আমলা; ১৩.৫৫% এর সোর্স সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প; সরকারি এজেন্সি ৮.৩%; এবং হোয়াইট হাউস ৮.৭%। অর্থাৎ, প্রায় ৫৩.৯% সংবাদের উৎসই রাজনীতি (Abdenour et al., 2019)। ফলাফল, এই স্পেশাল উৎসগুলো সংবাদমাধ্যমে বিশেষ প্রবেশাধিকার লাভ করে, যা সাধারণ কোনো ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠানের জন্য অসাধ্য (Herman & Chomsky, 1988/2002, p. 22)।

মিডিয়া তার সংবাদের নিয়মিত উৎসের ব্যাপারে নেতিবাচক কোনো সংবাদ ছাপাতে চাইলে অনেক সময়ই শক্তিশালী সেই উৎসটি মিডিয়ার সাথে তার সম্পর্ক কাজে লাগিয়ে গণমাধ্যমকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়। অন্য দিকে, গণমাধ্যম-কর্মী ও কর্মকর্তারাও তাদের নির্ভরযোগ্য সংবাদ উৎসকে চটাতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

সংবাদের সাথে উৎসের সম্পর্ক শুধুমাত্র দৈনিক সংবাদ সরবরাহ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। কখনো কখনো সরকারি কিংবা প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠানের প্রভাব, অন্য কোনো অপ্রাতিষ্ঠানিক ও জনপ্রিয় সংবাদ উৎস কর্তৃক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। তখন সেই উটকো সমস্যা প্রশমিত করা হয় 'বিশেষজ্ঞ' বাছাই করে, তাদেরকে উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করে, তাদের টার্গেটকৃত প্রজেক্টে অর্থায়ন করে।[১] কিংবা বিভিন্ন সংগঠনে তাদের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে, যারা ঐ উৎসের নিজস্ব বার্তাসমূহ জোরেশোরে প্রচার করবে। এভাবেই তৈরি হয় বিশেষজ্ঞ দল—সরকার কিংবা কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে যারা কাজ করে। কুখ্যাত মার্কিন রাজনীতিবিদ হেনরি কিসিঞ্জারের ভাষায়, 'বিশেষজ্ঞদের এই যুগে, বিশেষজ্ঞ নির্বাচনকারী তারাই, প্রচলিত প্রভাবশালী মতাদর্শগুলোর[২] প্রতি যাদের বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে। সর্বোপরি সংখ্যাগরিষ্ঠের এই মতকে আরও উচ্চতর পর্যায়ে সংজ্ঞায়িত ও সম্প্রসারিত করার যোগ্যতাই তাকে বিশেষজ্ঞে হিসেবে পরিণত করেছে'[৩] (Herman & Chomsky, 1988/2002, p. 23)। কখনো কখনো গণমাধ্যম নিজেরাই 'বিশেষজ্ঞ' যোগান দেয়, যারা সরকার বা কর্পোরেশনের তাঁবেদারি করে। সংবাদ উৎসের এই বিক্ষিপ্ততা গণমাধ্যমের নিরপেক্ষতাকে অধিক প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে। পাশ কাটিয়ে নিজেদের

[১] উদাহরণ, সরকারিভাবে নাচ, গান, সিনেমাসহ যৌন উত্তেজক প্রোগ্রামসমূহ প্রোমোট করা হয়, জনগণের অর্থ খরচ করে কিশোর-কিশোরীদের সংস্কৃতিমনা করার নামে এসবে উৎসাহিত করা হয় (সেই সাথে বিয়ের বয়স আইন করে পেছানো হয়)।

[২] যেমন : বাংলাদেশে সংস্কৃতি 'বিশেষজ্ঞ' কিছু ব্যক্তি আছেন, যারা সব কিছুতেই চেতনা'র প্রবেশ ঘটিয়ে বিশেষজ্ঞ সাজেন। যেসব দর্শক-শ্রোতা 'চেতনা'র আদর্শে উজ্জীবিত, তারা এসকল উটকো 'বিশেষজ্ঞ'দের অন্ধ সমর্থক হিসেবে শব্দ দূষণে লিপ্ত থাকেন।

[৩] বাংলাদেশের শিল্প, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে যারা পশ্চিমা প্রভুদের চর্চিত বিষয়গুলো চোখ বন্ধ করে মডার্ন শিল্প, সাহিত্য আর সংস্কৃতির নামে এ দেশে অনুপ্রবেশ করাচ্ছে, তারাই এই শ্রেণির বিশেষজ্ঞদের কাতারে রয়েছেন।

অপকর্ম চালিয়ে যাওয়া ব্যতীত এইসব প্রশ্নের কোনো সন্তোষজনক জবাব তাদের জানা নেই।

❁ ৪. কড়া সমালোচনা চর্চা :

হারম্যান-চমস্কি তাদের প্রোপাগান্ডা মডেলে 'ফ্ল্যাক' পরিভাষাটির বিস্তারিত কোনো ব্যাখ্যা দেননি। তবে এর দ্বারা তারা মিডিয়ার কোনো বিবৃতি বা প্রোগ্রামের বিরুদ্ধে নেতিবাচক সমালোচনাকে নির্দেশ করেন। হতে পারে এই সমালোচনা কোনো চিঠি, মেইল, ফোনকল, মামলা, হুমকি বা কোনো অন্যায় অভিযোগ। এটি হতে পারে সরকার, কোনো ব্যক্তি বা সংগঠন কর্তৃক পরিচালিত কাজ। এ ধরনের প্রতিবাদ যখন বড় আকার ধারণ করে, কিংবা প্রতিবাদকারী যখন প্রভাবশালী হয়, তখন তা মিডিয়ার জন্য ভোগান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কখনো কখনো তাদেরকে কোর্টে নিজেদের অবস্থানের বৈধতা প্রমাণ করতে হয়। কখনো-বা বিজ্ঞাপনদাতাগণ সংশ্লিষ্ট সংবাদ সংস্থা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

যেকোনো ধরনের ফ্ল্যাক সৃষ্টি করার সামর্থ্যের সঙ্গে ক্ষমতার এক নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। শক্তিশালী ফ্ল্যাক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ, দু ধরনেরই হতে পারে। প্রভাবশালী দল তাদের সমর্থকদের কাছে অভিযোগ করার মাধ্যমে পরোক্ষ ফ্ল্যাক সৃষ্টি করতে সক্ষম। অপরদিকে প্রত্যক্ষ ফ্ল্যাক হতে পারে রাষ্ট্রপ্রধানের কার্যালয় থেকে কোনো মেইল বা ফোনকল। এই ধরনের ফ্ল্যাক একে অপরের শক্তি বৃদ্ধি করে, এবং ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর সংবাদ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীকে জোরদার করে। এদের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফ্ল্যাক হলো গভর্নমেন্ট। গভর্নমেন্টের কোনো দুর্নীতির খবর প্রকাশ করলে গণমাধ্যমকে আক্রমণ করে কথা বলা, হুমকি দেওয়া, গণমাধ্যমের 'সংশোধন' করার 'দায়িত্ব' হাতে নেওয়া—এসবই ফ্ল্যাকের ভিন্ন ভিন্ন রূপ।

অ্যামেরিকায় ফ্ল্যাক : ইসরায়েলি লবিং

২০০৯ এর মার্চ মাসে ব্রিটিশ এমপি জর্জ গ্যালয়ে কানাডাতে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞার সম্মুখীন হন। তার অপরাধ—ফিলিস্তিনে হামাসের সমর্থন এবং আফগানিস্তানে কানাডিয়ান সৈন্যদল পাঠানোর বিরোধিতা করা (Summers, 2009)। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় গ্যালয়ে বলেন, বিচারকের এই সিদ্ধান্ত বাইরের লবিং ও রাজনৈতিক প্রভাবের ফল (Wallace & MacCharles, 2009)। গ্যালয়ে এখানে মূলত প্রো-ইসরায়েলি লবি-এর কানাডিয়ান একটি সংস্করণকে ইঙ্গিত করে কথাটি বলেন। ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের অত্যাচারের সংবাদ প্রকাশে এই লবি বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটি বাঁধা।

প্রো-ইসরায়েলি লবি বলতে আসলে কী বোঝায়? মূলত, এর দ্বারা সেসব সংগঠন ও ব্যক্তিদের নির্দেশ করা হয়, যারা সক্রিয়ভাবে মার্কিন বৈদেশিক নীতিকে ইসরায়েল-বান্ধব হিসেবে পরিচালিত করতে কাজ করে থাকে। এই লবি কোনো কেন্দ্রীয় একক নেতৃত্বের অধীনে সমন্বিত কার্যক্রম নয়। বরং অনেক ব্যক্তি বা দলের সমন্বয়। কেউ এই লবির অন্তর্ভুক্ত হতে চাইলে তার ইহুদি হওয়া জরুরি নয়। কেননা, অনেক খ্রিষ্টান যায়োনিস্ট নিরবচ্ছিন্নভাবে ইসরায়েলের স্বার্থে কাজ করে যাচ্ছে (Mearsheimer & Walt, 2007, pp. 112-113)। জাতিগতভাবে অ্যামেরিকান ইহুদিরা তুলনামূলক বিত্তশালী। মার্কিন রাজনীতিতেও তারা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে আসছে। তাই, অ্যামেরিকার জনসংখ্যার শতকরা তিন ভাগের কম হওয়ার পরও মার্কিন ইহুদিরা ডেমোক্র্যাটিক ও রিপাবলিক—উভয় দলেই প্রচুর অর্থায়ন করে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের সময়ে প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা এবং হোয়াইট হাউসের চিফ অব স্টাফ ছিল হ্যামিল্টন জর্ডান। প্রেসিডেন্টের উদ্দেশ্যে লিখিত একটি গোপন ফাইলে[১] তিনি বলেন যে, তৎকালীন ডেমোক্র্যাটিক ন্যাশনাল ফাইন্যান্স কাউন্সিলের মোট ১২৫ জন সদস্যের মধ্যে ৭০ জনই (৫৬%) ইহুদি। অপরদিকে রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট নিক্সনের ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনকালীন ক্যাম্পেইনের ৬০% অর্থ আসে ইহুদি দাতাদের পক্ষ থেকে (Jordan, 1977)। এই ফাইলটি ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে উন্মুক্ত করা হয়। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে ইহুদিদের অর্থায়নের হার বেশ কম, তথাপি ডেমোক্রেটদের অর্থের একটা বড় অংশ (২০%-৫০%) যোগান দেয় ইহুদিরা (Mearsheimer & Walt, 2007, p. 163)।

রাজনীতির পাগলা ঘোড়ার মুখে লাগাম পরানোর সাথে সাথে ইসরায়েলি লবির অন্যতম এজেন্ডা হলো—গণমাধ্যম, থিংক ট্যাঙ্ক, এমনকি একাডেমিয়াতে ইসরায়েল সংশ্লিষ্ট আলোচনাকে প্রভাবিত করা। কেননা, এই তিনটি সেক্টরসমূহ জনমত গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে (Mearsheimer & Walt, 2007, p. 168)। কোনো ব্যক্তি ইসরায়েলের সমালোচনা করলে তার বিরুদ্ধে ইহুদী-বিদ্বেষের[২] অভিযোগ আনা হয় কিংবা তার ওপর ব্যক্তিগত আক্রমণ করা হয়। অথচ অ্যামেরিকান ইসরায়েল পাবলিক অ্যাফেয়ার্স কমিটির (AIPAC) মতো সংগঠনগুলো মার্কিন রাজনীতিতে তাদের প্রভাবের কথা সগর্বে প্রচার করে বেড়ায়, যেটি বহু বছর ধরে চলমান ইসরায়েলি নির্যাতনে ফান্ডিংয়ের ব্যবস্থা করে। নিউ ইয়র্কে ইসরায়েলি দূতাবাসের সাবেক মুখপাত্র শালেভ বলেন,

'সাংবাদিক, সম্পাদক, রাজনীতিবিদরা যদি জানতে পারে যে, কয়েক ঘণ্টার ভেতর তারা হাজারও উত্তেজিত ফোন কল পেতে যাচ্ছে, তাহলে ইসরায়েলের

[১] Confidential Memorandum
[২] Anti-Semitism

সমালোচনা করার আগে তারা দুবার ভাববে। চাপ প্রয়োগের বিষয়ে ইহুদি লবির কার্যকারিতা প্রশংসনীয়' (Friedman, ১৯৮৭)।

মিডল ইস্ট ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা ড্যানিয়েল পাইপস ২০০২ খ্রিষ্টাব্দে মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মধ্যপ্রাচ্যের স্টুডেন্টদের নজরদারি করার লক্ষ্যে তার বিতর্কিত ওয়েবসাইট ক্যাম্পাস ওয়াচ[১] তৈরি করেন। পাইপস বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্টদের মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কিত স্কলারশিপ, ক্লাস ও অন্যান্য কার্যক্রমে ইসরায়েল-বিরোধী কোনো বক্তব্য বা আচরণ সম্পর্কে স্টুডেন্টদের রিপোর্ট প্রদান করতে উৎসাহিত করেন (McNeil, 2002)। জার্নালিস্ট ডেভিয়েস বেশ কিছু আন্তর্জাতিক সংস্থার কার্যক্রম উল্লেখ করেন, যারা ইসরায়েলের সমালোচকদের নিন্দার ব্যাপারে রীতিমতো বিশেষজ্ঞ। অনেস্ট রিপোর্টিং, GIYUS, MEMRI, BICOM[২] এবং অন্যান্য সংগঠনগুলো নিয়মিত সংবাদমাধ্যমের ওপর ফিলিস্তিনি 'সন্ত্রাস'-এর নিন্দা ও ইসরায়েলি 'শান্তিরক্ষা' মিশনের প্রশংসা করতে চাপ প্রয়োগ করে (Davies, 2008)।

বিংআমটন বিশ্ববিদ্যালয়ের[৩] এমিরেটাস প্রফেসর জেমস পেট্রাস বলেন, ইসরায়েলের বিপক্ষে কোনো সমালোচনা করলে একদল প্রো-ইসরায়েলি 'বিশেষজ্ঞ' বাহিনী দ্বারা সকল মেজর পত্রিকাগুলোর অপ-এড[৪] পাতায় অসৎ আক্রমণের শিকার হতে হয়। সেই সাথে চাকরিচ্যুত করার দাবি, পদ থেকে বিতাড়ন, কিংবা প্রোমোশন ও নতুন করে এপয়েন্টমেন্ট প্রত্যাখ্যান করার দাবির ঝড় বয়ে যায় (Petras, 2007)। আর এর ফলাফল হিসেবে সংবাদমাধ্যমে ইসরায়েলের স্লো মোশন গণহত্যার ব্যাপারে খুব কমই লেখা ছাপা হয়। তাই ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের যুদ্ধাপরাধের বিষয়গুলো অনেক সময়ই মার্কিন নাগরিকদের দৃষ্টির আড়ালে থেকে যায়।

❁ মতাদর্শ :

হারম্যান ও চমস্কি তাদের প্রোপাগান্ডা মডেলের ধারণাটি পাবলিশ করেন ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দে। সে সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তানের মাটিতে চরম মার হজম করে তার সাম্রাজ্যের ক্রান্তিকালে এসে পৌঁছেছে। লেখকদ্বয়ের মতে, তৎকালীন সময়ে মিডিয়ার সর্বশেষ ফিল্টারটি ছিল কমিউনিজম-বিরোধী এজেন্ডা। এই মতবাদটি এক অভিন্ন 'শত্রু'র বিরুদ্ধে মার্কিন জনগণকে পরিচালিত করতে সহায়ক ছিল।

---

[১] Campus Watch
[২] Honest Reporting, Give Israel Your United Support, the Middle East Media Research Institute, Britain Israel Communications and Research Center
[৩] Binghamton University
[৪] Op-ed: সম্পাদকীয় পৃষ্ঠার বিপরীতে একটি পৃষ্ঠা, যা পাঠকদের মন্তব্য, অনুভূতি ইত্যাদি প্রকাশ করে থাকে।

১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাবার পর এই মতবাদটি আর ততটা শক্তিশালী রূপে অবশিষ্ট রইল না। ফলে অভিন্ন শত্রুর ধারণার সে শূন্যস্থানটি পূরণের লক্ষ্যে তারা নিয়ে আসল 'মুক্ত বাজার', আর 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'-এর মতো মতবাদগুলো (Mullen, 2009)। অর্থাৎ, অভিজাত শ্রেণির স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট মতবাদের পক্ষে থাকবে মিডিয়া। আর তাদের স্বার্থ-বিরোধী যেকোনো কর্মকাণ্ডের বিরোধিতার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ফিল্টারের ভূমিকা পালন করবে।

'অভিজাত' (Elite) শব্দটির মর্মার্থ সুস্পষ্টভাবে নিরূপণ করা বেশ কঠিন। বর্তমান পৃথিবীতে এলিট শব্দটিকে ক্ষমতা, অর্থ, পদমর্যাদা, কর্তৃত্বের মতো বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয়। এলিট শ্রেণির স্বার্থ রক্ষার প্রশ্নে মিডিয়া সচরাচর কোনো আপস করে না। প্রকৃতপক্ষে, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের ব্যাপারে এলিট শ্রেণির ঐক্যমতই মিডিয়ার বৈধতা প্রদানের ছাড়পত্র। মিডিয়া সর্বশক্তি নিয়ে এলিটদের স্বার্থবিরোধী মতবাদের বিরোধিতা করে আসবে, সে মতবাদ যতই যৌক্তিক হোক না কেন। পুঁজিবাদী স্বত্বাধিকারীগণ পুঁজিবাদকে বৈধতা প্রদান করতে মিডিয়া সিস্টেমকে এমন ছাঁচে গড়ে নিয়েছে, যেন এটি তাদের স্বার্থবিরোধী যেকোনো মতাদর্শকে নেতিবাচক হিসেবে প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়। যেসব সাংবাদিক এই ফ্রেমওয়ার্কের নির্ধারিত সীমার বাইরে কাজ করে, তাদেরকে মৌলবাদী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

লিবারেল মিডিয়া সংস্থাসমূহ সমালোচনাকারী পাঠকদের দাবি পূরণ করতে অল্প সংখ্যক সমালোচক ব্যক্তি ও সাংবাদিকদেরকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করে। যদিও ঐ সকল ব্যক্তি ও সাংবাদিকদের পরিবেশিত তথ্যাদি নাগরিকদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অবহিত রাখতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করে। কিন্তু এই সকল সাংবাদিকগণ সংবাদ জগতের অত্যন্ত নগণ্য একটি অংশের প্রতিনিধিত্ব করে। এটা প্রমাণ করে যে, কর্পোরেট-বান্ধব মিডিয়া-সিস্টেমে তাদের সে অবস্থান মূলত পূর্বপরিকল্পিত নিস্ফল অর্থহীন কর্মকাণ্ড (Pedro-Carañana et al., 2018)।

এই ধরনের নাটকীয়তার মাধ্যমে কর্পোরেট মিডিয়া গণতান্ত্রিক সমাজের বহুমুখিতা প্রমাণে প্রয়োজনীয় এক দুর্লভ বিভ্রমের সৃষ্টি করে। এলিটদের সেবাদাস সংবাদমাধ্যমের সৃষ্ট সুবিশাল ও তপ্ত এক পৃথিবীতে কর্পূরের ন্যায় উড়ে যায় এই কয়েক ফোঁটা বিকল্প চিন্তা। প্রকৃতপক্ষে, বর্তমান প্রগতিশীল মিডিয়া কাজ করে নব্য লিবারেল প্রভাবের আওতাধীন হয়ে। এই মিডিয়া নিজেরাই নিজেদের বৈধতা প্রদান করে, অতঃপর স্বীয় তৃপ্তির কথা সগর্বে প্রচার করে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে। প্রতিষ্ঠিত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার 'মূলধারা'র সমালোচকরা যে ধরনের সমালোচনার অনুশীলন করেন, চমস্কির ভাষায় তা হলো 'বিরোধিতার ছল'[১]। যদিও এগুলো ক্ষমতার দোষ কিছুটা তুলে ধরে, কিন্তু আদতে তা ক্ষমতার শক্তিই বৃদ্ধি করে (Chomsky, 1988/2004)।

[১] Feigned Dissent

হারম্যান বলেন, মেইনস্ট্রীম মিডিয়াগুলো গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সরবরাহে উদাসীন থাকে। তারা বাস্তব সমস্যা নিয়ে কাজ করার চাইতে বিনোদনমূলক সংবাদ প্রদানে বেশি সফল বলা চলে (Pedro-Carañana et al., 2018)। এলিটশ্রেণি যেসব সমস্যার কথা বলতে প্রস্তুত নয়, মিডিয়া সাধারণ মানুষের দৃষ্টি সেসব থেকে সরিয়ে অন্য কোনো ইস্যুর দিকে নেওয়ার চেষ্টা করে।

বাংলাদেশে মিডিয়ার এই সর্বশেষ ফিল্টারটি যে কাল্পনিক মতাদর্শকে টার্গেট করে ব্যবহৃত হয়, সেটি হলো 'মৌলবাদ'। এর আভিধানিক অর্থ মূলের দিকে ফিরে যাওয়া। যারা কলকাত্তাই উদ্ভট বাঙালি তত্ত্ব সংস্কৃতি ত্যাগ করে ইসলামের দিকে ফিরে যায়, তাদেরকেই মৌলবাদী হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়। মিডিয়া ইসলামের মৌলিক শিক্ষাকে বাঙালিত্বের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে এক অভিনব ন্যারেটিভ সৃষ্টি করেছে। তাদের মতে, ইসলামের মৌলিক শিক্ষা গ্রহণ করা মানে ১৪০০ বছর পিছিয়ে যাওয়া। তাই মৌলবাদ একটি ঘৃণিত কাজ। বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের বোরকা, ছেলেদের দাড়ি, টাখনুর ওপর জামা মানেই 'জঙ্গি' বলে সন্দেহ করার ট্রেন্ড বেশ ভালোভাবেই চালানো হয়েছিল। তখন বামপন্থী পরগাছাদের সাথে সাথে জুড়ে গিয়েছিল অপর একটি সন্ত্রাসী ছাত্র সংগঠন। জঙ্গিবাদের ধোঁয়া তুলে বহু সাধারণ ছাত্রদের জীবন যারা নষ্ট করেছে।

মাঝে বেশ কয়েক বছর দেশীয় ইসলাম-বিদ্বেষী কাফির-মুরতাদগুলো 'হীরক রাজার দেশে'র মতো স্বাধীনতা পেয়ে তরুণ সমাজকে নষ্ট করার পাঁয়তারা করছিল। কিন্তু মুসলিমদের জাগরণে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধ মাঠে মারা গেছে। ইসলামপ্রেম মানেই 'পাকিস্তান-প্রেম', মৌলবাদী মুসলিমরা সব নব্য 'রাজাকার'—এই গাঁজাখুরি ন্যারেটিভ বেচে খাওয়ার দিন শেষ। সেক্যুলাররা খোঁড়া যুক্তি নিয়ে আর কতদিন বিশুদ্ধ ইসলাম চর্চাকে ট্যাকল দিতে পারে, মুসলিমরা এই নাটকের শেষটা দেখার জন্য অপেক্ষা করছে।

সর্বোপরি, মূলত এই পাঁচটি ফিল্টার মিডিয়ার 'সংবাদ' বাছাইয়ের প্রক্রিয়াকে সংক্ষিপ্ত ও সংকীর্ণ করে তোলে। এবং কোন ধরনের সংবাদ প্রচারণা পাবার উপযোগী—সেটি নির্ধারণ করে (Herman & Chomsky, 1988/2002, p. 31)। আরও অনেক ছোটখাটো ফ্যাক্টর রয়েছে, তবে সেগুলো এই পাঁচটি ফিল্টারের মতো এতটা প্রভাব বিস্তারকারী নয়।

Bibliography

Abdenour, J., Blankenship, J. C., Hedding, K. J., & Miller, K. C. (2019)। The Sinclair Effect: Comparing Ownership Influences on Bias in Local TV News Content. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 63(3), 474-493. https://doi.org/10.1080/08838151.2019.1653103

An, S., & Bergen, L. (2007)। Advertiser Pressure on Daily Newspapers: A Survey of Advertising Sales Executives. Journal of Advertising, 36(2), 111-121. https://doi.org/10.2307/20460787

Bennett, W. L., & Livingston, S. (2003)। Gatekeeping, Indexing, and Live-Event News: Is Technology Altering the Construction of News? Political Communication, 20(4), 363-380. https://doi.org/10.1080/10584600390244121

Broudy, D., & Tanji, M. (2018)। System Security: A Missing Filter for the Propaganda Model? In D. Broudy, J. Klaehn, & J. Pedro-Carañana, The Propaganda Model Today: Filtering Perception and Awareness (pp. 93-106)। University of Westminster Press.

Chomsky, N. (1988/2004)। Language and Politics. AK Press.

Craig, R. L., & Soley, L. C. (1992)। Advertising Pressures on Newspapers: A Survey. Journal of Advertising, 21(4), 1-10. https://doi.org/10.2307/4188853

Curtis, A. (Director)। (2003)। The Century of the Self [Motion Picture].

Davies, N. (2008). Flat Earth News. Chatto & Windus.

Djankov, S., McLiesh, C., Nenova, T., & Shleifer, A. (2003). Who Owns the Media? The Journal of Law & Economics, 46(2), 341-381. https://doi.org/10.1086/377116

Friedman, R. I. (1987). Selling Israel to America. Journal of Palestine Studies, 16(4), 169-179. https://doi.org/10.2307/2536739

Herman, E. S., & Chomsky, N. (1988/2002). Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media. Pantheon Books.

Ipsos MORI. (2013, February 15). Politicians trusted less than estate agents, bankers and journalists. Retrieved from Ipsos MORI: https://www.ipsos.com/ipsos-mori/en-uk/politicians-trusted-less-estate-agents-bankers-and-journalists

Jordan, H. (1977). Foreign policy and domestic politics memo. Retrieved from Jimmy Carter Presidential Library and Museum: https://www.jimmycarterlibrary.gov/digital_library/cos/142099/34/cos_142099_34a_24-Foreign_policy_domestic_politics_memo.pdf

McNeil, K. (2002, November 11). The War on Academic Freedom. Retrieved from The Nation: https://www.thenation.com/article/archive/war-academic-freedom/

Mearsheimer, J. J., & Walt, S. (2007). Israel Lobby and U.S. Foreign Policy. Farrar, Straus and Giroux.

Mullen, A. (2009). The Propaganda Model after 20 Years:. Westminster Papers in Communication and Culture, 6(2), 12-22. https://doi.org/10.16997/wpcc.121

Pedro-Carañana, J., Broudy, D., & Klaehn, J. (2018). The Propaganda Model

Today: Filtering Perception and Awareness. University of Westminster Press.

Petras, J. (2007). Why condemning Israel and the Zionist Lobby is so important. Journal of Contemporary Asia, 37(3), 380-385. https://doi.org/10.1080/00472330701408700

Schiller, H. I. (1999, September 9). US as global overlord: Dumbing down, American-style. Retrieved from hartford-hwp.com: http://www.hartford-hwp.com/archives/27c/501.html

Summers, D. (2009, March 20). George Galloway banned from Canada. Retrieved from The Guardian: https://www.theguardian.com/politics/2009/mar/20/george-galloway-banned-canada

Wallace, K., & MacCharles, T. (2009, March 30). Judge denies Galloway's bid to enter Canada. Retrieved from Toronto Star Newspapers: https://www.thestar.com/news/canada/2009/03/30/judge_denies_galloways_bid_to_enter_canada.html

Weaver, D. H., & Wilhoit, G. (1996). The American Journalist in the 1990s: U.S. News People at the End of An Era. Routledge.

অধ্যায় ৫

প্রোপাগান্ডা মডেলের কার্যকারিতা যাচাই

> আপনি যদি সতর্ক না হন, তাহলে পত্রিকাগুলো আপনাকে এমন মানুষদের ঘৃণা করতে শেখাবে, যারা অত্যাচারের শিকার। অপরদিকে ঐ সকল ব্যক্তিদের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করবে, যারা সেই অত্যাচার চালায়।
>
> – ম্যালকম এক্স

হারম্যান, চমস্কি মিডিয়ার কাজের ধরন ও প্রোপাগান্ডা মডেল সম্পর্কে প্রথম ধারণা পেশ করেন ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দে, *Manufacturing Consent*[১] নামক বইতে। অবশ্য প্রকাশের পর থেকেই তাদের সেই মডেলটি বেশ সমালোচনার মুখে পড়ে। তথাপি মিডিয়ার কর্মপ্রক্রিয়া বিশ্লেষণে প্রোপাগান্ডা মডেল কার্যকর সিস্টেম হিসেবে অধিষ্ঠিত হয়েছে। পুঁজিবাদী সমাজে ক্ষমতাসীন সিস্টেম কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে, প্রোপাগান্ডা মডেল সে সম্পর্কে বেশ কার্যকরী ব্যাখ্যা প্রদান করে।

৩৩ বছর পর এসে অনেকেই দাবি করতে পারেন, প্রোপাগান্ডা মডেল এখন অচল। এ দাবি ছাড়াও পাঠকদের মনে প্রোপাগান্ডা মডেল সম্পর্কে বেশ কিছু প্রশ্ন জাগাটাই স্বাভাবিক। তাই, বর্তমান সময়ে তার কার্যকারিতা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পেতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর জানা আবশ্যক। প্রশ্নগুলো হচ্ছে :

- ১. প্রোপাগান্ডা মডেল কি মিডিয়ার কর্মকাণ্ডকে সরলীকরণ[২] করে ফেলে?
- ২. তিন দশক পেরিয়ে আজকের মিডিয়াতে এই মডেল ও এর ফিল্টারগুলো কি মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে গেছে?
- ৩. ওপরের দুটি প্রশ্নের উত্তর যদি 'না' হয়, তাহলে ভিন্ন ভিন্ন মিডিয়ায় এর কার্যকারিতা কি অক্ষুণ্ণ থাকে?
- ৪. ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে, অর্থাৎ অ্যামেরিকা ব্যতীত অন্যান্য রাষ্ট্রে মিডিয়ার বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধানে প্রোপাগান্ডা মডেল কি প্রয়োগ করার উপযোগী?
- ৫. প্রোপাগান্ডা মডেলটি কি এখন সংস্কারযোগ্য?

---

[১] Manufacturing Consent : The Political Economy of the Mass Media

[২] Generalize ও Simplify

এ কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর পেলে পাঠকদের জন্য প্রোপাগান্ডা মডেল সম্পর্কে অনেকটাই স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া সম্ভব হবে। এখানে উল্লিখিত সর্বপ্রথম প্রশ্নটি হলো—

» ১. প্রোপাগান্ডা মডেল কি মিডিয়ার কর্মকাণ্ডকে সরলীকরণ করে ফেলে?

হারম্যান-চমস্কি প্রোপাগান্ডা মডেল থিওরি প্রস্তাবের পাশাপাশি বেশ কিছু গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রকাশ করেন। বিশ্বব্যাপী সংঘটিত কয়েকটি আলোচিত হত্যাকাণ্ড ও সে-সকল ঘটনা সম্পর্কে মার্কিন মিডিয়ার আচরণ বিশ্লেষণ করেন তারা। লেখকদ্বয় প্রমাণ করেন যে, শত্রুভাবাপন্ন কোনো রাষ্ট্রে কেউ নির্যাতিত হলে নির্যাতিত ব্যক্তি/গোষ্ঠী মার্কিন মিডিয়ায় সকলের সহানুভূতি লাভের যোগ্য ভিক্টিম হিসেবে বিবেচিত হয়। অপরদিকে এর মিত্র বা ক্লায়েন্ট সরকারের হাতে নির্যাতিতরা বিবেচিত লাভের অযোগ্য ভিক্টিম হিসেবে (Herman & Chomsky, 1988/2002, p. 37)। মার্কিনিদের এই ধরনের নোংরা কর্মকাণ্ড প্রমাণ করে যে, তাদের নৈতিকতা খুবই সংকীর্ণ।

লেখকদ্বয় ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ও সর্বাধিক জনপ্রিয় চারটি পত্রিকায় সে-সকল ঘটনাগুলো উল্লেখ করেন। এর মাধ্যমে মোট সংখ্যাগুলোর পারস্পরিক তুলনা করে ও মার্কিন মিডিয়া সেসব ঘটনা কিভাবে মূল্যায়ন করে, তার পর্যালোচনা করে তারা প্রমাণ করেন, ভিক্টিমের মূল্য নির্ভর করে কারা এর জন্য দায়ী তার ওপর, ভিকটিমের ওপর নয় (1988/2002, Table 2-1)। একদিকে শত্রু ও বিরোধী রাষ্ট্রের হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে গণমাধ্যম প্রোপাগান্ডার বিস্ফোরণ ঘটায়, অন্যদিকে বন্ধু ও ক্লায়েন্ট রাষ্ট্রের সরকারযন্ত্রের হত্যাকাণ্ড গুরুত্বহীনভাবে প্রকাশিত হয় এবং নিয়মিত কভারেজ পায় না।

প্রোপাগান্ডা মডেলের কার্যকারিতা যাচাইয়ে তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর নির্বাচনও চমৎকার পরীক্ষাক্ষেত্র হিসেবে কাজ করে। দেখা যায়, মার্কিন মিডিয়া তাদের সরকার সমর্থিত রাষ্ট্রগুলোর নির্বাচনকে বৈধতা প্রদানে কুণ্ঠাবোধ করে না—যদিও সেটি নিরপেক্ষ না হয়; অন্যদিকে বিরূপভাবাপন্ন বিরোধী মতাদর্শবলম্বী সরকারের ক্ষেত্রে মিডিয়া তাদের সংবাদ পরিবেশনের ধরন, নেতিবাচক বক্তব্য, নির্বাচনের সুষ্ঠুতা যাচাইয়ে অনাগ্রহ-সহ বিভিন্ন বিষয়কে সেই নির্বাচন 'অবৈধ' প্রমাণে কাজে লাগাতে সচেষ্ট হয় (1988/2002, chapter 3)। এ ক্ষেত্রেও লেখকদ্বয় পর্যাপ্ত গবেষণার আলোকে সংবাদ-মাধ্যমের দ্বিচারিতা চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তোলেন।

দীর্ঘ সময় ধরে পরিচালিত সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের ফলাফল এই প্রোপাগান্ডা মডেল। এর উদ্দেশ্য শুধুমাত্র সাংবাদিকদের কাজের প্রক্রিয়া ব্যাখা করা। কেননা তাদের কাজের পেছনের কী রকম চেতনা কাজ করছে, সেটি নির্ণয় করা প্রোপাগান্ডা মডেল দ্বারা সম্ভব নয় (Hearns-Branaman, 2018)। চমস্কি বলেন, এই বিশ্লেষণটি

ব্যক্তির চরিত্র দূরে রেখে কাজ করতে চায়। কেননা, তারা (সাংবাদিকগণ) শুধুই 'প্রতিস্থাপনযোগ্য যন্ত্রাংশ' (Chomsky, 2002, p. 26। অর্থাৎ, মিডিয়ার যে কাঠামো, তার বাইরে সাংবাদিকরা যেতে অনেকাংশেই অক্ষম। যাই হোক, তার এ ধরনের মন্তব্যের ফলে অনেকেই প্রোপাগান্ডা মডেলের সমালোচনা করে। Comeforo (2010) অভিযোগ করেন যে, প্রোপাগান্ডা মডেল বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সাংবাদিকদের সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় ভূমিকার বিষয়টিকে যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করে না। তাছাড়াও ল্যাং এবং ল্যাং[১] (2004a) মডেলটির একই রকম সমালোচনা করেন। উক্ত সমালোচনার জবাবে হারম্যান-চমস্কি বলেন, 'আমরা বিশ্বাস করি যে, সাংবাদিকদের চিন্তা আর কাজের বিপরীতে মিডিয়ার পারফর্মেন্সের ওপর আমাদের ফোকাস করাটা সম্পূর্ণ যৌক্তিক। কোনো রিপোর্টার যদি সরকার ও বিরোধীপক্ষের আয়োজিত নির্বাচনকে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে সামলায়, তাহলে এই পরস্পর-বিরোধী কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে তার মস্তিষ্কে কী চলছে সেটা জানা জরুরি নয়। তাদের কাজই তাদের হয়ে কথা বলবে, উক্ত রিপোর্টারের ব্যাখ্যাসমূহ এবং যুক্তি প্রয়োগ এখানে ততটা প্রাসঙ্গিক নয়' (Chomsky & Herman, 2004)।

টিভি ও ম্যাগাজিন জার্নালিজমের ওপর দশ বছর গবেষণা করেন হারবার্ট গ্যান্স। তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, যে-সকল আইডিয়া চাপ সৃষ্টি করতে পারে, সাংবাদিকদেরকে সেসব থেকে দূরে রাখা হয়। যদিও তাদের নিজেদের আগ্রহ, অন্যান্য পেশাদারগণ ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ গোড়া থেকেই তাদের ভিন্ন মতো পোষণে নিরুৎসাহিত করে (Gans, 1979/2004)।

কর্মক্ষেত্রের রীতিনীতির শিক্ষা দুই সময়ে হতে পারে : শিক্ষাজীবন ও কর্মজীবন। একইসঙ্গে এই শিক্ষা দুভাবে কাজ করতে পারে—সচেতনভাবে এবং অবচেতনভাবে। সেল্ফ সেন্সরশীপ যেমন সচেতনভাবে হয়ে থাকে, তেমনি তা অবচেতনভাবেও হতে পারে। যেখানে সাংবাদিকরা নিজেরাও এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা রাখে না যে, তারা চাপের মুখে নতিস্বীকার করছে কি না। ফলে মিডিয়াকর্মীদের সচেতন ও অবচেতন কাজের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা গবেষকদের জন্য অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। খোদ মিডিয়াকর্মীদের পক্ষেই এই ধরনের পার্থক্য নির্দেশ করা প্রায় অসম্ভব। তাই সাংবাদিকগণ এইরূপ বিশ্লেষণের সাথে একমত হোক বা না-হোক, তথ্য প্রমাণাদি যে নির্দেশনা দেয় সেটাই মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।

লেখকদ্বয় মিডিয়া ও রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিশ্লেষণপূর্বক যে থিওরি প্রদান করেছেন, তাতে প্রান্তিকতা ও সরলীকরণের কোনো স্থান নেই। বরং প্রোপাগান্ডা মডেলের সমালোচনা করতে গিয়ে অনেক স্কলার প্রান্তিকতা ও সরলীকরণ করে ফেলেছেন। এই থিওরি প্রকাশিত হবার পর প্রাথমিক পর্যায়ে এটি

[১] Lang & Lang

সম্পর্কে একাডেমিকদের প্রতিক্রিয়া ছিল—তারা প্রোপাগান্ডা মডেলকে অত্যন্ত নিয়ন্ত্রণবাদী, উদ্দেশ্যবাদী, ষড়যন্ত্রমূলক, ভাসা-ভাসা, ত্রুটিযুক্ত, বিপরীতমুখী হিসেবে দাবি করে (Eldridge, 1993, p. 25; Schlesinger, 1989)। পিয়ার্স রবিনসন মন্তব্য করেন, তারা প্রোপাগান্ডা মডেলকে উপেক্ষা করে চলে। অথচ, প্রোপাগান্ডা মডেল যেসব দাবির ওপর প্রতিষ্ঠিত, সেগুলো অনেকাংশেই মিডিয়া কাঠামোর ব্যাপারে অন্যান্য মূলধারার স্টাডির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ (Robinson, 2018)।

একাডেমিকগণ এই মডেলকে 'অযৌক্তিক' দাবি করার পেছনে শক্ত কোনো ভিত্তি দাঁড় করাতে পারেননি। এখন পর্যন্ত মিডিয়া-সরকার সম্পর্ক বিশ্লেষণে প্রোপাগান্ডা মডেলের বিকল্প কোনো মডেল প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অনেক স্কলারই প্রোপাগান্ডা মডেলের বিপক্ষে 'ষড়যন্ত্র তত্ত্ব' হওয়ার অভিযোগ তুলেছেন। সম্ভবত এই শ্রেণির সমালোচকরা বিশ্বাস করেন যে, মিডিয়ার সামাজিক উদ্দেশ্য হলো জনগণকে সত্যের আলোয় আলোকিত করা। প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করার মাধ্যমে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর জনগণের নিয়ন্ত্রণের দাবি ঘোষণা করতে সহায়তা করা। যাতে জনগণ বুদ্ধিমত্তার সাথে রাজনৈতিক দায়িত্বসমূহ সম্পাদন করতে পারে। কিন্তু, গত শতাব্দীর ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, মিডিয়ার প্রধানতম লক্ষ্য হলো—রাষ্ট্র ও সমাজের অভ্যন্তরে প্রভাবশালী দলের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক এজেন্ডা রক্ষা ও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করা (Mullen, 2009)।

Reese ও Shoemaker বলেন, 'রিপোর্টাররা (ক্যারিয়ার গড়ার স্বপ্নে) খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য প্রয়োগকৃত চাপের মুখে অরক্ষিত থাকে। যদি তারা প্রচলিত ধারণা থেকে ভিন্ন কিছু বলতে শুরু করে, তাহলে তাদের চিহ্নিত করা হয়। সম্পাদকগণ তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা ও নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে সন্দিহান হয়ে পড়েন' (1991/2014, p. 106)। অন্যদিকে চমস্কি মন্তব্য করেন,

> 'যেসব ব্যক্তি (নিউ ইয়র্ক) টাইমস-এ সাংবাদিক কিংবা সম্পাদকের পদ লাভ করে, তাদের অধিকাংশই হয় খুবই অনুগত কিংবা অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির। অনুগত ব্যক্তিরা নিজেদের খাপ খাইয়ে নেয়—তারা (ওখানকার) মূল্যবোধসমূহ আত্মস্থ করে এবং তারা যা বলে তা (নিজেরাই) বিশ্বাস করে' (Chomsky, 2002, p. 114)।[১]

আরও একটি পয়েন্ট হলো : প্রোপাগান্ডা মডেল গণমাধ্যমের সমালোচনা করলেও তার মানে এই নয় যে, সরকার ও কর্পোরেশনগুলো সম্পূর্ণ দায়মুক্ত। সংবাদমাধ্যমের অনৈতিক কর্মকাণ্ডের পেছনে তাদেরও দায় রয়েছে। তথাকথিত 'স্বাধীন সাংবাদিকতা'

[১] যদিও তা সব ক্ষেত্রে সত্য নয়। অনেক সময়ই সাংবাদিকরা মিথ্যা জেনেও অনেক সংবাদ সত্য হিসেবে প্রচার করে থাকে।

আজ বিশেষ গোত্রের বিশেষ সুবিধাগুলোকে সুরক্ষা প্রদান করে (Chomsky, 1989/2013)। আর সে কাজটি তারা করে নিজেদেরকে হর্তাকর্তার আসনে বসিয়ে। এক্ষেত্রে প্রোপাগান্ডা মডেল মিডিয়ার চরিত্র অনুসন্ধানে কোনো ত্রুটি করেনি।

» **২. তিন দশক পেরিয়ে আজকের মিডিয়াতে এই মডেল ও এর ফিল্টারগুলো কি মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে গেছে?**

৩৩ টি বছর পেরিয়ে এসে প্রোপাগান্ডা মডেল কি মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে যায়নি? এই মডেলের সর্বশেষ ফিল্টারটি যেই মতাদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত, সেই কমিউনিজম বিরোধিতাও সোভিয়েত ভেঙে যাবার ফলে যথেষ্ট দুর্বল হয়ে গেছে। আর ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে প্রোপাগান্ডা মডেল প্রকাশিত হবার মাত্র ৩ বছরের মধ্যে। এত বছর পর কি আর ফিল্টারগুলো কার্যকর আছে?

প্রোপাগান্ডা মডেল প্রকাশিত হবার বহু বছর পর এসেও আমরা প্রত্যক্ষ করছি, নব্য লিবারেলিজমের তীব্র সম্প্রসারণ, জাতীয়তাবাদের প্রসার, আর্থসামাজিক বৈষম্যের ক্রমবিকাশ, বর্ণবাদ আর অভিবাসী বিদ্বেষের[১] ছড়াছড়ি। গণতন্ত্রের মধ্যে বিদ্যমান[২] দুর্বলতার কারণে আজ তীব্র বৈষম্য, নির্যাতন, নিষ্পেষণ যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে, একইসাথে মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহ দিন দিন সংকুচিত হয়ে চলেছে। ফলাফল, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ এবং এলিটদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব ক্রমাগত ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে। রাষ্ট্রের সামরিকায়ন, পশ্চিমাদের ধারাবাহিকভাবে চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধ, গোপনে অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে অনৈতিক হস্তক্ষেপ ও অন্যান্য সমস্যাসমূহ নিয়ে এক অভূতপূর্ব যুগ আমরা পার করছি। যেখানে পশ্চিমা সামরিক আগ্রাসনকে বৈধ রূপ প্রদান করতে ব্যবহৃত হচ্ছে 'মানবতাবাদ' (Zollmann, 2018, p. 224)। এলিট শ্রেণির অকুণ্ঠ সমর্থক হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে মিডিয়াগুলো।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে মিডিয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে 'সঠিক' নিরপেক্ষ তথ্য প্রচারে ব্যর্থ হয়। বিজ্ঞাপন ধীরে ধীরে প্রিন্ট থেকে টিভি; অতঃপর টিভি থেকে ইন্টারনেটের প্রতি ধাবিত হয়েছে। গুগল, ফেসবুক, ইউটিউব, ইন্সটাগ্রাম ইত্যাদি মাধ্যম জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। তার ফলে মিডিয়ার প্রভাব আমাদের দৈনন্দিন জীবনের আরও গভীরে পৌঁছে গেছে। কয়েক দশক আগে মানুষ সংবাদ সংগ্রহ করতে প্রধানত খবরের কাগজ আর রেডিও'র ওপরই নির্ভর করত। আজ তরুণ সমাজের প্রায় প্রতিটি সদস্যই তথ্য সংগ্রহের জন্য স্মার্টফোন ব্যবহার করছে। তাহলে, প্রোপাগান্ডা মডেল কি আদৌ বর্তমান সময়ের মিডিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?

২০১৪ খ্রিষ্টাব্দে এক সাক্ষাৎকারে মার্কিন স্কলার Robert McChesney বলেন,

[১] Xenophobia
[২] Built-in

'...এখন আর কোনো প্রাইভেসি (নেই) এবং (কর্পোরেশনগুলো আমাদের) ইনফরমেশন ব্যবহার করে বিশেষজ্ঞদের কাছে বিক্রয় করতে... তারা সরকার, জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থা এবং সামরিক শক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে। তারা আক্ষরিক অর্থেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যে-সকল পন্থায় তথ্য সংগ্রহ করে, জনগণকে নজরদারিতে রাখে, তা যে কোনো গণতান্ত্রিক তত্ত্ব অনুসারেই একটি স্বাধীন সমাজের জন্য ক্ষতিকর।'

শিক্ষিত এবং সচেতন জনসাধারণ এলিট শ্রেণির স্বার্থের বিরুদ্ধে হুমকিস্বরূপ। তবুও সুস্পষ্ট বল প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের প্রতিহত করা গণতন্ত্রে গ্রহণযোগ্য নয়।[১] তাই, মিডিয়া একাধিক পক্ষের উত্থান সমর্থনের কল্পিত ভান করে। এমনকি কখনো কখনো প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থার সমালোচনাও করে থাকে। কিন্তু মিডিয়ার এই কৌশল চলমান ব্যর্থ সিস্টেমের পরিবর্তে বিকল্প সমাধানের প্রশ্নকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র সীমার ভেতরে আবদ্ধ করে ফেলে। সমাজের বৈষম্যমূলক কাঠামোকে সর্বদা প্রশ্নের উর্ধ্বে রাখে। বেশিরভাগ সময়ই দেখা যায়, রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে বিতর্ক, তা কেবল এলিটদের বিভিন্ন শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গিকেই প্রচার করে (Herman E. S., 2000)।

চিন্তার স্বাধীনতা ও এলিটদের স্বার্থের প্রতি সমালোচনামূলক মন্তব্য কদাচিৎ দেখা যায়, যখন মিডিয়া 'অসঙ্গতি' ঘটিয়ে ফেলে এবং নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রকাশের দাবিতে পাঠকদের চাপের সম্মুখীন হয় (Freedman, 2014, p. 28)। প্রকৃতপক্ষে, সংবাদমাধ্যম নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে কার্যকরী উপায় হিটলারের মতো ফ্যাসিবাদী স্টাইল নয়। বরং গণতান্ত্রিক সিস্টেমেও মিডিয়া অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কৌশলের অধীনে থাকে (Pedro-Carañana et al., 2018)।

❁ মালিকানা :

ম্যানুফেকচারিং কনসেন্ট-এর আপডেটেড (2002, p. xiii) এডিশনে লেখকদ্বয় দাবি করেন, অ্যামেরিকান নাগরিকগণ যে সংবাদমাধ্যমের আওতাধীন, তার প্রায় পুরোটাই নিয়ন্ত্রণ করে মাত্র দুই ডজন সংস্থা। সাম্প্রতিক অন্য একটি অনুসন্ধানেও দেখা যায়, পরিস্থিতি যথেষ্ট ভয়াবহ। শুধুমাত্র টিভি কিংবা প্রিন্ট মিডিয়া নয়, সংবাদমাধ্যমের প্রায় সকল ফরম্যাটই[২] গুটিকয়েক প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন (anonymous, n.d.)। এছাড়াও ২০২১-এর মে মাসে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 'দ্যা ফিউচার অব মিডিয়া প্রজেক্ট'-এ দেখা যায়, অ্যামেরিকার ৬৭২ টি পত্রিকার মধ্যে ৩৮২টির স্বত্বাধিকারী মাত্র সাতটি কোম্পানি (Anand et al., 2021)। সংবাদ প্রতিষ্ঠান, টেলিভিশন স্টেশন প্রতিষ্ঠায় বেশ বড় অঙ্কের অর্থ প্রয়োজন হয়। ফলে খুব

[১] যদিও শাসক-শ্রেণি এই নীতিকে থোড়াই আমলে নেয়।

[২] Broadcasting TV, Broadcasting Radio, Pay TV channel, Newspaper and Print, Telecom and Cable, Tech

কম ব্যক্তি বা সংগঠনই এটি করার সামর্থ্য রাখে।

অর্থাৎ, টিভি প্রোগ্রামিং-এর মাধ্যমে সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করার স্বাধীনতা এমন কিছু ব্যক্তি/সংগঠনের হাতে থাকে, যারা বিভিন্ন কর্পোরেশনের স্বত্বাধিকারী। মার্কেটে যাদের আধিপত্য রয়েছে। একই সঙ্গে রেডিও, ম্যাগাজিন, ফিল্ম স্টুডিও, ক্যাবল চ্যানেল-সহ মিডিয়ার অন্যান্য ফরম্যাটগুলোও তারাই নিয়ন্ত্রণ করে। প্রায়শই তারা তাদের লক্ষ্য বাস্তবায়নে তাদের আওতাধীন মিডিয়ার প্রতিটি ফরম্যাটকে একত্রে কাজে লাগায়। বস্তুত এই গুটিকয়েক 'সৌভাগ্যবান' সত্তা ব্যতীত বাদবাকি পৃথিবীর মূলধারার সংবাদ-মাধ্যমে প্রবেশের কোনো অধিকার নেই। খুব কমই এর ব্যতিক্রম ঘটে থাকে (Bergman, 2018, p. 160)।

❁ বিজ্ঞাপন :

তিন দশক পূর্বেকার সময়ের তুলনায় বর্তমানে বিজ্ঞাপনের গুরুত্ব ততটা হ্রাস পায়নি। কারণ, বিজ্ঞাপনের অর্থ অর্জনে গতানুগতিক প্রিন্ট মিডিয়াগুলোর প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পাচ্ছে। গ্রাহকদের আকৃষ্ট করতে এবং তাদেরকে বিজ্ঞাপনদাতাদের হাতের নাগালে পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যম হিসেবে মিডিয়াগুলো ভূমিকা পালন করে। আজকের পৃথিবীতে বিজ্ঞাপনদাতারা (প্রধানত শিল্পপতিরা) পুঁজিবাদ-বিরোধী কোনো প্রোগ্রাম সমর্থন করবে না (Herman & Chomsky, 1988/2002)। কোনো টিভি চ্যানেল সেরকমটি করলে কিছুদিন পরই হয়তো বিজ্ঞাপনের অর্থের অভাবে বা অন্য কোনো চাপে প্রচারণা বন্ধ করে দিতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, টেলিভিশন হলো একটি কর্পোরেট হাতিয়ার, যার অন্যতম লক্ষ্য জনতাকে বিজ্ঞাপনদাতার কাছে বিক্রি করা।

টিভি প্রোগ্রামগুলো ভিউ বাড়ানোর এক অদৃশ্য যুদ্ধে লিপ্ত। হাজারও প্রোগ্রামের ভিড়ে দর্শক যেন তাদের প্রোগ্রামকে বেছে নেয়, সেজন্য তাদেরকে বিশেষ কিছু দিতে হবে (Robinson, 2015)। দেখা যায়, দর্শকের চোখ যেন টিভি পর্দায় চুম্বকের মতো আটকে থাকে, সে উদ্দেশ্যে সিনারিও খুবই দ্রুত বদলায়। নজর কাড়তে অনেক সময়ই সজ্ঞানে টিভি প্রোগ্রামগুলোতে বিতর্কিত ও উত্তেজনাকর দৃশ্যের প্রদর্শনী করা হয়। পরিচালকরা জানে যে, তাদের প্রোগ্রাম যখন বিতর্কের জন্ম দেয়, তখন তা অধিক দর্শক আকর্ষণ করে। ফলাফল, বিজ্ঞাপনদাতাদের ভিড়, আর টিভি নেটওয়ার্কের প্রফিট বৃদ্ধি।

❁ উৎস :

রাষ্ট্র ও মিডিয়ার মধ্যকার সম্পর্কের অভিযোজনের ফলে বর্তমান মিডিয়া কাঠামো তারবার্তা, পাবলিক রিলেশন ইন্ডাস্ট্রি, সরকার, বিভিন্ন সংস্থার বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য

ও প্রেস রিলিজের ওপর পূর্বাপেক্ষা অধিক তীব্রতরভাবে নির্ভরশীল।

ইরাক যুদ্ধের (২০০৩) প্রারম্ভে যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট সংবাদগুলো অফিসিয়াল সোর্সের ওপর মিডিয়ার নির্ভরতা ও রাষ্ট্রীয় প্রোপাগান্ডার ক্ষমতার বিষয়টিকে আরও বিতর্কিত করে তোলে। যুদ্ধের পূর্বে মার্কিন ও ব্রিটিশ সরকার ইরাকি বাহিনীর কাছে গণ-বিধ্বংসী অস্ত্র থাকার মিথ্যা অভিযোগ তুলে। সেই অপবাদ দৃঢ়-প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে তারা যে প্রোপাগান্ডা ক্যাম্পেইন পরিচালনা করেছিল, পরবর্তী সময়ে সেটি ধীরে ধীরে প্রকাশ হয়ে পড়ে। বলা যায়, ইরাক যুদ্ধের মিডিয়া ক্যাম্পেইন বাস্তবতার যথেচ্ছ বিকৃতি সাধন করে এবং জনমত পরিবর্তনে গভর্নমেন্ট সোর্সের সহায়তায় আক্রমণাত্মক ও নিরবচ্ছিন্ন মিথ্যা ক্যাম্পেইন পরিচালনা করে।

December 2002 – March 2003: The March To War



The national press response to Chilcot. Photograph: Clipshare

যদিও-বা আমেরিকা ও ব্রিটেন-এর উক্ত অপবাদের বিপরীতে প্রচুর নির্ভরযোগ্য বিকল্প সোর্স থেকে সেই দাবির যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। ইন্টারনেটে এই ধরনের চ্যালেঞ্জ যথেষ্ট সুলভ থাকা সত্ত্বেও উভয় রাষ্ট্রের মিডিয়াই রাষ্ট্রীয় দাবির ওপর কোনোরকম যাচাই ছাড়াই সেগুলোকে সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য হিসেবে সংবাদ প্রচার করে (Robinson, ২০১৫)।

প্রকৃতপক্ষে, সংবাদ-মাধ্যমের অফিসিয়াল সোর্সের প্রতি যে ঝোঁক, তাতে সহসা পরিবর্তনের তেমন কোনো সম্ভাবনা নেই। মিডিয়া রিসার্চসমূহ আমাদের তেমন কোনো ইঙ্গিত-ও প্রদান করে না। অপরদিকে, সরকারযন্ত্রও তথ্য ও সংবাদ পরিমণ্ডলকে পছন্দনীয় রূপ প্রদানে প্রতিনিয়তই পূর্বাপেক্ষা অধিক বাস্তবধর্মী ও পেশাদার আচরণ প্রদর্শন করছে।

সাংবাদিকরা অফিসিয়াল চাপের ওপর তীব্রভাবে নির্ভরশীল নয়—এ মর্মে বাস্তব ও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ যতদিন পরিবেশিত না হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত প্রোপাগান্ডা মডেলের সোর্স ফিল্টার প্রবলভাবেই কার্যকর আছে। এতে কোনো সন্দেহ সৃষ্টি হবার অবকাশ নেই (Robinson, 2015)।

❁ ফ্ল্যাক :

হারম্যান-চমস্কি তাদের চতুর্থ ফিল্টারটির ক্ষেত্রে তেমন স্পষ্ট কোনো বর্ণনা দেননি। জার্মান এই পরিভাষাটির ব্যুৎপত্তি হয়েছিল মূলত সেনাবাহিনীর কথ্যভাষা থেকে। এখনকার সময়ে এসে ফ্ল্যাক শুধু প্রিন্ট মিডিয়াতেই সীমাবদ্ধ নেই, বরং তা সোশ্যাল মিডিয়াতেও ছড়িয়ে পড়েছে। কেউ পছন্দ করুক আর না-করুক; নব্য ফ্যাসিজম সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যাধির মতো আক্রান্ত করে ফেলেছে। অনলাইন-ফ্যাসিজমের প্রচারকরা ঘৃণা, শ্বেতাঙ্গবাদ, অভিবাসী ও রিফিউজিদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও অন্যান্য উগ্রবাদী ধারণা ছড়াচ্ছে। অফলাইন থেকে তাদের কার্যক্রম অনলাইনে বিস্তৃত হয়েছে, রিফিউজি এবং অভিবাসীদের—বিশেষ করে নারীদের—ওপর সহিংস আক্রমণের ঘটনা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে (Yam, 2021)। অন্যদিকে, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ব্যাপারে হারম্যান-চমস্কি মন্তব্য করেন, মিডিয়াগুলো একত্রিত হয়ে এমন এক 'আক্রমণ করার অস্ত্র' তৈরি করে—যেখানে একই বক্তব্য অন্যরা পুনরাবৃত্তি করতে থাকে। আমরা দেখতে পাই, বর্তমান পৃথিবীর রাজনীতি উগ্র-জাতীয়তাবাদ, বর্ণবাদ, অভিবাসী-বিদ্বেষ আর নব্য ফ্যাসিজমের রাজনীতি। তাই বলা যায়, নব্বইয়ের দশকের তুলনায় বর্তমানে ফ্ল্যাক আরও শক্ত মিডিয়া ফিল্টারিং প্রসেসে পরিণত হয়েছে।

❁ মতাদর্শ :

মতাদর্শ এমন একটি জটিল পরিভাষা, যার অনেক রকম অর্থই হতে পারে। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর চিন্তাধারা সঠিক বা ভ্রান্ত চেতনার ওপর ভিত্তি করে গঠিত মতাদর্শ, দৃষ্টিভঙ্গি-সবই মতাদর্শের অন্তর্ভুক্ত। কোনো জটিল, সমালোচকধর্মী ও গুরুত্বপূর্ণ মতাদর্শ সাধারণত আপনাকে ভালো ও মন্দের বৈশিষ্ট্য ও স্বরূপ নির্ণয়ের আলোচনা অনুমোদন করে এবং সিদ্ধান্ত প্রদান করে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে।

হারম্যান-চমস্কি মতাদর্শের প্রসঙ্গে নির্দিষ্ট কোনো ধরাবাঁধা কোনো সংজ্ঞা নির্ধারিত না করলেও কমিউনিজম বিরোধ, নব্য-উদারনীতি, পাশ্চাত্য আদর্শসমূহ, ডানপন্থী এবং জাতীয় নিরাপত্তা—এ মতবাদ গুলোর কথা উল্লেখ করেন (Herman & Chomsky, 1988/2002)।

ভিয়েতনাম যুদ্ধ চলাকালীন, নীতিমালা প্রণয়নকারী এবং সাংবাদিকগণ একটি কমন গ্রাউন্ডে দাঁড়িয়ে স্বীয় বিশ্বাসে অটল ছিলেন; তাদের সেই বিশ্বাসটি ছিল—কমিউনিজমের হুমকি অ্যামেরিকার কাছে এই দাবি রাখে যে, এর প্রসারে বাধা প্রদান করতে হবে; সেই সঙ্গে তারা এটাও নিশ্চিত করে যে, ভিয়েতনাম যুদ্ধকে শুধুমাত্র ভিয়েতনামীদের কমিউনিস্ট শাসনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করার এক ন্যায়নিষ্ঠ সংগ্রাম হিসেবেই বিবেচনা করা হবে। অথচ ঔপনিবেশিক ফ্রান্স[১] ও পরবর্তীকালে অ্যামেরিকার বিরুদ্ধে অসংখ্য ভিয়েতনামবাসীদের চলমান যুদ্ধ কমিউনিজম বিরোধিতার ফ্রেমের এতটাই বাইরে পড়ে যে, অধিকাংশ সাংবাদিক সম্ভবত এ রকম ব্যাখ্যা করার চিন্তাও করেননি। হ্যালিনের (১৯৮৬) এর মতে, ভিয়েতনাম যুদ্ধ যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী নীতির একটি উদাহরণ এবং একটি আগ্রাসী আক্রমণ, এই ধরনের ধারণা মূলধারার মার্কিন মিডিয়াতে কখনো আলোচিতই হয়নি।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনে তথাকথিত স্নায়ু যুদ্ধের[২] সমাপ্তি হলেও মতাদর্শ ফিল্টারটি মার্কিন মিডিয়ায় তার কার্যকারিতা হারায়নি। হারম্যান-চমস্কি বলেন, কমিউনিজম বিরোধিতা মূলত মুক্ত-বাজার অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট বাগাড়ম্বর। অন্য রাষ্ট্রে অ্যামেরিকার অর্থনৈতিক অনুপ্রবেশ ও প্রাইভেট কর্পোরেশনগুলোর জন্য বিরাট অঙ্কের সরকারি ভর্তুকি সংক্রান্ত এক বৃহৎ এজেন্ডার অংশ। সে এজেন্ডা 'এলিটদের স্বার্থ এবং যেকোনো রাষ্ট্রে—হোক সে ডানপন্থী বা বামপন্থী—অ্যামেরিকার অর্থনৈতিক অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে আসা যেকোনো চ্যালেঞ্জের বিরোধিতা করে।

কমিউনিজম বিরোধিতার পতনের পর অ্যামেরিকা তথাকথিত 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'[৩] সূচনা করে বিশ্বকে তাদের নব্য প্রতিদ্বন্দ্বীর সন্ধান দেয়। ডমকি[৪] (২০০৪)

---

[১] ১৮৮৭-১৯৫৪ পর্যন্ত ভিয়েতনাম ছিল ফ্রেঞ্চ ইন্দোচীনের অংশ
[২] Cold War
[৩] War on Terror
[৪] David Domke

বুশ প্রশাসন ও মার্কিন মিডিয়া বিশ্লেষণের পর সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, অ্যামেরিকা বিশ্বকে গুড এবং এভিল—এই দুই ভাগে ভাগ করার এক নতুন বাইনারি আলোচনার উত্থান ঘটিয়েছে। একই সঙ্গে বুশ প্রশাসন মতাদর্শ-ভিত্তিক আলোচনার আশ্রয় গ্রহণ করে। তারা অ্যামেরিকাকে ইউনিক গুণাবলিতে অলঙ্কৃত রাষ্ট্র হিসেবে চিত্রায়িত করে (Rojecki, 2008)।

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আলোচনা-সমালোচনায় মার্কিন মিডিয়া একটি নির্দিষ্ট প্যাটার্নের অনুসরণ করে। তারা যুদ্ধের জয়-পরাজয়ের সম্ভাবনা, যুদ্ধে হতাহত মার্কিনীদের জীবন এই যুদ্ধের মূল্যের চেয়ে বেশি হয়ে গেল কি না—এই সকল নির্দিষ্ট প্রশ্নে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সমালোচনা করে। তাদের যুদ্ধ বিষয়ক বিশ্লেষণের কোথাও এই যুদ্ধের নৈতিকতা ও বৈধতা সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করতে দেখা যায় না। অর্থাৎ, মার্কিন মিডিয়া তাদের নিজস্ব মতাদর্শগত সীমানার ভেতরেই অবস্থান করে। আর সেই মতাদর্শ অ্যামেরিকার নৈতিকভাবে উচ্চতর অবস্থান ও ফরেইন পলিসির বৈধতার ব্যাপারে নিঃসন্দেহ। আর তাই, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রশ্নে মার্কিন মিডিয়া তাদের প্রশাসনের সমর্থকের ভূমিকাই পালন করে।

২৩ নভেম্বর ২০০৮, *নিউ ইয়র্ক টাইমস*-এর Review of the Week-এ নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্টের জন্য তৎকালীন বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে গুটিকয়েক খণ্ডিত রামর্শের সন্নিবেশ ঘটানো হয়। ইরাক ও আফগানিস্তান যুদ্ধে অ্যামেরিকার সেনাবাহিনী বৈধ, এমনকি মহৎ—এই ধারণার ওপর ঐকমত্য থাকা অবস্থায় কয়েকজন বিশেষজ্ঞ উভয় যুদ্ধের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। তাদের সবাই যুদ্ধের ট্যাকটিকস, সামরিক আক্রমণের কার্যকারিতা ও প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে একমত হতে ব্যর্থ হন। তাদের মতে, যুদ্ধ দুটি ব্যর্থ হলে তা শুধুই 'কৌশলগত সাংঘাতিক ভুল' হিসেবে বিবেচিত হবে। এছাড়া অন্য কোনো অভিযোগ গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থাৎ, সে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের ব্যাপারে তারা সকলেই সন্তুষ্ট (Chalabi et al., 2008)।

আজ যারা সতর্ক পাঠক—যারা সর্বদা (গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে) সঠিক তথ্য সন্ধান করেন, তারা হয়তো-বা সংবাদ সন্ধানে আংশিক সফলতা পেতেও পারেন। কিন্তু, সঠিক তথ্যটি তার উপযুক্ত মনোযোগ ও প্রাসঙ্গিক গুরুত্ব লাভ করেছে কিনা, এটি অধিকাংশ পাঠকের বোধগম্য পন্থায় পরিবেশিত হয়েছে কি না, কিংবা এই তথ্যটি কি সফলভাবে বিকৃত ও দমন করা হয়েছে কি না— সে সম্পর্কে পাঠক অনেক সময়ই জানতে ব্যর্থ হয়। যদিও ইন্টারনেটের বদৌলতে ধীরে ধীরে দৃশ্যের কিছুটা ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটছে।

প্রকৃতপক্ষে, যতদিন এই অসম, পক্ষপাতদুষ্ট অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সমাজ-ব্যবস্থা টিকে থাকবে, যতদিন কর্তৃত্বশালী এলিটদের স্বীয় কর্মকাণ্ডকে সঠিক প্রমাণ

করতে হবে, ততদিন আপম অস্তিত্ব রক্ষার্থে তারা প্রোপাগান্ডা চালিয়ে যাবে। মিডিয়া কাঠামোও হয়তো ততদিন পর্যন্ত তাদের অনুগত চর হিসেবে কাজ করবে। ফলস্বরূপ, প্রোপাগান্ডা মডেল ও তার ফিল্টারগুলোও হয়তো-বা ততদিনই প্রাসঙ্গিক বিবেচিত হবে।

» **৩. ওপরের দুটি প্রশ্নের উত্তর যদি 'না' হয়, তাহলে ভিন্ন ভিন্ন মিডিয়ায় এর কার্যকারিতা কি অক্ষুণ্ন থাকে?**

লেখকদ্বয় মডেল প্রস্তাব করেন মূলত প্রিন্ট মিডিয়ার কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে। পরবর্তী যুগে অডিও-ভিজুয়াল মিডিয়া ও ইন্টারনেটের অভাবনীয় অগ্রগতির ফলে এই শতাব্দীতে টিভি ও ইন্টারনেট ভিত্তিক সংবাদ বৃহৎ পরিসরে পরিব্যাপ্তি লাভ করেছে। ক্যাবল নিউজ, ইন্টারনেটের উত্থানের পর লেখকদ্বয় দাবি করেন, তাদের প্রোপাগান্ডা মডেল আধুনিক নিউজ মিডিয়ার ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের চাইতেও অধিক প্রযোজ্য। অবশ্য, তারা কখনোই এমন দাবি করেন না যে, প্রতিটি সংবাদ ও মতামত প্রচারের ক্ষেত্রে প্রোপাগান্ডা মডেল কার্যকরী। তবে, যেসব ক্ষেত্রে এলিট শ্রেণির স্বার্থ বেশ শক্তিশালী ও স্পষ্ট, এবং এলিটদের ঐকমত্য রয়েছে, অন্যদিকে বিরোধী পক্ষের স্বার্থ বিচ্ছিন্ন ও অস্পষ্ট—সেসব ক্ষেত্রে প্রোপাগান্ডা মডেল যথেষ্ট কার্যকরী হয় (Mullen, 2009)।

ইন্টারনেটের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা পেতে ২০১৬ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রতি লক্ষ করা যাক। পিউ রিসার্চ সেন্টার-এর এক জরিপে দেখা যায়, উক্ত নির্বাচনে ১৮-২৯ বছর বয়স্ক ব্যক্তিরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ উৎস হিসেবে বিবেচনা করেছে। ত্রিশোর্দ্ধদের ক্ষেত্রে ৭৮% ব্যক্তি নির্বাচন সম্পর্কে জানতে টিভি নিউজ অনুসরণ করে, ৬৫% ডিজিটাল সংবাদ উৎস (৪৮% নিউজ ওয়েবসাইট, ৪৪% সোশ্যাল নেটওয়ার্ক) ব্যবহার করে, ৪৪% রেডিও ব্যবহার করে, ৩৬% প্রিন্ট মিডিয়া ব্যবহার করে। অর্থাৎ, ডিজিটাল সংবাদ উৎস ইতিমধ্যেই তরুণদের মাঝে সবচেয়ে জনপ্রিয় সংবাদ উৎস। আর বয়স্করাও প্রিন্ট মিডিয়া ছেড়ে ক্রমশ টিভি নিউজের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন (Gottfried et al., 2016)।

হারম্যান-চমস্কির মতে, বেশ কিছু ফ্যাক্টর মূলধারার মিডিয়ার আধিপত্যকে অদ্যাবধি সুরক্ষিত রেখেছে (Mullen, 2009)—

- ১. মূলধারার মিডিয়া প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেরাই ইন্টারনেট জগতে প্রবেশ করে সেখানে শীর্ষ সংবাদ সরবরাহকারী হিসেবে নিজেদের অবস্থান পোক্ত করেছে।
- ২. পূর্ব থেকেই বিদ্যমান পাঠক এবং পুঁজি তাদেরকে সম্ভাব্য অন্যান্য বিকল্প প্রতিদ্বন্দ্বীদের ওপর প্রচুর সুবিধা প্রদান করেছে।

- ৩. গুগল, ফেসবুকের মতো ইন্টারনেট ভিত্তিক বিকল্প সংবাদের উৎসসমূহের কার্যক্রম বিজ্ঞাপনের অর্থের ওপর নির্ভরশীল। এর ফলে বিকল্প নিরপেক্ষ সংবাদ-উৎস হিসেবে তাদের বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি অক্ষুণ্ণ থাকে না।
- ৪.সোশ্যাল মিডিয়াতে যারা সঠিক সংবাদ পরিবেশন করে, তারা সচরাচর প্রফেশনালি সংবাদ-মাধ্যমের সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত নয়। বরং প্রধানত সমালোচক ও বিশ্লেষক[১]।

ইন্টারনেটের সুচনালগ্নে এটি তথ্য ও আইডিয়ার অবাধ প্রবাহের একটি মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হতো। কিন্তু বর্তমানে মুনাফালোভী কর্পোরেশনগুলো ইন্টারনেটকেও পণ্যে রূপান্তরিত করে ফেলেছে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাষ্ট্রযন্ত্র কর্তৃক গণ-নজরদারি[২], যা স্পষ্টত গোপনীয়তার লঙ্ঘন এবং সরকার-যন্ত্রের করা ক্ষমতার অবৈধ প্রয়োগ। তাই, ইন্টারনেটকে কাজে লাগিয়ে পশ্চিমা একাডেমিকদের গণতান্ত্রিক মিডিয়া প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন আর বাস্তবায়িত হলো না। গুগল, ফেসবুকের মতো টপ লেভেলের প্লাটফর্মগুলো মৌলিকভাবে সংবাদভিত্তিক প্রতিষ্ঠান নয়, কিন্তু ইতিমধ্যেই এই প্রতিষ্ঠানগুলো সিআইএ, এফবিআই, এনএসএ, স্টেট ডিপার্টমেন্টের দাবিসমূহের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেছে। বর্তমানে ইন্টারনেটভিত্তিক সংবাদ প্রচারের যে অগ্রগতি, তাতে নিকট ভবিষ্যতে 'হয়তো-বা' সামগ্রিকভাবে নিউজ মিডিয়ার ওপর প্রোপাগান্ডা মডেল প্রয়োগে প্রান্তিকতা ও জটিলতা সৃষ্টির সম্ভাবনা হতে পারে। তবে এখন পর্যন্ত গতানুগতিক মিডিয়া ইন্টারনেটে তাদের আধিপত্য ধরে রেখেছে।

অন্যদিকে টেলিভিশন প্রোগ্রাম ও হলিউড ফিল্মে সিআইএ-র প্রভাব খাটানোর সফল ইতিহাস বেশ পুরোনো এবং প্রতিষ্ঠিত সত্য।[৩] এ বিষয়ে তর্ক করার কোনো অবকাশই নেই। ৯/১১-এর হামলার পর হলিউড এবং অধিকাংশ টিভি নেটওয়ার্কের পরিচালকগণ মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশের একজন শীর্ষ উপদেষ্টার সাথে সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাতের উদ্দেশ্য ছিল বিনোদন জগত কিভাবে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধতে সহযোগিতা করবে এবং এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের স্ট্রাকচার প্রতিষ্ঠার সূচনা কিভাবে করবে সে সম্পর্কে আলোচনা করা (Lyman, 2001)।

রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান লক্ষ লক্ষ হতদরিদ্র জনগণের ব্যাপারে টিভি চ্যানেলগুলোর সচেতন কোনো উদ্বিগ্নতা নেই। মুষ্টিমেয় অতি ক্ষুদ্র কিছু ব্যক্তি বা পরিবারের হাতে সিংহভাগ অর্থ পুঞ্জিভূত; ধনিক শ্রেণি আরও ধনী হচ্ছে, গরিব আরও গরিব হচ্ছে—এ ব্যাপারে তারা চিন্তিত নয়। তাদের জোরালো কোনো বক্তব্যও নেই। অথচ, কখনো কখনো অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে তাদের মায়াকান্না দেখে জনগণ যৌক্তিকভাবেই

[১] Critical analyst
[২] Mass Surveillance
[৩] see Jenkins, 2012, for more details

উল্টো তাদের চরিত্র নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে।

কর্পোরেট টেলিভিশনের প্রধান লক্ষ্য মুনাফা আদায়, আর এই লক্ষ্য অর্জনের অন্যতম একটি উপায় জনগণকে ভোগবাদিতায় অভ্যস্ত করা। টিভি প্রোগ্রাম ও বিজ্ঞাপনসমূহ নিয়মিতই ভোগবাদিতাকে দেশপ্রেমের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত করে দেয়[১]। অথচ, এ বিষয়ে প্রায় সকল গবেষণালব্ধ তথ্য আমাদের জানায় যে, ভোগবাদিতা মানুষের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের অবনতি ছাড়া কোনো লাভের কারণ হয় না (Kasser, 2002)।

» ৪. অ্যামেরিকা ব্যতীত অন্যান্য রাষ্ট্রে মিডিয়ার বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধানে প্রোপাগান্ডা মডেল কি প্রয়োগ করার উপযোগী?

প্রোপাগান্ডা মডেল যেহেতু অ্যামেরিকান মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রির পারফর্মেন্সের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত, এই মডেল কি অন্যান্য রাষ্ট্রের ভিন্ন ভিন্ন মিডিয়া সিস্টেম ও রাজনৈতিক কাঠামোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে কি না—সে বিষয়ে কর্নার[২] (২০০৩) সন্দেহ প্রকাশ করেন। তবে, প্রোপাগান্ডা মডেলের লেখকদ্বয় এটির সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে। ক্ল্যান-এর মতে (২০০৩), প্রোপাগান্ডা মডেল সংবাদ-মাধ্যমের সকল কার্যক্রম ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করে না।

প্রোপাগান্ডা মডেলের মৌলিক দাবিগুলোর সঙ্গে একমত হওয়া সত্ত্বেও বয়েড ব্যারেট (২০০৪) অভিযোগ করেন যে, প্রোপাগান্ডা মডেল ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে প্রতিটি স্বতন্ত্র ফিল্টারের পরস্পর তুলনামূলক প্রভাব নির্ধারণ করার কোনো পদ্ধতি শনাক্ত করেননি। একই সঙ্গে তিনি ফিল্টারগুলোর চরিত্রায়নের স্পষ্টতার অভাব সম্পর্কে দুঃখ প্রকাশ করেন।

এছাড়াও ল্যাং ও ল্যাং প্রোপাগান্ডা মডেল সম্পর্কে গুরুতর একটি অভিযোগ উত্থাপন করেন। তাদের মতে, সোর্স এবং সাংবাদিকদের স্বার্থ যখন ভিন্নমুখী হয়, তখন সে সম্পর্ক প্রায়শই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিণত হয়।

প্রোপাগান্ডা মডেলের কার্যকারিতার প্রশ্নে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো- বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এটির ফিল্টারগুলোর প্রভাবের পারস্পরিক তুলনামূলক পার্থক্য। উদাহরণস্বরূপ, ইরাক যুদ্ধের মতো প্রচণ্ড সহিংস সংঘর্ষে যুদ্ধের ময়দানের সংবাদের ক্ষেত্রে সোর্স ফিল্টারটি অন্যান্য ফিল্টার থেকে অধিক কার্যকর হবার সম্ভাবনা থাকে। অপর দিকে, ফিলিস্তিন ইসরায়েলের নির্যাতনের ব্যাপারে অ্যামেরিকার মিডিয়ার প্রচারের ক্ষেত্রে 'মতাদর্শ' ভিত্তিক ফিল্টার প্রয়োগ করার সম্ভাবনা বেশি

[১] যেমনঃ 'দেশীয় (কোম্পানির) পণ্য কিনুন, দেশের অর্থ দেশেই রাখুন।' অথচ প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভোগ্যপণ্য কিনলে ক্রেতার আত্মিক, আর্থিক কোনো লাভ হয় না; তার কষ্টার্জিত অর্থ চলে যায় কর্পোরেট ইন্সটিটিউটের সত্ত্বাধিকারীর ব্যাংক একাউন্টে।

[২] Corner

(Robinson, ২০১৫)। এ বিষয়ে হারম্যান মত প্রকাশ করেন, যেসব রাষ্ট্রের মৌলিক কাঠামো ও পরিস্থিতি আমেরিকার মতোই প্রোপাগান্ডা মডেলের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, সেসব ক্ষেত্রে তা কার্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রোপাগান্ডা মডেল এমন কোনো জাতি, সমাজ বা সম্প্রদায়ের ওপর প্রযোজ্য নয়, যেখানে বিকল্প সংগঠন ও মূল্যবোধ বিদ্যমান (Pedro-Carañana et al., 2018)। এছাড়াও এমন কোনো সমাজেও প্রোপাগান্ডা মডেল প্রযোজ্য নয়, যেখানে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে জনমত কোনো গুরুত্ব রাখে না

» ৫. প্রোপাগান্ডা মডেলটি কি এখন সংস্কারযোগ্য?

প্রোপাগান্ডা মডেল যদি অদ্যাবধি কার্যকরী সিস্টেম হিসেবে প্রয়োগযোগ্য থাকে, তাহলে সেটি কি আপডেট বা হালনাগাদকরণ, সম্প্রসারণ, সংকোচন ও সংস্কারযোগ্য?

প্রোপাগান্ডা মডেলে মিডিয়ার সঙ্গে 'প্রোপাগান্ডা' শব্দটি সম্পৃক্ত করা হয়েছে; তার মানে এই নয় যে, মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রির প্রতিটি ব্যক্তিই সুচতুর প্রোপাগান্ডিস্ট, যদিও কিছু সত্ত্বাধিকারী ও প্রোডিউসাররা জানে তারা কী করছে। এর মানে এটিও নয় যে, যারা সংবাদমাধ্যমের গ্রাহক তারা সবাই মূর্খ বা স্টুপিড (Bergman, 2018, p. 168)।

প্রোপাগান্ডা মডেল ফিল্টারসমূহ মূলত ঐ সকল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবসমূহ চিহ্নিত করে, যেগুলো সংবাদ-মাধ্যমের সত্য ও সঠিক সংবাদ প্রচারের দায়িত্বকে সীমাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু, যেসব ফ্যাক্টর এলিট শ্রেণির স্বার্থের বিপরীতে সক্রিয় থাকে, এবং যে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিতে জনসম্মতি সৃষ্টির চক্র অকার্যকর হয়ে পড়ে—উভয় ক্ষেত্রেই প্রোপাগান্ডা মডেল স্পষ্ট কোনো ধারণা দেয় না। উদাহরণস্বরূপ, এলিটদের অন্তঃদ্বন্দ্ব, কিংবা কোনো বিশেষ ঘটনাকে পুঁজি করে পর্যায়ক্রমিক সিরিজ সংবাদ (event driven news) কখনো কখনো মিডিয়ার কর্মকাণ্ডকে তাদের পরিকল্পিত সীমার বাইরে নিয়ে যায়, যদিও সেটি হয় খুবই স্বল্প সময়ের জন্য।

প্রোপাগান্ডা মডেলের লেখকদ্বয় তাদের মডেলকে সংবাদ-মাধ্যমের কর্মপ্রক্রিয়া বিশ্লেষণের একটি উপায় হিসেবেই দাবি করেন। তাদের মতে, সত্য প্রতিষ্ঠার খোঁজে তারা কোনো প্রকার একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেননি। তাই অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রোপাগান্ডা মডেল অপেক্ষা ভালো ফলাফল সরবরাহ করতে পারে (Mullen, 2009)।

হারম্যান-চমস্কি তাদের মানুফেকচারিং কনসেন্ট-এ উল্লিখিত প্রোপাগান্ডা মডেল যাচাই করতে যে-সকল ঘটনা বাছাই করেন, সেগুলো প্রধানত ফরেইন পলিসি ও বিশ্ব রাজনীতি সংশ্লিষ্ট ঘটনা। একই সঙ্গে, অভিজাত শ্রেণি পরিচালিত যে-সকল ঘটনা

সম্পর্কে মিডিয়া কভারেজ বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তার প্রায় সবগুলোই সহিংস সংঘর্ষ। মিডিয়া যে এলিটদের স্বার্থগুলোকে আরও শক্তিশালী করে—এ ধরনের প্রস্তাবনা প্রদানের ক্ষেত্রে যুদ্ধ তুলনামূলক সহজ ঘটনা। তাহলে প্রশ্ন হলো, যুদ্ধ ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রোপাগান্ডা মডেল কতটা কার্যকর। সেক্ষেত্রে, দেশীয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও মানবিক সংকট-সহ বিভিন্ন ইস্যুতে প্রোপাগান্ডা মডেলের কার্যকারিতা যাচাইয়ে লেখকদ্বয় স্কলারদের উদাত্ত আহ্বান জানান (Robinson, 2015)। তবে, আপাতদৃষ্টিতে বলা যায়, যেখানে মতাদর্শগত বাধা অপেক্ষাকৃত কম, সে-সকল ক্ষেত্রে কখনো কখনো পরিস্থিতিভেদে মিডিয়া নিরপেক্ষতা প্রদর্শন করে।

ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের প্রেক্ষাপটে প্রোপাগান্ডা মডেলের গ্রহণযোগ্যতা যাচাই করাটা বেশ জটিল বিষয়। মার্কিন মিডিয়া মূলত সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক একটি সেক্টর। অন্যান্য ওয়েস্টার্ন মিডিয়া সিস্টেমে উচ্চ পর্যায়ের অলাভজনক পাবলিক ব্রডকাস্টিং সার্ভিস ও সাংবাদিকতা প্রচলিত রয়েছে। অর্থাৎ, প্রোপাগান্ডা মডেল মার্কিন মিডিয়ার ক্ষেত্রে বেশ গ্রহণযোগ্য হলেও, অন্যান্য রাষ্ট্র ও মিডিয়া স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে এর প্রযোজ্যতায় পার্থক্য হওয়াটা স্বাভাবিক। তবে আমরা বলতে পারি, প্রোপাগান্ডা মডেল লিবারেল মিডিয়া সিস্টেমের ব্যাপারে সামগ্রিক একটি ধারণা পেশ করে (Robinson, 2018)।

Bibliography

Anand, B. N., King, G., Legg, H., & Tella, R. D. (2021, May). Index of Seven Big Owners of Dailies. Retrieved from Harvard University: https://projects.iq.harvard.edu/futureofmedia/index-seven-big-owners-dailies

anonymous. (n.d.). Who Owns the Media? Retrieved from Free Press: https://freepress.net/sites/default/files/2018-03/Who%20Owns%20the%20Media_2018%20Data.xlsx

Bergman, T. (2018). American Television: Manufacturing Consumerism. In D. Broudy, J. Klaehn, & J. Pedro-Carañana, The Propaganda Model Today: Filtering Perception and Awareness (pp. 159-172). University of Westminster Press.

Boyd-Barrett, O. (2004). Judith Miller, The New York Times, and the propaganda model. Journalism Studies, 5(4), 435-449. https://doi.org/10.1080/1461670041233129638 3

Chalabi, A., Cordesman, A. H., Kagan, F., Mansoor, P., Robinson, L., Rumsfeld, D., & Stewart, R. (2008, November 23). One War, Two Fronts: What's Next in Iraq and Afghanistan? Retrieved from The New York Times: https://www.nytimes.com/2008/11/23/opinion/23trans.html

Chomsky, N. (1989/2013). Necessary Illusions. House of Anansi Press.

Chomsky, N. (2002). Understanding Power: The Indispensable Chomsky. The New Press.

Chomsky, N., & Herman, E. S. (2004). Reply to Kurt and Gladys Engel Lang. Political Communication, 21(1), 103-107. https://doi.org/10.1080/1058460049027334-1699

Comeforo, K. (2010). Review Essay: Manufacturing consent: The political economy of the mass media. Global Media and Communication, 6(2), 218-230. https://doi.org/10.1177/1742766510373714

Eldridge, J. (1993). Getting the Message: News, Truth, and Power. Routledge.

Freedman, D. (2014). The Contradictions of Media Power. Bloomsbury Academic.

Gans, H. J. (1979/2004). Deciding What's News: A Study of CBS Evening News, NBC Nightly News, Newsweek, and Time. Northwestern University Press.

Gottfried, J., Barthel, M., Shearer, E., & Mitchell, A. (2016, February 4). The 2016 Presidential Campaign – a News Event That's Hard to Miss. Retrieved from Pew Research Center: https://www.pewresearch.org/journalism/2016/02/04/the-2016-presidential-campaign-a-news-event-thats-hard-to-miss/

Hallin, D. C. (1986). The "uncensored War": The Media and Vietnam. Oxford University Press.

Hearns-Branaman, J. O. (2018). What the Propaganda Model Can Learn from the Sociology of Journalism. In D. Broudy, J. Klaehn, & J. Pedro-Carañana. The Propaganda Model Today: Filtering Perception and Awareness (pp. 25-36). University of Westminster Press.

Herman, E. S. (2000). The Propaganda Model: a retrospective. Journalism Studies, 1(1), 101-112. https://doi.org/10.1080/1461670003611 95

Herman, E. S., & Chomsky, N. (1988/2002). Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media. Pantheon Books.

Kasser, T. (2002). The high price of materialism. MIT Press.

Klaehn, J. (2003). Model Construction: Various Other Epistemological Concerns: A Reply to John Corner's Commentary on the Propaganda Model. European Journal of Communication, 18(3), 377-383. https://doi.org/10.1177/02673231030183005

Lang, G. E., & Lang, K. (2004a). Noam Chomsky and the Manufacture of Consent for American Foreign Policy. Political Communication, 21(1), 93-101. https://doi.org/10.1080/10584600490273308-1780

Lang, G. E., & Lang, K. (2004b). Response to Herman and Chomsky. Political Communication, 21(1), 109–111. https://doi.org/10.1080/10584600490273362-1901

Lyman, R. (2001, November 12). A NATION CHALLENGED: THE ENTERTAINMENT INDUSTRY; Hollywood Discusses Role in War Effort. Retrieved from The New York Times: https://www.nytimes.com/2001/11/12/us/nation-challenged-entertainment-industry-hollywood-discusses-role-war-effort.html

Mullen, A. (2009). The Propaganda Model after 20 Years:. Westminster Papers in Communication and Culture, 6(2), 12-22. https://doi.org/10.16997/wpcc.121

Pedro-Carañana, J., Broudy, D., & Klaehn, J. (2018). The Propaganda Model Today: Filtering Perception and Awareness. University of Westminster Press.

Reese, S. D., & Shoemaker, P. J. (1991/2014). Mediating the Message: Theories of Influence on Mass Media Content. Routledge.

Robinson, P. (2015). The Propaganda Model: Still Relevant Today? In A. Edgley, Noam Chomsky (pp. 77-96). Palgrave Macmillan.

Robinson, P. (2018). Does the Propaganda Model Actually Theorise Propaganda? In D. Broudy, J. Klaehn, & J. Pedro-Carañana, The Propaganda Model Today: Filtering Perception and Awareness (pp. 53-68). University of Westminster Press.

Rojecki, A. (2008). Rhetorical Alchemy: American Exceptionalism and the War on Terror. Political Communication, 25(1), 67-88. https://doi.org/10.1080/10584600701807935

Schlesinger, P. (1989). From production to propaganda? Media, Culture & Society, 11(3), 283-306. https://doi.org/10.1177/016344389011003003

Yam, K. (2021, March 17). There were 3,800 anti-Asian racist incidents, mostly against women, in past year. Retrieved from NBC News: https://www.nbcnews.com/news/asian-america/there-were-3-800-anti-asian-racist-incidents-mostly-against-n1261257

অধ্যায় ৬

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ : নারকীয় ধ্বংসলীলা

> আজ আমরা লড়াই করছি নিরাপত্তা, প্রগতি আর শান্তির লক্ষ্যে; (এই লড়াই) শুধুমাত্র আমাদের জন্যই নয়, বরং সকল মানুষের জন্য। শুধুমাত্র একটি প্রজন্মের জন্য নয়, বরং সকল প্রজন্মের জন্য। আমরা লড়াই করছি আদিম অনিষ্ট আর দুর্ভাগ্যে জর্জরিত পৃথিবীকে পবিত্র করতে।
>
> – রুজভেল্ট, ১৯৪২

মার্কিনীরা নিজেদের স্বাধীনতা আর গণতন্ত্রের ফেরিওয়ালা হিসেবে পরিচয় দিতে পছন্দ করে। কিন্তু ইতিহাস আর বাস্তবতা এই দাবির সত্যায়নে পুরোপুরি ব্যর্থ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেও ল্যাটিন অ্যামেরিকাতে স্বৈরশাসকরা আঙ্কেল স্যামের[১] সমর্থন পেয়ে তাদের স্বৈরতন্ত্র দীর্ঘায়িত করেছে। গণতন্ত্র আর স্বৈরতন্ত্রের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্য নিয়ে অনেকেই দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে থাকেন। কিন্তু, অ্যামেরিকান এলিটরা গণতন্ত্রের থিওরি যতই কপচাক না কেন, একনায়কতন্ত্রে তাদের কোনো সমস্যা নেই—যতদিন সেটি তাদের দেখানো পুঁজিবাদী-ব্যবস্থা বজায় রাখে (Pauwels, 2002/2015)। তাই, এই ধরনের ভ্রান্তচিন্তার ফলে পশ্চিমারা এবং তাদের সেবাদাসেরা প্রায়শই লিবারেল হস্তক্ষেপবাদের চোরাগলিতে পথ হারায়। তারা মনে করে, এক মাত্র পশ্চিমারাই নৈতিকতাসম্পন্ন; রাজনৈতিক ঠিক-ভুল নির্ণয় করার যোগ্যতা কেবল তাদেরই আছে (Wheatcroft, 2014)।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে অ্যামেরিকানরা আদর করে উত্তম লড়াই[২] হিসেবে অভিহিত করে। তারা বলতে চায়—এটি ছিল মহান এক যুদ্ধ। অনেকেই ধারণা করেন, অ্যামেরিকা এই যুদ্ধের মাধ্যমে বিশ্বকে শান্তির পথে পরিচালিত করেছে। ফলে পরবর্তীকালে আর কোনো বৈশ্বিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। এই যুদ্ধ কাদের জন্য, কোনো স্বার্থে 'ভালো' আর 'মহান' ছিল? বস্তুত অ্যামেরিকার এলিট শ্রেণির জন্য, অ্যামেরিকার বৃহৎ কর্পোরেশন, ব্যাংকগুলোর জন্য এ যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষেই একটি মহান যুদ্ধ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। এ যুদ্ধ ওয়াশিংটন আর তার প্রভাবক—তথা

---

[১] Uncle Sam is a common national personification of the federal government of the United States or the country in general.

[২] The Good War

পুঁজিবাদী বাণিজ্যের অগ্রনায়কদের ক্ষমতা আর প্রভাব আরও বৃদ্ধি করে। তবে, সাধারণ নাগরিকদের বৈষয়িক জীবনেও এই যুদ্ধ কিছু ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।



Figure 2: Uncle Sam.

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঠিক কখন শুরু হয়েছিল? অনেকেই বলতে পারেন, ১৯৩১-এ জাপানের ম্যাঞ্চুরিয়া[১] আক্রমণের সময়। কিংবা ১৯৩৫-এ ইতালির ইথিওপিয়া আক্রমণের মুহূর্তে। অথবা ১৯৩৬-এ স্প্যানিশ গৃহযুদ্ধের সময়ে; হয়তো-বা ১৯৩৭-এ জাপান ও চীনের মধ্যকার শুরু হওয়া লড়াইয়ের সময়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপট আরম্ভ হয়। যাইহোক, আমরা ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরে জার্মানির পোল্যান্ড আক্রমণ থেকে সেপ্টেম্বর ১৯৪৫-এ জাপানের আত্মসমর্পণ পর্যন্ত যুদ্ধের সময়কাল ধরেই সামনে এগুব ইনশাআল্লাহ। এ বিশ্বযুদ্ধে যেভাবে অনেকগুলো সাম্রাজ্য পরস্পর মুখোমুখি হয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যাপারটা সেরকম নয়। বরং যুদ্ধ শুরু করবার জন্য জার্মানির দায়ী হবার পেছনে প্রায় সবাইই একমত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপট অনুধাবন করতে চাইলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ববর্তী সময়ে ইউরোপের পরিস্থিতি বোঝা জরুরি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পরাজিত জার্মান কলোনির একটা ক্ষুদ্র অংশ, পশ্চিম আফ্রিকার ক্যামেরুন ও টোগো ব্রিটিশ এবং ফরাসিরা তাদের কলোনির সঙ্গে একীভূত করে নেয়। পূর্ব আফ্রিকার জার্মান কলোনি তানজানিয়া দখল করে পর্তুগীজরা। আর জার্মানির কলোনির ও উসমানী সাম্রাজ্যের বাদবাকি অধিকাংশ অংশটুকু 'ম্যান্ডেট'[২]-এ রূপান্তরিত করা হয়, যার দায়িত্ব

[১] Manchuria

[২] A League of Nations mandate was a legal status for certain territories transferred from the control of one country to another following World War I, or the legal instruments that contained the internationally

থাকে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের কাছে। ম্যান্ডেটগুলোকে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। বিজয়ীপক্ষ সিদ্ধান্ত নেয়—

- প্রথম শ্রেণিকে শীঘ্রই স্বাধীন করে দেয়া হবে,
- দ্বিতীয় শ্রেণির স্বাধীনতা পেতে সময় লাগতে পারে,
- তৃতীয় শ্রেণি আরও দীর্ঘ সময় ঔপনিবেশিকদের অধীনে থাকার আশঙ্কা করতে পারে।

এই দেশগুলো বিজয়ীপক্ষের অংশীদারদের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। নতুন শাসকদের দায়িত্ব দেয়া হয় নব্য সংগঠিত আন্তর্জাতিক সংগঠন লীগ অব নেশন্স[১]-এর বিশেষ কমিটির কাছে তাদের রিপোর্ট পেশ করার। যুদ্ধ শেষে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি আর উসমানী সাম্রাজ্য—দুটিই বিলুপ্ত করে দেয়া হয়। ফলে শান্তিচুক্তিতে জার্মানির গুরুত্বই বেশি ছিল। ঐ সময়ে অধিকাংশ জার্মানরা পোলিশ ও পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য স্ল্যাভিক নাগরিকদেরকে বর্ণ ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে নিম্নশ্রেণির মনে করত। জার্মানরা নিজেদেরকে ভাবতো সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রজাতির উচ্চমানের এক মানবগোষ্ঠী হিসেবে। শান্তিচুক্তিতে জার্মানির রাইনল্যান্ড[২] আলাদা করার পরিকল্পনা করলেও পরবর্তীকালে সেটি ও এর উত্তর দিকের ৫০ কিলোমিটার ভূমি জার্মানির অধীনেই রাখা হয়। তবে সেটিকে বেসামরিকায়ন করে রাখা হয়। একই সঙ্গে ব্রিটেন ও অ্যামেরিকা ফ্রান্সের সঙ্গে নিশ্চয়তার চুক্তি সাক্ষর করে যে, জার্মানি পুনরায় ফ্রান্স আক্রমণ করলে তারা ফ্রান্সকে সহায়তা করবে। কিন্তু পরবর্তীকালে মার্কিন সিনেট সেই নিশ্চয়তার চুক্তি অনুমোদন খারিজ করে দেয়। অতঃপর ব্রিটেনও একমাত্র নিশ্চয়তা দানকারী হিসেবে থাকতে অস্বীকার করে বসে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেও ফ্রান্স জার্মানদের দ্বারা দুইবার আক্রমণের শিকার হয়েছিল—১৮৭০ ও ১৯১৪। তাই প্যারিস শান্তিচুক্তির সময়টাতে ফ্রান্স ভবিষ্যতে জার্মান আক্রমণ নিয়ে বেশ চিন্তিত ছিল—ঠিক যেমনিভাবে নেপোলিয়নের আমলে ১৮১৪ খ্রিষ্টাব্দে ইউরোপের অনেক দেশই ফ্রান্সের আগ্রাসন নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিল।

জার্মানিই ১ম বিশ্বযুদ্ধে সর্বপ্রথম শহরে বোমা হামলার সঙ্গে বিশ্বকে পরিচিত করে। পরে যুদ্ধ শেষে ভার্সাই চুক্তির[৩] মাধ্যমে মিত্রপক্ষ জার্মানির এয়ারফোর্স গঠন নিষিদ্ধ করে। কিন্তু, ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দের পর সোভিয়েতের দেওয়া সুযোগ-ব্যবস্থা কাজে

---

agreed-upon terms for administering the territory on behalf of the League of Nations.

[১] League of Nations

[২] The Rhineland is the name used for a loosely defined area of Western Germany along the Rhine, chiefly its middle section.

[৩] Treaty of Versailles

লাগিয়ে জার্মানি ফাঁকফোকর বের করে এই বাধানিষেধ অতিক্রম করে। সাঁজোয়া যান এবং সাবমেরিন সংশ্লিষ্ট নিষেধাজ্ঞা ফাঁকি দেবার ক্ষেত্রেও তারা অন্য রাষ্ট্রের অভিমুখী হয়। ভার্সাই চুক্তি অনুসারে জার্মানির সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা এক লাখের মধ্যে রাখা আবশ্যক ছিল। এই শর্ত ফাঁকি দেয়া হয় সামরিকায়িত পুলিশ বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেবার মাধ্যমে। চুক্তি অনুসারে ক্ষতিপূরণ দেয়া এড়াতে জার্মান সরকার ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে মুদ্রাস্ফীতির মাধ্যমে তাদের অর্থের মূল্য ধ্বংস করে দেয়। ফলে, জার্মানি অল্পই ক্ষতিপূরণ দেয়, কিন্তু জার্মান সরকারের ওপর জনগণের অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়, যা পরবর্তীকালে ন্যাশনাল সোশালিস্ট শাসন-ব্যবস্থার প্রতি তাদের সমর্থনের পেছনে বিরাট ভূমিকা পালন করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে জার্মান কিছু রাজনৈতিক দাবি করেন, যুদ্ধে জার্মানি পরাজিত হয়নি। বরং সমাজতান্ত্রিক, কমিউনিস্ট আর ইহুদিরা জার্মানির পিঠে পেছন থেকে 'ছুরিকাঘাত' করেছে। আর এর সাথে ছিল অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র। আসন্ন পরবর্তী যুদ্ধে আগের ভুল 'শোধরাতে' ১৯৩৩-এর জানুয়ারিতে জার্মানির রাজনীতির মঞ্চে চ্যান্সেলর হিসেবে আগমন ঘটে অ্যাডলফ হিটলারের। হিটলার তার লেখনী আর বক্তব্যে 'ছুরিকাঘাত'-এর গল্পকে বারবার ফিরিয়ে আনেন। তিনি ইতালি ও সোভিয়েতকে একটি মাত্র রাজনৈতিক সংগঠন অনুমোদনের জন্য প্রশংসা করেন। হিটলার মনে করতেন, জার্মানির ভবিষ্যৎ শান্তি চুক্তিতে হারানো জমি উদ্ধারের লক্ষ্যে করা যুদ্ধে নয়, বরং বিশাল 'জীবন ধারণের জায়গা' জয় করার যুদ্ধের মধ্যে নিহিত। তাই ব্রিটেন, ফ্রান্সন এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য হিটলার ধীরে ধীরে প্রস্তুত হন। তার পরিকল্পনা অনুযায়ী, 'নিচুশ্রেণি'র সোভিয়েতদের পরাজিত করার মাধ্যমে সেই যুদ্ধে তেলের মতো কাঁচামালের যোগান নিশ্চিত হবে।

ক্ষমতায় আসার সাত বছর পূর্বে হিটলার তার বিখ্যাত বই *Mein Kamph*-এ প্রোপাগান্ডা সম্পর্কে দুটি চ্যাপ্টারে বিস্তারিত আলোচনা করেন। পরবর্তীকালে ক্ষমতাসীন হয়ে হিটলার যে প্রোপাগান্ডা-স্টেট প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার ব্লুপ্রিন্ট ছিল এই বইটি। এই বইটিতে তিনি প্রোপাগান্ডা সম্পর্কে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। যেমন :

- প্রোপাগান্ডা সর্বদাই বৃহত্তর জাতির বৃহত্তর জনগণকে উদ্দেশ্য করে পরিচালনা করতে হবে।
- প্রোপাগান্ডা অবশ্যই জনপ্রিয় রূপে পরিবেশন করতে হবে এবং এটির বুদ্ধিবৃত্তিক স্তর স্থির করতে হবে। যাদের উদ্দেশ্যে এটি পরিচালিত হচ্ছে, তাদের মধ্যে সর্বনিম্ন বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির মাথার ওপর দিয়েও এটি যেন না যায়।
- প্রোপাগান্ডা কখনোই নিরপেক্ষভাবে সত্যটাকে জানার চেষ্টা করবে না। এটি

শুধু সেটুকু সত্যই জানাবে, যেটুকু তার নিজের পক্ষে থাকে।

- সকল কার্যকরী প্রোপাগান্ডাকে অবশ্যই কিছু নগ্ন উপাদান দ্বারা আবদ্ধ থাকতে হবে এবং সেই উপাদানগুলো যতটা সম্ভব প্রচলিত পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে হবে।
- যতক্ষণ না সর্বশেষ ব্যক্তিটি চিন্তাটি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়, ততক্ষণ সেই স্লোগানটি নিরবচ্ছিন্নভাবে পুনরাবৃত্তি করতে হবে।
- প্রোপাগান্ডাকে কিছু সহজ রূপে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে, এবং সেগুলো বারবার উপস্থাপন করতে হবে।
- প্রোপাগান্ডাকে জনসাধারণের বুদ্ধিমত্তার স্তরে ধরে রাখতে হবে। আর এর মূল্য একমাত্র এর অর্জিত প্রকৃত সাফল্যের দ্বারাই পরিমাপ করতে হবে।
- সাধারণ জনতার বৃহত্তর অংশ কূটনৈতিক, আইনশাস্ত্রের প্রফেসর কিংবা নির্দিষ্ট বিষয়ে যৌক্তিক ফয়সালা করতে সক্ষম ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত নয়।

জানুয়ারি ১৯৩৩, হিটলার জার্মানির চ্যান্সেলর পদে আসীন হন। পরবর্তীকালে ১৩ মার্চ হিটলার প্রোপাগান্ডা মন্ত্রণালয়প্রতিষ্ঠা করেন। যার মন্ত্রী হিসেবে প্রোপাগান্ডার রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব হয় জোসেফ গোবলস। ১৯৩৫, জার্মানিতে নুরমবার্গ ল[১] ঘোষণা করা হয়। যে আইনের ফলে অনার্যদের[২] সিভিল সার্ভিসে যোগদান এবং আর্যদের সাথে বিয়ে নিষিদ্ধ করা হয়। নতুন রাইশ সিটিজেনশিপ ল[৩] কেবল জার্মান কিংবা জার্মানদের রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়দের জার্মানির নাগরিক হবার যোগ্য হিসেবে ঘোষণা করে (Berenbaum, 2020)। *Mein Kamph*-এ হিটলার তার এই বিশ্বাসের কথা ব্যক্ত করেন যে, জার্মান জাতি সর্বশ্রেষ্ঠ, যে জাতির রক্ত নীচু জাতিগুলোর রক্তের সাথে মিশে বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বিবর্তন-ভিত্তিক ভুয়া বিজ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে হিটলার সমগ্র জার্মানি জুড়ে ইহুদি জাতি বিরোধী প্রোপাগান্ডা চালানো শুরু করে।

নাৎসিদের ইহুদি জাতি বিরোধী প্রোপাগান্ডা সফল হবার অনেকগুলো কারণ ছিল। জার্মানি তো বটেই, সমগ্র ইউরোপ জুড়েই ইহুদিদের শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে তাদের কুকর্মের কারণে কুনজরে দেখা হতো, তাছাড়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানদের হারের দায়ও হিটলার ইহুদি জাতির ওপর চাপিয়ে দেয়। *Mein Kamph*-এ হিটলার দাবি করেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরুতেই যদি ১২,০০০-১৫,০০০ দুর্নীতিগ্রস্থ ইহুদিকে বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করে হত্যা করা হতো, তাহলে যুদ্ধে মিলিয়ন জার্মানের আত্মত্যাগ বৃথা যেত না (Hitler, 1926/1939)।

---

[১] Nuremberg Law

[২] হিটলারের নাৎসি দল জার্মানদের Aryan বা সর্বোত্তম বর্ণের জাতি এবং বাকি জাতিসমূহকে non Aryan বা নিম্ন বর্ণের জাতি হিসেবে প্রচার করত। উদাহরণ : ইহুদি।

[৩] Reich Citizenship Law

অক্টোবর ০৪, ১৯৩৩, রাইশ প্রেস চিফ Otto Dietrich নতুন এডিটরিয়াল কন্ট্রোল ল[১] ঘোষণা করেন। এই আইন অনুসারে আর্য ও আর্য জীবনসঙ্গী রয়েছে—এই শ্রেণির ব্যক্তিগণ ব্যতীত কেউ সংবাদপত্র ও সাময়িকীর সম্পাদক হতে পারবে না। পরবর্তীকালে উক্ত আইন অমান্যকারীদের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করা হয় (Gordon, 2017, p. 39)। ক্ষমতাসীন নাৎসি সরকার বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সাময়িকী ক্রয় করা আরম্ভ করে, যে ক্রয়-বিক্রয় প্রায়শই সর্বনিম্ন মূল্যের বিনিময়ে সম্পন্ন হতো (Herf, 2006)। সে বছরই হিটলার Max Amann-কে রাইশ প্রেস চ্যাম্বার[২]-এর প্রেসিডেন্ট এবং রাইশ প্রেস লিডার[৩] হিসেবে ঘোষণা করেন (Snyder, 1998)। তার অধীনেই নাৎসি সরকার ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে ১২০টি দৈনিক পত্রিকা থেকে ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে ১৫০০টি পাবলিশিং হাউস এবং ২০০০টি সংবাদপত্রের মালিক বনে যায়। ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে নাৎসি নিয়ন্ত্রিত সংবাদ-মাধ্যমগুলোর ৮২.৫% দখল নিজেদের আয়ত্বে নিয়ে আনে (Herf, 2006)।

প্রোপাগান্ডা মন্ত্রণালয়ের অধীনে কর্মরত ছিল প্রায় ১৫০০ কর্মী, এই মন্ত্রণালয়ের অগ্রনায়ক হিসেবে গোবলস নিজেকে নাৎসি প্রোপাগান্ডার পাবলিক ফেইস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তার বক্তব্য দানের স্বতন্ত্র পদ্ধতি তাকে প্রোপাগান্ডা লিজেন্ডে পরিণত করার পথে বড় ভূমিকা রাখে। ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে তার মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রোপাগান্ডা ডিপার্টমেন্ট, ডোমেস্টিক ও ফরেইন প্রেস, পিরিওডিকাল প্রেস, ফিল্ম, রেডিও, ফাইন আর্টস, থিয়েটার, মিউজিক—এই সবগুলো বিভাগ তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করত। ফলে, দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি সেক্টর নাৎসি প্রোপাগান্ডায় আক্ষরিক অর্থেই প্লাবিত হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে, জার্মানির প্রতিটি সংবাদমাধ্যম, বিনোদনমাধ্যমে নাৎসিরা নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। ইউরোপ জুড়ে নিজেদের আধিপত্য পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্নে মাতাল হয়েই হোক বা অন্যান্য কারণেই হোক, জার্মানরা হ্যামেলিনের বাশিওয়ালার মতো হিটলারকে অনুসরণ করে। ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারিতে নাৎসি পার্টির[৪] সদস্য সংখ্যা ছিল ৮৪৯,০০০। কয়েক বছর পর, ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে তাদের সদস্য সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৫.৩ মিলিয়নে। আর ১৯৪৫ সালে এ পার্টির সদস্য সংখ্যা ছিল ৮ মিলিয়নেরও অধিক (Herf, 2006)।

এ তো গেল জার্মানির কথা। কিন্তু যুদ্ধে অ্যামেরিকার যোগদানের আগে সেখানকার প্রেক্ষাপট কেমন ছিল? প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপ ও অ্যামেরিকায় কাঙ্ক্ষিত শান্তির দেখা মেলেনি। ত্রিশ এর দশকে অর্থনৈতিক ধ্বসের পর দ্যা গ্রেট ডিপ্রেশন-এর ফলে রাজনৈতিক, সামাজিক টানাপোড়েন, সাধারণ নাগরিক যুদ্ধ ও তার পরিণতির

[১] Editorial Control Law
[২] Reich Press Chamber
[৩] Reich Press Leader
[৪] NSDAP

ওপর আর বিশ্বাস রাখতে পারেনি। ঐ সময় যুদ্ধের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত কলেজ স্টুডেন্টরা দলে দলে ভবিষ্যতের যোদ্ধা[১] নামক বিদ্রূপাত্মক সংগঠনে যোগদান করে। ইউনিভার্সিটি অব মিনেসোটার এক ছাত্রনেতা ঘোষণা করেন :

> 'আর পরের বার যখন তারা আসবে এবং বলবে, আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের স্ত্রী আর প্রিয়তমাদের রক্ষা করতে ভিন্ন কিছু মানুষের ভূমিতে হানা দিতে হবে, যারা প্রত্যেকেই আমাদের মতোই নিষ্পাপ এবং তাদেরকেও বিপথে পরিচালিত করা হয়েছে, আমরা জানি তখন কী করতে হবে। আমরা আমাদের স্ত্রী আর প্রিয় মানুষদের সাথে অবস্থানের মাধ্যমে তাদের প্রতিহত করব। আমরা তাদের হত্যার আহ্বানে কর্ণপাত করব না' (Sevareid, 1946/1976)।

১৯৩৬ সালের এক বক্তব্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট বলেছিলেন, 'আমি যুদ্ধ ঘৃণা করি' (Sparrow, 2011, p. 65)। 'যুদ্ধের বাজারে শিল্প-কারখানা ও কৃষি ক্ষেত্রের উৎপাদন কিছু ব্যক্তির জন্য বিপুল সৌভাগ্য বয়ে আনে বটে; কিন্তু সমগ্র জাতির জন্য এটি বয়ে আনে বিপর্যয়... আমরা যদি মুনাফা কিংবা শান্তির মধ্যে যেকোনো একটি বেছে নেয়ার সিদ্ধান্তের মুখোমুখি হই, জাতি অবশ্যই ঘোষণা করবে—'আমরা শান্তি চাই' (Harper, 1994)।

মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে অ্যামেরিকান নাগরিকদের যুদ্ধে প্ররোচিত করার অভিযোগে ব্যাংকার ও অস্ত্রব্যবসায়ীদের মৃত্যুর সওদাগর[২] হিসেবে অভিহিত করেছিল। বিষয়টি মার্কিন সিনেট তদন্তও করে। তবে তারা প্রত্যক্ষ কোনো অপরাধ শনাক্ত করতে ব্যর্থ হয়। তবে কমিটির প্রচেষ্টায় অ্যামেরিকাকে যুদ্ধ থেকে দূরে রাখতে 'নিউট্রালিটি অ্যাক্ট'[৩] প্রণয়ন করে কংগ্রেস (anonymous, n.d.)। কমিটি তাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে পুরোপুরি সফল হয়নি। ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে যুদ্ধরত দেশের নিকট বিপজ্জনক নয় এমন পণ্য বিক্রয়ের অনুমোদন দেয় সরকার। যে পণ্য সরাসরি অর্থের বিনিময়ে হবে এবং ক্রেতার নিজস্ব জাহাজে বহন করে নিয়ে যেতে হবে (Olmsted, 2009)। ঐ সময়টাতে ইতালি ইথিওপিয়া আক্রমণ করে (১৯৩৫), হিটলারের জার্মানি ভার্সাই চুক্তি ভঙ্গ করে রাইনল্যান্ড দখল করে (১৯৩৬), জাপান আক্রমণ করে চীনকে (১৯৩৭)। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে শিকাগোর এক ভাষণে 'আগ্রাসী' রাষ্ট্রগুলোকে একঘরে করার আহ্বান জানান।

মার্চ ১৯৩৬, জার্মানি রাইনল্যান্ডকে পুনরায় সামরিকায়ন করে। একই মাসে হিটলার জার্মান বাহিনীকে অস্ট্রিয়ার দিকে মার্চ করার নির্দেশ দেয়। কিন্তু কোনো রাষ্ট্রই

[১] Veterans of Future Wars
[২] Merchants of Death
[৩] Neutrality Act

হিটলারকে আটকানোর উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসেনি। সহজেই অস্ট্রিয়া দখলের পর জার্মানিতে হিটলারের সমর্থন আরও বৃদ্ধি পায়। এর মাধ্যমে ইতালি, হাঙ্গেরি ও চেকোস্লোভাকিয়ার সাথে প্রত্যক্ষ বর্ডার লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে জার্মানি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সম্পদও অর্জন করে। ১৯৩৮-এর শরতে হিটলার চেকোস্লোভাকিয়া আক্রমণের পরিকল্পনা করছিল। এই আক্রমণের কারণ হিসেবে বলা হচ্ছিল, চেকোস্লোভাকিয়ার সীমানায় ৩ মিলিয়ন জার্মান রয়েছে, যারা তাদের 'প্রাপ্য' অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যদি সংখ্যালঘু এই জনগোষ্ঠীকে আপাতদৃষ্টিতে কোনো ভোগান্তির শিকার হতে দেখানো যায়, তাহলে চেকোস্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে জার্মানির আক্রমণ যথার্থ হিসেবে দেখানো যাবে। অন্যরা এতে নাক গলাবে না। জার্মানদের এই প্রোপাগান্ডা পরিকল্পনা বেশ ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়। কিন্তু শেষ সময়ে ব্রিটিশ সরকার চেকোস্লোভাকিয়ার নেতৃবৃন্দকে বলে জার্মান সংখ্যালঘুদের প্রচুর সুযোগ সুবিধা দেয়ার জন্য। আর হিটলার চেকোস্লোভাকিয়ার জার্মানদের বলে ওদের দাবি ক্রমাগত বৃদ্ধি করতে। জার্মানি যখন আক্রমণের দ্বারপ্রান্তে, তখন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চ্যাম্বারলিন[১] জার্মানি যাওয়ার পরিকল্পনা ঘোষণা করলেন। এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় হিটলারের নিকট ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে গ্রহণ করা ব্যতীত কোনো উপায় ছিল না। হিটলার চ্যাম্বারলিনের কাছে এমন কিছু দাবি করলেন, যেগুলো (তার পরিকল্পনা অনুযায়ী) মেনে নেয়া সম্ভব নয়। কিন্তু, হিটলারকে অবাক আর হতাশ করে চ্যাম্বারলিন ঐ দাবিগুলোর ব্যাপারে প্রাগের[২] সরকারের সম্মতি অর্জন করে ফেললেন এবং দ্বিতীয় বৈঠকে হিটলারকে সেটি জানালেন। এরপর হিটলার যখন আবারও আরও কিছু অবান্তর দাবি তুলে ধরলেন, তখন ব্রিটেন, ফ্রান্স—উভয় রাষ্ট্রের সরকারই বুঝতে পারে যে, জার্মানি যুদ্ধ করার জন্য অজুহাত খুঁজছে। উভয় রাষ্ট্রই তখন যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়া শুরু করল আর পরিষ্কার করে দিল, জার্মানি হামলা করলে তারাও যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। হিটলার তাকে সাহায্য করতে মুসোলিনির সাড়া চাইলেন, কিন্তু ইতালি তখনো ইথিওপিয়া আর স্প্যানিশ গৃহযুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত। তাই হিটলার তাৎক্ষণিক চেকোস্লোভাকিয়া আক্রমণের পরিকল্পনা বাতিল করে মিউনিখে তৃতীয় বৈঠকে বসতে রাজি হলেন (Weinberg, 2014)।

১৯৩৮ সালে মিউনিখে তৃতীয় বৈঠকে করা চুক্তি অনুযায়ী জার্মান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা জার্মানির অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া হয়। কিন্তু হিটলার তার চিন্তা-চেতনায় যুদ্ধ শুরুর সিদ্ধান্তে ছিলেন অটল। পরের বছরই, মার্চ ১৯৩৯-এ হিটলার চেকোস্লোভাকিয়া আক্রমণ করে বসলেন। ফলে পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রগুলো জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হলো। ফ্রান্স ও ব্রিটেনকে যুদ্ধে হস্তক্ষেপে নিরুৎসাহিত করতে ইতালি

[১] Neville Chamberlain
[২] চেকোস্লোভাকিয়ার রাজধানী

ও জাপানের সঙ্গে জার্মানির মিত্রতার ঘোষণা সে সময় প্রয়োজনীয় মনে হচ্ছিল। কিন্তু, জাপান তখন বিভিন্ন ফ্রন্টে যুদ্ধে ব্যস্ত থাকায় মিত্র হতে ছিল অনিচ্ছুক। ফলে বিকল্প হিসেবে সোভিয়েতের সঙ্গে জার্মানি মিত্রতা স্থাপন করে। অতঃপর ১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯, জার্মানি পোল্যান্ডে আক্রমণ করে। পরে সোভিয়েতও পোল্যান্ড আক্রমণে যোগ দেয়। ফ্রান্স ও ব্রিটেন জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ধীরে ধীরে ইউরোপ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে এক ভয়ানক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ।

এদিকে বিশ্বযুদ্ধ শুরুর পর সাম্রাজ্যবাদী জাপান ঘোষণা করল, এশিয়ার ভূমি এশিয়ানদের জন্য। এই ঘোষণার ফলে ইন্দোচায়না, ব্রিটিশ মালয়, ডাচ ইস্ট ইন্ডিজ-এর মতো ইউরোপিয়ান কলোনিগুলো জাপানের হামলার আশঙ্কায় অস্তিত্ব-সংকটে পড়ে যায়।

যুদ্ধে মার্কিন যুদ্ধবিরোধীদের[১] লক্ষ্য ছিল, যুদ্ধে না জড়িয়ে বরং অ্যামেরিকা বিশ্বের যেকোনো রাষ্ট্রে ব্যবসার সুযোগ অক্ষুণ্ণ রাখুক (Hoff, 1999)। অন্যদিকে যুদ্ধপন্থীরা[২] চাইল যুদ্ধে যোগদান করতে। যুদ্ধপন্থীদের নিউট্রালিটি অ্যাক্ট পুনর্বিবেচনা করার প্রাথমিক প্রচেষ্টা যুদ্ধবিরোধীরা ব্যর্থ করে দেয়। কিন্তু নভেম্বর, ১৯৩৯-এ অ্যামেরিকার অস্ত্র বিক্রয়ে নিষেধাজ্ঞা বাতিল করা হয়, ফলে ব্রিটেন ও ফ্রান্স অ্যামেরিকান অস্ত্র কেনার বৈধতা লাভ করে। কিন্তু, প্রথমে জার্মানির কাছে ফ্রান্সের পতনের পর ব্রিটিশরাও যখন যুদ্ধে হিমশিম খাচ্ছিল, তখন মার্কিন যুদ্ধপন্থীরা যুদ্ধে অ্যামেরিকার সরাসরি অংশগ্রহণের আহ্বান জানাতে শুরু করল। যুদ্ধরত রাষ্ট্রসমূহের কাছে অস্ত্র ও যুদ্ধোপকরণ সরবরাহ খুব সহজ সিদ্ধান্ত ছিল না। কিন্তু, মার্কিন কংগ্রেস যুদ্ধ-বাণিজ্যের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে। টাইম, লাইফ এবং ফরচুনস-এর প্রকাশক হেনরি বলেন, ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে অ্যামেরিকা বৈশ্বিক নেতৃত্ব দখলের সুযোগ হাতে পেয়েও তালগোল পাকিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে এসে অ্যামেরিকাকে অবশ্যই 'অ্যামেরিকান শতাব্দী'[৩] সৃষ্টি করার লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। অ্যামেরিকান শতাব্দী বলতে হেনরি যা বলতে চেয়েছিলেন সেটি হলো, অ্যামেরিকাকে অবশ্যই এর মুক্ত বাজার সিস্টেম, মানবতাবাদের মতো মতাদর্শগুলো পৃথিবীজুড়ে ছড়িয়ে দিতে হবে (Herring, 2008)।

১৯৪০-তে তৃতীয় বারের মতো প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবার পূর্বে নির্বাচনী প্রচারণায় রুজভেল্ট প্রতিশ্রুতি দেন, 'আপনাদের সন্তানদেরকে বহির্বিশ্বের আর কোনো যুদ্ধে পাঠানো হবে না' (Bourke, 2001, p. 19)। যুদ্ধের শুরুর সময়টাতে, অর্থাৎ ১৯৩৯ থেকে ১৯৪১ এর শুরুর সময়টা পর্যন্ত অ্যামেরিকা ব্রিটেনের নিকট যুদ্ধাস্ত্র ও অন্যান্য

[১] isolationist
[২] Internationalist
[৩] The 'American Century'

কাঁচামাল সরবরাহ করে। হিটলারের ইউরোপ জয়ের যুদ্ধাভিযানে ব্রিটেন আর ফ্রান্স যখন জার্মানির বিপক্ষে যুদ্ধ করছিল, তখনো অ্যামেরিকা যুদ্ধে সক্রিয় হয়নি।

মার্চ ১৯৪১, ইউএস কংগ্রেস ল্যান্ড-লিজ অ্যাক্ট[১] অনুমোদন করে, যার মাধ্যমে অ্যামেরিকা যুদ্ধাস্ত্রের বিনিময়ে কানাডা, দক্ষিণ অ্যামেরিকাতে ব্রিটিশ বেইসগুলো লীজ নেয়ার পদ্ধতি চালু করে। আগস্ট ১৯৪১, রুজভেল্ট এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ইউন্সটন চার্চিল অ্যাংলো-অ্যামেরিকান যুদ্ধের লক্ষ্য হিসেবে আটলান্টিক চার্টার[২] প্রণয়ন করেন। যেটির মূলনীতি ছিল : যুদ্ধ-পরবর্তী শাসন-ব্যবস্থাতে বৈশ্বিক জাতিসমূহের জাতিগত আত্মনিয়ন্ত্রণ[৩], ব্যবসা আর কাঁচামালে সমানাধিকার, সমুদ্রসমূহে প্রবেশের স্বাধীনতা আর অস্ত্র নিরোধকে[৪] সম্মান করা হবে। তারা বলেন, ব্রিটেন ও অ্যামেরিকা নতুন করে আর কোনো অঞ্চল দখল করতে চায় না এবং তারা নতুন একটি আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী প্রতিষ্ঠান গঠন করতে চায় (Brewer, 2009)।

রুজভেল্ট অ্যামেরিকার জনগণের কাছে আটলান্টিক চার্টারকে চারটি বিষয়ে স্বাধীনতার রূপে পরিবেশন করেন : বাক্‌স্বাধীনতা, ধর্মের স্বাধীনতা, অভাব ও ভয় থেকে মুক্তি[৫]। ১৯৪১ এর জানুয়ারির ৬ তারিখেও রুজভেল্ট কংগ্রেসে এই চারটি বিষয়কে ব্রিটেনকে সহায়তা করার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন। রুজভেল্টের ভাষায়, অ্যামেরিকা মানুষের সার্বজনীন অধিকারের লক্ষ্যে কাজ করছে। তার এই পদক্ষেপে জাতিসংঘ ঘোষিত 'সার্বজনীন মানবাধিকার নীতি' মৌলিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে (anonymous, n.d.)। পরবর্তীকালে চার্চিল বলেন যে, রুজভেল্ট তার প্রাইভেট সার্কেলের নিকট যুদ্ধে যোগদানের ব্যাপারে কংগ্রেসের বাধার কথা উল্লেখ করে হতাশা প্রকাশ করে বলেন। তিনি যুদ্ধের অনুমোদনের জন্য কংগ্রেসের কাছে আবেদন করার বদলে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করবেন। তিনি শুধু একটি 'ঘটনা'র জন্য অপেক্ষা করছেন, যা তাকে আক্রমণ চালানোর বৈধতা দেবে (Dallek, 1979/1995)।

পরের মাসেই রুজভেল্ট তার কাঙ্ক্ষিত ঘটনার সংবাদ পেয়ে যান। তিনি ইউএস ডেস্ট্রয়ার Greer ও জার্মান ইউ-বোটের একটি দ্বন্দ্বকে কাজে লাগান। রুজভেল্ট

---

[১] Land-lease Act
[২] Atlantic Charter
[৩] Self-determination বা 'জাতিগত আত্মনিয়ন্ত্রণ' বলতে নির্দিষ্ট কোনো সম্প্রদায়ের—যারা নিজেদের জাতীয়তা সম্পর্কে সচেতন—নিজস্ব রাষ্ট্রগঠন ও নিজেদের সরকার গঠনের অধিকারকে বোঝানো হয়।
[৪] Disarmament
[৫] Freedom of speech, freedom of worship, freedom from want and freedom from fear

নৌবাহিনীকে আদেশ দেন, যেকোনো জার্মান বোটকে দেখামাত্র আক্রমণ করতে। যদিও তিনি রেডিওতে ঘটনাটিকে জার্মানদের ইচ্ছাকৃত আক্রমণ হিসেবে চিত্রায়িত করেন। কিন্তু তিনি তার বক্তব্যে এটি উল্লেখ করতে 'সফলতার' সঙ্গে 'ভুলে' যান যে, মার্কিন যুদ্ধজাহাজটি জার্মান বোটকে অনুসরণ করছিল এবং জার্মান বোটের পজিশন ব্রিটিশ বাহিনীকে রেডিওর মাধ্যমে জানাচ্ছিল। যার প্রতিউত্তরে জার্মান ইউ-বোট মার্কিন জাহাজকে আক্রমণ করে (Alterman, 2004; Mawdsley, 2011)। পরবর্তীকালে আরও দুটি অ্যামেরিকান জাহাজে ইউ-বোট আক্রমণ করে, এর মধ্যে একটি ১৯৪১-এর অক্টোবরের এর ৩১ তারিখে ১১৫ জন মার্কিন নাগরিকসহ ডুবে যায়। কিন্তু, এর পরও অ্যামেরিকার ২৫% এর-ও কম নাগরিক যুদ্ধে যোগদানের পক্ষে মত দেয়। অতঃপর কংগ্রেসে তীব্র বিতর্কের পর[১] নভেম্বরের এর ১৭ তারিখ নিউট্রালিটি আইন বাতিল করা হয়। এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমেই অ্যামেরিকা বেশ জোরেশোরে মিত্রপক্ষের সমর্থক হিসেবে যুদ্ধে আবির্ভূত হয়।

১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে জার্মানি তার মিত্র সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর আক্রমণ করে বসে। ফলে যুদ্ধের পুরো হিসেব-নিকেশ মুহূর্তেই বদলে যায়। পরাজয়ের মুখে পড়তে পড়তেও সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন প্রতিরোধে সফল হয়, তখন যুদ্ধ জয়ের সম্ভাবনার পাল্লা জার্মানির বিপরীতে হেলে যায়। মাঝে ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটেন যখন জার্মানির বিপক্ষে কার্যত একাই লড়াই করছিল, তখন জাপান এশিয়ায় ইউরোপীয় কলোনিগুলো দখলের দিকে মনোনিবেশ করে। ঐ সময়ে জাপান যদি মালয়ের রাবার, টিন ও তেলের সাপ্লাই বন্ধ করে দিত, তাহলে ব্রিটেনের জার্মান আক্রমণ রহিত করার ক্ষমতা-ই ধ্বংস হয়ে যেত (Rotter, 2010)। তাই সাম্রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেপ্টেম্বর, ১৯৪০-এ জাপান যখন দক্ষিণে ফ্রেঞ্চ ইন্দোচায়নার দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে, সেই পরিকল্পনার জবাবে অ্যামেরিকা জাপানের ওপর বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে দেয় (Bosworth & Maiolo, 2015, p. 271)। জাপান অ্যামেরিকার সঙ্গে সমঝোতা করার চেষ্টা করে। তারা অ্যামেরিকার কাছে প্রস্তাব পাঠায়, তাদের এশিয়ার মূল ভূখণ্ড দখলের বিষয়ে অ্যামেরিকা যেন অনুমোদন প্রদান করে। বিপরীতে অ্যামেরিকা জাপানকে চীন থেকে সরে আসার কথা বলে, ফলে কূটনৈতিক সমঝোতার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। পরবর্তীকালে জাপান তার লক্ষ্য অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখলে অ্যামেরিকা জাপানের ওপর সব ধরনের পণ্য সরবরাহে নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করে। এর জবাবে ডিসেম্বর ৫, ১৯৪১-এ জাপান অ্যামেরিকার পার্ল হারবার[২] এ হামলা চালায়। ডিসেম্বর ৮, রুজভেল্ট তার কাঙ্ক্ষিত যুদ্ধ ঘোষণা করার কাঙ্ক্ষিত অনুমোদন লাভ করেন। ডিসেম্বর ১১, জাপানকে মিত্র হিসেবে পেতে

[১] ৫০ জন সিনেটর পক্ষে এবং ৩৭ জন বিপক্ষে মত প্রকাশ করেন।
[২] Pearl Harbor হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে অবস্থিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি নৌ ও বিমান ঘাঁটির নাম।

এবং যুদ্ধে ক্রমবর্ধমান পরাজয়ের সম্ভাবনা হ্রাস করতে হিটলার অ্যামেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে (Weinberg, 1994)।

যুদ্ধে রুজভেল্টের প্রধান টার্গেট জাপান ছিল না, ছিল জার্মানি। কিন্তু পার্ল হারবারে আক্রমণ করে জাপান। ডিসেম্বর ০৮, জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেও মার্কিন প্রশাসন তাদের পাবলিক বিবৃতিতে দাবি করে, নিজের বৈশ্বিক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এই আক্রমণের মাস্টারমাইন্ড ছিলেন হিটলার, তার উসকানিতেই টোকিও এই হামলা চালায়। ডিসেম্বর ০৯, রুজভেল্টের তার ফায়ারসাইড চ্যাট-এ[১] ও এই ব্যাখ্যার ওপরই জোর দেন (Roosevelt, n.d.)। আর হিটলারের যুদ্ধ ঘোষণা রুজভেল্টের এই সমস্যা দূর করে দেয় (Frank & Osgood, 2010)।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতালব্ধ অ্যামেরিকান জনগণ পরবর্তীকালে ইউরোপীয় 'গৃহযুদ্ধ' থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে রাখার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে। তাই, যুদ্ধ শুরুর পর হিটলার যখন ইউরোপ জুড়ে ধ্বংসলীলা পরিচালনা করছিল, তখনো মার্কিন নাগরিকদের যুদ্ধে যোগদানের কোনো উদ্দেশ্যই ছিল না। ফলে, যুদ্ধে জড়াতে ইচ্ছুক মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট পার্ল হারবারের ঘটনা ঘটার আগে বছর দুয়েক মার্কিন জনমত নিয়ে প্রবল দুশ্চিন্তায় ছিলেন। এই বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাইকৃত এবং ঐতিহাসিকদের নিকট প্রমাণিত (Osgood & Frank, 2010)। অফিস অব ওয়ার ইনফরমেশন পরবর্তীকালে জনগণের মতামত যাচাই করে দেখেছিল, পার্ল হারবারে জাপানের আক্রমণের পর তারা কোনো আদর্শের জন্য নয়, বরং আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই যুদ্ধে যোগদান করে।

যুদ্ধের শুরু থেকেই প্রোপাগান্ডিস্টরা একে গণতন্ত্র আর স্বৈরতন্ত্রের চূড়ান্ত লড়াই হিসেবে ঘোষণা করে। 'সভ্যতা বনাম বর্বরতা'র রূপ দান করে। 'উন্নত জীবন এবং নিরাপদ পৃথিবী' হবে যুদ্ধজয়ের পুরস্কার—এই স্লোগান দিয়ে তারা যুদ্ধের প্রচারণা চালায়। যুদ্ধকালীন সময়ে তারা সঠিক তথ্যের সঙ্গে উৎসাহব্যঞ্জক আর ভরসা জাগানো সাংস্কৃতিক বিশ্বাস' মিশিয়ে প্রোপাগান্ডা ছড়ায়। বাস্তবতা আর প্রত্যাশিত বাস্তবতা—এ দুয়ের মধ্যকার ব্যবধান তারা মুছে ফেলে। ছোট্ট মফস্বল শহরের প্রশান্তিময় পরিবেশ আর চিরাচরিত পারিবারিক জীবন-এর চিত্র ব্যবহার করে তারা প্রোপাগান্ডা পোস্টার তৈরি করত। যুদ্ধ শেষে প্রত্যেকে ঘরে ফিরে আসবে, সকলে উন্নত জীবনযাপন করবে—এই স্বপ্ন দেখিয়ে অ্যামেরিকা সাধারণ নাগরিকদের কাছে যুদ্ধ বিক্রি করে (Brewer, 2009)।

---

[১] Fireside chat

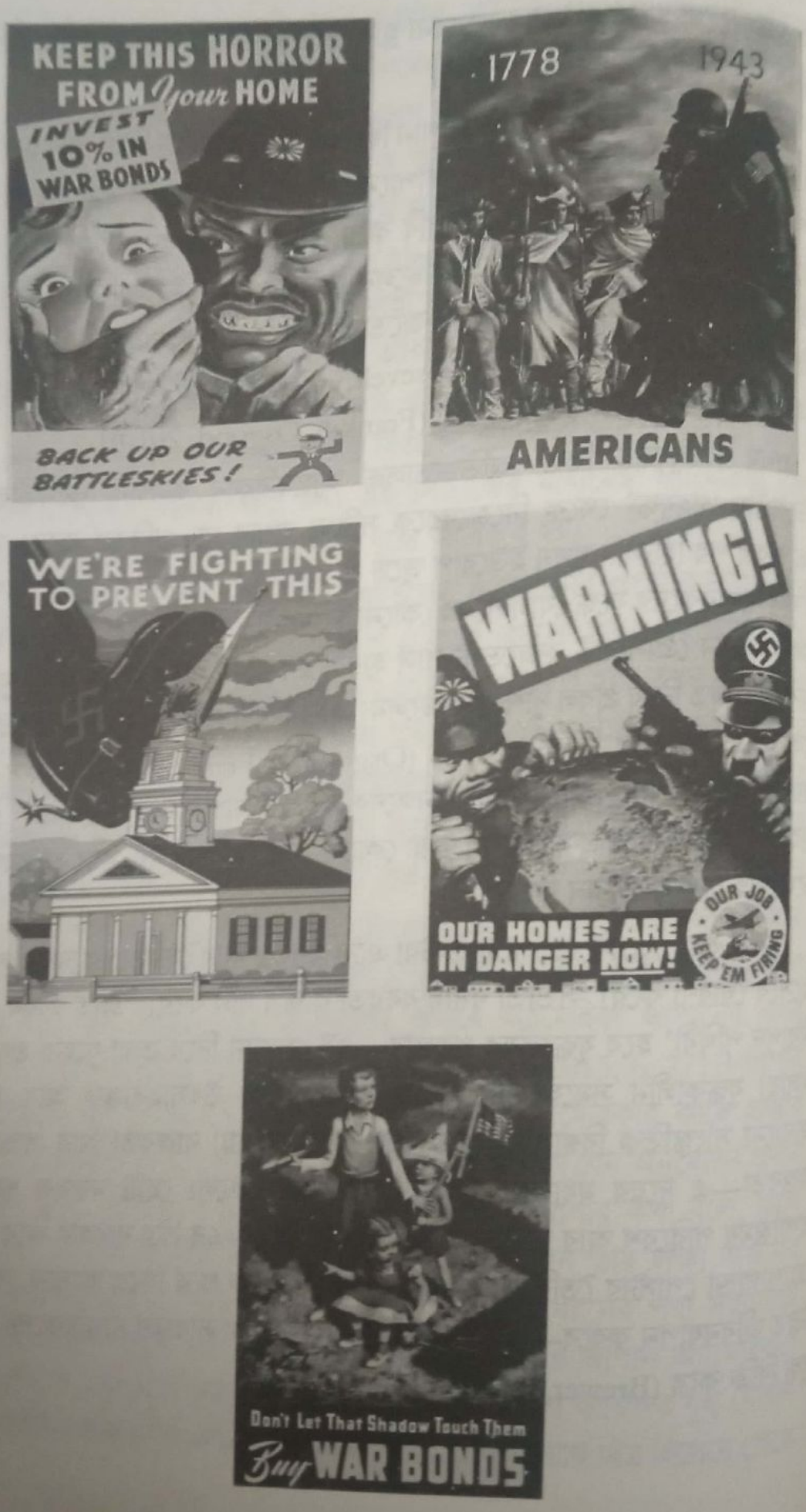


Figure 3: WW-II Propaganda Posters.

১৯৪২, রুজভেল্ট যুদ্ধের প্রচারণা করতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মতোই অফিস অব ওয়ার ইনফরমেশন[১] বা OWI প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংগঠনটি এর আদর্শ সংগঠন সিপিআই-এর মতো ফোর মিনিট ম্যান-এর অনুকরণে ভিক্টরি স্পিকারস প্রোগ্রাম-এর[২] ব্যবস্থা করে। কিন্তু অচিরেই তারা অনুধাবন করে, রেডিও-চলচ্চিত্রের যুগ এই আইডিয়াকে ওল্ড ফ্যাশনে পরিণত করে দিয়েছে। তৎকালীন সময়ে অ্যামেরিকার ৯০% নাগরিক দৈনিক গড়ে চার ঘণ্টা রেডিও শুনত। রেডিওর জনপ্রিয়তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এটি মিডিয়া কোম্পানিগুলোর সঙ্গে মিলে বিভিন্ন শো, কমেডি, সোপ অপেরা, খেলার সংবাদের সঙ্গে যুদ্ধের সংবাদ একীভূত করে প্রচার করতে শুরু করে। OWI-এর সবচেয়ে জনপ্রিয় রেডিও প্রোপাগান্ডা সিরিজ 'ইউ ক্যান্ট ডু বিজনেস উইদ হিটলার'[৩] এর উদ্দেশ্য ছিল অনেকগুলো বানোয়াট তথ্যকে বাস্তব হিসেবে উপস্থাপন করা। যেমন- নাৎসি সরকারের লক্ষ্য পারিবারিক জীবনব্যবস্থা ধ্বংস, হিটলারের বাহিনী পরিপূর্ণ করতে নারীদের সন্তান জন্মদানে বাধ্য করা। তারপর সেসব বাচ্চাদের নাৎসি মতবাদে বিশ্বাসী করে গড়ে তোলা। এসব বিষয় প্রচার করে নাৎসি সরকারের বিরুদ্ধে এক 'পবিত্র ঘৃণা' সৃষ্টি করা। বাস্তবিক পক্ষে, রেডিও শ্রোতারা OWI-এর শোগুলোকে বাস্তববাদী হিসেবেই গ্রহণ করে। ১৯৪৪ এর বসন্তে-ও ৬৫% অ্যামেরিকান বিশ্বাস করত যে, জার্মান জনগণ তাদের নেতৃবৃন্দের হাত থেকে মুক্তি চায় (Horten, 2002)। অপরদিকে হলিউড পরিচালকরা অ্যামেরিকা ও সোভিয়েত—দুই মিত্রের মধ্যকার সম্পর্ককে আবেগ মিশিয়ে চলচ্চিত্রে দেখানো শুরু করল। সে-সকল চলচ্চিত্রে তারা রাশিয়ান কৃষকদের উপকারী, মহৎ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে দেখাতে লাগল, কিন্তু সেসব চলচ্চিত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নে স্ট্যালিনের নির্মমতা তারা বেমালুম চেপে গেল (Koppes & Black, 1987)।

মে ৭, ১৯৪৫, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মতোই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও জার্মানি ও তার মিত্রশক্তিরা পরাজিত হয় এবং আত্মসমর্পণ করে। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে গ্রেফতারের হাত থেকে রক্ষা পেতে হিটলার আত্মহত্যা করে। জার্মানিকে অ্যামেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়ন দুই ভাগে বিভক্ত করে নেয়। আর লীগ অব নেশনস-এর আদলে পরবর্তীকালে গঠিত হয় জাতিসংঘ[৪]।

যুদ্ধ শেষে নব্য প্রতিষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড ও ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের ব্যাপারে বলতে গিয়ে মার্কিন প্রশাসনের মুখপাত্র বলেন, এই সংগঠনগুলোর একমাত্র উদ্দেশ্য হলো—অর্থনৈতিক লড়াইয়ের সমাপ্তি, পণ্য লেনদেনে মুক্ত, ন্যায্য ও স্থিতিশীল সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করা। এক্ষেত্রে সর্ববৃহৎ আর্থিক অবদান রাখা রাষ্ট্র

[১] Office of War Information (OWI)
[২] Victory Speakers Program
[৩] You Can't Do Business with Hitler
[৪] United Nations

হিসেবে অ্যামেরিকা এই আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলো নিয়ন্ত্রণ করবে।

মে, ১৯৪৫, সান ফ্রান্সিসকো কনফারেন্স-এ আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিরা জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা করে। জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে করা সমঝোতার ভিত্তিতে ব্রিটিশ ও ফ্রান্সের সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ থাকে। অ্যামেরিকা জাপানের কাছ থেকে যেসব দ্বীপ দখল করেছিল সেগুলোর দখল অ্যামেরিকার কাছেই থেকে যায়। জাতিসংঘের মুখোশের আড়ালে বিজয়ীপক্ষ ফিলিস্তিনের বাসিন্দাদের জমি বেদখল করে। জোরপূর্বক ইসরায়েল নামক বায়বীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করে, যেটি ছিল অ্যামেরিকার ঘোষিত 'জাতিগত আত্মনিয়ন্ত্রণ'-এর সরাসরি লঙ্ঘন। অথচ অ্যামেরিকা সেখানে ইসরায়েল প্রতিষ্ঠায় প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল। *নিউ ইয়র্ক পোস্ট* অ্যামেরিকার ঘোষিত সব আদর্শ আর তাদের স্বার্থের এ দ্বন্দ্ব ফুটিয়ে তোলে তাদের হেডলাইন 'অ্যামেরিকার অবস্থান ঔপনিবেশিক স্বাধিনতার জন্য হুমকিস্বরূপ' এর মাধ্যমে (Brewer, 2009)।

হিরোশিমাতে আর্তনাদ

আগস্ট ৬, ১৯৪৫, জাপানের হিরোশিমায় আক্রমণ পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ঘোষণা করেন, হিরোশিমায় বোমা হামলা করা হয়েছে। হিরোশিমাকে তিনি একটি মিলিটারি বেইস হিসেবে আখ্যায়িত করেন। এর তিন দিন পর নাগাসাকিতে আরও একটি পারমাণবিক বোমা হামলা করা হয়। পরপর এই দুটি বোমা হামলায় ১৮০,০০০ জাপানী হত্যার শিকার হয়। এরা ছাড়াও অ্যাটমিক রেডিয়েশন পয়জনে আরও হাজার হাজার নাগরিক ধুঁকে ধুঁকে মরছেন। তবে এ তথ্যকে মার্কিন সেনারা জাপানের প্রোপাগান্ডা হিসেবে আখ্যায়িত করেছিল।

বোমা হামলার কিছুকাল পরেই এক Gallup পোলে দেখা যায়, ৮৫% অ্যামেরিকান জাপানে পারমাণবিক বোমা হামলা সমর্থন করেন। এর বহু বছর পর, ১৯৯১ সালের একটি জরিপের[১] ফলাফলে দেখা যায়, ৬৩% অ্যামেরিকান তখনো পারমাণবিক হামলাকে সমর্থন করেন। এর চেয়েও বিস্ময়কর তথ্য হলো, খোদ ২৯% জাপানীও বোমা হামলাকে বৈধ বলে মনে করেন![২] তবে ২০১৫ সালে জাপানীদের বৈধতা দানের হার ১৪%-এ নেমে এসেছে (Stokes, 2015)। জাপানে পারমাণবিক বোমা ব্যবহারের পক্ষে অ্যামেরিকানদের অধিকাংশ ব্যক্তির মত প্রকাশ করার অনেকগুলো কারণ থাকতে পারে। এর মধ্যে একটি কারণ হয়তো-বা প্রচলিত একটি মিথের প্রভাব। এই বিশ্বাস যে, ট্রুম্যান-এর হাতে হয়তো শুধু দুটি অপশন ছিল,

[১] Detroit Free Press Survey

[২] আমাদের দেশেও অনেকেই মনে করেন, ব্রিটিশরা এসে আমাদের 'সভ্য' বানিয়েছে। ঔপনিবেশিক শিক্ষার প্রোডাক্ট সব দেশেই বিদ্যমান।

একদিকে পারমাণবিক বোমা, অন্যদিকে জাপানে চূড়ান্ত হামলার নির্দেশ। অনেক ইতিহাসবিদও এই মতবাদ প্রচার করেন। প্রকৃতপক্ষে, জনপ্রিয় এই মতামতটি আসলে একটি মিথ ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ—

- পারমাণবিক হামলা এবং চূড়ান্ত আক্রমণ ছাড়াও অন্য পথ খোলা ছিল।
- ট্রুম্যান ও তার উপদেষ্টামণ্ডলী বিশ্বাস করত যে, জাপান এতটাই দুর্বল যে, চূড়ান্ত আক্রমণ আবশ্যিক ছিল না।
- পরিস্থিতি যদি খুব বাজেও হয়ে যেত, তবুও ১৯৪৫-এর গ্রীষ্মে সামরিক পরিকল্পনাকারীরা যে পরিমাণ অ্যামেরিকান সৈন্যের হতাহত হবার আশঙ্কা করেছিল, সেটি পরবর্তী সময় ট্রুম্যান আর তার উপদেষ্টাদের দাবি করা লক্ষ লক্ষ সৈন্য অপেক্ষা অনেক কম (Walker, 1997/2004)।

এপ্রিল ১২, ১৯৪৫, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের আকস্মিক মৃত্যুর দিনই ভাইস প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। তখন পর্যন্ত তিনি পারমাণবিক বোমা তৈরির ম্যানহাটন প্রজেক্ট[১] সম্পর্কে বিস্তারিত কিছুই জানতেন না। তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন রুজভেল্ট তাকে এ বিষয়ে তেমন কিছু জানাননি। ট্রুম্যান যখন ন্যাশনাল ডিফেন্স প্রোগ্রাম তদন্ত করার লক্ষ্যে গঠিত স্পেশাল কমিটিতে চেয়ারম্যান ছিলেন, তখন তিনি জানতে পারেন, নতুন একটি মারণাস্ত্র আবিষ্কার করতে অত্যন্ত গোপন এক প্রকল্প চলমান। কিন্তু কোনো বিশদ বর্ণনা তাকে দেয়া হয়নি। প্রেসিডেন্ট হবার পর সেক্রেটারি অব ওয়ার স্টিমসন সবচেয়ে জরুরি একটি ব্যাপারে তাকে বুঝিয়ে দেয়ার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করলেন। অতঃপর, তৎকালীন সিনেটর বাইর্ন্স[২] প্রেসিডেন্টকে এ ব্যাপারে ব্রিফ করলেন। তিনি জানালেন, প্রকৃতপক্ষে একটি পারমাণবিক বোমা বানানোর কাজ চলছে। এটা এতটাই শক্তিশালী হবে যে, সম্ভবত একটা আস্ত শহরকে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা যাবে (Truman, 1955)।

কিছুদিন পর স্টিমসনের উচ্চ পর্যায়ের উপদেষ্টাদের নিয়ে গঠিত একটি স্পেশাল কমিটিকে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান অনুমোদন প্রদান করেন। যে কমিটির কাজ হবে নতুন এই মারণাস্ত্রের প্রভাব পর্যালোচনা করা। মে ০৯ থেকে জুন ০১, এই সময়ের মধ্যে আয়োজিত পাঁচটি বৈঠকে এই পরিষদের সদস্যরা অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। কিন্তু, জাপানে এই বোমা ব্যবহার হবে কি হবে না, সে বিষয়ে তারা কোনো আলোচনাই করেননি (Walker, 1997/2004)।

কমিটির সদস্যদের হাতে খুবই সীমিত সময় অবশিষ্ট ছিল। তারা ঐকমত্যে

---

[১] Manhattan Project
[২] James F. Byrnes

পৌঁছালেন যে, এটমিক বোমা কোনো পূর্ব সতর্কবার্তা ছাড়াই ফেলা হবে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট কোনেন্ট[১] পরামর্শ প্রদান করলেন, সবচেয়ে ভালো লক্ষ্যবস্তু হবে কোনো যুদ্ধের উৎপাদনশীল এলাকা, যেখানে প্রচুর কর্মী রয়েছে এবং যার চারপাশ যুদ্ধকর্মীদের বাড়ি দিয়ে ঘেরা। স্টিমসন এই পরামর্শটি গ্রহণ করলেন। অর্থাৎ তারা প্রত্যেকেই এ বিষয়ে জ্ঞাত ছিল যে, প্রচুর বেসামরিক নারী ও শিশুরাও এ হামলার শিকার হবে (Cirincione, 2007; Maddox, 1995)।

তবে, কমিটিটি সবচেয়ে বেশি সময় ব্যয় করে যুদ্ধ-পরবর্তী আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এই বোমার প্রভাব বিশ্লেষণে। এই আলোচনার ফোকাস ছিল—সোভিয়েতের সাথে অ্যামেরিকার সম্পর্কের স্বরূপ নির্ধারণ। অ্যামেরিকা কি সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে জটিল সম্পর্ক সহজ করবে, নাকি বোমাকে হুমকি হিসেবে ব্যবহার করে অ্যামেরিকার স্বার্থ এগিয়ে নিয়ে যাবে। কমিটিতে প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি বাইর্ন্স এই সমস্যার সমাধান হিসেবে বলেন, 'সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত কাজ হবে—আমরা যেন অগ্রগামী থাকি, সেটি নিশ্চিত করতে রিসার্চ ও প্রোডাকশনের কাজকে যত দ্রুত সম্ভব এগিয়ে নিয়ে যাওয়া' এবং স্ট্যালিনকে এ বিষয়ে কিছু না জানানো (Cirincione, 2007)। এটমিক বোমার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কূটনৈতিক স্বার্থ আদায় করে নেয়ার ব্যাপারে ট্রুম্যান বাইর্ন্সের সঙ্গে একমত প্রকাশ করেন।

যুদ্ধের সময়টাতে অ্যামেরিকানরা জাপানিদেরকে বেশি বর্বর হিসেবে জানত। মার্কিন জনগণ জাপানীদের থেকে নিচু প্রজাতি হিসেবে দেখত; তারা তাদেরকে ইঁদুর, সরীসৃপ কিংবা বনমানুষ হিসেবে চিত্রায়িত করত। একই অবস্থা ছিল জাপানেও। জাপানিরাও অ্যামেরিকানদের সম্পর্কে একই প্রকার ধারণা পোষণ করত। যাই হোক, তীব্র রক্তক্ষয়ী এই যুদ্ধে দ্বীপাঞ্চলের যুদ্ধ ক্যাম্পেইন-এর[২] শেষ দিকে মার্কিন সফলতাই জাপান সাম্রাজ্যের অন্ধকার ভবিষ্যতের সম্ভাব্যতা পূর্ণ করে দেয়। পরবর্তীকালে অ্যামেরিকান সৈন্যবাহিনী জাপানি দ্বীপগুলোতে সিরিজ বোমা হামলার ক্যাম্পেইন শুরু করে, যে মিশনের দায়িত্বে ছিলেন হ্যান্সেল। তিনি চেয়েছিলেন আবাসিক এলাকা এড়িয়ে জাপানি শিল্প কারখানাগুলো লক্ষ্য করে হামলা পরিচালনা করতে। কিন্তু, এখানে কিছু প্রতিবন্ধকতা ছিল, B-২৯ বিমানগুলো নিরাপদে হামলা পরিচালনা করতে ৩০,০০০ ফিট উচ্চতায় উড্ডীন অবস্থায় টার্গেটকে কেন্দ্র করে বোমা ফেলত। সেই সঙ্গে এত উচ্চতায় প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে বোমাগুলোর মাত্র ১০% কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে আঘাত হানতে সক্ষম হয়। ১৯৪৫ এর প্রথম দিকে কমান্ডিং ডিরেক্টর অব আর্মি এয়ার ফোর্স, হেনরি আর্নল্ড জেনারেল লুমেকে হ্যান্সেলের স্থলাভিষিক্ত করেন। পরবর্তীকালে আর্নল্ড জাপানের শহরগুলোতে বোম্বিং-এর জন্য

[১] James B. Conant
[২] জাপানী দ্বীপগুলোতে যুদ্ধে

চাপ বৃদ্ধি করায় এটি পরিষ্কার হয় যে, বোমা হামলা কেবল মিলিটারি টার্গেটেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। হ্যান্সেল, আর্নল্ডের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন। কিন্তু ঐ সময়ে লুমে নীতি-নৈতিকতার মারপ্যাঁচের হিসেব না কষে বরং সবচেয়ে কার্যকরী উপায়ে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের উপায় খুঁজছিলেন। যুদ্ধের পর তিনি মন্তব্য করেছিলেন, 'নিরপরাধ বেসামরিক নাগরিক বলতে কিছু নেই' (Sherry, 1987)।

লুমে তার নয়া কৌশলে নির্ধারণ করলেন, রাতের আঁধারে বি-২৯ যুদ্ধ বিমানগুলো নিম্ন উচ্চতা দিয়ে টোকিওতে আক্রমণ করবে। লুমের লক্ষ্য ছিল—টোকিওতে এমন নির্মম আঘাত করা যেন এটি 'জ্বলে ছারখার হয়ে মানচিত্র থেকে মুছে যায়' (Schaffer, 1985, p. 128)। মার্চ ০৯, অ্যামেরিকার বোমা হামলায় এত অধিক সংখ্যক মানুষ হত্যার শিকার হয় যে, নিচ দিয়ে উড়ে যাওয়া B-২৯ এর পাইলটরা মাংস পোড়ার দুর্গন্ধে অসুস্থ হয়ে পড়ে। মার্চ ০৯-১০, এই দুই দিনের আক্রমণে ৮৭,০০০ অপেক্ষা বেশি মানুষ হত্যার শিকার হয়। টোকিও সহ অন্যান্য শহরে বোমা হামলা নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে লাগল। কিন্তু, অ্যামেরিকান এয়ার ফোর্স তাদের পাবলিক বিবৃতিতে পূর্বের অবস্থানেই অটল থাকে আর বিবৃতি দেয়, তারা বেসামরিক নাগরিকদের ওপর বোমা হামলার পলিসি গ্রহণ করেনি।

এপ্রিল ১৯৪৫, এডমিরাল সুজুকি[১] জাপানের প্রিমিয়ার পদে অধিষ্ঠিত হন। নিযুক্ত হয়ে তার সর্বপ্রথম গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোর একটি ছিল-চিফ ক্যাবিনেট সেক্রেটারি সাকমিজু[২]-কে জাপানের যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সক্ষমতা সম্পর্কে একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করতে বলা। সাকমিজু খোলাখুলি আর সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়, পরিস্থিতির উন্নতি হবার কিংবা জাপানের যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সক্ষমতার কোনো আশা নেই (Chairman's Office & Wilds, 1946)।

যুদ্ধ চালিয়ে যাবার বিষয়ে জাপানের সুপ্রিম কাউন্সিল ফর দ্যা ডিরেকশন অব দ্যা ওয়ার-এর ছয় সদস্যের মধ্যে মতানৈক্য থাকলেও জাপানের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও জাপানের সম্রাটের মর্যাদা রক্ষার ব্যাপারে সকলেই একমত ছিলেন। জুনের শেষ দিকে জাপানের সম্রাট সুপ্রিম কাউন্সিলকে তলব করেন এবং তাদের জানান, মস্কোকে শান্তিচুক্তি করার ব্যাপারে তার ইচ্ছার কথা যেন জানানো হয়। সম্রাটের ব্যক্তিগত সিল-মোহরের রক্ষক কিডোর এই পরামর্শ গ্রহণে তিনি প্রস্তুত। ততদিনে জাপান, অ্যামেরিকা উভয় রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দের কাছেই এটি পরিষ্কার যে, জাপানের নিশ্চিত হারই হবে যুদ্ধের চূড়ান্ত ফলাফল।

জুন ১৮, ১৯৪৫, জাপানকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করার উপায় ও অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা করতে হোয়াইট হাউসে জয়েন্ট চিফ অব স্টাফদের বৈঠক হয়। ট্রুম্যান

[১] Baron Kantaro Suzuki
[২] Hisatsune Sakomizu

ও তার প্রধান লেফটেন্যান্টরা অনুধাবন করেন, জাপান পতনের অতি নিকটবর্তী। কিন্তু তখনো তারা জাপানকে দ্রুত আত্মসমর্পণে বাধ্য করার উপায় খুঁজছিলেন। ঐদিনের বৈঠকে চিফ অব স্টাফরা জানান যে, জাপানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপ কিউশু[১] দখল করলেই জাপান হাল ছেড়ে দিবে। কিন্তু, সেটি দখল করতে গিয়ে অ্যামেরিকান বাহিনীর হতাহতের সংখ্যা কেমন হতে পারে? তারা নির্ধারিত সংখ্যা উল্লেখ করতে অপারগতা প্রকাশ করেন। তবে ধারণা করেন যে, আক্রমণের প্রথম ৩০ দিনের হতাহতের সংখ্যা এর পূর্বে লুজন দ্বীপ দখলের সময়কার হতাহতের সংখ্যা অপেক্ষা বেশি হবে না (Feis, 1966, p. 09; anonymous, 1945)। অর্থাৎ, কিউশুতে আক্রমণ করলে প্রথম মাসে সম্ভাব্য হতাহতের সংখ্যা ৩১,০০০ জন। এটিই একমাত্র হিসেব, যা ট্রুম্যান যুদ্ধ সমাপ্ত হবার পূর্বে শুনেছিলেন। তাই, যুদ্ধের পর ট্রুম্যান ও তার উপদেষ্টামণ্ডলী যুদ্ধের পর যেমনটি দাবি করেন: যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে উচ্চ পদস্থ সামরিক কর্মকর্তাদের কাছ থেকে প্রেসিডেন্ট ইনফরমেশন পেয়েছিলেন, জাপানে চূড়ান্ত আক্রমণ করলে ৫০০,০০০ থেকে ১ মিলিয়ন হতাহত বা নিহত হবে। তার সেই দাবির কোনো আর্কাইভ নেই, কোনো প্রাইমারি এভিডেন্স বা প্রমাণ নেই (Bernstein, 1999)।

জাপানকে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত শিথিল করার ধারণা ১৩ জুলাই শক্তিশালী সমর্থন পায়। ঐ সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূতকে জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী টোগোর দেয়া একটি কূটনৈতিক বার্তার পাঠোদ্ধার করতে সক্ষম হয় অ্যামেরিকা। ঐ বার্তাটির মূল বক্তব্য ছিল—যুদ্ধ জাপানের নাগরিকদের জীবনে শুধু ধ্বংস আর মন্দভাগ্যই বয়ে আনছে। মহান সম্রাট আন্তরিকভাবে কামনা করেন যে, এই পরিস্থিতির দ্রুত অবসান ঘটুক। টোগোর মতে, শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে একমাত্র বাধা বিনাশর্তে আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্তে অ্যামেরিকার অটল থাকা (National Security Archive, 1945)।

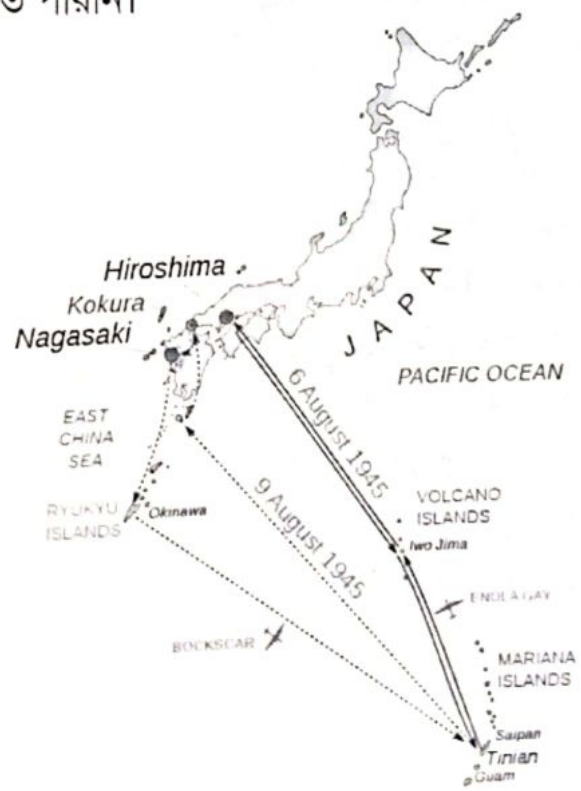
যুদ্ধ শেষ হবার পর, ১৯৪৬ সালের জুলাইতে ইউনাইটেড স্টেটস স্ট্রাটেজিক বম্বিং সার্ভে সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, (জাপানের বিরুদ্ধে) যুদ্ধ 'নিশ্চিতভাবে ১৯৪৫ শেষ হবার আগেই সমাপ্ত হতো। খুব সম্ভবত ১ নভেম্বর ১৯৪৫ এর আগেই... যদিও রাশিয়া পেসিফিক ওয়ার-এ যোগদান না করত, যদিও বোমা ব্যবহৃত না হতো, এমনকি যদিও কোনো (চূড়ান্ত) আক্রমণ করার পরিকল্পনাও করা না হতো।' (Chariman's Office; Walter Wilds, 1946)। কিন্তু ১৯৪৫ এ যুদ্ধের শেষ দিকের দিনগুলোতে ট্রুম্যান প্রশাসন বোমা ব্যবহার করার পথ পরিত্যাগ করার চেষ্টায় লিপ্ত ছিল না, বরং তারা ব্যস্ত ছিল দ্রুত যুদ্ধ সমাপ্ত করার পথ আবিষ্কারে। হিরোশিমার তৎকালীন জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৩৪০,০০০। এটি ছিল জাপানের একটি আঞ্চলিক

[১] Kyushu

হেডকোয়ার্টার; কিন্তু এটি কোনো গুরুত্ব বহনকারী মিলিটারি কেন্দ্রও ছিল না। নতুবা B-২৯ বম্বিং ক্যাম্পেইনের লিস্টে হিরোশিমার নামও থাকত। শহরটিকে B-২৯ Raid-এর লিস্ট থেকে আলাদা রাখা হয়, যেন পারমাণবিক বোমার ধ্বংসাত্মক ক্ষমতার চূড়ান্ত নাটকীয় প্রদর্শনী সম্ভব হয় (Walker, 1997/2004)।

অ্যামেরিকা খুব দ্রুত যুদ্ধ শেষ করতে চাচ্ছিল কারণ, তারা চাচ্ছিল সোভিয়েত সৈন্যদের চীন থেকে এবং সোভিয়েত অফিসিয়াল কর্মকর্তাদের জাপান থেকে দূরে রাখার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে। বার্নস্টেইন[১]-এর ভাষায়, পারমাণবিক বোমা ব্যবহার করে এই সবগুলো পরিকল্পনার বাস্তবায়নই হবে অ্যামেরিকার প্রধান উদ্দেশ্যের সঙ্গে 'বোনাস' (Rotter, 2008)।

আগস্ট ৬, ১৯৪৫। কর্নেল টিবেটস[২] তার মায়ের নামে নাম রাখা এনোলা গে[৩] নামক বি-২৯ প্লেনে করে পারমাণবিক বোমা লিটল বয় নিয়ে টিনিয়ান দ্বীপ থেকে হিরোশিমার দিকে রওনা হন। আবহাওয়া ছিল পরিষ্কার, ইও জিমা দ্বীপ থেকে তার সঙ্গী হয় আরও দুটি বি-২৯, যেগুলোর পাইলট ও ক্রুদের উদ্দেশ্য ছিল, তারা বোমা বিস্ফোরণের ছবি ও বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করবে। বিমানগুলো যখন হিরোশিমার আকাশে পৌঁছল, মাত্র তিনটি প্লেনের আগমনের ফলে হিরোশিমায় কোনো ওয়ার্নিং সাইরেন বাজানো হয়নি। নগরের বাসিন্দারাও সেদিন ভয়ে নিরাপদ স্থানে লুকানোর কোনো কারণ দেখতে পায়নি।



[১] Barton Bernstein
[২] Colonel Paul W. Tibbets
[৩] Enola Gay

Figure 4: Atomic Bomb Attacks map in Hiroshima and Nagasaki.

(হিরোশিমা সময়) সকাল ০৮:১৫। এনোলা গে তার গচ্ছিত লিটল বয়কে ধ্বংসলীলা চালাতে অবমুক্ত করে দেয়। নগরের ভূমি থেকে ১৯০০ ফিট উচ্চতায় বোমাটি বিস্ফোরিত হয়। মুহূর্তের মধ্যে হিরোশিমা উদ্ভাসিত হয় এক তীক্ষ্ণ আলোর ঝলকানিতে; আর তারপর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এক প্রচণ্ড দমকা হাওয়া; কান স্তব্ধ করে দেয়া বিক্ষুব্ধ গর্জন; সেই সঙ্গে দেয়াল ভাঙার বিকট সব শব্দ। বোমা বিস্ফোরণের স্পটের অর্ধ মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে যা কিছু ছিল, সবকিছু আক্ষরিক অর্থেই তাৎক্ষণিক নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এই সীমানার ভিতরে থাকা প্রতিটি মানুষের অস্তিত্ব পৃথিবীর বুক থেকে হারিয়ে যায় মুহূর্তের ব্যবধানে। অর্ধমাইল ব্যাসার্ধের পর থেকে ক্ষয়ক্ষতির তীব্রতা ক্রমশ হ্রাস পায়। বিস্ফোরণের চূড়ান্ত পর্যায়ে আসে অদৃশ্য—এবং শুরুতে অনুপলব্ধ—গামা রেডিয়েশন[১] এবং নিউট্রন; যারা তখনো আক্রান্ত হননি তাদের অনেকের দেহে এগুলো প্রবেশ করে। আকাশে ধুলো আর ধোঁয়া জমে সৃষ্টি হয় বিষণ্ণ কালো মেঘ, যা দেড় ঘণ্টা যাবৎ বর্ষণ করে ধূসর কালো বৃষ্টি। হিরোশিমা প্লাবিত হয় তেজস্ক্রিতায় (Rotter, ২০০৮).

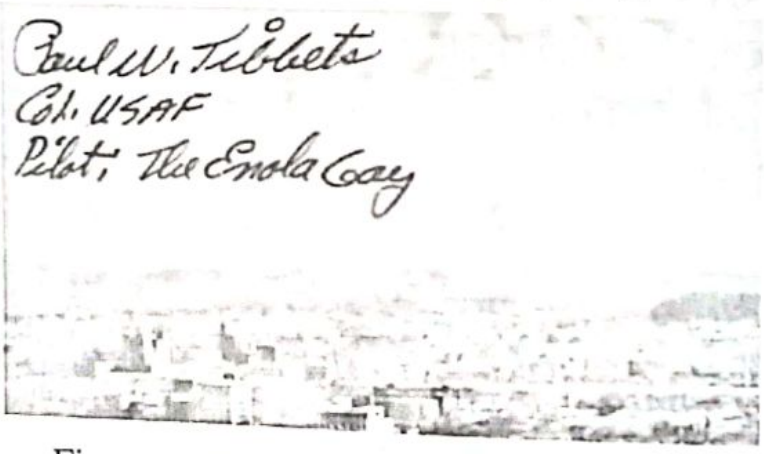


Figure 5: Bombing Aftermath in Hiroshima.

বিস্ফোরণ আর রেডিয়েশন হিটের ভুক্তভোগী যারা ছাই হওয়ার হাত থেকে প্রাণে বেঁচে যায়, তাদের অধিকাংশই আলোর তীব্র ঝলকানিতে দৃষ্টি শক্তি হারায়, আঘাতের তীব্রতায় নিস্তেজ হয়ে পড়ে, প্রচণ্ড উত্তাপে ঝলসে যায়, শরীর জুড়ে ফোস্কা পড়ে। উড়ন্ত কাচের আঘাতে তাদের দেহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অধিকাংশের গায়ের জামা তীব্র উত্তাপে পুড়ে ছাই হয়ে যায়, কিন্তু পুনরায় গায়ে জামা দেবার শক্তি তাদের ছিল না, সেই অবস্থাতেই তারা সাহায্যের আশায় উঠবার চেষ্টা করতে থাকে। যাদের তখনো নড়ার শক্তি অবশিষ্ট ছিল, তারা ধ্বংসস্তূপে ধূলাবালি আর ধোঁয়ার সাগরে হোঁচট খেতে খেতে ইতস্তত এদিক সেদিক ভূতুড়ে গতিতে এগুবার চেষ্টা করছিল। কিছু মানুষের শরীর থেকে চামড়া ঝুলে ঝুলে পড়ছিল। চারিদিকে তখন মৃতদেহের

[১] Gama radiation

খণ্ডিত অংশ ইতস্তত ছড়ানো ছিটানো। বেঁচে যাওয়া সৌভাগ্যবানরাও এতটাই দুর্বল ছিল যে, জখম আর তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবে পরবর্তীকালে ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুবরণ করে। অনেকেই মৃত্যুবরণ করে ক্যান্সার ও অন্যান্য জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে (Walker, 1997/2004)।



Figure 6: Hiroshima Bomb's victim.

হিরোশিমার বাসিন্দারা ৬ আগস্ট সকালের যে ব্যাপারটি সবচেয়ে বেশি মনে রেখেছিল, সেটি হচ্ছে—স্তব্ধতা। ২০ মাইল দূরে Island Sea-তে থাকা এক মাঝি বলেন, তিনি সেখান থেকে বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পান। কিন্তু হিরোশিমার গুটিকয়েক বাসিন্দাই কেবল কান স্তব্ধ করে দেয়া সেই শব্দ শুনতে পেয়েছিল। বোমা বিস্ফোরণের আলোক ঝলকানি, দেহ পুড়িয়ে দেয়া প্রচণ্ড উত্তাপ—এ সবের পর হিরোশিমার বুকে নেমে আসে এক প্রগাঢ় নীরবতা। যারা নিহত হয়, তারা নিঃশব্দে দেহ ত্যাগ করে। আহত'রা ছিল নিশ্চুপ, কেউ কান্না করা তো দূর—একটু কাতর শব্দও করেনি। বাচ্চারাও স্তব্ধ হয়ে যায়, হাতেগোনা কয়েকজন ব্যক্তিই কেবল কথা বলতে সক্ষম হয়েছিল। পুড়ে যাওয়া মানুষগুলো দু'বাহু ঊর্ধ্বে উত্তোলিত করে রাখছিল, যেন দেহের সঙ্গে বাহুর ঘর্ষণে উৎপন্ন তীব্র যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। অনেক আহত ব্যক্তি যন্ত্রণার উপশম করার আশায় (Ota) নদীর তীরে যায়। তারা মৃতদেহের সাথে জলে ভাসতে ভাসতে স্রোতের টানে এগিয়ে যাচ্ছিল। পরবর্তীকালে নদীর জলেই তাদের সলিল সমাধি হয়। তেজস্ক্রিয়তার উত্তাপে দগ্ধ-আহত ব্যক্তিদের মুখ, হাত পুড়ে ফুলে যায়, শরীরের ত্বক পাতলা খোসার মতো আলগা হয়ে ঝুলতে থাকে, ঠিক যেন ময়লা ন্যাকড়া। তারা দু হাত উত্তোলিত করে শব্দহীন যন্ত্রণা নিয়ে কাকতাড়ুয়ার মতো এমনভাবে Ota নদীতে গিয়ে পড়ছিল, যেন সবাই কোনো এক অদ্ভুত অলস প্রতিযোগিতায় লিপ্ত (Hachiya, 1955/1995)।

সেই দুঃস্বপ্নের দিনের অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে এক মুদি দোকানদার

বলেন, 'মানুষের ত্বক পুড়ে কালো হয়ে গিয়েছিল... তাদের কোনো চুল ছিল না, সব পুড়ে যায়।' প্রথম দেখাতে তিনি আহতদের সামনের দিক আর পিছনের দিকের পার্থক্য করতে পারছিলেন না। তাদের হাত, মুখ, দেহের চামড়া ঝুলছিল, তার ভাষায়—ঠিক যেন চলন্ত কোনো প্রেতাত্মা। তারা এক বিশেষ গতিতে হাঁটছিল—খুব ধীরে ধীরে (Rotter, 2008)।

আহত ব্যক্তিদের যন্ত্রণা বৃদ্ধি করতে হিরোশিমায় অবস্থিত ৪৫টি হাসপাতালের মধ্যে মাত্র তিনটি হাসপাতালই সেবা চালিয়ে যাবার মতো অক্ষত ছিল। বাকি সবগুলো ধুলোয় মিশে যায়। ৯০% ডাক্তার ও নার্স আহত-নিহত হন। যেসব নাগরিক সবচেয়ে বেশি আহত হয়েছিলেন, তাদের সেখানেই ফেলে রাখা হয় মৃত্যুর অপেক্ষায় (Chariman's Office; Walter Wilds, 1946)।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট যখন হিরোশিমায় বোমা হামলার সংবাদ পান, তখন তিনি সাগরের বুকে অবস্থান করছিলেন। USS Augusta-তে অবস্থানরত ট্রুম্যান হিরোশিমায় 'সফলতা'র ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট হাতে পান। বিজয় উল্লাসে গর্বিত ট্রুম্যান সাথে থাকা একদল নাবিকদেরকে এই ঘটনার ব্যাপারে মন্তব্য করেন, 'এটাই ইতিহাসের সবচে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা' (Truman, 1955)। এ ঘটনাটি পরবর্তীকালে তিনি তার আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেন।

৯ আগস্ট অপর একটি B-২৯ তিনিয়ান দ্বীপ থেকে ফ্যাট-ম্যান নামক প্লুটোনিয়াম বোমা নিয়ে Kokura-এর উদ্দেশ্যে রওনা হয়। কিন্তু বৈরি আবহাওয়ার কারণে বিমানটির পাইলট Kokura যাবার সিদ্ধান্ত বদলে নাগাসাকিতে রওনা হন। সেখানে একটি স্টেডিয়ামকে আক্রমণের কেন্দ্র[১] হিসেবে ফোকাস করে বোমাটি অবমুক্ত করা হয়। তিন দিন পূর্বে হিরোশিমাতে যে নারকীয় হত্যাকাণ্ড মঞ্চায়িত হয়েছিল, নাগাসাকিতেও পুনরায় সেই একই 'মৃত্যুময়' দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি হলো। আক্রমণের দিন থেকে নভেম্বর পর্যন্ত নাগাসাকিতে প্রায় সত্তর হাজার লোক নিহত হয়।

আগস্ট এর ৯ তারিখ সোভিয়েত ইউনিয়ন জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এর আগের দিন, ৮ আগস্ট ট্রুম্যান, Potsdam থেকে আসার পর স্টিমসন তার সঙ্গে দেখা করেন। প্রেসিডেন্টকে দেয়া তার ডকুমেন্টগুলোর একটিতে বোমার আঘাতে ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে পর্যবেক্ষণে উঠে আসা তথ্য ছিল। ঐ রিপোর্ট অনুযায়ী[২], হিরোশিমাতে কমপক্ষে এক লাখ ব্যক্তি নিহত হয় (Walker, 1997/2004)।

---

[১] Ground Zero

[২] according to conservative estimation



Figure 7: Nagasaki Boming Attack's 'Ground Zero', Before and After the Attack.

পারমাণবিক বোমা হামলার ব্যাপারে অ্যামেরিকার নেতৃবৃন্দই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়। সাধারণ মার্কিন নাগরিকরা এই হামলার ব্যাপারটা কিভাবে গ্রহণ করেছিল? আগস্ট ২৬, ১৯৪৫, এক গ্যালপ পোলে-এ দেখা যায়, ৮৫% জনগণ পারমাণবিক হামলাকে অনুমোদন করে। মাত্র ১০% এই হামলার বিরোধিতা করে। ট্রুম্যান তার স্মৃতিকথায় (১৯৫৫) দাবি করেন যে, সেক্রেটারি অব স্টেট মার্শাল তাকে জানিয়েছিল, 'শত্রুকে নিজ ভূমিতে আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে অর্ধ-মিলিয়ন অ্যামেরিকান নাগরিকের প্রাণ বিসর্জনের ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনা রয়েছে।' ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বলেন, এই বোমা ব্যবহার করে তিনি ২৫০,০০০ অ্যামেরিকান নাগরিকের জীবন বাঁচিয়েছেন, পরবর্তীকালে দাবি করলেন সিকি মিলিয়ন (২৫০,০০০) অ্যামেরিকান ও সমান সংখ্যক জাপানি তরুণ (১৯৪৮), সম্ভাব্য অর্ধ-মিলিয়ন হতাহত (১৯৪৯), মিলিয়ন

(১৯৫৯), ১২৫,০০০ অ্যামেরিকান ও সমান সংখ্যক জাপানি নওজোয়ান (১৯৬৩)। অর্থাৎ, ট্রুম্যান কখনোই একটি নির্দিষ্ট সংখ্যার ওপর স্থির হতে সক্ষম হননি। কারণ, তিনি কখনো এ ধরনের কোনো বার্তাই পাননি (Alperovitz, 1995, pp. 516-517)।

অবশেষে জাপানের বিনা শর্তে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে এক ক্লান্তিকর দীর্ঘ সর্বনাশা যুদ্ধের অফিশিয়াল সমাপ্তি ঘোষিত হয়। জাপান পরিণত হয় আধুনিক মার্কিন উপনিবেশ রাষ্ট্রে। যুদ্ধের বছরগুলো পেরিয়ে আসা রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র অ্যামেরিকাই পূর্বাপেক্ষা ধনী আর শক্তিশালী হিসেবে আবির্ভূত হয়। দেখা গেল, যুদ্ধে শেষে বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ স্বর্ণ অ্যামেরিকার কাছে মজুদ হয়েছে; বিশ্বের অর্ধেক ম্যানুফেকচারিং প্রোডাক্ট তারা উৎপাদন করছে। তেলের খনিসমূহ, শিপিং, ইলেক্ট্রনিক ইন্ডাস্ট্রি তাদের নিয়ন্ত্রণে। সর্ববৃহৎ মিলিটারি ফোর্স, এয়ারফোর্স তাদের নিয়ন্ত্রণে; আর বিশ্বের একমাত্র পারমাণবিক বোমার প্রযুক্তির অধিকারী অ্যামেরিকা। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, আইএমএফ আর ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সাহায্যে অ্যামেরিকা নিজেদেরকে 'পৃথিবীর ব্যাংক' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে, যেখানে সবাই অর্থের ভালোমন্দের ব্যাপারে তাদের ওপর নির্ভরশীল হবে (Brewer, 2009)।

অ্যামেরিকার নাগরিকরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রোপাগান্ডা ভার্সনটিকেই মনে রাখতে বেশি পছন্দ করেন। তারা এই যুদ্ধকে গণতন্ত্রের জন্য, দাসত্বের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধ হিসেবে মনে রাখেন, যে যুদ্ধে নিরপরাধ মানুষেরা নিজেদের নির্মম শত্রুর হাত থেকে রক্ষার্থে লড়েছেন; যে যুদ্ধ তাদেরকে দিয়েছে পূর্বাপেক্ষা উন্নত একটি জীবন। কিন্তু তারা ভুলে যায়, এই যুদ্ধে তারা আফ্রিকান অ্যামেরিকানদের অনুরোধ করেছে স্বাধীনতার জন্য লড়তে—যে স্বাধীনতা অ্যামেরিকার মাটিতে খোদ আফ্রিকান অ্যামেরিকানদের নিজেদেরই ছিল না। যুদ্ধের পর স্বাধীনতার ফেরিওয়ালা সেজে যে অ্যামেরিকা দেশের পর দেশে নিজেদের স্বার্থে শাসক পরিবর্তন করা শুরু করে, সে অ্যামেরিকা তাদের পারমাণবিক বোমা তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় ইউরেনিয়াম সংগ্রহ করেছিল বেলজিয়ামের দখলকৃত উপনিবেশ কঙ্গো থেকে। পশ্চিমা অসভ্যতার কী এক নির্মম পরিহাস! এটি ছিল এমন এক যুদ্ধ, যেখানে অ্যামেরিকা হিরোশিমা আর নাগাসাকিতে একটি মাত্র বোমার আঘাতে বেসামরিক নাগরিকদের উড়িয়ে দিয়েছিল কর্পূরের মতো। অবশেষে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটলেও শেষ হলো না বিশ্বের মানুষদের পরাধীনতা; বিশ্বব্যাপী '*স্বাধীনতা*'র নামে নিজেদের স্বার্থ আদায়ের এক নতুন লড়াই শুরু করল নব্য সৃষ্ট পুঁজিবাদী, সুদি মহাজন আধুনিক সাম্রাজ্য—যুক্তরাষ্ট্র।

Bibliography

"Magic" - Diplomatic Summary, War Department, Office of Assistant Chief of Staff, G-2, No. 1205 - July 13, 1945, Top Secret Ultra. (1945, July 13). Retrieved from National Security Archive: https://nsarchive.gwu.edu/document/15429-magic-diplomatic-summary-war-department-office?fbclid=IwAR2311b_F9Uco_AY8Z8CkDUS5U1AKQBZwAgi-RAtrTWJ-cCJgcp32npSvYs

Alperovitz, G. (1995). The Decision to Use the Atomic Bomb: And the Architecture of an American Myth. Knop.

Alterman, E. (2004). When Presidents Lie: A History of Official Deception and Its Consequences. Viking.

anonymous. (1945, June 18). Foreign Relations of the United States: Diplomatic Papers, The Conference of Berlin (The Potsdam Conference), 1945, Volume I. Retrieved from Office of the Historian: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1945Berlinv01/d598?fbclid=IwAR2XfDWD9FQm8HOSxgxkD_9kZVJUjO0VKYdPcyJWLLuC9TQ8FR25Br9RoFY

anonymous. (n.d.). FDR and the Four Freedoms Speech. Retrieved from FDR Presidential Library & Museum: https://www.fdrlibrary.org/four-freedoms

anonymous. (n.d.). Merchants of Death. Retrieved from United States Senate: https://www.senate.gov/about/powers-procedures/investigations/merchants-of-death.htm

Berenbaum, M. (2020, May 13). Nürnberg Laws. Retrieved from Encyclopedia Britannica: https://www.britannica.com/topic/Nurnberg-Laws.

Bernstein, B. J. (1999). Reconsidering Truman's claim of 'half a million American lives' saved by the atomic bomb: The construction and deconstruction of a myth. Journal of Strategic Studies, 22(1), 54-95. https://doi.org/10.1080/01402399908437744

Bosworth, R., & Maiolo, J. (2015). The Cambridge History of the Second World War (Volume 2). Cambridge University Press.

Bourke, J. (2001). The Second World War: A People's History. Oxford University Press.

Brewer, S. A. (2009). Why America Fights: Patriotism and War Propaganda from the Philippines to Iraq. Oxford University Press.

Chariman's Office; Walter Wilds. (1946). Japan's Struggle To End The War: The United States Strategic Bombing Survey. U.S. Government Printing Office.

Cirincione, J. (2007). Bomb Scare: The History and Future of Nuclear Weapons. Columbia University Press.

Dallek, R. (1979/1995). Franklin D. Roosevelt and American Foreign Policy, 1932-1945. Oxford University Press.

Feis, H. (1966). The atomic bomb and the end of World War II. Princeton University Press.

Frank, A. K., & Osgood, K. (2010). Selling War in a Media Age: The Presidency and Public Opinion in the American Century. University Press of Florida.

Gordon, G. S. (2017). Atrocity Speech Law: Foundation, Fragmentation, Fruition. Oxford University Press.

Hachiya, M. (1955/1995). Hiroshima Diary: The Journal of a Japanese

Physician, August 6-September 30, 1945. University of North Carolina Press.

Harper, J. L. (1994). American Visions of Europe: Franklin D. Roosevelt, George F. Kennan, and Dean G. Acheson. Cambridge University Press.

Herf, J. (2006). The Jewish Enemy: Nazi Propaganda during World War II and the Holocaust. Belknap Press.

Herring, G. C. (2008). The American Century and Beyond: U.S. Foreign Relations, 1893-2014. Oxford University Press.

Hitler, A. (1926/1939). Mein Kampf - The Official 1939 Edition. Coda Publishing Ltd.

Hoff, J. (1999). The American Century: From Sarajevo to Sarajevo. Diplomatic History, 23(2), 285-319. https://doi.org/10.1111/1467-7709.00167

Horten, G. (2002). Radio Goes to War: The Cultural Politics of Propaganda during World War II. University of California Press.

Koppes, C. R., & Black, G. D. (1987). Hollywood Goes to War: How Politics, Profits and Propaganda Shaped World War II Movies. Free Press.

Maddox, R. J. (1995). Weapons for Victory: The Hiroshima Decision Fifty Years Later. University of Missouri Press.

Mawdsley, E. (2011). December 1941: Twelve Days that Began a World War. Yale University Press.

Olmsted, K. S. (2009). Real Enemies: Conspiracy Theories and American Democracy, World War I to 9/11. Oxford University Press.

Pauwels, J. R. (2002/2015). The Myth of the Good War: America in the Second World War. Lorimer.

Roosevelt, F. D. (n.d.). December 9, 1941: Fireside Chat 19: On the War with Japan. Retrieved from Miller Center: https://millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches/december-9-1941-fireside-chat-19-war-japan#dp-expandable-text

Rotter, A. J. (2008). Hiroshima: The World's Bomb. Oxford University Press.

Rotter, A. J. (2010). Light at the End of the Tunnel: A Vietnam War Anthology. Rowman & Littlefield Publishers.

Schaffer, R. (1985). Wings of Judgment: American Bombing in World War II. Oxford University Press.

Sevareid, E. (1946/1976). Not So Wild a Dream. Diversion Books.

Sherry, M. S. (1987). The Rise of American Air Power: The Creation of Armageddon. Yale University Press.

Snyder, L. L. (1998). Encyclopedia of the Third Reich. Wordsworth Editions.

Sparrow, J. T. (2011). Warfare State: World War II Americans and the Age of Big Government. Oxford University Press.

Stokes, B. (2015, August 4). 70 years after Hiroshima, opinions have shifted on use of atomic bomb. Retrieved from Pew Research Center: https://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/08/04/70-years-after-hiroshima-opinions-have-shifted-on-use-of-atomic-bomb/

The Neutrality Acts, 1930s. (n.d.). Retrieved from Office of the Historian: https://history.state.gov/milestones/1921-1936/neutrality-acts

Truman, H. S. (1955). Memoirs by Harry S Truman, Vol. 1: Year of Decisions. Doubleday.

Walker, J. S. (1997/2004). Prompt and Utter Destruction: Truman and the use of Atomic Bombs against Japan. University of North Carolina Press.

Weinberg, G. L. (1994). A World at Arms: A Global History of World War. Cambridge University Press.

Weinberg, G. L. (2014). World War II: A Very Short Introduction. Oxford University Press.

Wheatcroft, G. (2014, December 9). The myth of the good war. Retrieved from the Guardian: https://www.theguardian.com/news/2014/dec/09/-sp-myth-of-the-good-war

অধ্যায় ৭

ভিয়েতনাম যুদ্ধ : উপনিবেশ বনাম স্বাধীনতা

সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই ভিয়েতনামে ইউরোপিয়ান মিশনারি তাদের কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছিল। সেখানে তারা সফলভাবে প্রায় ৭% ভিয়েতনামীকে ক্যাথলিক খ্রিষ্টানে রূপান্তরিত করতেও সক্ষম হয়। ইউরোপীয় জাতিগুলোর উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার সূচনাকালে ভিয়েতনাম ও তার সম্পদের ব্যাপারে ঔপনিবেশিকদের আগ্রহের বেশ ঘাটতি ছিল। পরবর্তীকালে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বহু সভ্যতার হন্তারক ফ্রান্সের দখলদাররা ইন্দোচীন[১] দখল করে নেয়। ফরাসিবিপ্লবের পর তাদের ক্রমবর্ধমান কাঁচামালের চাহিদা পূরণে তারা আফ্রিকার জনপদগুলোর সম্পদের দিকে নজর দেয়। এছাড়াও ইন্দোচীনের দক্ষিণে আরও সম্ভাব্য বড় সম্পদের উৎস এবং চীনের বাজারও তাদের মাথায় ছিল। এতসব মতলব তারা শুধুমাত্র একটি 'মহৎ' উদ্দেশ্য দেখিয়ে 'বৈধ' করে—যে মহৎ উদ্দেশ্য শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে ইউরোপীয় আগ্রাসনকারীরা ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছে। ফ্রেঞ্চ ঔপনিবেশিকরা ঘোষণা করে, তারা সভ্য করার মিশন[২] বাস্তবায়নের মাধ্যমে, বস্তুগত অগ্রগতি এবং নৈতিক 'উন্নতি' অর্জনের মাধ্যমে ইন্দোচায়নার জনগণের 'সেবা' করছে (Lawrence, 2008)।

ঊনবিংশ শতকের ষাট-এর দশকে ফ্রান্স ইন্দোচীন অভিযানে প্রথম বড় সফলতার মুখ দেখতে পায়। ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে কম্বোডিয়া এবং ১৮৯৩-এ লাওসে ফ্রান্স প্রোটেক্টরেট[৩] বা আশ্রিত রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। ১৮৬৭ সালে ফ্রান্স কলোনি অব কোচিন চায়না প্রতিষ্ঠা করে, যেটি ছিল ইন্দোচায়নার সবচেয়ে লাভজনক অংশ। এসকল রাজ্যে ফ্রান্সের সম্রাট ছিল নামেমাত্র দায়িত্বশীল, ঔপনিবেশিক দখলদাররাই ছিল প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী। 'সভ্যতার সূতিকাগার'-এর দাবিদাররা এসে ভিয়েতনামের বাসিন্দাদের পুরো জীবনধারাই বদলে দেয়। ক্ষুদ্র সংখ্যক ভিয়েতনামী ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর

[১] ভিয়েতনাম, লাওস ও কম্বোডিয়াকে একত্রে ১৯৫০ সাল অব্দি 'ইন্দোচীন' বলা হতো। যা ছিল ফরাসি উপনিবেশ এবং পরবর্তীকালে ফরাসি ইউনিয়নের অন্তর্গত।

[২] Civilizing mission

[৩] Protectorates: যে ভূখণ্ড অন্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও সুরক্ষিত।

গোলামি করার সিদ্ধান্ত নেয়, ফ্রেঞ্চ দখলদারদের সঙ্গে সঙ্গে তারাও নিজ জাতির উপনিবেশের সুবিধা ভোগ করতে শুরু করল। এর মাধ্যমে ভিয়েতনাম জুড়ে উত্থান ঘটে নয়া জমিদার, ব্যাংকার আর ব্যবসায়ী শ্রেণির—বিশেষ করে দক্ষিণ ভিয়েতনামে, সেখানকার জমি ছিল উত্তর ভিয়েতনাম অপেক্ষা তুলনামূলক বেশি উর্বর। ফ্রেঞ্চদের গোলাম হাতেগোনা সুবিধাভোগী কয়েকজন ভিয়েতনামীরা অল্প সময়েই বেশ বিত্তশালী হয়ে যায় (তুলনীয়: ব্রিটিশ উপনিবেশ আমলে কলকাতার নব্যশিক্ষিত বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়)। তারা শহরগুলোতে ঐশ্বর্যশালী পশ্চিমা জীবন যাপন করা শুরু করে। এই শ্রেণির লোকেরা ইউরোপীয় পোশাক পরত, ওয়াইন পান করত, আর তাদের বাচ্চাদের ফ্রেঞ্চ স্কুলে পড়াত (Lawrence, 2008)।



কিন্তু গোটা ভিয়েতনামবাসীদের জন্য উপনিবেশ নিয়ে আসে অভূতপূর্ব সব কষ্ট আর নিপীড়ন। ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী ইন্দোচায়নায় তাদের তৈরি রাস্তা, খাল, ব্রিজ, সেচ পদ্ধতি বেশি গর্ব আর হম্বিতম্বি করে (তুলনীয়: ব্রিটিশরা আমাদের রেল দিয়েছে)। কিন্তু, মূলত এইসব অবকাঠামোগত উন্নয়নসমূহ ভিয়েতনামকে আন্তর্জাতিক বাজারে কাঁচামাল যোগান দেয়া কলোনিতে পরিণত করতে ইচ্ছুক ফ্রেঞ্চ বিনিয়োগকারীদেরই কাজে আসত। কৃষকরা—জনসংখ্যার ৯০%—আরও গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হয়। ফ্রেঞ্চ কর্তৃপক্ষ সেখানে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আফিম-এর উৎপাদন ও বিতরণ নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে। ভিয়েতনামের প্রথাগত জমিবণ্টন পদ্ধতি বদলে দখলদাররা নব্য আইন প্রণয়ন করে, যা ধনী বিনিয়োগকারীদের সুযোগ আরও বৃদ্ধি করে দেয় (তুলনীয় : ব্রিটিশদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত)। দখলদারদের কৃষিক্ষেত্রকে বাণিজ্যিকীকরণ আইনের ফাঁদে পড়ে অধিকাংশ কৃষি জমি হাতেগোনা কয়েকজন ফ্রেঞ্চ ব্যবসায়ী আর প্রো-ফ্রেঞ্চ ভিয়েতনামী গোলামদের হাতে চলে যায় (Warren, 2013)। উপনিবেশবাদিদের প্রণীত নতুন উচ্চমাত্রার ট্যাক্স সিস্টেম কৃষকদের ওপর চাপ আরও বাড়িয়ে তোলে। দখলদারদের দাবিকৃত অর্থ পরিশোধ করতে না পেরে অনেকেই ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে, ফলে তারা ঔপনিবেশিক বা নব্য ফটকাবাজদের (হঠাৎ ধনী) কাছে জমি বিক্রয় করে দিতে বাধ্য হয় (হুবহু বৃটিশ শাসনের মতো)।

গুটিকয়েক ধনী আর সংখ্যাগরিষ্ঠ নিঃস্বদের মাঝে ব্যবধান ক্রমশ বেড়েই চলে;

ব্যক্তিগত ফায়দা লুটার এই সিস্টেমে ঋণ, হতাশা আর পরনির্ভরশীলতার দুষ্টচক্র আরও বিস্তৃত হলো। লক্ষ লক্ষ কৃষক তাদের জমি হারিয়ে ঔপনিবেশিকদের প্রতিষ্ঠিত কলকারখানায়, রাবার বাগানে, কয়লা খনিতে কাজ নিতে বাধ্য হলো। সেখানে পানির দামে, নির্মম পরিবেশে বিরামহীনভাবে তাদের কাজ করতে বাধ্য করা হয়। রাবার বাগানে কাজের পরিবেশ এতটাই নির্মম ছিল যে, সবচেয়ে কঠোর বাগানগুলোতে কাজ করতে গিয়ে প্রতি চারজনে একজন মারা পড়ত। আর কঠোরতা সহ্য করতে না পেরে পালিয়ে গেলে, পলাতক ব্যক্তিদের কপালে জুটত অকথ্য নির্যাতন বা মৃত্যু।

১৯৩০, দ্যা গ্রেট ডিপ্রেশন-এর ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে চালের মূল্য ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। ফলে ভিয়েতনামের কৃষকরা অল্প মূল্যে চাল বিক্রয় করে উচ্চ হারের কর পরিশোধ করতে গিয়ে চরম বেকায়দায় পড়ে। সেপ্টেম্বর ১২, ১৯৩০, Nghe An-এর ছয় হাজার কৃষক স্থানীয় রাজধানী Vinh-এর দিকে শান্তিপূর্ণ মার্চ শুরু করে। দখলদার ফ্রান্স সেখানে বিমান হামলা চালিয়ে ১১৭ জন কৃষককে হত্যা করে। সেই দিনই হত্যার শিকার হওয়া মানুষগুলোর আত্মীয়রা মৃতদেহ নিতে আসলে তাদের ওপর দ্বিতীয় দফা হামলা চালানো হয়; সেই হামলাতে নিহত হয় আরও ১৫ জন (Schulzinger, 1997)।

ভিয়েতনামের একটি শিক্ষিত প্রভাবশালী গ্রুপের জন্য উপনিবেশের এই বিষয়গুলো বস্তুগত দিকের চেয়েও বেশি মানসিক পীড়নের বিষয় ছিল। এই সকল প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মধ্যে কিছু ব্যক্তি—যাদের অনেকেই ফরাসি স্কুলে শিক্ষালাভ করেছে—ফ্রেঞ্চদের উৎখাত করে ভিয়েতনামকে নতুন করে গড়ার কথা ভাবতে শুরু করে।

দুঃখময় এই সময়ের একটু পেছনে ফিরে তাকাই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সদ্য সমাপ্ত হয়েছে। ফ্রান্সে আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিরা যুদ্ধের চূড়ান্ত হিসেব নিকেশ করতে ফ্রান্সে জড়ো হয়েছেন। তরুণ এক ভিয়েতনামী নাগরিক প্যারিসে ভার্সাই কনফারেন্সে তার জাতির স্বায়ত্তশাসনের আবেদন নিয়ে মিত্রশক্তির পক্ষে থাকা মার্কিন সেক্রেটারি অব স্টেট রবার্ট ল্যানসিং এবং উড্রো উইলসনের কাছে গিয়েছিল। কিন্তু, ওই তরুণকে হতাশ করে সোজা বেরিয়ে যাবার দরজা দেখিয়ে দেয়া হয়। সেদিনের সেই তরুণটির নাম ছিল—হো চি মিন[১] (Bricmont, 2006)। সেদিনের সেই আচরণের ফলাফল—একমাত্র আশার স্থল হিসেবে বাধ্য হয়েই সেই তরুণ ভিড়ে যায় কমিউনিস্টদের দলে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনে যাবার পর ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইন্দোচীন কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে হো চি ভিয়েতনামে ফিরে আসার পর প্রতিষ্ঠা করেন ভিয়েতনাম ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ বা ভিয়েত মিন[২] (Rotter, 2010)।

---

[১] Ho Chi Minh
[২] Viet Minh

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে জার্মানির হাতে চরম মার খেয়ে ফ্রান্সের যখন বেশ মুমূর্ষু অবস্থা, তখন ফ্রান্সের দুর্বল কলোনিয়াল কর্তৃপক্ষকে বশ করে জাপান সহজেই ইন্দোচীন দখল করে নেয়। জাপানের সঙ্গে ফ্রেঞ্চ ঔপনিবেশিকরা শুরুতে হাত মেলানোয় যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে রুজভেল্ট তাদের সমালোচনা করে বলেন, ফ্রান্সের দীর্ঘ উপনিবেশ সেখানকার পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটিয়েছে (Hess, 1972)। একই সঙ্গে তিনি মনে করতেন, ভিয়েতনামীরা তখনো নিজেদের শাসনভার গ্রহণ করবার 'যোগ্য' হয়নি। মারা যাওয়ার কিছু দিন পূর্বে তিনি বলেন, ফ্রান্স যদি ইন্দোচীনের নাগরিকদের হাতে স্বাধীনতা সমর্পণ করার জন্য তাদের 'প্রস্তুত' করার সংকল্প গ্রহণ করে, তাহলে ফ্রান্সের উচিত উপনিবেশের ওপর কর্তৃত্ব ধরে রাখা। ওদিকে যুদ্ধে ফ্রেঞ্চ কলোনিয়াল কর্মকর্তারা যখন জাপানের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল, তখন ভিয়েত মিন ফ্রান্স ও জাপান, উভয়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে কর্মী রিক্রুট করা আরম্ভ করে। এর সাথে সাথে তারা সেখানকার নাগরিকদের ভূমি সংস্কার ও স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতিও দেয় (Brewer, 2009)।

হো চি মিনের কাছে সাম্রাজ্যবাদী শাসক আর পুঁজিবাদী দখলদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মাঝে কোনো পার্থক্য ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তিনি ইউএস অফিস অব স্ট্রাটেজিক সার্ভিসের একজন এজেন্ট হিসেবে কর্মরত ছিলেন, যেই ওএসএসই আজকের সিআইএ-র অগ্রদূত। যুদ্ধ সমাপ্ত হলে দোসরা সেপ্টেম্বর হো চি উত্তর ভিয়েতনামের রাজধানী হানয়তে অর্ধ লক্ষ জনতার সামনে ভিয়েতনামকে ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক[১] হিসেবে স্বাধীন ঘোষণা করেন।

হো চি মিন ঘোষিত ডিআরভি নিয়ে সোভিয়েত তেমন আগ্রহ দেখাল না। কারণ, মিন-এর স্বাধীনচেতা মনোভাব সম্পর্কে তারা ভালো করেই জানত। ডিআরভি-র স্বাধীনতার ব্যাপারে তাই হো চি মিন-এর একমাত্র ভরসা ছিল অ্যামেরিকা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অ্যামেরিকা ঘোষণা করেছিল, তারা জাতিসমূহের আত্ম-নিয়ন্ত্রণ[২] প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করছে। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার আগেই অ্যামেরিকার নীতিবাক্য আর স্বার্থের দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয়ে যায়—যেটি দীর্ঘকাল ধরে চলা অ্যামেরিকার দ্বিচারিতার প্রতিফলনও বটে। মৃত্যুর পূর্বে রুজভেল্ট 'ইয়াল্টা কনফারেন্সে' কলোনিসমূহের অস্তিত্ব বজায় রাখার ব্যাপারে সম্মতি প্রদান করে যান (Rotter, 2010)। যুদ্ধের অন্তিম মুহূর্তে, পরবর্তী প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ফরাসি নেতৃবৃন্দকে নিশ্চিত করেন, ইন্দোচীনের উপনিবেশ পুনর্দখলের ব্যাপারে ওয়াশিংটন তাদের বিরোধিতা করবে না (Lawrence, 2008)।

যুদ্ধের শেষে বিজয়ী মিত্রপক্ষের ব্রিটিশ বাহিনী দক্ষিণ ভিয়েতনামে ও চীনা

[১] Democratic Republic of Vietnam
[২] Self-determination

বাহিনী উত্তর ভিয়েতনামে জাপানি সৈন্যদের গ্রেফতার করে। অপরদিকে, ফরাসি জাতীয় নেতারা যুদ্ধের ধ্বংসাবশেষ থেকে নিজেদের পুনরুদ্ধার করতে অভিমত ব্যক্ত করলেন। তাদের রাষ্ট্র তার পূর্ব ক্ষমতা আর সম্মান কেবল ফরাসি সাম্রাজ্য পুনর্দখলের মাধ্যমেই ফিরে পেতে সক্ষম হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অ্যামেরিকান প্রশাসনও সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল, ফ্রান্স তাদের শক্তিশালী মিত্র হিসেবে পুনরায় ভূমিকা রাখতে পারবে, যদি ফ্রান্স নিজের হারানো শক্তি পুনরুদ্ধার করতে পারে। তাই মার্কিন প্রশাসন ইউরোপে মিত্র রাষ্ট্রগুলোকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে ভিয়েতনামে ফ্রান্সের সংকট কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।

মার্কিন সরকারি কর্মকর্তারা ভিয়েতনামে থাকা অফিসারদের একথা একাধিকবার জিজ্ঞাসা করে যে, মিন ঠিক 'কতটা কমিউনিস্ট'। যেসব মার্কিন অফিসার ভিয়েতনাম সম্পর্কে সবচেয়ে ভাল জানত, তারা জানায় হো একজন কমিউনিস্ট। তবে 'প্রথমত ও সর্বাগ্রে' সে একজন জাতীয়তাবাদী, ভিয়েতনামের স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গকৃত এবং সেখানকার সবচেয়ে জনপ্রিয় জননায়ক। তারা দাবি করেন, সেখানে সোভিয়েতের উপস্থিতির কোনো চিহ্ন নেই। তথাপি ট্রুম্যান-এর সেক্রেটারি অব স্টেট, ডীন অ্যাচেসন মিনকে একজন 'পরিষ্কার কমিউনিস্ট'[১] হিসেবে প্রচার করার সিদ্ধান্ত নেন, যেন এর দ্বারা ভিয়েতনামে স্নায়ুযুদ্ধের ব্যাখ্যা প্রয়োগ করা মার্কিন প্রশাসনের জন্য সহজ হয়। ভিয়েতনাম ও অন্যান্য এশিয়ান অ-কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলো ডমিনো'র সারির মতো অবস্থিত, একটি রাষ্ট্রে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠিত হলে বাকি রাষ্ট্রগুলোও ভূপাতিত হবে—মার্কিন প্রেসিডেন্ট এই থিওরিকে অ্যামেরিকার স্বার্থের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হন। তিনি ইন্দোচায়নার টিন, টাংস্টেন-এর মতো কাঁচামাল এবং কৌশলগত মিলিটারি বেসগুলোতে প্রবেশাধিকার সুরক্ষিত করার প্রয়োজনীয়তার দিকে ইঙ্গিত দেন (Brewer, 2009)।

ফ্রান্সের পুনর্দখলের প্রক্রিয়া শুরু হয় দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে। সেখানে ব্রিটিশ বাহিনী তাদের সমগোত্রীয় ঔপনিবেশিক মিত্রদের সাহায্য করতে সেপ্টেম্বর ১৯৪৫, ভিয়েত মিনের বিপক্ষে দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাজধানী সাইগনে ফ্রেঞ্চ অভ্যুত্থান ঘটায় এবং তারপর ইউরোপ থেকে ফ্রেঞ্চ বাহিনী নিয়ে এসে কোচিন চায়না[২]-তে ফ্রেঞ্চ বাহিনীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। উত্তর ভিয়েতনামে চীনা বাহিনী ফ্রান্সের প্রতি এতটা বন্ধুসুলভ ছিল না, তারা ফ্রেঞ্চ কলোনিয়াল কর্তৃপক্ষকে সেখানে প্রবেশ করতে বেশ কয়েক মাস বাধা প্রদান করে। পরবর্তীকালে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬-এ চীনকে প্রচুর অর্থনৈতিক সুবিধা প্রদানের বিনিময়ে ফ্রান্স সেখানে প্রবেশ করে (Lawrence, 2008)।

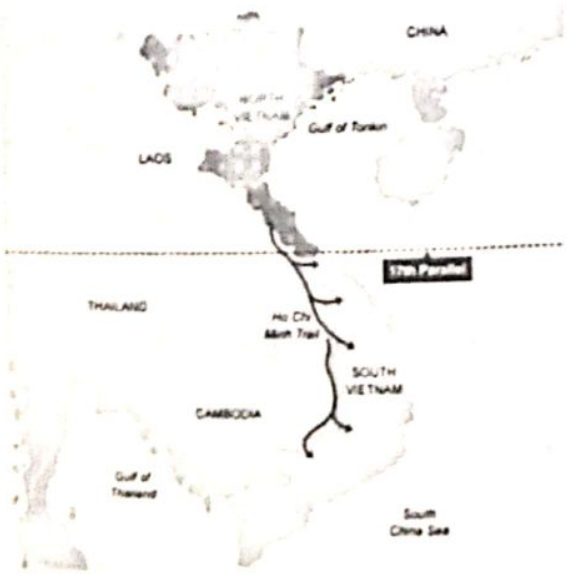
---

[১] Outright Commie

[২] Gianh River-এর দক্ষিণ দিকের অংশ বা ভিয়েতনামের দক্ষিণাঞ্চল।

ফ্রান্স ডিআরভিকে নিশ্চিহ্ন করতে চাইলেও চীনের মধ্যস্থতায় মার্চ ভিয়েতনামকে কলোনিয়াল শাসনের অধীনে স্বায়ত্বশাসিত 'মুক্ত প্রদেশ' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের চুক্তি স্বাক্ষর করে। বিনিময়ে ডিআরভি ফ্রান্সকে উত্তর ভিয়েতনামে ১৫,০০০ সৈন্য প্রবেশ এবং ফ্রান্সের অর্থনৈতিক স্বার্থ বজায় রাখার অনুমতি প্রদান করে। কিন্তু, কোচিন চায়না নিয়ে দু পক্ষ মতপার্থক্যে লিপ্ত হয়। ডিআরভি যেটিকে ভিয়েতনামের অংশ হিসেবে গণ্য করত, কিন্তু ফ্রান্স উক্ত এলাকাকে ফ্রান্সের নিজস্ব অংশ হিসেবে দাবি করে। উভয়পক্ষ বিষয়টি গণভোটের মাধ্যমে সমাধান করতে একমত হয়। কিন্তু উভয় রাষ্ট্রেই এই চুক্তি কট্টরপন্থীদের সমালোচনার শিকার হয়। পরবর্তীকালে ইন্দোচায়নাতে ফ্রেঞ্চ হাই কমিশনার এডমিরাল Thierry d'Argenlieu যুদ্ধ উসকে দেয়ার চেষ্টা করেন। ডিসেম্বরে ফ্রান্সের সৈন্যদের উসকানিতে দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাজধানী হানয়তে সংঘর্ষের সূত্রপাত হলো; ফ্রেঞ্চ আর্মি ডিআরভি-কে রাজধানী থেকে উৎখাত করে।

প্রাথমিক পর্যায়ে ফ্রান্স দ্রুত সফলতা লাভ করলেও ভিয়েত মিন নিজেদেরকে ধীরে ধীরে গুছিয়ে নেয়। দীর্ঘ ক্লান্তিকর যুদ্ধের ময়দানে নামার পর ফ্রেঞ্চবাহিনী দেখতে পেল, মিন তাদেরকে আসন্ন এক কঠিন যুদ্ধের ব্যাপারে যে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন, সেটিই সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। এবারে ভিয়েতনামের বাসিন্দাদের স্বাধীনতার স্বপ্ন এত সহজে ভাঙা যাবে না। তিন বছর যুদ্ধের পর ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে যুদ্ধ অচলাবস্থায় গিয়ে ঠেকে; ফ্রান্স সেখানকার শহরসমূহ আর গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলো দখলে নেয়, আর ভিয়েত মিন গ্রামাঞ্চলসমূহ নিয়ন্ত্রণ করে। যুদ্ধের অচলাবস্থা দূর করে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেতে ফ্রান্স দুটি কৌশল খাটানোর চেষ্টা করে।



এক, ফ্রেঞ্চ সরকার ঘোষণা করে, তারা হো চি মিনের সঙ্গে আর কোনো সংলাপে বসবে না। হো চি মিনকে তারা 'সংশোধনের অযোগ্য' কমিউনিস্ট হিসেবে ঘোষণা করে খারিজ করে দেয়। এরপর তারা সাবেক রাজা বাও ডাই[১]-কে বিকল্প সরকারের নামমাত্র প্রধান হিসেবে বসিয়ে তাকে আংশিক স্বাধীনতা প্রদান করে। মার্চ ৮, ১৯৪৯, ফ্রান্স ও বাও ডাই 'অ্যাসোসিয়েটেড স্টেট অব ভিয়েতনাম'-এর চুক্তি স্বাক্ষর করে; একই বছর লাওস ও কম্বোডিয়া-কেও সহযোগী রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

[১] Bao Dai

ফ্রান্সের দ্বিতীয় কৌশলটি ছিল, বাও ডাই-এর পুতুল সরকারের জন্য আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ের প্রচেষ্টা। এই সময় আরেক ঔপনিবেশিক 'সভ্য' সাম্রাজ্য ব্রিটেন ফ্রান্সের মিত্র হিসেবে সহযোগিতা করলেও বিশ্বজুড়ে এর সমালোচনা শুরু হয়। একই সঙ্গে, নিজ দেশে অন্যান্য সংকটের প্রভাবে ফ্রান্সে অর্থনৈতিক টানাপোড়েন শুরু হয়। ফ্রান্স সরকার সিদ্ধান্তে আসে, তাদের সবচেয়ে শক্তিশালী ও বিত্তশালী মিত্র অ্যামেরিকা সাহায্য করলে তারা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারবে। ফ্রান্স তখন ঘোষণা করল, তারা ঔপনিবেশিক যুদ্ধ নয়, বরং কমিউনিজমের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। ফেব্রুয়ারি ৭, ১৯৫০, অ্যামেরিকা তথাকথিত নব্য ভিয়েতনামের পুতুল সরকারের সঙ্গে সম্পর্কের সূচনা করে। ওয়াশিংটন ফ্রান্সকে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। তবে ঐ সময়ে অ্যামেরিকা কোরিয়ান যুদ্ধে ব্যস্ত থাকায় ট্রুম্যান প্রশাসন সিদ্ধান্ত নেয়, তারা তখনই ভিয়েতনামে মার্কিন সৈন্য পাঠাবে না।

১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে ভিয়েতনামে ফ্রান্সের সৈন্য সংখ্যা ৫০০,০০০-এ পৌঁছায়; আর যুদ্ধের ৮০% খরচই তখন বহন করত অ্যামেরিকা (Neilson, 1998)। কিন্তু, এর আগের বছরগুলোতে সৈন্যসংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি সত্ত্বেও যুদ্ধে ফ্রান্সের অবস্থানের ক্রমশ অবনতি হচ্ছিল। অক্টোবর ১৯৫৩-এ ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী জোসেফ ল্যানিয়েল শান্তি আলোচনা শুরু করবার ইচ্ছা পোষণ করলে চি মিন তাতে সম্মত হন। ১৯৫৪ সালে Dien Bien Phu উপত্যকাতে ফ্রেঞ্চ বাহিনীর মারাত্মক পরাজয়ের পর ২১ জুলাই জেনেভাতে শান্তিচুক্তি সম্পন্ন হয়। কিন্তু তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার[১] তখনো সরাসরি অ্যামেরিকার সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপের নির্দেশ দেননি। জেনেভায় শান্তি আলোচনায় ফ্রেঞ্চ ও ভিয়েতনামীরা ভিয়েতনামকে সাময়িক ভাগ করতে সম্মত হয়। হো চি মিনের বাহিনী ১৭ম প্যারালাল[২] এর উত্তর অংশে চলে যায়, ফ্রান্সের সৈন্য ও গোলাম বাহিনী এটির দক্ষিণ অংশে অবস্থান করে। সকলেই একমত হয় যে, ভিয়েতনামের উভয় অংশ ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে দেশব্যাপী নির্বাচনের মাধ্যমে একীভূত হবে। হো চি মিন নিশ্চিত ছিলেন, সেই নির্বাচনে তিনিই জয়লাভ করবেন; সেই সঙ্গে নিশ্চিত ছিল অ্যামেরিকাও। তাই অ্যামেরিকা এই সন্ধির সমর্থন প্রদানে অস্বীকার করে। তারা ঘোষণা করে, মার্কিন সরকার জেনেভা চুক্তির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না। কিন্তু গোপনে তারা পরিকল্পিত নির্বাচন বানচালের উদ্দেশ্যে কাজ শুরু করে দেয়।

তথাকথিত 'জাতিগঠন'[৩] পলিসির অনুসরণে অ্যামেরিকা দক্ষিণ ভিয়েতনামে তাদের গোলাম সরকার প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই উদ্দেশ্যে তারা ভিয়েতনামের

---

[১] Eisenhower
[২] বিষুবরেখার সতেরো ডিগ্রি উত্তরের অক্ষাংশ রেখা।
[৩] Nation-building

জাতীয়তাবাদী জিন ডিয়েমকে বেছে নেয়; সে ছিল একই সঙ্গে কমিউনিস্ট-বিরোধী এবং রোমান ক্যাথলিক। জিন ডিয়েম ক্ষমতায় আসার পর দক্ষিণের রাজধানী থেকে কর্নেল ল্যান্সডেল-এর অধীনে সিআইএর একদল অফিসার দক্ষিণ ভিয়েতনামে মনস্তাত্ত্বিক অপারেশন[১] চালানো শুরু করে। তারা পরিকল্পিতভাবে গুজব ছড়ায়, উত্তর ভিয়েতনামে ক্যাথলিকরা নির্যাতিত হচ্ছে, অনেকে হত্যার শিকার হচ্ছে। তারপর গুজবে আতংকিত পলাতক ক্যাথলিকদের জন্য ক্ষুদ্র জাহাজের বহর পাঠানো হলো, অ্যামেরিকান প্রোপাগান্ডিস্টরা যার নাম দেয় স্বাধীনতার পথ[২] (Hall, 2006/2018, p. 13; Addington, 2000, p. 50)।

১৯৫৫, অ্যামেরিকার প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের কারণে কলোনি পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনার ব্যাপারে আশাহত হয়ে ফ্রান্স দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে সৈন্য সরিয়ে নেয়। অ্যামেরিকার সমর্থনপুষ্ট জিন ডিয়েম দক্ষিণে প্রতিষ্ঠা করে দুর্নীতিবাজ এক সরকার। ১৯৫৬, পূর্ব নির্ধারিত নির্বাচন বাতিল করে ডিয়েম তার অধীনে দক্ষিণ ভিয়েতনামে গণভোটের আয়োজন করে। উক্ত নির্বাচনে সে অবিশ্বাস্যভাবে ৯৮.২% ভোট পেয়ে 'জয়লাভ' করেন। রাজধানী সাইগনে নিবন্ধিত ৪০৫,০০০ ভোটের মধ্য থেকে ভোট কাস্ট হয় ৬০৫,০০০টি। নাটকীয় ও প্রহসনের এই নির্বাচনের দুর্নীতির পুরো ঘটনাটিই মার্কিন মিডিয়া চেপে যায় (Olson, 1995, p. 62)। ঐ সময়টাতে ডিয়েমকে মার্কিন মিডিয়া গণতন্ত্রের ত্রাণকর্তা রূপে চিত্রায়িত করত। ১৯৫৭, ডিয়েম-এর অ্যামেরিকা সফরের সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার বলেন, 'ডিয়েম সকল স্থানের [সেসব] মানুষের জন্য দৃষ্টান্তে পরিণত হয়েছে—যেসব মানুষেরা স্বাধীনতা ভালোবাসে এবং স্বৈরশাসনকে ঘৃণা করে' (Eisenhower, 1957, p. 335)।

ওদিকে উত্তর ভিয়েতনামীরা দক্ষিণে তাদের কার্যক্রম অব্যহত রাখে। ১৯৬০-এর প্রথমার্ধে প্রতি মাসে গড়ে অন্তত ১৫০ জন করে দক্ষিম ভিয়েতনামী সরকারি কর্মকর্তা 'ভিয়েত কঙ'[৩]-এর গেরিলা সৈন্যদের হাতে হত্যার শিকার হতো (Moyar, 2006)। দক্ষিণ ভিয়েতনাম এবং অ্যামেরিকার জন্য পরিস্থিতির ক্রমশ অবনতি ঘটতে শুরু করে। ১৯৬০ সালের ২০ ডিসেম্বর দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও নৃগোষ্ঠীগুলোর ৫০ জন প্রতিনিধি কম্বোডিয়ার সীমান্তের নিকটে এক প্রত্যন্ত জায়গায় ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট বা এনএলএফ প্রতিষ্ঠা করে। দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে তাদের গেরিলা আক্রমণ আরও অধিক তীব্রতর ও ধ্বংসাত্মক রূপ ধারণ করে। একই সঙ্গে ডিয়েম প্রশাসনও আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠে। মে ১, ১৯৫৯, ডিয়েম সরকার

---

[১] Psy-ops
[২] 'Passage to Freedom'
[৩] Diem gov. এবং U.S. gov. NLF-এর বিদ্রোহী গেরিলা বাহিনীর সৈন্যদের Viet Cong বা Vietnamese Communist (VC) হিসেবে অভিহিত করত।

ডিক্রী[১] জারি করে সরকার-বিরোধী প্রতিটি ব্যক্তিকে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে ঘোষণা করে। এর মাধ্যমে নিরাপত্তা বাহিনী সন্দেহভাজন যেকোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতার, বিচার কিংবা তাৎক্ষণিক 'জায়গায়' হত্যা করার কর্তৃত্ব পায়।

১৯৬১-১৯৬৫, নর্থ ভিয়েতনাম এবং অ্যামেরিকা, উভয়পক্ষই দক্ষিণ ভিয়েতনামে নিজেদের সক্রিয়তা বৃদ্ধি করে। ১৯৬১ সালে পরবর্তী মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি, সাউথ ভিয়েতনাম আর্মির সম্প্রসারণ ও সেখানে অতিরিক্ত মার্কিন মিলিটারি উপদেষ্টাদের পাঠানোর প্রস্তাব অনুমোদন করেন। পরের বছর দক্ষিণ ভিয়েতনামে মার্কিন সামরিক উপদেষ্টার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৯০০০ জনে। অপরপক্ষে ভিয়েত মিনের উত্তরসূরি সংগঠন এনএলএফ-এ মুক্তিকামী জনগণ গণহারে যোগদান করতে শুরু করে। তারা দক্ষিণের সাইগন সরকারের বিরুদ্ধে গেরিলা আক্রমণ ও রাজনৈতিক উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কর্মকাণ্ড চালানো আরম্ভ করে। ভিয়েত কঙ-এর গেরিলা হামলার জবাবে অ্যামেরিকাও আক্রমণাত্মক অপারেশনে অংশগ্রহণ শুরু করে; সাইগনের আর্মির[২] সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মার্কিন বাহিনীও আক্রমণে যোগদান করল। কিন্তু ARVN সাধারণ কৃষক আর ভিয়েত কঙের মধ্যে পার্থক্য করতে পারছিল না। কারণ, প্রচুর কৃষক নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছিল। বিশাল ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে তারা নির্বিচারে গ্রামগুলোতে বোম্বিং করত। কেনেডি কমিউনিস্ট যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে উদ্ভিদনাশক কেমিক্যাল[৩] ও নাপাম[৪] ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করেন এবং গোপনে তাদেরকে যুদ্ধে আরও সক্রিয় হওয়ার পরামর্শ প্রদান করেন। কিন্তু ওয়াশিংটন চাচ্ছিল না যে, সাধারণ জনগণের নিকট বেসামরিক নাগরিক হত্যা, নাপাম ও উদ্ভিদনাশক ব্যবহারের বিষয়টা প্রকাশিত হোক। তাই অ্যামেরিকান মিডিয়ায় সিভিলিয়ান হতাহত ও উদ্ভিদনাশক বিষয়ক প্রতিবেদন নিষিদ্ধ করা হয় (Brewer, 2009)।

কমিউনিস্টদের দৃঢ়তার সামনে অ্যামেরিকা সমর্থিত দক্ষিণ ভিয়েতনাম শক্তিশালী মনোবলের প্রকাশ ঘটাতে ব্যর্থ হয়। ১৯৬৩, অধিকারের দাবিতে নির্যাতিত বৌদ্ধদের

---

[১] Decree 10/59
[২] Army of the Republic of Vietnam বা ARVN
[৩] Defoliants herbicides
[৪] Dr. Louis F. Fieser এর নেতৃত্বে গবেষক দল এই ভয়ংকর মারণাস্ত্র উদ্ভাবন করেন। ন্যাপথেনিক এসিড (Na), পামিটিক এসিড (palm) এবং গ্যাসোলিনের এর মিশ্রণে এক ধরনের জেলী। বোমার ভিতরে ব্যবহার করা হয়। বিস্ফোরণের পর জেলীগুলো আঠার মতো লেগে যায় এবং আগুন ধরে যায়। ফলে ২৭৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপ-সহ জ্বলতে থাকে। এর দরুন বোমা টার্গেটে ফেলার প্রয়োজনও কমে যায়, আশেপাশে পড়লেও টার্গেট ক্ষতিগ্রস্ত করা যায়। 1980 United Nations Convention বেসামরিক এলাকায় নাপাম ব্যবহার নিষিদ্ধ করে। অ্যামেরিকা এর স্বাক্ষরকারী হলেও 'প্রোটোকল-৩'এ সই করেনি। বিভিন্ন যুদ্ধে এই নৃশংস অস্ত্র ব্যবহার করে আসছে দেশটি।

আন্দোলনের মিছিলে দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারি বাহিনী গুলি চালায়। ডিয়েম বাহিনী শত শত বৌদ্ধ নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করে, দক্ষিণ ভিয়েতনামে তিনি মার্শাল ল' ঘোষণা করেন। ভিয়েতনামের দক্ষিণে সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে অস্থিতিশীলতা। ওদিকে, ডিয়েম ও তার প্রশাসন সাইগনে মার্কিন বাহিনীর ক্রমবর্ধমান সংখ্যার ব্যাপারে আপত্তি জানায়, এমনকি ১৯৬৩-এর বসন্তে হো চি মিনের সঙ্গে সম্ভাব্য যুদ্ধ বিরতির ব্যাপারে আলোচনাও আরম্ভ করে দেয়। তাই আগস্ট, ১৯৬৩-এ কিছু দক্ষিণ ভিয়েতনাম জেনারেল গোপনে মার্কিন প্রতিনিধিদের সঙ্গে ডিয়েমকে ক্ষমতার মসনদ থেকে সরানোর ব্যাপারে যোগাযোগ করে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেনেডি সাইগনে নিয়োগপ্রাপ্ত অ্যামেরিকার রাষ্ট্রদূত হেনরি লজকে তাদের পরিকল্পনার ব্যাপারে সবুজ সংকেত প্রদান করেন। এরপর, আকস্মিক ও সফল এক ক্যু শেষে দক্ষিণ ভিয়েতনাম মিলিটারি অফিসাররা ডিয়েমকে হত্যা করে। ১৯৬৩-এর শেষ দিকে এনএলএফ যুদ্ধ আরও তীব্রতর করার সিদ্ধান্ত নেয়।

ভাগ্যের কী অদ্ভুত পরিহাস! এর কিছুদিন পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেনেডি নিজেই গুপ্তহত্যার শিকার হন। নিহত হবার পূর্বে সর্বশেষ প্রেস কনফারেন্সে তিনি বলেছিলেন, ভিয়েতনামে তাদের উদ্দেশ্য হলো, অ্যামেরিকানদের স্বগৃহে ফিরিয়ে আনা, দক্ষিণ ভিয়েতনামীদেরকে নিজেদের 'মুক্ত' ও 'স্বাধীন' দেশ হিসেবে বাঁচার অধিকার প্রদান করা এবং ঐ দেশকে গণতান্ত্রিক শক্তি দ্বারা পরিচালনার অধিকার প্রদান করা। নভেম্বর ১৯৬৩, কেনেডি নিহত হবার পর জনসন[১] প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। ১৯৬৪-এর জুনে তিনি দক্ষিণ ভিয়েতনামে সামরিক উপদেষ্টাদের সংখ্যা ২৩,০০০-এ উন্নীত করেন। তার বিশ্বাস ছিল, সামরিক আক্রমণে মাধ্যমে তিনি ভিয়েত কঙ-কে এ কথা বিশ্বাস করাতে সক্ষম হবেন, তাদের পক্ষে যুদ্ধ জয় সম্ভব নয়, ফলে তারা সমঝোতা করার ইচ্ছা পোষণ করবে।

১৯৬৪-১৯৬৭, এই সময়ে অ্যামেরিকা ৬০০ জন স্বীকৃত সাংবাদিককে ফ্রি ট্রান্সপোর্ট ও তথ্য সরবরাহ করে। ভিয়েতনামে চিফ পাবলিক রিলেশন অফিসার ব্যারি[২] এবং মার্কিন মিলিটারি কমান্ডার জেনারেল ওয়েস্টমোরল্যান্ড[৩], ভিয়েতনামে দায়িত্ব পাবার পর তথ্য অধিদপ্তর[৪] চালু করেন, সেটিই ছিল ভিয়েতনামে অফিশিয়াল সংবাদের একমাত্র উৎস। তাদের সাথে রিপোর্টাররা এমন কোনো সংবাদ ছাপা হতে বিরত থাকতে একমত হন, যে সংবাদ মিলিটারি অপারেশনকে ব্যহত করতে পারে। অন্যদিকে ওয়াশিংটনও তাদের এই বক্তব্যে অটল থাকে যে, তাদের দক্ষিণ ভিয়েতনাম গঠন করার প্রচেষ্টা সফলতার দিকেই যাচ্ছে।

[১] Lyndon B. Johnson
[২] Barry Zorthian
[৩] William C. Westmoreland
[৪] MACV office of Information

আগস্ট, ১৯৬৪, গালফ অব টোঙ্কিনে[১] ইউএস নেভি ও নর্থ ভিয়েতনামের একটি সংঘর্ষ হয়। মার্কিন ডেস্ট্রয়ার ম্যাডোক্স, নর্থ ভিয়েতনামের তীরের নিকটবর্তী এলাকায় গোপন মিশনে থাকাকালীন নর্থ ভিয়েতনামের টর্পেডো বোটগুলোর সঙ্গে গুলি বিনিময় করে। কিছুদিন পর ম্যাডোক্স ও অন্য একটি ডেস্ট্রয়ার C. Turner Joy-এর ক্রু'রা জানায় যে, তাদের ওপর আবারও আক্রমণ করা হয়েছে। পরবর্তীকালে অবশ্য ম্যাডোক্স-এর ক্যাপ্টেন স্বীকার করেন, রাত্রিকালীন অনির্ভরযোগ্য রাডার রিডিংয়ের ওপর ভিত্তি করে দ্বিতীয় আক্রমণের কথা রিপোর্ট করা হয় এবং নর্থ ভিয়েতনামের পক্ষ থেকে শত্রুতাপূর্ণ কার্যক্রমের কোনো সুনিশ্চিত প্রমাণ নেই। কিছু মার্কিন অফিসার দ্বিতীয় আক্রমণের ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেন।

কিন্তু সত্য আবিষ্কারের ব্যাপারে জনসনের আগ্রহ খুব কমই ছিল। এই ধোঁয়াশাপূর্ণ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ডিফেন্স সেক্রেটারি রবার্ট ম্যাকনামারা ঘোষণা করেন যে, তাদের ওপর একটি আক্রমণ হয়েছ। অর্থাৎ, সেই ঘটনা নর্থ ভিয়েতনামের বিপক্ষে অ্যামেরিকার প্রতিশোধ গ্রহণের বৈধতা এনে দেয়। প্রেসিডেন্ট জনসন একটি কংগ্রেশনাল রেজুলেশনের আবেদন করেন, যা তাকে মার্কিন বাহিনীর ওপর যেকোনো সশস্ত্র হামলা প্রতিহত করতে এবং ভবিষ্যতে আক্রমণ প্রতিরোধ করতে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষমতা প্রদান করবে। কংগ্রেস কোনো মতপার্থক্য ছাড়াই[২] রেজুলেশন প্রণয়ন করে। আর এরই মাধ্যমে অ্যামেরিকা অফিসিয়ালি ভিয়েতনামে প্রত্যক্ষ যুদ্ধের সূচনা করে।

এ যুদ্ধের শুরু থেকেই মার্কিন সরকার কেন এতে লিপ্ত হয়েছে, সাধারণ নাগরিকদের কাছে সেটির ব্যাখ্যা দেয়া তাদের জন্য বেশ কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়ায়। মার্কিন নীতিনির্ধারকরা আশঙ্কা করেন, ভিয়েতনামকে কমিউনিস্টদের হাত থেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হলে সেটি সোভিয়েতের বিরুদ্ধে অ্যামেরিকার ইমেজকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে। তাই তারা স্নায়ুযুদ্ধের অফিসিয়াল ব্যাখ্যা দিয়ে ভিয়েতনামে তাদের জড়িয়ে পড়ার বিষয়কে বৈধতা দেবার চেষ্টা করেন। তারা বলেন, তাদের উদ্দেশ্য হলো, নর্থ ভিয়েতনাম থেকে অ্যামেরিকার সমর্থনপুষ্ট দক্ষিণ ভিয়েতনামে কমিউনিজমের ভাইরাস ছড়ানো প্রতিরোধ করা। কিন্তু মার্কিন নীতি নির্ধারকরা জানত—ভিয়েতনামী কমিউনিস্টরা বহিরাগতদের নিষ্ঠুর শাসন থেকে মুক্ত করে তাদের বিভক্ত দেশকে পুনঃসংযুক্ত করতে চায়। তারা ধারণা করে, অ্যামেরিকার সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার এক বৃহৎ প্রদর্শনী তাদের 'শত্রু' উত্তর ভিয়েতনামীদের স্বীয় পরিকল্পনা ত্যাগে উদ্বুদ্ধ করবে (Brewer, 2009)।

---

[১] Gulf of Tonkin

[২] (Senate: 88-2, House of Representative: 416-0) the Gulf of Tonkin Resolution

কিন্তু, অ্যামেরিকার প্রথাগত যুদ্ধকালীন ব্যাখ্যার সঙ্গে ভিয়েতনাম যুদ্ধ খাপ খায়নি। সেখানে লুসিতানিয়া, যিমারম্যান টেলিগ্রাম বা পার্ল হারবারের মতো কোনো ঘটনা ছিল না, যা অ্যামেরিকাকে 'আগ্রাসনের শিকার' এক নিরীহ নিরপরাধ দেশের চরিত্র পুনরায় মঞ্চায়নের সুযোগ করে দিবে। সাবেক প্রেসিডেন্ট ম্যাকিনলের চালু করা প্রথা[১] অনুসরণ করে ট্রুম্যান থেকে জুনিয়র বুশ—সকলেই দেশে দেশে শ্বেতাঙ্গদের বোঝা বহন করে। ভিয়েতনামেও সেই একই ঘটনা ঘটে। অ্যামেরিকানরা ভিয়েতনামীদের কমিউনিজমের হাত থেকে রক্ষা করে তাদের হৃদয়-মন জয় করতে গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদ তাদের দুয়ারে পৌঁছে দিবে। যদিও তাদের কথিত লক্ষ্যসমূহ আর ভিয়েতনামী গ্রামগুলোতে তাদের পরিচালিত বিধ্বংসী কর্মকাণ্ডের অবশ্যম্ভাবী বৈপরীত্য মার্কিন কর্তাদের কাছে ছিল সুবিদিত একটি বিষয় (Brewer, 2009)।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রেডিও যে ভূমিকা পালন করেছিল, ভিয়েতনাম যুদ্ধে টেলিভিশন তেমনি করে যুদ্ধকে মার্কিনীদের ঘরের অভ্যন্তরে নিয়ে হাজির হয়। ৬০-এর দশকে অ্যামেরিকার ৯০% বাড়িতেই টিভি ছিল (Allen & Thompson, 2019)। সেসময়ে প্রতিটি বাড়িতে গড়ে প্রতিদিন ছয় ঘণ্টা টিভি দেখা হতো। ঐ দশকের শেষে অর্ধেকেরও বেশি নাগরিক তাদের সংবাদের প্রধান উৎস হিসেবে টিভির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তাই, যুদ্ধের সময়টাতে মার্কিন প্রশাসন সম্পর্কে সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে টিভি নেটওয়ার্কগুলোর 'সমর্থন প্রদানকারী ও দ্ব্যর্থক' সংবাদগুলো তাদের খুঁতগুলো গোপন করার উপায় অবলম্বন করত। টিভি নেটওয়ার্কগুলো স্নায়ুযুদ্ধের ফ্রেমওয়ার্ক গ্রহণ করে এটির বৈধতা প্রমাণে মার্কিন নীতি নির্ধারকদেরকে সহায়তা করে যায়। যুদ্ধের সংবাদগুলো ছিল দেশপ্রেম, ভরসা, উৎসাহ আর উদ্দীপনা নিয়ে পরিপূর্ণ আবেগনির্ভর, এমন সংবাদ যা সহজেই শ্রোতাদের হৃদয়ে যুদ্ধ নিয়ে ইতিবাচক ধারণা সৃষ্টি করতে সক্ষম।

কিন্তু, টিভি নেটওয়ার্কগুলো যুদ্ধের ভয়াবহতার দৃশ্য খুব কম সময়-ই ক্যামেরায় ধারণ করত। সেক্ষেত্রেও দেখা যেত, অধিকাংশ সময়-ই শুধুমাত্র আহতদের হেলিকপ্টারে তুলে পরিবহন করার দৃশ্য দেখানো হচ্ছে। যুদ্ধের রিপোর্টাররা তরুণ সৈনিকদের উৎসাহ-উচ্ছ্বাস প্রকাশকারী সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে অ্যামেরিকাতে প্রচার করত; একই সঙ্গে উত্তর ভিয়েতনামীদের এমনভাবে চিত্রায়িত করা হতো, যেন তারা মানুষের চাইতে নিম্ন শ্রেণির কোনো এক প্রাণী।

যুদ্ধের সময় সাইগনে অফিশিয়াল ব্রিফিং[২] প্রকৃতপক্ষে সঠিক সংবাদ জানানোর চাইতে ভুল সংবাদই জানাত বেশি। সেখানকার পাবলিক অ্যাফেয়ার্সের অ্যাসিস্ট্যান্ট

[১] ফিলিপাইন যুদ্ধতে
[২] যা 'Five O'clock Follies (মূর্খতা)' হিসেবে রিপোর্টারদের কাছে পরিচিত ছিল

সেক্রেটারি অব ডিফেন্স সিলেভস্টার[১] মন্তব্য করেন, 'দেখুন, যদি আপনারা ভেবে থাকেন যে, কোনো অ্যামেরিকান অফিশিয়াল (কর্মকর্তা) আপনাকে সত্য বলবে, তাহলে আপনারা ষ্টুপিড। শুনলেন, কী বললাম? ষ্টুপিড' (Lofgren, 2016)।

১৯৬৪ এর নভেম্বরে পুনঃনির্বাচিত হবার পর জনসন যুদ্ধে আরও অগ্রসর হওয়ার পদক্ষেপ নেন। তিনি উত্তর ভিয়েতনামে আকাশপথে আক্রমণের সূচনা করেন, অন্যদিকে হানয় প্রথমবারের মতো দক্ষিণ ভিয়েতনামে নিয়মিত নর্থ ভিয়েতনাম আর্মি পাঠায়। ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৫, এই সময়ের মধ্যে ভিয়েতনামে মার্কিন সামরিক বাহিনীর সক্রিয়তা নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। মার্চ ৮, ১৯৬৫, অ্যামেরিকান নেভি Da Nang-এর উপকূলে নোঙর ফেলে। এর মাধ্যমে নৌপথ-সহ যুদ্ধের প্রতিটি সেক্টরে অ্যামেরিকা সক্রিয় হয়। ১৯৬৫ অর্থ বছরে মার্কিন সরকার দক্ষিণপূর্ব এশিয়াতে সামরিক কার্যক্রমের জন্য $১০০ মিলিয়ন বাজেট ধার্য করে, যদিও পরবর্তীকালে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় $৮০০ মিলিয়নে (Fink et al., 1998, p. 93)। অ্যামেরিকার এই তীব্র আক্রমণের মুখে উত্তর ভিয়েতনাম রক্ষণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করে। আর দক্ষিণ ভিয়েতনামে লক্ষ লক্ষ ভিয়েতনামী অ্যামেরিকার আগ্রাসনের মুখে পরিণত হয় উদ্বাস্তুতে।

যুদ্ধের ব্যাপ্তিকাল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অ্যামেরিকার সৈন্য সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। কিন্তু, জনসন চাইছিল, তাদের এই সিদ্ধান্ত যেন মার্কিন জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ থেকে যতটা সম্ভব বিরত থাকে। সুস্পষ্ট কোনো ঘোষণা ব্যতীতই জনসন বিশাল এক যুদ্ধে মার্কিন নাগরিকদের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলে। কিন্তু, যুদ্ধে সরাসরি জড়ানো ও সম্প্রসারণের এই ঘটনা জনরোষের সৃষ্টি করে। ওদিকে দক্ষিণ ভিয়েতনাম -এ ক্ষমতার মসনদে অভিনেতাদের একের পর এক পালাবদলে দক্ষিণ ভিয়েতনাম বাহিনীর অবস্থাও তখন শোচনীয়। তাই মার্কিন কমান্ডাররা আরও অতিরিক্ত ১৫০,০০০ সৈন্য পাঠানোর অনুরোধ জানালেন। যুদ্ধের ডামাডোলে আবারও সৈন্য বৃদ্ধির অনুরোধে জনসন, তার উপদেষ্টামণ্ডলী ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মাঝে চলে এক তীব্র বিতর্ক। ইউএস-এর আন্ডার সেক্রেটারি জর্জ বিল-সহ কয়েকজন এই অনুরোধের বিরোধিতা করে মন্তব্য করেন যে, এরকম প্রত্যন্ত অঞ্চলে গেরিলা যুদ্ধ করার জন্য অ্যামেরিকা প্রস্তুত নয়। অন্যদিকে সেক্রেটারি অব ডিফেন্স ম্যাকনামারা এবং রকফেলার ফাউন্ডেশনের সাবেক প্রেসিডেন্ট এবং তৎকালীন সেক্রেটারি অব স্টেট ডেভিড রাস্ক[২] ডমিনো থিওরির কথা উল্লেখ করে মিলিটারি কমান্ডারদের সমর্থন করলেন (Hunt M. H., 1996, p. 89)।

জুলাই, ১৯৬৫, জনসন ভিয়েতনামে মার্কিন পদাতিক বাহিনী সম্প্রসারণের

[১] Arthur Sylvester
[২] David Dean Rusk

অনুমতি প্রদান করেন। পরের তিনটি বছর অ্যামেরিকা দক্ষিণ ভিয়েতনামে স্থল-যুদ্ধ আর উত্তর ভিয়েতনামে আকাশ যুদ্ধ ক্রমবর্ধমান হারে চালিয়ে যায়। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত সফলতা কিংবা নিদেনপক্ষে অগ্রগতি—যেকোনো একটির মুখ দেখতেও তারা ব্যর্থ হয়। ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মার্কিন বাহিনী উত্তর ভিয়েতনামে ৬৪৩,০০০ টন বোমা হামলা করে (Lebovic, 2019, p. 36; Berger, 1976, p. 89)। ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাও তাদের এই আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পায়নি। তাদের আক্রমণে চার্চ, প্যাগোডা বিধ্বস্ত হয়; বৌদ্ধ ভিক্ষু ও পাদ্রিরা নিহত হয়। স্কুলে বোমা হামলায় শিক্ষারত শিশুরা তাৎক্ষণিক মৃত্যুবরণ করে। নির্মম এই হামলায় প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়েও উত্তর ভিয়েতনামের বাসিন্দারা শুধুমাত্র স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাতেই যুদ্ধে সমান তালে লড়ে যাচ্ছিল। যুদ্ধের পর একজন গ্রাম্য বয়োবৃদ্ধ তাদের সেই লড়াইয়ের কথা স্মরণ করতে গিয়ে বলেন, তারা (ভিয়েতনামের বাসিন্দারা) তাদের ঘৃণাকে (যুদ্ধাংদেহি) সক্রিয়তায় রূপান্তরিত করেছিল (Malarney, 2002)।

১৯৬৫-এর শেষ দিকে দক্ষিণ ভিয়েতনামে মার্কিন সৈন্য সংখ্যা ছিল ১৮৪,৩০০, পরের বছর তা বেড়ে দাঁড়ায় ৩৮৫০০ জনে। ১৯৬৭-এ ৪৮৫,৬০০; ১৯৬৯-এ সৈন্য সংখ্যা পৌঁছায় ৫৪৩,৪০০ জনে (Daddis, 2013; Sorley, 2004, prologue xvii)। এই চার বছরে অ্যামেরিকান বাহিনী কেবল দক্ষিণ ভিয়েতনামেই বোমা হামলা করে ১ মিলিয়ন টনেরও বেশি, অর্থাৎ উত্তর ভিয়েতনামে হামলার প্রায় দ্বিগুণ। ১৯৬২-১৯৭৩ এই সময়ের মধ্যে মোট বিস্ফোরক ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ৮ মিলিয়ন টন। উত্তর ভিয়েতনামে ১ মিলিয়ন, কম্বোডিয়াতে ৫০০,০০০ টন, লাওস-এর হো চি মিন ট্রেইলার বা গুপ্তপথে ৩ মিলিয়ন এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামে ৪ মিলিয়ন টন (Anderson, 2011)। আর এখনো পর্যন্ত সেসব এলাকায় অবিস্ফোরিত অবস্থায় রয়েছে প্রায় ৩০০,০০০ টন বিস্ফোরক (Stoler, 2013, p. 26)।

একদিকে অ্যামেরিকা যুদ্ধ তীব্র থেকে তীব্রতর করছিল, অন্যদিকে একই সময়ে অ্যামেরিকাতে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন বেশ জোরালো হচ্ছিল। বিশ্ববিখ্যাত বক্সিং চ্যাম্পিয়ন মুহাম্মদ আলী-সহ[১] অর্ধ মিলিয়ন তরুণ যুদ্ধে যোগদানের জন্য বাধ্যতামূলক ড্রাফটিংকে পরিত্যাজ্য ঘোষণা করে। এর আগে ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে জনসন তার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার পরিবর্তে স্বদেশে যুদ্ধের সমর্থন বৃদ্ধির চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনে বিরক্ত হয়ে তিনি সিআইএ-কে নির্দেশ দিলেন, প্রতিবাদকারীদের নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে অবৈধ নজরদারি শুরু করতে। অপারেশন ক্যাআস[২] শীর্ষক এই প্রোগ্রামে (Olmsted, ১৯৯৬) সিআইএ অফিসাররা পরবর্তী ৭ বছরে প্রায় ১০০,০০০ মার্কিন নাগরিকের তথ্য সংগ্রহ করে (Price, 2016, p.

[১] এ সিদ্ধান্তের কারণে তাঁকে জেলে পর্যন্ত পাঠানো হয়।
[২] Operation Chaos

10)। একই সঙ্গে এফবিআই অফিসাররা আন্দোলনকারীদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে তাদের নাকাল করার কার্যক্রম হাতে নেয়। মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র মন্তব্য করেন, 'আমরা কৃষ্ণাঙ্গ তরুণ ছেলেগুলোকে নিয়ে যাই... তাদের ৮০০০ মাইল দূরে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে পাঠাই, যা (স্বাধীনতা) তারা (কৃষ্ণাঙ্গরা) দক্ষিণ-উত্তর জর্জিয়া বা উত্তর হারলামে (অ্যামেরিকাতে) পায়নি' (Engel et al., 2014)।

মার্কিন প্রশাসন অ্যামেরিকার সাধারণ জনগণকে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন থেকে বিরত রাখতে তাদের প্রগ্রেস ক্যাম্পেইন নিরবচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে যায়। নভেম্বর ১৭, ১৯৬৭, সিবিএস-এর স্টিভ[১]-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে (এবং পরে আরও কয়েকটি প্রোগ্রামে) ভিয়েতনামের দায়িত্বে থাকা জেনারেল ওয়েস্টমোরল্যান্ড প্রায় প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরেই উন্নতি, আশা, অগ্রগতি বা আত্মবিশ্বাস[২] শব্দগুলো ব্যবহার করেন (Daddis, 2011, pp. 128-129)।

মার্চ, ১৯৬৮, ওয়েস্টমোরল্যান্ড ও জয়েন্ট চিফ অব স্টাফরা জনসনকে আরও ২০৫,০০০ সৈন্যের জন্য আবেদন করে, এবং কম্বোডিয়া, লাওস-এ আক্রমণের অনুমতি প্রার্থনা করে। ম্যাকনামারা-র উত্তরসূরি সেক্রেটারি অব ডিফেন্স ক্লিফোর্ড[৩] অনুধাবন করেন যে, পেন্টাগনের তখনকার যুদ্ধ কৌশলের মাধ্যমে অতিরিক্ত ২০৫,০০০ সৈন্য মিলেও ভিয়েত কঙের দৃঢ় সংকল্পকে টলাতে পারবে না। আর দক্ষিণ ভিয়েতনামকেও নিজেদের আত্মরক্ষা করতে সক্ষম করে তুলবে না। তিনি সহ সাবেক সেক্রেটারি অব ডিফেন্স অ্যাচেসন ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা যখন ভিয়েতনাম থেকে সরে আসার পরামর্শ দিল, তখন সেটি ছিল জনসনের জন্য বড় একটি ধাক্কা। কেননা, তারাই ভিয়েতনাম যুদ্ধকে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছে। অতঃপর তারাই আবার বলছে যে, অ্যামেরিকা এ যুদ্ধ জিততে সক্ষম নয়, সরে আসাই উত্তম।

যুদ্ধের উত্তরোত্তর ব্যয় বৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি, আর ঘাটতি বৃদ্ধির ফলে অ্যামেরিকাতে চলা জরিপগুলোতে দেখা যাচ্ছিল, প্রেসিডেন্টের জনপ্রিয়তার গ্রাফ ক্রমশ নিম্নমুখী। স্বদেশ ও যুদ্ধ ফ্রন্ট একই সঙ্গে সামলাতে গিয়ে হিমশিম খাওয়া জনসন মার্চ ৩১, ১৯৬৮-তে যুদ্ধের তীব্রতা কমিয়ে আনার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন, সেই সঙ্গে বিস্ময়করভাবে পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচন থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেন। তিনদিন পর হানয় থেকে যুদ্ধের ব্যাপারে আলোচনার ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়; কিন্তু সে আলোচনা ফলপ্রসূ হয় না। সেক্রেটারি অব স্টেট ক্লিফোর্ড এবং প্রধান মার্কিন

[১] Steve Rowen
[২] Progress, Optimism, Improve, Confidence
[৩] Clark Clifford

সমঝোতাকারী, এ দুজন মিলে জনসনের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে উত্তর ভিয়েতনামকে অভূতপূর্ব এক 'শিক্ষা' দেবার ইচ্ছার কথা জানান। মে, ১৯৬৮, প্যারিসে শান্তি আলোচনা শুরু হয়। অপরদিকে জনসন, দক্ষিণ ভিয়েতনামে তাদের সর্ববৃহৎ 'সার্চ এন্ড ডেস্ট্রয়' অপারেশন শুরু করে।

১৯৬৮-এর মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী রিচার্ড নিক্সন ভিয়েতনাম যুদ্ধের পরিসমাপ্তির প্রতিশ্রুতি দেন। সেই সঙ্গে তিনি 'গৌরবময় শান্তি'[১] অর্জনের পরিকল্পনার কথাও ব্যক্ত করেন। তিনি ঘোষণা করেন, তিনি যুদ্ধে পরাজিত প্রথম মার্কিন প্রেসিডেন্ট হতে চান না। কিন্তু, নিক্সন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবার পরের বছরগুলোতেও কোনোকিছুর বদল হলো না। দক্ষিণ ভিয়েতনাম নিজেরা নর্থ ভিয়েতনাম বাহিনীকে সামলানোর মতো শক্তিশালী হতে পারেনি। যুদ্ধের ময়দানে আমেরিকা সেই পুরনো সমস্যাগুলোরই মুখোমুখি হচ্ছিল। ১৯৬৯, নিক্সন ক্ষমতায় আসার দ্বিতীয় মাসেই উত্তর ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়াতে নর্থ ভিয়েতনাম যোদ্ধাদের ঘাঁটিতে মেজর বোমা হামলা ক্যাম্পেইনের সূচনা করেন, যেটি ছিল তার দেয়া প্রতিশ্রুতির সম্পূর্ণ বিপরীত (Lebovic, 2019; Rotter, 2010)। সমালোচিত হবার আশঙ্কায় নিক্সন এই তথ্যটি গোপন রাখেন।

'আমরা বনাম তারা'[২] মার্কিনীদের বহুল ব্যবহৃত এই পদ্ধতিটা নিক্সন যুদ্ধের ময়দানের পাশাপাশি নিজ রাষ্ট্রেও ব্যবহার করতে শুরু করলেন। ১৯৬৯-এ প্রতি দশ জনে সাত জনই মনে করত, ভিয়েতনাম যুদ্ধ একটি ভুল সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু প্রশাসনের সমর্থকদেরকে দেশপ্রেমী, আর সরকারের পলিসির সমালোচকদেরকে শত্রু হিসেবে অভিহিত করলেন নিক্সন। প্রেস অফিসের সীমাবদ্ধতায় অসন্তুষ্ট নিক্সন তার পলিসি প্রোমোশন করতে হোয়াইট হাউস যোগাযোগ অধিদপ্তর[৩] প্রতিষ্ঠা করেন। এটির কাজ ছিল স্লোগান তৈরি করা, কলামিস্টদের সঙ্গে লবিং করা, ব্যক্তিগতভাবে সম্পাদকদের সাথে প্রশাসনের মুখপাত্রদের নির্ধারিত সাক্ষাতকারের ব্যবস্থা করা। ১৯৭২ সালে প্রেসিডেন্টের মিডিয়া কভারেজের ওপর করা পর্যবেক্ষণে সাংবাদিক Ben Bagdikan মত প্রকাশ করেন, নিউজ মিডিয়া ক্রমেই ক্ষমতাসীন প্রশাসনের প্রোপাগান্ডা অস্ত্রতে পরিণত হয়েছে (Baughman, 1992, p. 177)। মে, ১৯৬৯, সেক্রেটারি অব ডিফেন্স ল্যার্ড[৪] নর্থ ভিয়েতনামীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধবন্দীদের[৫] সাথে আচরণের ক্ষেত্রে জেনেভা কনভেনশনের নীতি ভঙ্গের অভিযোগ করেন

[১] Peace with honor. বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশটি যেন মাথা নত করে অনৈতিক এক যুদ্ধ থেকে ফিরে না আসে, প্রেসিডেন্ট নিক্সন সেটি নিশ্চিত করার পরিকল্পনা ব্যক্ত করেন।
[২] Us vs them
[৩] White House Office of Communications
[৪] Melvin Laird
[৫] Prisoners of War বা POWs

(McCain, 2008)।

হানয়-এর কর্মকর্তাদের নিকট নিক্সন পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে সৈন্য অপসারণের জন্য আল্টিমেটাম দেন, যেটি হো চি মিন সেপ্টেম্বর ১৯৬৯-এ তার মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বেই খারিজ করে দেয়। নিক্সন পেন্টাগনের পরামর্শে নিরপেক্ষ কম্বোডিয়াতে কমিউনিস্টদের ঘাটিতে বোম্বিং রেইড শুরু করে। এই রেইডে কম্বোডিয়াতে ১০০,০০০ টন বোমা ফেলা হয়, ভিয়েতনামের বাইরে বোমা হামলার এই ঘটনাও অ্যামেরিকার নাগরিকদের কাছে গোপন করা হয় (Chon & Thet, 2010, p. 73; Schlight, 1996, p. 102; Willbanks, 2004)।

নভেম্বর, ১৯৬৯, যেসব মার্কিন নাগরিক যুদ্ধের ব্যাপারে নীরবতা পালন করছে, তাদেরকে নিক্সন তার সমর্থক হিসেবে দাবি করে প্রশংসা করেন। কিন্তু সংবাদ-মাধ্যমের কিছু ব্যক্তি যখন তার বক্তব্যের সমালোচনা করল, নিক্সন ওইসব ব্যক্তির সম্মানহানি করার পরিকল্পনা করেন এবং সে দায়িত্ব তার ভাইস প্রেসিডেন্ট অ্যাগ্নিউকে[১] দিলেন। অ্যাগ্নিউ টিভিতে দেয়া তার একটি বক্তব্যে বলেন, '...এই দেশের জনগণের নিকট পরিষ্কার হবার পূর্বেই প্রেসিডেন্টের বক্তব্য এবং চিন্তাভাবনা কোনো ধরনের শত্রুভাবাপন্ন সমালোচকের বিদ্বেষের মাধ্যমে প্রভাবিত হওয়া ব্যতীত সেগুলো সম্পর্কে তাদের (জনগণের) নিজের চিন্তা নিজে করবার অধিকার রয়েছে।' (Buchanan, 2017)। প্রকাশনীগুলোকে অ্যাগ্নিউ নিউ ইয়র্ক ও ওয়াশিংটন-এর সুবিধাভোগী উন্নাসিক ব্যক্তিদের একটি ক্ষুদ্র, অনির্বাচিত[২] সঙ্ঘ হিসেবে অভিহিত করেন, যাদের মতামত 'অ্যামেরিকার (নাগরিকদের) অভিমতের প্রতিনিধিত্ব করে না' (Maltese, 1994)।

গেরিলা যুদ্ধে এনএলএফ যোদ্ধাদের হতাহতের সংখ্যা অ্যামেরিকা ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম অপেক্ষা কয়েকগুণ বেশি ছিল। তা সত্ত্বেও অপরিচিত পরিবেশে কোনো উৎসাহ প্রদানের যোগ্য উৎস না থাকায়, 'অপ্রয়োজনে' মৃত্যু প্রান্তরে দীর্ঘদিন অবস্থান করে মার্কিন সৈন্যদের শারীরিক ও মানসিক দৃঢ়তা ক্রমশ কমতে থাকে। দেখা গেল, গড়ে মাত্র ১৯ বছর বয়সী মার্কিন সৈন্যদের একই স্পটে বারবার যুদ্ধ করতে হতো। আর প্রতিবারই চারদিক থেকে অ্যামবুশের আশঙ্কা তাদের মনোবল ভেঙে গুঁড়িয়ে দিত। আতঙ্ক আর হতাশায় মার্কিন সৈন্যরা প্রত্যেক ভিয়েতনামবাসীকেই অবিশ্বাসের চোখে দেখতে শুরু করল। ওদিকে জওয়ানরা ক্রমশ বিপজ্জনক মিশনে যেতে অস্বীকার করতে শুরু করে। যেসব অফিসার বিপজ্জনক অপারেশনের নির্দেশ দিতো, সৈনিকরা তাদের বিরুদ্ধে গ্রেনেড আক্রমণ শুরু করল (Hunt A. E., 1999, p. 144; Daddis, 2017, pp. 153-154)। পরবর্তী বছরগুলোতে এই

[১] Spiro Agnew
[২] Point to be noted.

ধরনের ঘটনা নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেলো (Knidsvatter, 2003)। দেখা গেল, ১৯৭১-এর শেষে সৈনিকদের মানসিক বৈকল্য চরমে পৌঁছে যায়। রাজধানী থেকে দূরবর্তী এলাকাগুলোতে সৈনিকদের মাঝে মাদক সেবন, বর্ণবাদী আচরণ পরিণত হয় খুবই স্বাভাবিক একটি বিষয়ে।

ঐ সময়টাতে অনেক যুদ্ধফেরত সৈনিক ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরোধিতা করতে শুরু করে। যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ২০,০০০ যুদ্ধফেরত সৈনিকরা VVAW[১]-তে যোগদান করেন (Hunt A. E., 1999)। এপ্রিল, ১৯৭১, যুদ্ধবিরোধী সৈনিকরা ওয়াশিংটনে বিক্ষোভ সমাবেশ করেন; শত শত সৈনিক তাদের মেডেল ছুড়ে ফেলেন। সেখানে উপস্থিত মলিন চেহারার, হুইল চেয়ার বা ক্র্যাচের পঙ্গু সৈনিকদের ছবি অ্যামেরিকার সৈনিকদের বিজয়ী বেশে ঘরে ফেরার প্রথাগত চিত্রের সঙ্গে ঠিক মানানসই ছিল না।

জানুয়ারি, ১৯৭২, একদিকে ভিয়েতনাম যুদ্ধের জন্য ড্রাফটিং অবশেষে সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়। অন্যদিকে, নিক্সন আবারও বড় আকারের 'বোমা হামলা ক্যাম্পেইন'-এর নির্দেশ প্রদান করেন। ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২, প্রতিবেশী রাষ্ট্র লাওসকেও অ্যামেরিকা তাদের যুদ্ধের ময়দান বানিয়ে নেয়। মার্কিন কলেজ ক্যাম্পাসগুলোতে যুদ্ধ ক্রমাগত সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। বিক্ষোভ মিছিলগুলোতে পুলিশ এবং ন্যাশনাল গার্ড-এর গুলিতে চার জন ছাত্র নিহত হয়। প্রেসিডেন্ট নিক্সন-এর জনপ্রিয়তার হার ধ্বসে নেমে আসে ৩১%-এ। এই জটিল মুহূর্তে *নিউ ইয়র্ক টাইমস* ভিয়েতনামে অ্যামেরিকার কার্যক্রমের ব্যাপারে প্রতিরক্ষা দপ্তরের প্রস্তুতকৃত ও ড্যানিয়েল এলসবার্গ-এর ফাঁস করা 'পেন্টাগন নথি' পাবলিশ করতে শুরু করে। সিক্রেট সেই নথি প্রকাশের ফলে বিক্ষুব্ধ জনগণ সবিস্ময়ে জানতে পারে, কেনেডি ও জনসন প্রশাসন কংগ্রেস ও জনগণের কাছ থেকে যুদ্ধের ব্যাপারে অনেক তথ্যই গোপন করেছেন। অক্টোবর, ২৬, কিসিঞ্জার সাংবাদিকদের বলেন, '(যুদ্ধে) সন্ধি অতি নিকটবর্তী' (anonymous, 1972)। অন্যদিকে ডিসেম্বরে নিক্সন নতুন করে আবারও বোমা হামলার নির্দেশ প্রদান করেন।



বেশ লম্বা সময় ধরে দর কষাকষির পর ১৯৭২-তে অ্যামেরিকা ও নর্থ ভিয়েতনাম একটা সমঝোতায় আসবে বলে মনে হচ্ছিল। শর্তানুসারে, মার্কিন বাহিনী সৈন্য প্রত্যাহার করবে; নর্থ ভিয়েতনাম প্রবেশ করতে পারবে দক্ষিণ

[১] Vietnam Veterans Against the War

ভিয়েতনামে। নিরপেক্ষ দেশের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হবে। অবশেষে ২৭ জানুয়ারি ১৯৭৩-এ প্যারিসে উভয়পক্ষের মধ্যে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তি অনুমোদন না করলেও কংগ্রেস নিক্সনকে আগস্ট ১৫, ১৯৭৩-এর ভিতর ইন্দোচীনে সকল মিলিটারি কার্যক্রম সমাপ্ত করতে বাধ্য করে। এপ্রিল, ১৯৭৫, মার্কিন বাহিনী সাইগনের মার্কিন দূতাবাস থেকে সর্বশেষ হেলিকপ্টারটি প্রত্যাহার করে নেয়। নিচে রেখে যায় অ্যামেরিকায় আশ্রয়প্রার্থী কান্নারত অসংখ্য ভিয়েতনামী দালালদের। প্রভুদের প্রস্থানে যারা ভিয়েত কঙের হাতে নিজেদের কচুকাটা হবার আশঙ্কা করছিল।

যুদ্ধে ক্ষয়ক্ষতির পরিসংখ্যান

অ্যামেরিকানরা চলে যায়, কিন্তু পিছনে ফেলে যায় তাদের দুষ্কৃতি আর লালসার রক্তাক্ত ক্ষত চিহ্ন। আনুমানিক দশ লক্ষ ভিয়েতনামের বাসিন্দা এই যুদ্ধের ফলে অসুস্থ হয় কিংবা জন্মকালীন ত্রুটি নিয়ে পৃথিবীতে আসে; যার প্রধান কারণ এজেন্ট অরেঞ্জ[১] ও অন্যান্য উদ্ভিদনাশক ব্যবহার। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, যুদ্ধ শেষ হবার এত বছর পরও আজ পর্যন্ত আনুমানিক ৩৫ মিলিয়ন ল্যান্ড মাইন এবং অন্যান্য অবিস্ফোরিত অস্ত্র হাজার হাজার ভিয়েতনামী, কম্বোডিয়ান ও লাওস-এর বাসিন্দাদের অঙ্গহানি বা মৃত্যুর কারণ হচ্ছে।

মার্চ ১৬, ১৯৬৮, কোয়াং নাই[২] প্রদেশের মি লাই[৩] নামের ছোট্ট একটি গ্রাম। অ্যামেরিকান বাহিনীর ধারণা, উক্ত প্রদেশটি এনএলএফ-দের শক্ত একটি ঘাঁটি। তাই অ্যামেরিকা ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম বাহিনী কোয়াং নাই-তে প্রায়ই বোমা হামলা করত। তারা সেখানকার পুরো এলাকা জুড়েই এজেন্ট অরেঞ্জ স্প্রে করে। অ্যামেরিকার চার্লি কম্পানি ডিভিশনের ১১শ ইনফ্যান্ট্রি[৪] বিগ্রেডের ফার্স্ট ব্যাটালিয়ন 'তথ্য' পায় যে, ভিয়েত কঙ গেরিলারা মি লাই গ্রাম দখল করে নিয়েছে। তাই চার্লি কম্পানিকে তাদের ধ্বংস করার মিশনে সেখানে পাঠানো হলো। আর্মি কমান্ডাররা হামলা করতে প্রস্তুত বাহিনীকে জানায়, সেখানে যাদের পাওয়া যাওয়া যাবে তাদের সকলেই ভিয়েত কঙ বা এর সমর্থক। তাই তারা তাদেরকে গ্রামটি ধ্বংস করে দেয়ার নির্দেশ দেয়। ভিয়েতনাম যুদ্ধে অ্যামেরিকা প্রায়শই বিপজ্জনক এলাকাকে ফ্রি-ফায়ার জোন হিসেবে ঘোষণা করত, যেন সেখানে বিনা বাধায় বেসামরিক নাগরিকদের কথা চিন্তা না করেই হামলা করা যায়। যাইহোক, কমান্ডিং অফিসার ক্যাপ্টেন আর্নেস্ট তাদেরকে

[১] Agent Orange
[২] Quang Ngai
[৩] My Lai
[৪] 11th Infantry

বলেন যে, 'চলতে সক্ষম এমন (যা কিছু পাবে) সবকিছু হত্যা করো' (Turse, n.d.)। ১৬ তারিখ সকালে সেখানে গিয়ে ভিয়েত কঙ বা এনএলএফদের পাবার বদলে তারা দেখল, সেখানে শুধু মাত্র নারী, শিশু, ও বৃদ্ধরা অবস্থান করছে। অনেকে তখনো সকালের ভাত রান্না করছিল। মিশনটির লিডার উইলিয়াম ক্যালি সবাইকে দলে দলে জড়ো করে তাদের কুঁড়েঘরে পরীক্ষা করালেন। সব কিছু খুঁজেও কোনো ভিয়েত কঙ-এর অস্তিত্ব না পেয়েও ক্যালি সৈনিকদের নির্দেশ দিলেন গ্রামবাসীদেরকে হত্যা করার। তার নির্দেশে একে একে সবাইকে হত্যা করা হলো। যেসব নারীরা তাদের সন্তানকে বাঁচাতে চাইলেন, তাদেরকেও গুলি করা হলো, বাচ্চাদেরও ছাড়া হলো না। যারা পালাতে চাইল, তাদের হত্যা করা হলো পিছন থেকে ধাওয়া করে (History.com Editors, 2020)।

উক্ত গণহত্যার সময় উপস্থিত থাকা সার্জেন্ট মাইকেল বলেন, তিনি সেখানে যুদ্ধ করতে সক্ষম পুরুষ একজনও দেখেননি—মৃত কিংবা জীবিত। হত্যা করার পূর্বে তারা অনেক নারীকে ধর্ষণ করে, তারপর পুরো গ্রামটাকে জ্বালিয়ে দেয়। ওয়ারেন্ট অফিসার থম্পসন আর্মি হেলিকপ্টার দিয়ে টহলরত অবস্থায় সেখানে পৌঁছান। তিনি বলেন, '...আমরা সেখানে ইতস্তত অবস্থায় উড্ডীন ছিলাম। আর কিছু সময় পরই আমরা লক্ষ্য করলাম, চারদিকে শুধু মৃতদেহ, যেদিকেই তাকাই, মৃতদেহ দেখতে পাই। সেখানে নাবালক ছিল—দুই, তিন, চার, পাঁচ বছর বয়সী, নারী, বৃদ্ধ; যুদ্ধ করতে সক্ষম কেউ সেখানে ছিল না।' সেদিনের গণহত্যায় কমপক্ষে ৫০৪ জন নিহত হয়, যাদের মধ্যে ১৮২ জন ছিল নারী (১৭ জন গর্ভবতী) এবং ১৭৩ টি শিশু, যাদের মধ্যে একেবারেই নাবালক ৫৬ জন। কিন্তু অফিশিয়ালি রিপোর্ট করা হয়, ১২৮ জন ভিয়েত কঙ নিহত হয়েছে, এবং ৩ টি অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে, সাথে 'আনুমানিক' ১০-১১ জন নারী-শিশু 'অসাবধানতাবশত' মারা গেছে।

এই ঘটনা অনেকদিন চাপা ছিল, যতদিন না রাইডেনআওয়ার[১] এই ঘটনা জনসম্মুখে আনার চেষ্টা করলেন। তিনি প্রেসিডেন্ট নিক্সন, জয়েন্ট চিফ অব স্টাফ এবং কয়েকজন কংগ্রেস সদস্যকে চিঠি লিখেন এবং সব শেষে তিনি ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্ট সিমোর হার্শকে নভেম্বর ১৯৬৯-এ এই ঘটনা নিয়ে একটি সাক্ষাৎকার দেন। হার্শ মি লাই-এর গণহত্যার ওপর ধারাবাহিক প্রতিবেদন লিখতে শুরু করলেন। ১২ নভেম্বর ১৯৬৯, মি লাই গণহত্যা নিয়ে সিমোর হার্শ-এর প্রথম আর্টিকেলটি প্রকাশিত হয়। গণহত্যার ঘটনা প্রকাশিত হয়ে পড়ার ফলে জনগণের ক্ষোভের মুখে পরবর্তীকালে মার্কিন আর্মি ঘটনাটি তদন্তের ঘোষণা দেয়। চার মাস পর সেই তদন্তে মি লাই গণহত্যার বিস্তারিত আর ধামাচাপা দেবার ঘটনার প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐ

[১] Ron Ridenhour, ১১শ বিগ্রেডের একজন সৈন্য, যিনি সেদিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না কিন্তু এ ঘটনা সম্পর্কে জানতেন।

সময়ে তারা এই ঘটনার বাকি প্রমাণগুলো ধামাচাপা দেয়ার প্রচেষ্টা আরম্ভ করে। এই ঘটনায় ইউএস আর্মি ১৪ জনকে দোষী হিসেবে সাব্যস্ত করে, কিন্তু লেফটেন্যান্ট ক্যালি ব্যতীত সবাই খালাস পেয়ে যায়। মার্চ, ১৯৭১, ক্যালিকে যাবজ্জীবন শাস্তি প্রদান করা হয়। কিন্তু প্রেসিডেন্ট নিক্সনের নির্দেশে তাকে জেলখানার বদলে তার আরামদায়ক এপার্টমেন্টে গৃহবন্দী করার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৭৪ সালের এপ্রিল মাসে ক্যালির শাস্তি কমিয়ে দশ বছর করা হয়। আর নভেম্বর মাসে সে প্যারোলে মুক্তি পায়। এই ছিল বিশ্বজুড়ে মোড়লগিরি চালানো অ্যামেরিকার দেশীয় আইনে ভিনদেশে গণহত্যা চালানোর সর্বোচ্চ শাস্তির নমুনা।

মার্কিন বাহিনী অভ্যন্তরীণভাবে দ্বিতীয় আরেকটি তদন্তের ঘোষণা দেয়, যেটির সম্পর্কে সাধারণ জনগণ কিছুই জানত না। আর্মির চিফ অব স্টাফ অফিসারদের একটি দল গঠন করেন, যারা এ ধরনের অন্যান্য অভিযোগের তথ্য সংগ্রহ করবে। তারা গোপনে পাঁচ বছর তাদের এই গোপন কার্যক্রম পরিচালনা করে। এই সময়ে তারা অ্যামেরিকান বাহিনীর সকল প্রকার বর্বরতা সম্পর্কে নয় হাজার পৃষ্ঠার প্রমাণ সংগ্রহ করে। পেন্টাগন কালেকশনের পুরো ব্যাপারটাই গোপন রাখে। ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে মার্কিন সংগঠন NARA পেপারগুলো পরীক্ষার জন্য সর্বপ্রথম অনুমোদন প্রদান করে। আর্কাইভ কালেকশনটিতে শত শত সৈন্যের বক্তব্য রয়েছে—যারা ভিয়েতনামে ধর্ষণ, খুন, গনহত্যা ও অন্যান্য নৃশংস কাজ করেছেন বা প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। শুধুমাত্র পেন্টাগনের নিজস্ব তদন্তেই ৩০০টি ঘটনা প্রমাণিত হয়। ৫০০টি ঘটনা প্রমাণিত হয়নি বা সম্পূর্ণ তদন্ত সম্পন্ন করা হয়নি। যেসব অফিসার ঘটনাগুলো সংকলিত করেন, তাদের মতে এই সংখ্যাগুলোও ভিয়েতনামে ওয়ার ক্রাইমের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র।

VVAW-এর নেতৃবৃন্দের একজন, জন কেরি, এপ্রিল ১২, ১৯৭১-এ ক্যাপিটাল হিল[১]-এ যুদ্ধের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেন, 'মার্কিন আর্মি ধর্ষণ, কান কেটে ফেলা, যৌনাঙ্গে পোর্টেবল টেলিফোনের তার বেঁধে পাওয়ার অন করা, মুখাবয়ব ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা, বিস্ফোরক ব্যবহার করে মৃতদেহ উড়িয়ে দেয়া, যথেচ্ছভাবে বেসামরিক নাগরিকদের গুলি করা, চেঙ্গিস খানের বাহিনীর মতো গ্রাম গুঁড়িয়ে দেয়া, গবাদি পশু-কুকুরকে খেলাচ্ছলে হত্যা করা, মজুদকৃত খাদ্যে বিষ মেশানো... এগুলো সহ অন্যান্য অপরাধে লিপ্ত ছিল' (Cohn & Gilberd, 2009)। অর্থাৎ, মি লাই গণহত্যা কোনো বিচ্ছিন্ন পাশবিক ঘটনা ছিল না—যেমনটা অ্যামেরিকানরা মনে করেন। বরং এটি অনেকগুলো অপারেশনের মধ্যে 'একটি' অপারেশন। কিন্তু অন্যান্য অপারেশনগুলো মি লাই-এর মতো প্রকাশিত হয়নি। ঘটনাগুলো ধামাচাপা দিতে

[১] Capitol Hill

মিলিটারির ভেতরের হুইসেলব্লোয়ারদের[১] শাসিয়ে, ভয় দেখিয়ে চুপ করানো হয়। গুরুতর অভিযোগের তদন্ত শেষ হলে তদন্ত রিপোর্টগুলো গুম হয়ে যায় ক্লাসিফাইড[২] ফাইলের অন্ধকার রাজ্যে (Turse & Nelson, 2006)।

১৯৫৪ থেকে ১৯৭৫, এই সময়ের ভেতর প্রায় ৩ মিলিয়ন ভিয়েতনামী নাগরিক মৃত্যুবরণ করে, যাদের বেশিরভাগই নিহত হয় অ্যামেরিকা ও তার মিত্র দক্ষিণ ভিয়েতনামের সেনাদের হাতে। অন্যদিকে, অ্যামেরিকার নিহত সৈন্যের সংখ্যা মাত্র ৫৮,২০০। ভিয়েতনামের নিখোঁজ নাগরিকের সংখ্যাই প্রায় ৩০০,০০০, যা অ্যামেরিকার মোট হতাহতের সংখ্যা থেকেও কয়েকগুণ বেশি (Wagner, 2019)। যুদ্ধে মার্কিন এয়ারফোর্স প্রায় ৫০০,০০০ একর জমির ফসলে উদ্ভিদনাশক স্প্রে করে (Anderson, 2011)। এই বিশাল কেমিক্যাল অ্যাটাক প্রজেক্ট আক্ষরিকভাবেই দক্ষিণ ভিয়েতনামের অর্ধেক বনাঞ্চল ধ্বংস করে দেয় (Knock, 2003)। অ্যামেরিকা ও তার মিত্র দক্ষিণ ভিয়েতনাম মিলে সর্বমোট ০৫ মিলিয়ন একর জমিতে (Stoler, 2016) ৭৩ মিলিয়ন লিটার কেমিক্যাল এজেন্ট স্প্রে করে, যার ৬২%-ই এজেন্ট অরেঞ্জ—একটি উদ্ভিদনাশক—যেটির সবগুলো ধ্বংসাত্মক প্রভাব কয়েক প্রজন্ম পেরিয়ে এসেও এখন পর্যন্ত অজানা।

উদ্ভিদনাশক স্প্রে'র বিধ্বংসী প্রভাবে ভিয়েতনামের বিশাল আয়তনের চাষযোগ্য ভূমি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে যায়। কেমিক্যালের অবশিষ্টাংশ রয়ে যায় মাটি, নদী, ফুড চেইনে। VAVA[৩] ধারণা করে যে, ৩ মিলিয়নেরও বেশি ভিয়েতনামের নাগরিক ডাইঅক্সিনের সংস্পর্শে আসার কারণে গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যায় ভোগে। ডাইঅক্সিনের প্রভাব কখনো কখনো এক প্রজন্মে সুপ্ত অবস্থায় থেকে পরের প্রজন্মে ক্ষতিকর লক্ষণ তৈরি করতে সক্ষম। এর ক্ষতিকর প্রভাবগুলোর মধ্যে রয়েছে ক্যান্সার, মানসিক সমস্যা, রোগ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় ত্রুটি, হরমোন-জনিত সমস্যা, স্নায়ুবিক সমস্যা এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যগত প্রভাব। ভিয়েতনামের হতভাগ্য নাগরিকরা কেমিক্যাল আক্রমণের 'পুরস্কার' হিসেবে বাহু বা পা ছাড়া শিশু, অদ্ভুত বিকৃত চেহারা, বেঢপ আকৃতির মাথা, অস্বাভাবিক ত্বক, কালো চুল কিংবা দাগে ভরা দেহ সম্পন্ন শিশু; আংশিক বা সম্পূর্ণ প্যারালাইজড শিশু—এই ধরনের হৃদয়বিদারক দৃশ্যের সঙ্গে বেশ পরিচিত (Gammeltoft, 2014)।

[১] যে ব্যক্তি কোনো প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে চলা অবৈধ কোনো বিষয়ের কথা ফাঁস করে দেয়।
[২] কোনো পেপারকে অফিসিয়াল সিক্রেট পেপার হিসেবে নির্ধারিত করা, যে পেপারে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তির প্রবেশাধিকারের অনুমোদন রয়েছে।
[৩] The Vietnamese Associations of Victims of Agent Orange



অনেক মার্কিন যোদ্ধা কেমিক্যাল পয়জনের সংস্পর্শে আসার ফলে যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ক্যান্সারসহ বিভিন্ন গুরুতর পর্যায়ের স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগতে শুরু করে। অনেকের সন্তান জন্মগত ত্রুটি নিয়ে জন্মগ্রহণ করতে আরম্ভ করে। বিভিন্ন পরীক্ষায়

এজেন্ট অরেঞ্জ-এ ব্যবহৃত ক্যামিকেল ডাই-অক্সিন-এর সঙ্গে এই সকল রোগ ও লক্ষণের সংযোগ প্রমাণিত হয়। তথাপি মার্কিন যোদ্ধাদের সেবায় নিয়োজিত সরকারি প্রতিষ্ঠান VA[১] এই সব লক্ষণকে যুদ্ধ সম্পর্কিত রোগ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানে অস্বীকার করে। মার্কিন ভিয়েতনাম যোদ্ধা ও তাদের সমর্থন প্রদানকারীগণ বহু বছর ধরে এ সকল প্রাণঘাতী ক্যামিকেল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ও সরকারের নিকট ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়ে আসে। কিন্তু উভয়ই তাদের দাবিকে শুরু থেকেই অগ্রাহ্য করতে থাকে। অনেকেই ক্যান্সারসহ অন্যান্য রোগে মারা যায়, তাদের সঙ্গিনীদের বহু সংখ্যক গর্ভপাত হয়। অনেকে সেরিব্রাল পালসি, স্পাইনা বাইফিডার মতো জন্মগত ত্রুটি-সহ সন্তান জন্মদান করে (Anderson, 2011)।

এজেন্ট অরেঞ্জ-এর 'বুমেরাং'[২] ভুক্তভোগী ও VVAW মোট ২০০,০০০ যোদ্ধা ও তাদের পরিবারের পক্ষ থেকে এর উৎপাদনকারীদের বিপক্ষে মামলা করে। কিন্তু, আদালত তাদের সুবিচার প্রদান করতে 'ব্যর্থ' হয়। ছয় বছর পর ১৯৮৫-এর মে মাসে কেমিক্যাল কোম্পানিগুলো আদালতের কার্যক্রমের বাইরে $১৮০ মিলিয়ন দিয়ে মামলার এডভোকেটদের সঙ্গে ব্যাপারটার দফারফা করে। ইচ্ছে না থাকলেও ভুক্তভোগীদের এটি মেনে নিতে হয়। আইনজীবীরা বিশাল অঙ্কের টাকা নিয়ে চলে যায়, আর ভুক্তভোগীদের জন্য অবশিষ্ট থাকে অর্থের ক্ষুদ্র একটা অংশ। ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে মার্কিন কংগ্রেস এজেন্ট অরেঞ্জ অ্যাক্ট পাস করে, যার ফলে ভিয়েতনাম যোদ্ধারা নির্দিষ্ট কিছু শর্ত পূরণ হলে চিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণ পাবার যোগ্যতা লাভ করে। যদিও কোনো আইনগত দায়বদ্ধতা থেকে এমনটি করা হয়েছে, সে কথা তারা স্বীকার করেনি (Gammeltoft, 2014)। ১৯৯৪ সালে ন্যাশনাল একাডেমি অব সাইন্স-এর অন্তর্ভুক্ত ইন্সটিটিউট অব মেডিসিন সিদ্ধান্তে আসে যে, কোনো ব্যক্তি এজেন্ট অরেঞ্জের সংস্পর্শে আসার ফলে Soft-tissue Sarcoma, non-Hodgkin's lymphoma, Hodgkin's disease, Chloracne এবং porphyria cutanea-এর মতো জটিল সব রোগে আক্রান্ত হয় (Sills, 2014)। এছাড়াও এটি বিভিন্ন ক্যানসারও সৃষ্টি করতে পারে। ২০০২ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ইন্সটিটিউটটি এজেন্ট অরেঞ্জ-এর সংস্পর্শে আসা ব্যক্তির সন্তানদের রিপোর্টে Type 2 diabetes ও spina bifada-এর মতো রোগ দুটি যোগ করে। ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে ক্লিনটন প্রশাসন ইন্সটিটিউট অব মেডিসিন কর্তৃক স্বীকৃত এজেন্ট অরেঞ্জ-এর প্রভাবে সৃষ্ট রোগগুলোকে ক্ষতিপূরণ দিতে সম্মত হয়। VA ধারণা করে, এটি পরবর্তী দশ বছরে প্রায় $৩৫০-$৬০০ মিলিয়ন ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে (Anderson, 2011)। এ তো গেলো ভিয়েতনামে

[১] Veterans Administration
[২] ভিয়েতনামবাসীদের ধ্বংস করতে গিয়ে যারা নিজেরাও কেমিক্যাল ওয়ারফেয়ার-এর ধ্বংসাত্মক রূপ দেখতে বাধ্য হয়।

নিযুক্ত আমেরিকান যোদ্ধাদেরকে দেওয়া ক্ষতিপূরণের পরিমাণ। কেমিক্যাল ওয়ারে ক্ষতিগ্রস্ত ভিয়েতনামী ভুক্তভোগীদের এখন পর্যন্ত কোনো ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়নি। ভবিষ্যতে দেওয়ার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না (Stoler, 2016)।

আইজেনহাওয়ার, কেনেডি, জনসন, নিক্সন—যুদ্ধ চলাকালীন প্রত্যেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট দাবি করে, তারা কেবল স্বাধীন দক্ষিণ ভিয়েতনাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই যুদ্ধ করেছে। যুদ্ধের তীব্রতার শীর্ষে থাকা অবস্থায় মার্কিন ঐতিহাসিক আর্থুর[১] ভিয়েতনামে অ্যামেরিকার পলিসিকে তাদের 'আন্তর্জাতিক-প্রীতির সাধারণ কার্যক্রম'-এর একটি অংশ হিসেবে ঘোষণা করেন (Bricmont, 2006)। কিন্তু, বাস্তবতা তো এই যে, ওয়াশিংটন চাচ্ছিল একটি অনুগত রাষ্ট্র, যে রাষ্ট্র অ্যামেরিকার বৈদেশিক নীতি চোখবুজে অনুসরণ করবে। আর যুদ্ধ জটিল অবস্থায় চলে গেলে যুদ্ধের নামে অ্যামেরিকার সম্মান রক্ষাই তাদের প্রধান লক্ষ্যে পরিণত হয়। অ্যামেরিকানদের সেই সম্মানের মূল্য ১-৩ মিলিয়ন ভিয়েতনামী নাগরিক পরিশোধ করে নিজেদের জীবনের বিনিময়ে, যারা ধারা আজও চলমান। কেমিক্যাল যুদ্ধের শিকার মানুষগুলোর প্রজন্মের পর প্রজন্ম এখনো পর্যন্ত অ্যামেরিকার পৌঁছে দেয়া 'স্বাধীনতা'র মূল্য পরিশোধ করে চলেছে। মিটিয়ে চলেছে তাদেরকে 'সভ্যতা'র দুয়ারে পৌঁছে দিতে 'অক্লান্ত পরিশ্রমী' শ্বেতাঙ্গদের বহন করা বোঝার দেনা।



[১] Arthur Schlesinger

Bibliography

Addington, L. H. (2000). America's War in Vietnam: A Short Narrative History. Indiana University Press.

Allen, S., & Thompson, R. J. (2019, July 1). Television in the United States. Retrieved from Encyclopedia Britannica: https://www.britannica.com/art/television-in-the-United-States

Anderson, D. (2011). The Columbia History of the Vietnam War. Columbia University Press.

anonymous. (1972, October 27). Transcript of Kissinger's News Conference on the Status of the Cease-Fire Talks. Retrieved from The New York Times: https://www.nytimes.com/1972/10/27/archives/transcript-of-kissingers-news-conference-on-the-status-of-the.html

Baughman, J. L. (1992). The Republic of Mass Culture: Journalism, Filmmaking, and Broadcasting in America since 1941. Johns Hopkins University Press.

Berger, C. (1976). The United States Air Force in Southeast Asia, 1961-1973. Office of Air Force History, USAF.

Brewer, S. A. (2009). Why America Fights: Patriotism and War Propaganda from the Philippines to Iraq. Oxford University Press.

Bricmont, J. (2006). Humanitarian Imperialism: Using Human Rights to Sell War. Monthly Review Press.

Buchanan, P. J. (2017). Nixon's White House Wars: The Battles That Made and Broke a President and Divided America Forever. Crown Forum.

Chon, G., & Thet, S. (2010). Behind the Killing Fields: A Khmer Rouge Leader and One of His Victims. University of Pennsylvania Press.

Cohn, M., & Gilberd, K. (2009). Rules of Disengagement. New York University Press.

Daddis, G. A. (2011). No Sure Victory: Measuring U.S. Army Effectiveness and Progress in the Vietnam War. Oxford University Press.

Daddis, G. A. (2017). Withdrawal: Reassessing America's Final Years in Vietnam. Oxford University Press.

Editors, H. (2020, April 17). My Lai Massacre. Retrieved from History: https://www.history.com/topics/vietnam-war/my-lai-massacre-1

Eisenhower, D. D. (1957, December 31). Dwight D. Eisenhower: 1957 : containing the public messages, speeches, and statements of the president, January 1 to December 31, 1957. Retrieved from Public Papers of the Presidents of the United States: https://quod.lib.umich.edu/p/ppotpus/4728417.1957.001/375?rgn=full+text;view=image

Engel, J. A., Lawrence, M. A., & Preston, A. (2014). America in the World: A History in Documents from the War with Spain to the War on Terror. Princeton University Press.

Fink, C., Gassert, P., Junker, D., & Mattern, D. S. (1998). 1968: The World Transformed. Cambridge University Press.

Gammeltoft, T. M. (2014). Haunting Images: A Cultural Account of Selective Reproduction in Vietnam. University of California Press.

Hall, M. (2006/2018). The Vietnam War. Routledge.

Hess, G. R. (1972). Franklin Roosevelt and Indochina. The Journal of American History, 59(2), 353–368. https://doi.org/10.2307/1890195

Hunt, A. E. (1999). The Turning: A History of Vietnam Veterans Against the War. New York University Press.

Hunt, M. H. (1996). Crises in U.S. Foreign Policy: An International History Reader. Yale University Press.

Knidsvatter, P. S. (2003). American Soldiers: Ground Combat in the World Wars, Korea, and Vietnam. University Press of Kansas.

Knock, T. J. (2003). "Come home, America": The story of George McGovern. In R. B. Woods, Vietnam and the American Political Tradition: The Politics of Dissent (pp. 82–120). Cambridge University Press.

Lawrence, M. A. (2008). The Vietnam War: A Concise International History. Oxford University Press.

Lebovic, J. H. (2019). Planning to Fail: The US Wars in Vietnam, Iraq, and Afghanistan. Oxford University Press.

Lofgren, M. (2016). The Deep State: The Fall of the Constitution and the Rise of a Shadow Government. Viking.

Malarney, S. (2002). The Realities and Consequences of War in a Northern Vietnamese Commune. In M. B. Young, & R. Buzzanco, A Companion to the Vietnam War (pp. 65–78). Blackwell Publishing Company.

Maltese, J. A. (1994). Spin Control: The White House Office of Communications and the Management of Presidential News. University of North Carolina Press.

McCain, J. S. (2008, January 28). John McCain, Prisoner of War: A First-Person Account. Retrieved from U.S. News: https://www.usnews.com/news/articles/2008/01/28/john-mccain-prisoner-of-war-a-first-person-account

Moyar, M. (2006). Triumph Forsaken: The Vietnam War, 1954–1965. Cambridge University Press.

Neilson, J. (1998). Warring Fictions: Cultural Politics and the Vietnam War Narrative. University Press of Mississippi.

Olmsted, K. S. (1996). Challenging the Secret Government: The Post-Watergate Investigations of the CIA and FBI. University of North Carolina Press.

Olson, G. A. (1995). Mansfield and Vietnam: A Study in Rhetorical Adaptation. Michigan State University Press.

Price, D. H. (2016). Cold War Anthropology: The CIA, the Pentagon, and the Growth of Dual Use Anthropology. Duke University Press.

Rotter, A. J. (2010). Light at the End of the Tunnel: A Vietnam War Anthology. Rowman & Littlefield Publishers.

Schlight, J. (1996). A War Too Long: The USAF in Southeast Asia 1961–1975. Air Force History and Museums Program.

Schulzinger, R. D. (1997). A Time for War: The United States and Vietnam, 1941–1975. Oxford University Press.

Sills, P. (2014). Toxic War: The Story of Agent Orange. Vanderbilt University Press.

Stoler, A. L. (2013). Imperial Debris: On Ruins and Ruination. Duke University Press.

Stoler, A. L. (2016). Duress: Imperial Durabilities in Our Times. Duke University Press.

Turse, N. (n.d.). Kill Anything That Moves: The Real American War in Vietnam. Metropolitan Books.

Turse, N., & Nelson, D. (2006 , August 6). Civilian Killings Went Unpunished. Retrieved from Los Angeles Times: https://www.latimes.com/news/la-na-vietnam6aug06-story.html

Wagner, S. E. (2019). What Remains: Bringing America's Missing Home from the Vietnam War. Harvard University Press.

Warren, J. A. (2013). Giap: The General Who Defeated America in Vietnam: The General Who Defeated America in Vietnam. St. Martin's Press.

Willbanks, J. H. (2004)। Abandoning Vietnam: How America Left and South Vietnam Lost Its War. University Press of Kansas.

অধ্যায় ৮

অ্যামেরিকা, ইরাক ও আফগানিস্তান



Figure 8 : পিতামাতার রক্তে রঞ্জিত Samar Hassan, মার্কিন বাহিনী যার মা-বাবাকে তাদের ছয় ভাইবোনের সামনেই সদ্য গুলি করে হত্যা করেছে।

সমগ্র পৃথিবী জুড়ে, যেকোনো দিনে সরকার অথবা রাজনৈতিক দলের হাতে একজন পুরুষ, নারী বা শিশু, বাস্তুচ্যুত, নির্যাতিত, নিহত অথবা 'গুম' হয়; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অ্যামেরিকা এর দায়ভারে অংশীদার থাকে।

-Amnesty International

চলুন, পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোর উপনিবেশীয় নৃশংসতার কথা কিছুক্ষণের জন্য ভুলে গিয়ে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে কথিত 'তৃতীয় বিশ্বের' দেশগুলোতে তাদের আক্রমণের ধরন বিবেচনা করি। এই পিরিয়ডে এসে সাম্রাজ্যবাদ ধারণ করেছে এক নব্য-উপনিবেশীয় রূপ। এখন দেশগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে 'স্বাধীন' থাকে, কিন্তু সেগুলোকে পশ্চিমা আধিপত্যের ছাতার নিচে নিয়ে আসতে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার জোরজবরদস্তী প্রয়োগ করা হয়। অ্যামেরিকা ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের এই আচরণকে ('সেক্যুলার-ধর্ম' ত্যাগ করে) নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলে নাইন ইলেভেনের পর মার্কিনীদের মনে জাগা সেই বিখ্যাত প্রশ্নটির উত্তর পাওয়া যাবে, 'কেন তারা

আমাদের ঘৃণা করে' (Bricmont, 2006)। সেই সঙ্গে তারা এটাও অনুধাবন করতে পারবে যে, আজকের ইউরোপীয় বা অ্যামেরিকানরা ইরাক কিংবা আফগানিস্তানের বাসিন্দা হলে তারাও ঠিক সেখানকার জনগোষ্ঠীর মতোই পশ্চিমাদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বহু আগে থেকেই ব্রিটেন মধ্যপ্রাচ্যে নিজেদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখার প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিল। যুদ্ধের পর সে প্রতিযোগিতায় যোগ দেয় অ্যামেরিকা; আর ব্রিটেন ধীরে ধীরে অগ্রনায়ক থেকে পার্শ্ব-নায়কের ভূমিকায় অংশগ্রহণে বাধ্য হয়। তাদের এই আগ্রহের উৎস গণতন্ত্র কিংবা স্বাধীনতা ছিল না, ছিল মধ্যপ্রাচ্যের 'অফুরন্ত' সম্পদ—যা পুঁজিবাদের কার্যকারিতা অক্ষুণ্ণ রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের প্ল্যানার জর্জ ক্যানেন মধ্যপ্রাচ্যে অ্যামেরিকার বৈদেশিক নীতির বেসিক ফ্রেমওয়ার্ক নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেন—

> 'বিশ্বের মাত্র ৬.৩% জনসংখ্যা (অ্যামেরিকায়) থাকলেও এর সম্পদের ৫০% আমাদের কাছে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে, আমরা অসন্তোষ ও হিংসার পাত্র ব্যতীত অন্য কিছুই হব না। আসন্ন সময়ে আমাদের আসল কাজ হবে (আন্তর্জাতিক) সম্পর্কের এমন এক ছক উদ্ভাবন করা যা আমাদেরকে জাতীয় নিরাপত্তায় কোনো ক্ষতি ছাড়াই অসমতার এই অবস্থানকে ধরে রাখার অনুমোদন দিবে' (Arnove, 2000, pp. 10-11)।

এবার চলুন ফিরে যাই আশির দশকে। কুয়েত আক্রমণের পূর্বে সাদ্দাম হোসেনও অ্যামেরিকা আর পশ্চিমা স্বার্থের এক যোগ্য সেবাদাস হিসেবেই ভূমিকা পালন করত। কিন্তু, এই আক্রমণ তাকে অ্যামেরিকা-ব্রিটেনের বন্ধু থেকে সরাসরি 'নব্য হিটলার'-এ পরিণত করে। ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের অমানবিক নির্যাতন আর ইসরায়েলি পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যাপারে কোনো সমস্যা অনুভব না করা অ্যামেরিকা ইরাককে নিয়ে হঠাৎ করেই মধ্যপ্রাচ্যের নিরাপত্তার ব্যাপারে 'চিন্তিত' হয়ে পড়ে।

ইরাক যখন ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে(১৯৮০-১৯৮৮) লিপ্ত হয়, তখন অ্যামেরিকা ইরাককে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে সহায়তা করে। তখন ডোনাল্ড রামস্ফেল্ড[১]-এর মতো উর্ধ্বতন মার্কিন কর্মকর্তারা তখন সাদ্দাম হোসেনের সঙ্গে ইরাকে সাক্ষাৎ করতেন; হাস্যোজ্জ্বল মুখে ছবি তুলতেন। কিন্তু, অমীমাংসিত এ যুদ্ধের শেষে সাদ্দাম হোসেন মারাত্মক অর্থনৈতিক টানাপোড়েনে পড়ে যায়। ইরাকের তেল রপ্তানির নাটকীয় পতন ঘটে; দেশটির ঋণ $৮০ বিলিয়ন ছাড়িয়ে যায়; বাৎসরিক মুদ্রাস্ফীতি ঘটে ৪০%। ইরাকে সাদ্দামের উন্নয়ন প্রকল্প থমকে দাঁড়ায়। কুয়েত, মিশর ও অন্যান্য আরব

[১] Donald Rumsfeld

রাষ্ট্র ইরাকের যুদ্ধ-ঋণ মওকুফে অস্বীকৃতি জানিয়ে দেয়; উভয়পক্ষের মাঝে তেলের মূল্য, সীমানা ইস্যু নিয়ে দর কষাকষি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ফলাফল, কুয়েতের 'অফুরন্ত' তেল-উৎসের হিসেব মাথায় রেখে অবশেষে সাদ্দাম হোসেন ২ আগস্ট ১৯৯০ আক্রমণ করে কুয়েত দখল করে নেয় (Brands, ২০০৮)।

কুয়েত আক্রমণের জবাবে অ্যামেরিকা ও তার মিত্র রাষ্ট্রগুলো ৭ আগস্ট কোয়ালিশন গঠন করে; ঐ সময়টাতে সৌদি আরব ছিল অ্যামেরিকার তেলের প্রধান উৎস। ইরাকের বিরুদ্ধে অ্যামেরিকার প্রথম পদক্ষেপ ছিল অর্থ সংক্রান্ত। তারা অ্যামেরিকার ব্যাংকগুলোতে ইরাকি সম্পদ ফ্রিজ করে দেয়, এর সঙ্গে সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যও বন্ধ ঘোষণা করে। ৯ আগস্ট অ্যামেরিকান আর্মি মুসলিমদের পবিত্র ভূমি সৌদি আরবে পৌঁছায়; সেই জাজিরাতুল আরবে, রাসূল ﷺ তাঁর মৃত্যুর পূর্বে যেখান থেকে কাফিরদের বিতাড়িত করতে বলে গিয়েছিলেন। অক্টোবরের শেষে মার্কিন আর্মি ও মেরিন বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা পৌঁছায় ২১০,০০০-সদস্যে, সাথে সাথে কোয়ালিশন-এর অন্যান্য দেশ থেকে আগত মোট সৈন্য-সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৫,০০০-এ (Doyle, 2010)।

অক্টোবর ১০, ১৯৯০, পনেরো বছর বয়সী কুয়েতের মেয়ে নায়িরাহ[১] মার্কিন 'Congressional Human Rights Caucus'-এর সামনে কান্নারত অবস্থায় সাক্ষ্য দেয়। আবগাপ্লুত কণ্ঠে সে জানায়, ইরাকি সৈন্যরা কুয়েত অভিযানের সময় হাসপাতালের ইনকিউবেটর থেকে ছোট ছোট শিশুদেরকে ঠাণ্ডা ফ্লোরে মৃত্যুর অপেক্ষায় ফেলে রাখে। আসল ঘটনা ফাঁস হবার আগ পর্যন্ত সিনেটররা তার অভিযোগ বহুবার তাদের বক্তব্যে নিয়ে আসেন; প্রেসিডেন্ট সিনিয়র বুশ পরবর্তী সপ্তাহে কয়েকবার এই ঘটনার উল্লেখ করেন (Walton, 1997; Bush G. H., 1990)। পরবর্তী দিনগুলোতে এই ঘটনা মার্কিন মিডিয়া আরও ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রচার করতে শুরু করে। কিন্তু, নায়িরাহ ইরাকী সেনাদের বিরুদ্ধে যেসব দাবি করেছিল, পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয় যে, তার সবগুলোই ছিল মিথ্যা (MacArthur, 1992)।

মেয়েটি জানিয়েছিল, তার পরিবার তখনো কুয়েতে অবস্থান করছে। কিন্তু পরবর্তীতে জানা গেল, নায়িরাহ ছিল অ্যামেরিকায় নিযুক্ত কুয়েতি রাষ্ট্রদূতের কন্যা। এই গোমর ফাস হওয়ার পূর্বে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ও মেয়েটির বক্তব্য সত্য হিসেবে দাবি করে (anonymous, 1992)। কুয়েতের 'প্রাথমিক সেবা' ব্যবস্থার ডিরেক্টর মুহাম্মাদ[২] বলেন, 'আমার মনে হয় এটা শুধু প্রোপাগান্ডার জন্যই ছিল।' অথচ বুশ দাবি করেছিলেন, ইরাকি বাহিনী শত শত শিশুকে হত্যা করেছে (Cohen, 2002)।

[১] Nayirah
[২] Mohammed Matar

ইরাকের বিরুদ্ধে অ্যামেরিকার সামরিক আক্রমণের সময় জর্ডান ব্যতীত অধিকাংশ আরব রাষ্ট্র ইরাকের কুয়েত দখলকে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক ও সামরিক ভারসাম্যের জন্য হুমকি হিসেবে গণ্য করে, এবং অ্যামেরিকার নেতৃত্বে ইরাকে সামরিক আগ্রাসনের সমর্থন জানায়। বাংলাদেশ-সহ ৩৬টি দেশ এই সামরিক আক্রমণে অংশগ্রহণ করে। সৌদি ও কুয়েত প্রত্যেকে $১ বিলিয়ন করে অর্থ প্রদান করে। যুদ্ধে তুরস্ক সরাসরি অংশগ্রহণ করেনি, কিন্তু তারা ইরাকি তেলের পাইপলাইন বন্ধ করে দেয়। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে ইরাক-অ্যামেরিকার মধ্যকার এই দ্বন্দ্ব 'ইরাক বনাম আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র'-সমূহের দ্বন্দ্বের রূপ ধারণ করে (Brands, 2008)।

স্থলযুদ্ধ শুরু হবার পূর্বে সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট গর্বাচেভ প্রস্তাব রাখেন, তিনি সাদ্দামকে তার সেনাবাহিনীকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কুয়েত ছেড়ে চলে যেতে সম্মত করবেন। কিন্তু তার সেই প্রস্তাবে সিনিয়র বুশ অস্বীকৃতি জানায়। গর্বাচেভও তার দাবিতে অটল থাকে। ফেব্রুয়ারি ২১, সে সন্ধির প্রস্তাব রাখে যে, সন্ধিতে ইরাক দুই-তৃতীয়াংশ সৈন্য সরিয়ে নিলে সিকিউরিটি কাউন্সিল নিষেধাজ্ঞা তুলে নিবে। বুশ সেই প্রস্তাবও বাতিল করে দেয়। তাই গর্বাচেভ অন্য এক প্রস্তাব রাখলেন। এবারে সৈন্য অপসারণ হবে তাৎক্ষণিক, তিন সপ্তাহের মধ্যে অপসারণ শেষ হবে; এবং তারপর নিষেধাজ্ঞা বা অবরোধ তুলে নেয়া হবে। এই প্রস্তাবটি সিকিউরিটি কাউন্সিলের শর্তসমূহ পূরণ করেছিল, কিন্তু বুশ এটিও বাতিল করে দেয়।

বাস্তবিকভাবে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট কোনো সমাধানে যেতে রাজি ছিলেন না। যখন জয়েন্ট চিফ অব স্টাফদের চেয়ারম্যান কলিন পাওয়েল বুশকে জানায় যে, স্থলযুদ্ধ আরম্ভে আর একটু অপেক্ষা করলে আক্রমণের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে। তখন তার প্রতিক্রিয়ায় বুশ তার পরিকল্পনার কথা জানান এভাবে,'যদি তারা শক্তির ভারে ভেঙে যায়, সেটি (সৈন্য) অপসারণের চাইতে উত্তম।' অর্থাৎ, শান্তিপূর্ণভাবে ঘটনার সমাধান করার কোনো ইচ্ছাই অ্যামেরিকার ছিল না। পরবর্তীকালে এই যুদ্ধে প্রায় ১০০,০০০ ইরাকি সৈন্য নিহত হয় এবং 'অন্তত' ৩৫,০০০ বেসামরিক নাগরিক অ্যামেরিকা ও বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর হাতে হত্যার শিকার হয় (Brands, 2008)। আর তিন দশক আগের সেই যুদ্ধের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব আজ পর্যন্ত ইরাকীদের জীবনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

যুদ্ধের সময় ইউএস দাবি করে, ইরাকে তাদের ও তাদের সাঙ্গপাঙ্গদের যুদ্ধ ছিল 'পরিচ্ছন্ন' যুদ্ধ, তারা সেখানে 'স্মার্ট অস্ত্র' ব্যবহার করছে—যেগুলো অ্যামেরিকা যেখানে চেয়েছে, ঠিক সেখানেই বিস্ফোরিত হয়েছে। অথচ যুদ্ধ শেষে দেখা গেল, হামলাকারীরা ইরাকের বেসামরিক অবকাঠামো-সমূহ টার্গেট করে হামলা করায় দেশটির ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, সুয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, ইলেকট্রিক জেনারেটিং প্ল্যান্ট—গুরুত্বপূর্ণ সব অবকাঠামো পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে

হচ্ছিল, তাদের কৌশলটি ছিল—এখন বোম্বিং করি, বেটারা মরুক পরে।

আগস্ট ৬, ১৯৯০, সাদ্দামের কুয়েত আক্রমণের চারদিন পর জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ ইরাকের ওপর অর্থনৈতিক অবরোধ চাপিয়ে দেয়—যেটির স্থায়িত্ব ছিল ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। ইরাকের ওপর চাপানো এই অবরোধের ব্যাপারে ইউএস, ইউকে প্রায়শই দাবি করত যে, এই অবরোধের দায়ভার পুরোপুরি সাদ্দাম হোসেনের। যাই হোক, এর প্রভাবে ইরাকে প্রয়োজনীয় মেডিসিন ও মেডিকেলের যন্ত্রাদি দুর্লভ হয়ে দাঁড়াল। ইরাকি জনগণ অতি জরুরি মেডিসিনের জন্য জাতিসংঘ আর ক্লিনটন ব্লেয়ারদের দয়ার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে; কিন্তু 'মানবতার মুক্তির দূত' জাতিসংঘ ইরাকিদের যন্ত্রণা লাঘবে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। বিশুদ্ধ পানি আর মেডিসিনের অভাবে ইরাকের শিশুরা সামান্য ডাইরিয়া, টাইফয়েডের মতো পানিবাহিত রোগে মহামারির ন্যায় মৃত্যুবরণ করতে লাগল। অথচ যুদ্ধের পূর্বে ইরাকের শিশুদের সবচেয়ে গুরুতর সমস্যা ছিল স্থূলতা সমস্যা (Arnove, 2000, p. 36)।

জাতিসংঘের 'মানবিক সহায়তা' বিষয়ক কার্যক্রমের কো-অরডিনেটর হ্যালিডে[১] ১৯৯৮-এ পদত্যাগ করে বলেন, 'আমরা একটি সম্পূর্ণ মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করার প্রক্রিয়ায় অবস্থান করছি। ... এটা অবৈধ এবং অনৈতিক।' তাকে যখন বলা হলো, অবরোধের বিধ্বংসী প্রভাবের পেছনের কারণ হলো ইরাকের শাসকগোষ্ঠীর অবহেলা, এর জবাবে তিনি বলেন, 'এটা (এ দাবি) পুরোটাই আজেবাজে কথা; প্রকৃত সত্য এই যে, সাদ্দাম হোসেন ইরানে এবং পরে কুয়েতে ঝামেলায় জড়ানোর পূর্বে তারা বেসামরিক অবকাঠামোতে বিশাল বিনিয়োগ করে। স্বাস্থ্যসেবা ক্লিনিক, গ্রাম্য ক্লিনিক, শিক্ষা, ১০,০০০ স্কুল সমগ্র দেশ জুড়ে ছড়িয়ে ছিল, (এরকম) শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা পদ্ধতি এর সকল আরব প্রতিবেশীর জন্য ছিল ঈর্ষণীয় ব্যাপার। আমরা সেখানে জড়ানোর পূর্বে ইরাকের নিজস্ব বিস্তৃত খাদ্য বিতরণ সিস্টেম (কার্যকর) ছিল' (Bricmont, 2006)। হ্যালিডের উত্তরসূরি Hans von Sponeck-ও ২০০০-এর ফেব্রুয়ারিতে তার পূর্বসূরিকে অনুসরণ করে একই কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করেন।

পরবর্তীকালে অ্যামেরিকান কর্মকর্তারা যখন স্বীকার করে সাদ্দাম হোসেনের বায়োলজিক্যাল অস্ত্র পুনর্নির্মাণের কোনো প্রমাণ তারা পায়নি, তখন মার্কিন নীতি নির্ধারকরা পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে ইরাকের সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়ার সম্ভাবনার ব্যাপারে আশঙ্কা প্রকাশ করেন। কারণ, সম্পর্ক স্বাভাবিক হলে ইরাকের ওপর থেকে অবরোধ সরিয়ে দেয়া হতে পারে। *ফরেইন অ্যাফেয়ার্স*-এর এক আর্টিকেলে RAND কর্পোরেশন-এর বিশ্লেষক ডেনিয়েল বাইম্যান দাবি করেন যে, ইরাকে অস্ত্র পরীক্ষার অচলাবস্থাই প্রকৃতপক্ষে অ্যামেরিকা ও তাদের মিত্রদের জন্য সর্বোত্তম বাস্তববাদী

[১] Denis Halliday

ফলাফল। তাই, সাদ্দাম হোসেন যদি অস্ত্র পরীক্ষার সঙ্গে সহযোগিতা করে, তাহলে সেটির দ্বারা অবরোধের সমাপ্তি ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে (Arnove, 2000, p. 15)। হারম্যান এটিকে ব্যাখ্যা করেন এভাবে,

'সাম্রাজ্যবাদীদের একটি কৌশল হচ্ছে এমন ভান করা যে, টার্গেটকৃত শত্রুকে সমঝোতার সুযোগ অফার করা হয়েছে। তারপর দ্রুতই দাবি করা যে, (শত্রুপক্ষ) সেই সুযোগ বাতিল করে দিয়েছে। আর তারপর কঠোর আক্রমণ করা কিংবা অবরোধ চলমান রাখা, যা হয়তো বিশাল অঙ্কের মানুষের প্রাণ কেড়ে নিবে। এই সিস্টেমের সৌন্দর্য এটাই যে, বোমার আঘাতে যত সংখ্যক মানুষই নিহত হোক না কেন, যত শিশুই অবরোধের ফলে মারা যাক না কেন, এটা আমাদের দোষ নয়; তারা আমাদের 'সমঝোতা' করার 'যুক্তিসঙ্গত' প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেছে। (এর মাধ্যমে) তারা নিজেরাই এটিকে তাদের ওপর বয়ে এনেছে' (Arnove, 2000)।

১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে মার্কিন নেতৃবৃন্দ খোলাখুলি বলেন, ইউনাইটেড নেশন স্পেশাল কমিশন[১] বা Unscom ইরাকে বায়োলজিক্যাল, কেমিক্যাল কিংবা নিউক্লিয়ার অস্ত্র তৈরির সক্ষমতা খুঁজে না পাওয়ার ঘোষণা দিক কিংবা না দিক, তারা অবরোধ সক্রিয় রাখবে' (Arnove, 2000, p. 27)।

১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে রিপোর্টার স্টাল[২] ইরাকে অ্যামেরিকান অবরোধের ব্যাপারে জাতিসংঘে তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ও পরবর্তীকালে সেক্রেটারি অব স্টেট, ম্যাডেলিন অলব্রাইটকে জাতীয় টেলিভিশনে জিজ্ঞেস করেন,

আমরা শুনেছি যে, অর্ধ মিলিয়ন শিশু মারা গেছে।[৩] আমি বলতে চাচ্ছি, এখানে হিরোশিমায় নিহতদের চাইতেও অধিক শিশু মারা গেছে। আর ... এর মূল্য কি যথার্থ?

অলব্রাইটজবাব দিলেন, 'আমি মনে করি এটা খুবই জটিল সিদ্ধান্ত, কিন্তু এই (শিশু হত্যার) মূল্য...আমরা মনে করি এটা যথার্থ' (Bailey & Immerman, 2015)।

অর্থাৎ, তেলের চাইতে পাঁচ লক্ষ শিশুর জীবনের মূল্য তাদের কাছে বেশি নয়। পরবর্তী দশকের ওয়ার অন টেররে যেখানে ইরাক-আফগানিস্তান মিলিয়ে প্রায় হাফ মিলিয়ন মানুষ নিহত হয়, সেখানে উপসাগরীয় যুদ্ধে শুধু অর্থনৈতিক অবরোধেই পাঁচ বছরে পাঁচ লক্ষ শিশু মারা যায়, যার পেছনে প্রধান দায়ভার ছিল অ্যামেরিকা ও জাতিসংঘের।

---

[১] United Nations Special Commission
[২] Lesley Stahl
[৩] মারা যায়নি, বরং সিস্টেমেটিক উপায়ে মেরে ফেলা হয়েছে

যুদ্ধের পূর্বে ইরাক ছিল বিশ্বের অন্যতম তেল উৎপাদনকারী দেশ। চমস্কি বলেন, পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে ইরাকের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। তবে, পশ্চিমাদের কাছে ইরাকের তেল যতটা আকর্ষণীয় ছিল, ইরাকের জনগণ ততটা 'আকর্ষণীয়' ছিল না। কারণ, অধিক জনসংখ্যা মানেই রাষ্ট্রের প্রফিট ভিনদেশী অয়েল কোম্পানির হাতে যাওয়ার বিরুদ্ধে চাপ বৃদ্ধি (Arnove, 2000, p. 53)।

ইরাকে পরোক্ষ গণহত্যা চালানো ও জাজিরাতুল আরবের পবিত্র ভূমিতে অ্যামেরিকান সৈন্যবাহিনীর পদার্পণের প্রতিবাদে আল-কায়েদা ১৯৯৮-এ কেনিয়া এবং তানজানিয়ায় মার্কিন দূতাবাসে হামলা চালিয়ে ২০০ জন এবং ২০০০ খ্রিষ্টাব্দে ইয়েমেনে মার্কিন মিসাইল ডেস্ট্রয়ারে হামলা করে ২৪ জনকে হত্যা করে। অন্যদিকে ইরাকের ওপর অবরোধ চলমান রাখার পাশাপাশি অ্যামেরিকা ১৯৯৮ এবং ১৯৯৯-এ সুদান, আফগানিস্তান ও ইরাকে বোমা হামলা চালায়। যেসকল হামলার প্রতিটি ক্ষেত্রে পশ্চিমারা নিজেদেরই প্রণীত আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে।

ডিসেম্বর ১৯৯৮-এ Unscom ডিরেক্টর বাটলার[১] তার ইন্সপেক্টরদেরকে ইরাকে মার্কিন বোমা হামলার পূর্বে সেখান থেকে নিয়ে আসেন। ইরাক বহু আগে থেকেই Unscom অফিসিয়ালদের বিরুদ্ধে অ্যামেরিকার হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ করে আসছিল। পরে ইরাকিরা যখন তাদেরকে সহায়তা করা বন্ধ করে দেয়, তখন অ্যামেরিকা ও ব্রিটেন আবারও ইরাকী জনগণের ওপর অপারেশন ডেজার্ট ফক্স[২] নামের প্রহসনের হামলা আরম্ভ করে। পরবর্তীকালে মিডিয়ায় Unscom কর্মকর্তাদের গুপ্তচরবৃত্তির খবর ফাঁস হয়ে গেলে মার্কিন সরকার তাদের কৃতকর্মের কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। প্রহসনের বিষয় এই যে, ইরাক তাদের তেল বিক্রয়ের রয়ে যাওয়া অতি অল্প পরিমাণ অর্থ দিয়ে ইরাকে জাতিসংঘের পুরো কার্যক্রমের ব্যয়ভার বহন করছিল। অর্থাৎ, ইরাকি জনগণ নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে অ্যামেরিকার গুপ্তচরবৃত্তির অর্থের যোগান দিতে বাধ্য হয়; একই সঙ্গে এর প্রতিবাদ করায় বোমা হামলারও শিকার হয় (Arnove, 2000, p. 70)।

অবরোধের প্রভাব

অবরোধের কারণে ইরাকি জনগণের হওয়া ভোগান্তি উপেক্ষা করার প্রবণতা ছিল অ্যামেরিকান ও ব্রিটিশ মিডিয়ার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। ১৯৯৯ সালে ইরাকের দুরবস্থা নিয়ে ইউনিসেফের একটি বিশেষ রিপোর্ট প্রকাশের পরও তাদের সেই ফ্রেমওয়ার্কে সামান্যই পরিবর্তন আসে। ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ইরাকে অ্যামেরিকা ও ব্রিটেনের বম্বিং এবং অবরোধের কুপ্রভাব নিয়ে ১৯৯৯ সালের ১২ আগস্ট ইউনিসেফের সেই রিপোর্ট

[১] Richard Butler
[২] Operation Desert Fox

প্রকাশের সময়কার পশ্চিমা রিপোর্টগুলো সামগ্রিকভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, মিডিয়াগুলোতে—

- ইরাকি জনগণের ওপর জাতিসংঘের অবরোধের প্রভাবকে হয় উপেক্ষা করে কিংবা ছোট করে উপস্থাপন করে।
- বোমা হামলায় বেসামরিক নাগরিকদের মৃত্যুর রিপোর্টকে উপেক্ষা করে কিংবা সন্দেহ প্রকাশ করে।
- গোটা ইরাককেই 'একজন' সাদ্দাম হোসেন হিসেবে দেখানো হয়।
- উভয় পক্ষের সংবাদ প্রচারে কৃত্রিম 'ভারসাম্য' বজায় রাখে।
- নিজেদেরকে সরকারের জায়গায় 'ধরে' বক্তব্য প্রদান করে।
- বিশেষজ্ঞদের (!) সংকীর্ণ একটি দলকে ব্যবহার করে (Arnove, 2000)।

সিবিএস এবং এনবিসি টেলিভিশন নেটওয়ার্ক ইউনিসেফের রিপোর্টকে সরাসরি উপেক্ষা করে। রিপোর্ট প্রকাশের চারদিন পর *এবিসি* বাগদাদে তখনকার জীবনযাপন নিয়ে একটি রিপোর্ট প্রচার করে। সেখানে ইরাকিদের ওপর অবরোধের প্রভাব সম্পর্কে ইউনিসেফের রিপোর্টকে পুরোপুরি উপেক্ষিত করে; তারা বরং বাগদাদের রাস্তার পাশের বাজারগুলোতে রিস্টওয়াচ বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি নিয়ে 'আদর্শ' একখানা মজাদার রিপোর্ট প্রচার করে। এনপিআর ইউইনিসেফের প্রাপ্ত তথ্যাবলি নিয়ে রিপোর্ট করতে সময় নেয় প্রায় চল্লিশ দিন, সেপ্টেম্বর-এর ২২ তারিখ তাদের প্রধান নিউজ ম্যাগাজিনে এ ব্যাপারে বার্তা প্রকাশ করা হয় (Arnove, 2000)।

আর যেসব রিপোর্টার ইউনিসেফের রিপোর্ট নিয়ে পর্যালোচনা করেন, তারা ইরাকে শিশু মৃত্যুর জন্য অবরোধই দায়ী—এই রিপোর্ট নিয়ে 'সন্দেহ' প্রকাশ করেন। তাদের মতে, এর জন্য অবরোধ নীতির পরিবর্তে ইরাকি সরকার দায়ী। *ওয়াশিংটন পোস্ট*-এর সম্পাদকীয় 'দ্যা সাফারিং অব চিলড্রেন'-এ বলা হয়,

> 'সাদ্দাম হোসেনই প্রথম ব্যক্তি নন যিনি শিশুদের দুঃখকষ্টকে যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে, তবে তার দেশের নিজেদের সন্তানদের কষ্টভোগকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে সে নিশ্চিত (বিশেষ) বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তার সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে ইরাকের সবচেয়ে অরক্ষিত জনগণকে অবরোধের বিরুদ্ধে কাজে লাগিয়ে তার ক্যাম্পেইনকে এগিয়ে নেয়া...।'

এরপর সম্পাদকীয়টিতে ইরাকি সরকারের সমালোচনা চালিয়ে গেলেও অত্যন্ত জরুরি দ্রব্যাদি সরবরাহে অ্যামেরিকা ও ইংল্যান্ডের দেরি করার কথা তারা এড়িয়ে যায়। বাচ্চাদের ভোগান্তির সমালোচনা করলেও *ওয়াশিংটন পোস্ট* ইউনিসেফের যে ধারণা—৫০০,০০০ ইরাকী শিশু মার্কিনীদের দেয়া অবরোধের কারণে মৃত্যুবরণ

করেছে—সেটির ব্যাপারেও নিশ্চুপ থাকে। *লস এঞ্জেলস টাইমস*-এর আর্টিকেলে ইউনিসেফের রিপোর্টটিকে অ্যামেরিকার 'সাদ্দাম হোসেনকে দমিয়ে রাখা এবং নিজেদের পলিসি বজায়' রাখার পথে নিছক একটি বাধা হিসেবে চিহ্নিত করে। শিশুদের পরিস্থিতি, ইরাকি নাগরিকদের ভবিষ্যৎ ছিল তাদের সমীকরণের বাইরে।

নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর একটি রিপোর্টের শিরোনামে ইউনিসেফের রিপোর্টটির কথা থাকলেও, ভিতরে শুধু সংক্ষেপে সেটির উল্লেখ করা হয়। আর তারপর সেটিতে শুধুই অপ্রমাণিত অভিযোগ আর ধাপ্পাবাজি বিবৃতি। শুধুমাত্র একটি বাক্যে রিপোর্টার বারবারা[১] তিনটি মিথ্যা দাবি করেন—'অবরোধের শুরু থেকে প্রেসিডেন্ট হোসেন বাধাহীনভাবে খাদ্য ও মেডিসিন আনতে অনুমোদনপ্রাপ্ত ছিলেন; কিন্তু, তেল বিক্রয় ব্লক করায় সে অবশিষ্ট অর্থ রাজকীয় প্রাসাদ এবং নির্মাণ প্রজেক্টে ব্যয় করার সিদ্ধান্ত নেন।'

- প্রথমত, অবরোধের শুরু থেকেই পারতপক্ষে খাদ্য ও মেডিসিন আমদানিতে সীমা নির্ধারিত হয়ে যায়।
- দ্বিতীয়ত, ইরাক সরকার 'বাধাহীনভাবে' খাদ্য ও মেডিসিন আমদানি করার অনুমোদন প্রাপ্ত ছিল না।
- তৃতীয়ত, 'খাদ্যের জন্য তেল' প্রজেক্টের অর্থ ইরাক সরকারের হাতে যেত না; বরং সম্পূর্ণ টাকা যেত জাতিসংঘের পরিচালিত Escrow একাউন্টে (Arnove, 2000)।

❁ বোমা বিস্ফোরণে হতাহত বেসামরিক নাগরিক

১৯৯৮-এর ১৬ ডিসেম্বর আক্রমণের পর বোমা হামলার চলাকালীন সময়ে ইরাক নিয়ে প্রকাশিত ১০০০টি সংবাদের মাত্র দশ শতাংশ সংবাদে 'বেসামরিক হতাহত'-এর তথ্য উপস্থাপিত হয়। ডিসেম্বরে বোমাবাজির মাঝেই ব্রিটিশ মন্ত্রীরা 'শহরের হাসপাতালগুলোতে পশ্চিমা সাংবাদিকদের (প্রবেশের) অনুমতি দেয়ার ইরাকি "কৌশল" নিয়ে চিন্তিত' ছিলেন। তাই তারা ব্রিটিশ সাংবাদিকদেরকে বেসামরিক নাগরিকদের হতাহতের ঘটনার ব্যাপারে গুরুতর সন্দেহপ্রবণতার চর্চা করার আহ্বান জানায়। ডিসেম্বর ১৯, লস এঞ্জেলস টাইমস বিবৃতি দেয় যে, 'বেসামরিক হতাহতের ঝুঁকি নেয়ার ব্যাপারে (মার্কিন) প্রশাসনের তীব্র অনীহা বেশ স্পষ্ট।' বাস্তবিকভাবে, বেসামরিক ভুক্তভোগীদের ব্যাপারে সংবাদ দমন কিংবা অস্বীকার করার ব্যাপারে প্রশাসনের প্রচেষ্টাই বরং সুস্পষ্ট ছিল। আর টাইমস তাদের এই মিথ্যা দাবির পক্ষে শুধুই পেন্টাগনের বিবৃতি ছাড়া আর কোনো প্রমাণই উপস্থাপন করেনি (Arnove, 2000)।

[১] Barbara Crosette

এছাড়াও ইরাকি জনগণের ওপর হামলাকে 'টার্গেট সাদ্দাম' হিসেবে অভিহিত করা, সাংবাদিকরা সরকারের স্থানে 'আমরা' অর্থাৎ নিজেদেরকে বসিয়ে পরিস্থিতির পক্ষ-বিপক্ষ আলোচনা করা, ইরাকি জনগণের সুস্পষ্ট ভোগান্তিকে ইরাক সরকারের 'দাবি' হিসেবে চিহ্নিত করা, আর অবরোধপন্থী 'বিশেষজ্ঞদের' জয়জয়কারের ভিড়ে গুটিকয়েক 'আউটসাইডার' অবরোধ বিরোধী বিশেষজ্ঞকে সাধারণত টেলিফোনে সাক্ষাৎকার নেয়া—এই ছিল মার্কিন 'সাম্যবাদী' 'নিরপেক্ষ' মিডিয়ার সামগ্রিক চরিত্র।

ইরাকের ওপর চাপানো অবরোধে ধীরে ধীরে ভুগে মারা যায় কমপক্ষে ১.৫ মিলিয়ন ইরাকি—যাদের অধিকাংশই শিশু—নাগরিক, যাদের মৃত্যুর জন্য প্রধানত দায়ী অ্যামেরিকা, ব্রিটেন, জাতিসংঘ। এটাকে গণহত্যা বলা না হলে আর কোন ঘটনাকে গণহত্যা বলা যাবে?

৯/১১

সেপ্টেম্বর ১১, ২০০১। ঊনিশ জন মুসলিম যাত্রী চারটি ক্যালিফোর্নিয়াগামী বাণিজ্যিক বিমান হাইজ্যাক করে। এর মধ্যে দুটি নিউ ইয়র্কে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্তারের নর্থ ও সাউথ টাওয়ারে আঘাত করে, অপর একটি পেন্টাগনে ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টে আঘাত করে। আর সর্বশেষ বিমানটি সম্ভবত ক্যাপিটল হিল-এ বিধ্বস্ত করবার পরিকল্পনা থাকলেও সেটি ব্যর্থ হয়। এই হামলায় নিহত হয় প্রায় ৩০০০ অ্যামেরিকান।

মুসলিম জনপদগুলোতে অ্যামেরিকার তৎকালীন নৃশংসন সব গণহত্যার প্রতিশোধ নিতেই AQ দুর্ধর্ষ এই হামলা পরিচালনা করে[১]। ভয়ানক ৯/১১-এর এই হামলার পর জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে বুশ বলেন, 'অ্যামেরিকাকে হামলার টার্গেট করা হয়েছে। কারণ, আমরা স্বাধীনতা ও সুযোগ-সুবিধাতে বিশ্বের উজ্জ্বলতম বাতিঘর' (Bush G. W., 2001a)। তার ভাষায়, এই আক্রমণ ছিল 'সর্বনিকৃষ্ট মানব চরিত্রের প্রতিনিধিত্বকারী ঘটনা।' তিনি বলেন, তিনি আক্রমণকারী ও তাদের আশ্রয় দানকারীদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করবেন না। সেপ্টেম্বর ২০, ২০০১-এ তিনি দাবি করেন, 'সকল অঞ্চলের প্রতিটি রাষ্ট্রকে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে; হয়

[১] আমি AQ-এর হামলার সমর্থন বা প্রচার করছি না, হামলার পেছনের কারণ দেখাচ্ছি। ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন না থাকায় অনেকেই ভাবে ৯/১১ এর হামলার কারণেই অ্যামেরিকা মুসলিম রাষ্ট্রে হামলা করেছে; অর্থাৎ ৯/১১ হলো কারণ (cause) আর ওয়ার অন টেরর হলো এর প্রভাব (effect)। অথচ প্রকৃত সত্যটি হলো, মুসলিম ভূখণ্ডে অ্যামেরিকার গণহত্যা আর অপকর্মের (cause) কারণেই ৯/১১ এর হামলা (effect) পরিচালিত হয়। একটা কথা স্পষ্টভাবে মাথায় রাখা উচিত, লিবারেল সেক্যুলারিজমের বিজয়ই ইতিহাসের শেষ নয়, আর ৯/১১-ই ইতিহাসের শুরু নয়।

আপনারা আমাদের সঙ্গে অথবা সন্ত্রাসীদের সঙ্গে' (Bush G. W., Transcript of President Bush's address, 2001b)।

এখানে বলে রাখা ভালো, অ্যামেরিকার যে গণতন্ত্র, সে গণতন্ত্রে গণমাধ্যম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অ্যামেরিকার আধিপত্য টিকিয়ে রাখতে মার্কিন গণমাধ্যমগুলো যুদ্ধ, (ভিনদেশে মার্কিন) হস্তক্ষেপ ও সামরিকায়নকে প্রোমোট করতে শুরু করে। ফলাফলস্বরূপ, মার্কিন মিডিয়া পরিণত হয় রাষ্ট্রীয় প্রোপাগান্ডার একো চ্যাম্বারে (Coyne, 2021, Advance Praise)। ওয়াশিংটন থেকে হলিউড—সব জায়গায়ই মার্কিন প্রোপাগান্ডা স্থূল, সূক্ষ্ম আকৃতিতে বিদ্যমান। তাই অ্যামেরিকার[১] সংবাদমাধ্যমের প্রকৃত চেহারা বুঝতে চাইলে সেখানকার 'এলিট' মিডিয়াগুলোর দিকে নজর বুলানো প্রয়োজন। কারণ, 'এলিট' মিডিয়াগুলোই অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্যান্য মিডিয়া ও জনগণের মধ্যে আলোচনার ধারা নির্ধারিত করে দেয় বা দেয়ার চেষ্টা করে।

৯/১১ হামলার পর মার্কিন সাংবাদিকরা ঝুঁকে পড়ে যুদ্ধের দিকে। সম্পাদকীয় থেকে শুরু করে সব জায়গায় যুদ্ধের সমর্থনে সংবাদ, মতামত প্রকাশিত হতে শুরু করে। *নিউ ইয়র্ক টাইমস*-এর মতো মূলধারার সকল সংবাদপত্রগুলো প্রেসিডেন্টকে সমর্থনের প্রয়োজনীয়তা ঘোষণা করে (anonymous, War Without Illusions, 2001)।

অক্টোবর ০৭, ২০০১, অ্যামেরিকা, ব্রিটেন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও অন্যান্য মোট ৪০টি রাষ্ট্র 'সন্ত্রাস দমন'-এর নামে আফগানিস্তানে হামলা চালায়। সেপ্টেম্বর ১১, ৯/১১-এর হামলা থেকে অক্টোবর ০৮—আফগান যুদ্ধ শুরুর আগ পর্যন্ত অ্যামেরিকার সর্ববৃহৎ দশটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত ১০৪ টি সম্পাদকীয়ের একটিতেও কোনো সম্পাদক এই দাবি করেনি যে, এই অবৈধ সামরিক আগ্রাসন সঠিক সিদ্ধান্ত নয়। আসলে তখন কেউই ধারণা করেনি, তারা আগ্রাসনের পেছনে থাকা 'কাঙ্ক্ষিত' লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হবে। বরং, উল্লখিতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র অফিসিয়াল সোর্স নিয়ে আলোচনা করা হয়, যা অনুমিতভাবেই যুদ্ধপন্থি ছিল (Ryan, 2004)।

এ সময়ে যুদ্ধের সমর্থন বৃদ্ধির পিছনে মিডিয়ার প্রভাবের চিত্রটা বেশ চমকপ্রদ। সেপ্টেম্বর '০১-এ ABC/ Washington Post-এর জরিপে দেখা যায়, যারা বুশের বক্তব্য শুনতেন, তাদের মাঝে প্রেসিডেন্টকে সমর্থনের হার বৃদ্ধি পায় এবং আফগানিস্তান যুদ্ধ-সহ সামরিক আগ্রাসনের প্রতি সমর্থন বৃদ্ধি পায় (DiMaggio, 2015, p. 23, Figure 1.1)। অক্টোবর ২০০১ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০০২-এর মধ্যে ৮০% অ্যামেরিকান নাগরিক সংবাদ-মাধ্যমগুলো 'নিবিড়ভাবে' পর্যবেক্ষণ করেন

[১] নিবন্ধে ব্যবহৃত 'অ্যামেরিকা'।

(DiMaggio, 2015, p. 24, Figure 1.3)। আর নভেম্বর ২০০১ থেকে জানুয়ারি ২০০২ এর মধ্যে যারা আফগানিস্তান সম্পর্কিত সংবাদে নজর রেখেছেন, তাদের মাঝে যুদ্ধের ব্যাপারে উদ্যম বৃদ্ধি পায়[১] (DiMaggio, 2015, p. 25, Figure 1.5)।

মার্কিনীদের হামলার পর তালেবানরা যখন রাজধানী থেকে পিছু হটে, তখন আফগানিস্তান যুদ্ধে আপাত 'বিজয়' লাভ করে অ্যামেরিকার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় ইরাকের ওপর। ২০০২-এর সেপ্টেম্বরে ইরাক যুদ্ধের প্রোপাগান্ডা ক্যাম্পেইনের সূচনা হলে মিডিয়ার ফোকাস আফগানিস্তান থেকে পরিবর্তিত হয়ে টার্গেট করে ইরাককে। অক্টোবর ও নভেম্বর-এ ডেমোক্রেটরা যুদ্ধ আয়োজনের সমালোচনা করলে এ বিষয়ে প্রতিবেদন সংখ্যা আবারও কমে যায়। অতঃপর যুদ্ধ শুরুর আগমুহূর্তে, মার্চ ২০০৩-এ পত্রিকাগুলোতে ইরাক ও গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্র[২]-সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদনের সংখ্যা গড়ে প্রায় ৭০টি-তে পৌঁছায় (DiMaggio, 2015, Figure 2.1)।

২০০৪-এ *ওয়াশিংটন পোস্ট*-এর সাবেক মিডিয়া এডিটর কুর্টজ[৩] রিপোর্ট করেন, 'আগস্ট ২০০২ থেকে মার্চ ১৯, ২০০৩ তারিখে যুদ্ধ শুরু হওয়া পর্যন্ত ১৪০টি প্রথম পাতার সংবাদ ইরাকের বিরুদ্ধে (মার্কিন) প্রশাসনের ব্যাখ্যার ওপর গভীরভাবে ফোকাস করেছে' (Finnegan, 2007, p. 67)। আরেক পুলিৎজার পুরস্কারপ্রাপ্ত সাংবাদিক ডি জং বলেন, তার কর্মক্ষেত্র *ওয়াশিংটন পোস্ট* 'ক্ষমতায় থাকা যে-কারও মুখপাত্র' হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে (Kurtz, 2004)।

নিউ ইয়র্ক টাইমস—বিশেষ করে তাদের রিপোর্টার জুডিথ মিলার—অফিসিয়াল বার্তা প্রচারে গুরুতর ভূমিকা পালন করে। সেপ্টেম্বর ৮, ২০০২, মিলার দাবি করে, 'ইরাক পারমাণবিক অস্ত্রের সন্ধানে এগিয়ে গেছে এবং পারমাণবিক বোমা তৈরির উপাদানের খোঁজে বিশ্ব জুড়ে অভিযানে বেরিয়েছে' (Gordon & Miller, 2002)। সেপ্টেম্বর ১৩, (ওয়াইট হাউজের বরাতে) মিলার পুনরায় কলাম লিখলেন। সেখানে তিনি সাদ্দাম হোসেনের বিরুদ্ধে 'কেমিক্যাল, বায়োলজিক্যাল ও নিউক্লিয়ার' অস্ত্র তৈরির প্রচেষ্টার অভিযোগ তোলেন (Miller & Gordon, 2002b)। নভেম্বর ১২, মিলার ইরাকের বিরুদ্ধে নার্ভ গ্যাস সংশ্লিষ্ট ড্রাগের অভিযোগ তোলেন। মার্চ ১৯, ২০০৩, এবার তিনি সাদ্দামের অবৈধ অস্ত্র 'সন্ত্রাসী'দের কাছে বিক্রয় করার পূর্বেই সেগুলো খুঁজে বের করার প্রত্যয় জানান (Miller, 2003a)।

এবার আসুন ডিসেম্বর ৯, ২০১৯ এর একটা রিপোর্ট দেখি। এদিন *ওয়াশিংটন পোস্ট* 'At War with the Truth' শিরোনামে একটি তথ্যবহুল রিপোর্ট প্রকাশ

[১] ঐ সময়টিতে মার্কিনীরা মিডিয়ার প্রভাব ছাড়াই আফগানিস্তান যুদ্ধ সমর্থন করত।
[২] Weopon of Mass Destruction, WMD
[৩] Howard Kurtz

করে। সেখানে SIGAR[১] নামক ফেডারেল এজেন্সির, আফগান যুদ্ধে সরাসরি ভূমিকা রাখা অফিসারদের ইন্টার্ভিউ নিয়ে প্রকাশিত ২০০০ পৃষ্ঠার ডকুমেন্টে দেখা যায়, উচ্চপদস্থ মার্কিন লিডারদের দৃষ্টিতে এই যুদ্ধ ছিল অজেয় এক যুদ্ধ। কিন্তু তারা এই তথ্য অ্যামেরিকান নাগরিক ও কংগ্রেসের কাছ থেকে গোপন রাখে। SIGAR-এর প্রধান John Sopko ওয়াশিংটন পোস্ট-এর কাছে স্বীকার করে, আফগান পেপার এটি উন্মোচিত করেছে যে, 'অ্যামেরিকান নাগরিকদের কাছে প্রতিনিয়ত মিথ্যা বলা হয়েছে' (Whitlock, 2019)। প্রায় এক দশক পূর্বে আফগান যুদ্ধের অফিসার ডেভিসও[২] বলেছিলেন, 'সিনিয়র মার্কিন মিলিটারি লিডাররা ইউএস কংগ্রেস ও মার্কিন নাগরিকদের সঙ্গে আফগানিস্তানের মাটিতে (যুদ্ধ) পরিস্থিতি নিয়ে যোগাযোগের সময় সত্যকে এতটাই বিকৃত করেছে যে, সত্য (এখন) হয়ে গেছে অচেনা' (Davis, 2012)।

আবার চলুন ফিরে যাই অতীতের দিকে। মার্চ ১৯, ২০০৩, আফগানিস্তানের পর অ্যামেরিকা ও ব্রিটেন আক্রমণ করে ইরাক। এপ্রিল ১০, আক্রমণকারী বাহিনীর হাতে পতন হয় ইরাকের রাজধানী বাগদাদের। মে ১, বুশ জুনিয়র যুদ্ধের প্রধান অপারেশনগুলোর সমাপ্তি ঘোষণা করেন। কিন্তু, এর কিছুদিন পরই আগ্রাসনকারীদের বিপক্ষে নির্যাতিত ইরাকিদের অভ্যুত্থান ঘটে।

ইরাক যুদ্ধের প্রোপাগান্ডা ক্যাম্পেইনের প্রথম পর্যায়ের প্রাথমিক উপাদান ছিল ভয় সৃষ্টি[৩]; আর সেটির সহায়ক উপাদান হিসেবে ছিল মানবাধিকার, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ইত্যাদি। যুদ্ধের নৈতিকতার প্রশ্নে মিডিয়া প্রেসিডেন্ট বুশকে সমালোচনাবিহীন সমর্থন দেয়, যার ফলে অফিসিয়াল প্রোপাগান্ডা কোনো ধরনের ফিল্টারিং ছাড়াই একেবারে তরতাজা মৌলিক[৪] আকৃতিতে জনগণকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয় (DiMaggio, 2015)।

ইরাক যুদ্ধ 'বিক্রয়'-এর ক্যাম্পেইন পুরোদমে শুরু হয় ২০০২-এর শেষার্ধে। ২০০২ থেকে ২০০৩—এই সময়ের মধ্যে মিডিয়ার সহযোগিতায় বুশ প্রশাসন বিশ্বের ইতিহাসের অন্যতম বৃহৎ পাবলিক রিলেশন ক্যাম্পেইনটি পরিচালনা করে। আর সেই ক্যাম্পেইন সফলতার সঙ্গে ইরাক যুদ্ধের সমর্থনে অ্যামেরিকার জনমত বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়।

অথচ যুদ্ধ শুরু হবার সাত বছর পর জুলাই ২০১০-এর এক Gallup Poll-এ দেখা যায়, 'সাধারণভাবে, ইরাকে অ্যামেরিকার বিষয় (অবস্থা) কেমন যাচ্ছে বলে

---

[১] Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction
[২] Lieutenant Colonel Daniel Davis
[৩] Rhetoric of fear
[৪] Raw

আপনার মনে হয়'- এই প্রশ্নের জবাবে প্রায় ৪৮% অ্যামেরিকান নেতিবাচক উত্তর দেয়। কিন্তু, যুদ্ধের প্রারম্ভিক পর্যায়ে প্রোপাগান্ডার তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে, ২০০৩-এর এপ্রিলে ঠিক একই প্রশ্নের জবাবে ২১% উত্তরদাতা জবাব দিয়েছিল, যুদ্ধ 'খুবই ভালো' চলছে। আরও ৬৪% বলেছিলেন 'মোটামুটি ভালো'। ঐ সময়ে মাত্র ২% মনে করতেন যে, অ্যামেরিকার আক্রমণ 'খুবই বাজে' পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। একই সময়ের (২০০৩) জরিপে দেখা যায় ৫৮% অ্যামেরিকান মনে করতেন, ইরাক যুদ্ধ অ্যামেরিকাকে নিরাপদ করেছে। ২০০৩ এর মার্চে ৬৮% অ্যামেরিকান নাগরিকের ধারণা ছিল, ইরাক যুদ্ধে জড়ানো (লাভক্ষতির হিসেবে) যথার্থ ছিল। ঐ সময়ে ৭৩% মার্কিন নাগরিক ইরাক যুদ্ধকে নৈতিকভাবে বৈধ মনে করত। একই মাসে ৫১% অ্যামেরিকান নাগরিক বিশ্বাস করত, সাদ্দাম হোসেন ৯/১১ এর সঙ্গে জড়িত ছিল (Gallup, 2017)।

ইরাকে হামলার ব্যাপারে মার্কিন সরকারের উদ্দেশ্য ছিল বহুমুখী, তবে ইরাকের তেলের উৎপাদন এগুলোর মধ্যে প্রধানতম একটি বিষয় ছিল। তারা ইরাকে আক্রমণের যৌক্তিকতা হিসেবে বেশ কয়েকটি 'কারণ' দেখায়। সেগুলো হলো—

- ইরাকের অধীনে থাকা গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্র (WMD) ও নিউক্লিয়ার বোমা
- 'সন্ত্রাসী' গোষ্ঠীর সঙ্গে ইরাকের আঁতাত
- ইরাক আক্রমণে বৈশ্বিক সম্মতি

পরবর্তীকালে দেখা যায়, উল্লিখিত প্রতিটি ক্ষেত্রে অ্যামেরিকান প্রশাসন ও মিডিয়া অবিরত মিথ্যার পর মিথ্যা বলে গেছে। সেগুলোর কিছু নিয়ে আমরা আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ।

সাদ্দাম হোসেন ও গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্র

২০০২ সালে বুশ প্রশাসন WHIG[১] প্রতিষ্ঠা করে, যেটির সদস্য ছিল রাইস, প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা রোভ, ভাইস প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা লুইস লিবিও অন্যান্য হেভিওয়েট কর্মকর্তারা (Anderson, 2015; Kucinich, 2008)। এই টাস্কফোর্সের কাজ ছিল ইনফরমেশন রিলিজের সময় সাবধানতার সঙ্গে প্রশাসনের প্রতিটি সেক্টরে একই 'তথ্য' প্রচারের কাজটি নিশ্চিত করা। যেন বুশ প্রশাসনের যুদ্ধ বিক্রয়ের ক্যাম্পেইনে কোনো ফাঁকফোকর না থাকে। আর মিথ্যা প্রচারণার ফলস্বরূপ, সেপ্টেম্বর ২০০২-এ *সিবিএস* পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায়, ৮০% অ্যামেরিকান ধারণা করতেন, ইরাকে মারণাস্ত্র রয়েছে। আর ৬২% মনে করতেন, ইরাক সেগুলো

[১] White House Iraq Group

আমেরিকার বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে (NYT, n.d.)।

যাইহোক, ইরাকের তথাকথিত মারণাস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ শুরুর আগে তাদের চালানো প্রোপাগান্ডার টাইমলাইন (Hinchey, 2007) ছিল অত্যন্ত চমকপ্রদ আর বিস্ময়কর—

- আগস্ট ২৬, ২০০২, তৎকালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট চিনী[১] বলেন, '...কোনো সন্দেহ নেই যে, সাদ্দাম হোসেনের নিকট বর্তমানে মারণাস্ত্র রয়েছে। কোনো সন্দেহ নেই যে, সে ওইগুলো আমাদের বন্ধু, আমাদের মিত্র ও আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য স্তূপীকৃত করছে' (Cheney, 2002)।
- আগস্ট ২৬, ২০০২, চিনী বলেন, '[ইরাকের] এসকল অস্ত্রাদি ইরাককে রক্ষার জন্য নয়। এসব আক্রমণাত্মক অস্ত্র গণহারে মরণ আঘাত হানার উদ্দেশ্যে (রাখা হয়েছে) ...।' (২০০২)।
- সেপ্টেম্বর ২৮, ২০০২, ইরাকের বিষয়ে বুশ 'তথ্য' দেয় যে, ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স আশঙ্কা প্রকাশ করেছে, 'ইরাক সরকার নির্দেশ দেবার ৪৫ মিনিটের মধ্যে (ইরাক) বায়োলজিক্যাল বা কেমিক্যাল আক্রমণ চালাতে সক্ষম' (Bush G. W., 2002a)।
- অক্টোবর ২, ২০০২, বুশ বলেন, 'বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে ইরাক সরকার এক স্বতন্ত্র জরুরি অবস্থা (সৃষ্টিকারী) হুমকি (স্বরূপ)। আমরা এ সরকারের বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ণ ইতিহাস জানি। ... তারা সন্ত্রাসীদের অর্থায়ন ও আশ্রয় দিয়েছে, তারা গণহত্যার মারণাস্ত্র আবিষ্কার করেছে। তারা সেগুলো নিরীহ নারী-পুরুষ ও শিশুদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে' (Bush G. W., 2002d)।
- অক্টোবর ৭, ২০০২, Cincinnati Speech-এ বুশ বলেন, 'যদি আমরা জানি যে, আজ সাদ্দাম হোসেনের কাছে ভয়ংকর অস্ত্রাদি রয়েছে—এবং আমরা (সেটি) জানি—তাহলে তার মুখোমুখি হতে বিশ্বের অপেক্ষা করার কি কোনো যৌক্তিকতা আছে? যেখানে সে আরও শক্তিশালী হচ্ছে এবং অধিক ভয়ংকর অস্ত্রের উন্নয়ন ঘটাচ্ছে?' বুশ তার বক্তব্যে স্মরণ করেন, সাদ্দাম 'হাজার হাজার টন কেমিক্যাল এজেন্ট' উৎপাদন করেছিল, এবং 'ইরান ও তার নিজ দেশে চল্লিশটির বেশি গ্রামে রাসায়নিক আক্রমণের নির্দেশ দেয়' যা '২০,০০০ মানুষকে আহত/নিহত করে, ৯/১১ এর আক্রমণে নিহতদের চেয়ে ছয় গুণ বেশি' (Bush G. W., 2002e)।
- জানুয়ারি ২৮, ২০০৩, স্টেট অব দ্যা ইউনিয়ন এড্রেস-এ বুশ দাবি করেন, ইরাকের মতো বাতিল রাষ্ট্রের হাতে বায়োলজিক্যাল অস্ত্র থাকা বিশ্বের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি (Bush G. W., 2003f)।

---

[১] Dick Cheney

- ফেব্রুয়ারি ৫, ২০০৩, জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ-এ সেক্রেটারি অব স্টেট পাওয়েল[১] উল্লিখিত সবগুলো মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে ইরাকের চলমান বায়োলজিক্যাল অস্ত্রের ল্যাব থাকার দাবি করেন (Powell, 2003b)।

যুদ্ধ শুরুর এক মাস পূর্বেই আন্তর্জাতিক অস্ত্রের নিরীক্ষকরা কোয়ালিশন লিডারদের সতর্কবার্তা দিয়ে বলেছিলেন, ইরাকে সম্ভবত কোনো মারণাস্ত্র পাওয়া যাবে না। পরবর্তীকালে, মার্চ ১, ২০০৫-এ ব্রিটিশ সরকারের ফাঁস হওয়া এক নথিতে প্রমাণিত হয় যে, বুশ প্রশাসন মারণাস্ত্র-এর ব্যাপারে জনগণকে প্রতারিত করে ইরাক যুদ্ধের পথ তৈরি করেছে। 'Downing Street Memo', সাবেক ব্রিটিশ প্রাইম মিনিস্টার টনি ব্লেয়ার ও তার সিনিয়র ন্যাশনাল সিকিউরিটি টিম-এর ২৩ জুলাই, ২০০৩-এর বৈঠকের সারাংশ প্রকাশ করে (Manning, 2002)। এই মেমোতে পাওয়া তথ্যগুলো ছিল :

- ফরেইন সেক্রেটারি স্ট্র মিটিং-এ ইঙ্গিত দেন, বুশ ইতিমধ্যেই ইরাকে সামরিক আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন।
- সাবেক ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসেসের প্রধান রিচার্ড[২] বিশ্বাস করেন, 'এখন সামরিক আক্রমণ অবশ্যম্ভাবী বলেই দৃশ্যমান।'
- 'বুশ সাদ্দাম হোসেনকে সামরিক আক্রমণের মাধ্যমে সরাতে চেয়েছিলেন' সন্ত্রাস আর মারণাস্ত্রকে একসাথে ব্যবহার করে আক্রমণকে বৈধতা দিয়ে। সেই লক্ষ্যে ইন্টেলিজেন্স আর তথ্যসমূহ পলিসির চতুর্দিকে 'সাজানো' হচ্ছিল (Vlahos, 2015)।

উপসাগরীয় যুদ্ধের পর ১৯৯১-এ জাতিসংঘ সিকিউরিটি কাউন্সিল ধারা ৬৮৭-এর মাধ্যমে ইরাককে 'অবৈধ' অস্ত্রমুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সিদ্ধান্তের অধীনে জাতিসংঘ তাদের UNSCOM-কে ইরাকের অভ্যন্তরে পর্যবেক্ষণ করার প্রস্তাব দেয়। ৯/১১-এর পরের বছর সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘে বুশের দেয়া বক্তব্যের পর নভেম্বর ২০০২-এ জাতিসংঘ সিকিউরিটি কাউন্সিল ধারা ১৪৪১-এর অধীনে পর্যবেক্ষকরা ইরাকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ইরাক তাতে সম্মতও হয়। ইন্সপেক্টররা ইরাকে যেকোনো গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্রের কোনো চিহ্নই খুঁজে পাননি।

অর্থাৎ, একদিকে প্রশাসন ঘোষণা করে, ইরাক যদি আন্তর্জাতিক ইন্সপেক্টরদের অস্ত্র পরিদর্শন করার সম্মতি দেয়, তাহলে তারা যুদ্ধ বর্জন করতে ইচ্ছুক। অপর দিকে ইরাক আক্রমণ করার ব্যাপারে আগেই অ্যামেরিকা সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিল। অবশ্য কয়েক বছর পর—ডিসেম্বর ১৪, ২০০৫—বুশ নিজেই আসল তথ্য ফাঁস করে সগর্বে

[১] Colin Powell
[২] Richard Dearlove

বলেন, মারণাস্ত্র ও পারমাণবিক বোমা না থাকলেও তিনি ইরাক আক্রমণ করবেন (Legum & Rupar, 2005; Goldman, 2008)।

ইরাকের নিউক্লিয়ার প্রোগ্রাম

ইরাকের ইউরেনিয়াম কেনার ব্যাপারে বুশ প্রশাসনের মিথ্যা অভিযোগ করে। এরপর সিআইএ তাদের অফিসার ইউলসনকে সে তথ্য যাচাই করতে আফ্রিকায় পাঠায়। তিনি নাইজারে অনুসন্ধান শেষে জানুয়ারি ২০০৩-এ *নিউ ইয়র্ক টাইমস*-এর এক আর্টিকেলে এ ধরনের দাবিকে ঘোরতর সন্দেহজনক হিসেবে সাব্যস্ত করেন (Wilson, 2003)। মার্চ ২০০৩-এ জাতিসংঘের প্রধান নিউক্লিয়ার ইন্সপেক্টর ও অন্যান্য স্বতন্ত্র বিশেষজ্ঞরা সাবধানতার সঙ্গে পরীক্ষার পর ইরাকের ইউরেনিয়াম কেনার ব্যাপারে অ্যামেরিকা ও ব্রিটেনের দেখানো ডকুমেন্টগুলোর ব্যাপারে বলেন, সেগুলো 'আসল' নয় (Warrick, 2003)। কেবল ইরাক আক্রমণকে বৈধতা দিতেই নকল নথিগুলো প্রস্তুত করা হয়।

বুশ প্রশাসন ইরাকের ইউরেনিয়াম কেনার ব্যাপারে নকল দলিলকে পুঁজি করে দাবি করে, ইরাক পারমাণবিক বোমা তৈরি করতে যাচ্ছে (Risen, 2003)। কিন্তু, তাদের নকল দলীল ব্যবহারের এই তথ্য ফাঁস হয় যুদ্ধ শুরুর পর। এর আগেই অবশ্য অ্যামেরিকান সরকার ও মিডিয়া প্রায় জোরপূর্বক 'প্রমাণ' করে ফেলে যে, ইরাকে নিউক্লিয়ার প্রোগ্রাম চলছে।

চলুন ইরাকের তথাকথিত নিউক্লিয়ার প্রোগ্রামের ব্যাপারে অ্যামেরিকার প্রাপ্ত প্রকৃত তথ্যের টাইমলাইন (Hinchey, 2007) দেখে নিই—

- ডিসেম্বর ২০০১, ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটি ধারণা করে যে, ইরাক তার নিউক্লিয়ার বোমার প্রোগ্রাম চালু করেনি।
- অক্টোবর ২০০২, ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স এস্টিমেট[১] সিদ্ধান্তে পৌঁছায়, ইরাকে কোনো নিউক্লিয়ার অস্ত্র নেই বা অস্ত্র বানাতে প্রয়োজনীয় উপাদান নেই।
- অক্টোবর ৬, ২০০২, সিআইএ হোয়াইট হাউজকে পরামর্শ দেয়, 'দুর্বল' প্রমাণ ব্যবহার করে ইরাকের আফ্রিকা থেকে ইউরেনিয়াম খোঁজার কথা প্রেসিডেন্টের বক্তব্য থেকে প্রত্যাহার করা উচিত।
- জানুয়ারি ২৯, ২০০৩, ইন্টারন্যাশনাল এটমিক এনার্জি এ্যাসোসিয়েশন[২] বা IAEA-এর প্রধান মুহাম্মাদ আল-বারাদি[৩] বলেন, ইরাকে দুই মাস তত্ত্বানুসন্ধান

[১] National Intelligence Estimate
[২] International Atomic Energy Association
[৩] Mohamed El Baradei

ও ইরাকি অফিসিয়ালদের সাক্ষাৎকার নিয়ে তারা বুশ প্রশাসনের পারমাণবিক প্রোগ্রামের ব্যাপারে করা অভিযোগের কোনো প্রমাণ খুঁজে পাননি (Lynch, 2003)।

- মার্চ ৭, ২০০৩, ইরাকে দায়িত্বরত প্রধান পারমাণবিক অস্ত্র নিরীক্ষক মুহাম্মাদ আল-বারাদি জাতিসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে রিপোর্ট পেশ করে যে, ইন্সপেক্টররা 'ইরাকের নিউক্লিয়ার প্রোগ্রাম আরম্ভের কোনো প্রমাণ বা বিশ্বাসযোগ্য ইঙ্গিত' পাননি (Rich, 2006)।
- মার্চ ১১, ২০০৩, সিআইএ মন্তব্য করে, IEAE-এর রিপোর্টের ব্যাপারে তাদের কোনো সন্দেহ নেই।

অর্থাৎ, ইরাকে কোনো নিউক্লিয়ার অস্ত্র পাওয়া যাবে না, এ ব্যাপারে অ্যামেরিকা যুদ্ধের আগেই পরিষ্কার ধারণা রাখতো। বুশ প্রশাসনের ইরাকের অ্যালুমিনিয়াম টিউব কেনার ব্যাপারে মিথ্যাচারের পর ইন্সটিটিউট ফর সাইন্স এন্ড ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটি বা ISIS জানায়, প্রশাসনের সঙ্গে যেসব মার্কিন নিউক্লিয়ার বিশেষজ্ঞ ভিন্নমত পোষণ করে, তাদের কাছে মৌন অবস্থান আশা করা হয়। বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একজন অভিজ্ঞ মন্তব্য করেন, প্রেসিডেন্ট যা বলার বলেছেন, কাহিনী এখানেই সমাপ্ত (Aluminum Tubing, 2002)।

এ তো গেল ইরাকের নিউক্লিয়ার প্রোগ্রামের ব্যাপারে অ্যামেরিকার পাওয়া তথ্য। এবারে চলুন, নিউক্লিয়ার প্রোগ্রামের ব্যাপারে বুশ প্রশাসনের প্রচারকৃত মিথ্যা প্রোপাগান্ডার টাইমলাইন (Hinchey, 2007) কীরকম ছিল সেটি দেখে নিই।

- মার্চ ২২, ২০০২, প্রেসিডেন্ট বলেন, '(সাদ্দাম) একজন ভয়ংকর ব্যক্তি, যে কিনা বিশ্বের সবচেয়ে ভয়ানক অস্ত্রসমূহের অধিকারী।'
- আগস্ট ২৬, ২০০২, চিনী বলেন, 'আমাদের মধ্যে অনেকেই (এ ব্যাপারে) নিশ্চিত যে, সাদ্দাম হোসেন খুব শীঘ্রই নিউক্লিয়ার অস্ত্রের অধিকারী হবেন।' (Pillar, 2011, p. 37)।
- সেপ্টেম্বর ৮, ২০০২, চিনী বলেন, 'সম্পূর্ণ নিশ্চয়তার সঙ্গে আমরা জানি যে, সে (সাদ্দাম) তার নিউক্লিয়ার অস্ত্র তৈরির উদ্দেশ্যে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করছে।' (Mearsheimer, 2011)।
- সেপ্টেম্বর ১২, ২০০২, জাতিসংঘে বুশ বলেন, 'ইরাক দক্ষ নিউক্লিয়ার সাইন্টিস্ট ও টেকনিশিয়ান নিয়োগ দিয়েছে। তাদের নিকট নিউক্লিয়ার অস্ত্র তৈরিতে প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো রয়েছে' (Bailey & Immerman, 2015, p. 67)।
- সেপ্টেম্বর ২০, ২০০২, চিনী বলেন, তাদের হাতে সাদ্দাম হোসেনের নিউক্লিয়ার

অস্ত্র তৈরির 'অকাট্য প্রমাণ' রয়েছে।

- অক্টোবর ৭, ২০০২, বুশ বলেন, 'বিপদের সুস্পষ্ট প্রমাণের সামনে, আমরা চূড়ান্ত প্রমাণের—বন্দুকের ধোঁয়া—জন্য অপেক্ষা করতে পারি না, যেটি (হয়তো এক সময় বৃহৎ) মাশরুম মেঘের রূপে[১] দেখা দিবে' (MacDonald, 2014, p. 30)।
- ডিসেম্বর ৩১, ২০০২, বুশ বলেন, 'আমরা জানি না (সাদ্দামের নিকট) পারমাণবিক অস্ত্র আছে কি না।' (থাকার আশঙ্কা প্রকাশ)
- জানুয়ারি ২৮, ২০০৩, বুশ বলেন, 'ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট জানতে সক্ষম হয়েছে যে, সাদ্দাম হোসেন সাম্প্রতিক সময়ে আফ্রিকা থেকে যথেষ্ট পরিমাণ ইউরেনিয়াম অন্বেষণ করেছে'—স্পেসিফিকভাবে বললে নাইজার থেকে (Bailey & Immerman, 2015, p. 70)।
- মার্চ ১৬, ২০০৩, চিনী বলেন, 'বস্তুত, আমরা বিশ্বাস করি, (সাদ্দাম) পারমাণবিক অস্ত্রাদি পুনর্নির্মাণ করেছে।'

এছাড়াও ২০০২-এর *ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স এস্টিমেট* বা NIE-এর পাবলিক ভার্শনটি ছিল এর ক্লাসিফাইড ভার্শন থেকে ভিন্ন। পাবলিক ভার্শনে দাবি করা হয়, বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, ইরাকে নিউক্লিয়ার প্রোগ্রাম চলছে। অন্য দিকে ক্লাসিফাইড ভার্শনে (গোপনীয় সরকারি ডকুমেন্ট) দেখা যায়, ইন্টেলিজেন্স অফিসাররা বলেন, ইরাকের নিউক্লিয়ার বোমা তৈরির কোনো প্রচেষ্টা তারা চিহ্নিত করতে পারেননি (Landay, 2015)। পাবলিক 'এনআইই' ভার্শনে দেখা যায়, ইরাক সব ধরনের হামলায় বায়োলজিক্যাল এজেন্ট ব্যবহার করতে পারে। অথচ ক্লাসিফাইড ভার্শনে এ ব্যাপারে কোনো কথাই নেই।

মার্কিন প্রশাসন জানত যে, ইরাকে নিউক্লিয়ার প্রোগ্রামের কোনো চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যাবে না। সিআইএ সাবেক দূত উইলসনকে প্রশাসনের দাবির সত্যতা যাচাইয়ে পাঠায়। উইলসন যখন সিআইএ'র অনুরোধে ইরাকের ইউরেনিয়াম ক্রয়ের কথিত অভিযোগ সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করে অ্যামেরিকায় ফিরে এ ব্যাপারে সঠিক তথ্য প্রকাশ করেন, তখন মার্কিন প্রশাসন তার স্ত্রীর প্রকৃত পরিচয়[২] মিডিয়ায় ফাঁস করে দেয় তার স্বামীকে শায়েস্তা করার জন্য (Behind the CIA, 2005)।

মার্কিন প্রোপাগান্ডাগুলোর মাঝে সবচে চাঞ্চল্যকর প্রোপাগান্ডার পেছনের সূক্ষ্ম কারসাজি যে-কাউকেই বিস্মিত করবে। প্রশাসনিক কর্মকর্তারা নির্দিষ্ট কিছু সংবাদ প্রতিষ্ঠানকে, দখলদারিত্বকে সমর্থন করবে—এই শ্রেণির 'তথ্য' সরবরাহ করত; যারা

[১] পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের পরে ধোঁয়ার আকৃতি অনেকটা মাশরুমের মতো দেখা যায়।
[২] undercover CIA agent

সেসব 'তথ্য' জনগণের নিকট পরিবেশন করত। পরবর্তীকালে কর্মকর্তারা সেইসব সংবাদকে তাদের (অফিসিয়াল) তথ্যের প্রাথমিক উৎস হিসেবে উদ্ধৃতি দিত, যদিও সেই তথ্যটি মূলত প্রশাসনিক কর্মকর্তারাই মিডিয়াকে সরবরাহ করেছিল। *নিউ ইয়র্ক টাইমস* সেপ্টেম্বর ২০০২-এ সরকারি কর্মকর্তাদের কাছ থেকে তথ্য পেয়ে ইরাকের অ্যালুমিনিয়াম টিউব কেনার ব্যাপারে আর্টিকেল পাবলিশ করে। সংবাদটি প্রকাশিত হবার পর ঠিক ঐ দিনই চিনী ও রাইস টেলিভিশনে এই রিপোর্টটির রেফারেন্স প্রদান করে। চিনী বলেন, 'নিউ ইয়র্ক টাইমসে আজ সকালে একটি সংবাদ এসেছে,... এবং আমি টাইমসকে (সংবাদটির) কৃতিত্ব দিতে চাই' (Cheney, 2002)। অর্থাৎ, তথ্যটি প্রশাসন থেকে সরবরাহ করা হলেও সংবাদের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করতে সেটি গোপন রাখা হয়।

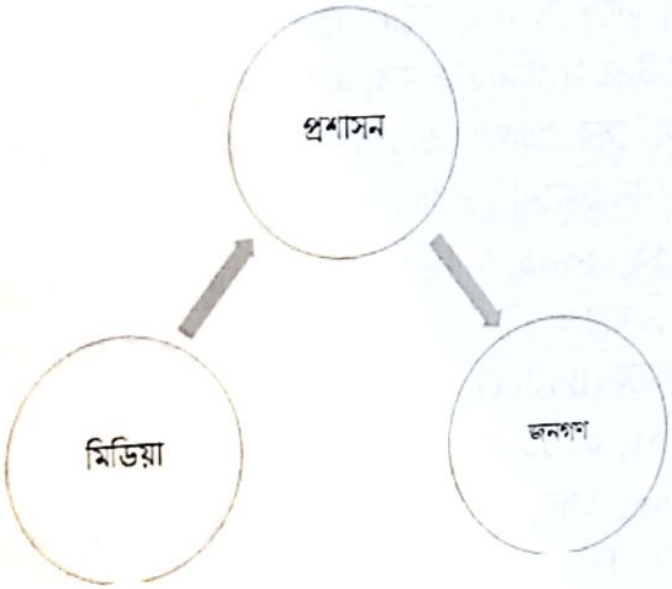


Figure-৯ : তথ্য বৈধকরণ প্রক্রিয়া

মার্কিন প্রোপাগান্ডার আরও একটি বিশেষ দিক হলো, তারা দাবি করছিল, 'প্রমাণ'-এর অনুপস্থিতিই আসন্ন হুমকির একটি প্রমাণ। ২০০২ সালের ৮ সেপ্টেম্বর জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা কন্ডোলিসা রাইস বলেন, কোনো শক্ত প্রমাণ থাকার প্রয়োজন নেই। কারণ, ইরাকের নিউক্লিয়ার অস্ত্রের ব্যাপারে 'কিছু অনিশ্চয়তা সব সময়ই থাকবে', কিন্তু 'আমরা সামান্য ধোঁয়াকে 'মাশরুম মেঘ'(-এ পরিণত) হতে দিতে চাই না' (Blitzer, 2003)।

সশস্ত্র সংগঠনের সম্পৃক্ততা

বুশের প্রোপাগান্ডা ক্যাম্পেইন শুরু করার আগেই সিআইএ জানিয়েছিল যে, 'সাদ্দাম হোসেন ইরাকের অভ্যন্তরে সক্রিয় ইসলামি 'চরমপন্থীদের' হুমকি হিসেবে দেখে

(Williams, 2017)। সাদ্দাম হোসেন ও ওসামা বিন লাদেন স্বভাবগত পার্টনার হবার কথা নয়' (Byrd & Reid, 2009)। তবে, ইরাকের কাছে মারণাস্ত্র থাকা যেহেতু আমেরিকার জন্য ততটা হুমকিস্বরূপ নয়, তাই 'হুমকি'র কালোমেঘ সৃষ্টি করতে মঞ্চে উপস্থিত করা হলো আল কায়েদার গল্প। ইরাকের সঙ্গে আল কায়েদা ও অন্যান্য সংগঠনের সম্পৃক্ততা না থাকা সত্ত্বেও বুশ প্রশাসন বারবার একই মিথ্যা উচ্চারণ করতে থাকল। বুশ প্রশাসনের আল কায়েদা বিষয়ক প্রোপাগান্ডা টাইমলাইনের চিত্র (Hinchey, 2007) অনেকটা এরকম :

- ডিসেম্বর ৯, ২০০১, এনবিসিতে চিনী বলেন, 'এটা বেশ ভালোভাবে নিশ্চিত (করা হয়েছে) যে, সে [৯/১১ হামলার অন্যতম মুহাম্মাদ আতা] প্রাগে যায়, আক্রমণের কয়েক মাস পূর্বে সে 'ইরাকি' ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের এক সিনিয়র অফিসারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে' (LaMonica, 2014)। যদিও সিআইএ, এফবিআই উভয় সংগঠনই জানত, এরকম কিছু আসলে কখনোই ঘটেনি। কিন্তু হোয়াইট হাউসের প্রোপাগান্ডার ব্যাপারে রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা এ ব্যাপারে তেমন কোনো উচ্চবাচ্য করেনি।
- সেপ্টেম্বর ১২, ২০০২, জাতিসংঘের জেনারেল এসেম্বলিতে বুশ দাবি করে, ইরাক নিউক্লিয়ার অস্ত্র তৈরির চেষ্টায় লিপ্ত এবং আল কায়েদার সদস্যরা ইরাকে অবস্থান করছে (Bush G. W., 2002f)।
- সেপ্টেম্বর ২৫, ২০০২, বুশ বলেন, 'আপনি যখন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নিয়ে কথা বলবেন, তখন আপনি আল কায়েদা ও সাদ্দামের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবেন না' (Pincus, 2006)।
- সেপ্টেম্বর ২৬, ২০০২, বুশ বলেন, '...অতিবাহিত প্রতিটি দিন হতে পারে সেই দিন, যখন ইরাকি সরকার পারমাণবিক অস্ত্র কোনো সন্ত্রাসী মিত্রকে দিয়ে দিয়েছে' (Bush G. W., 2002b)।
- অক্টোবর ১৪, ২০০২, বুশ বলেন, '(সাদ্দাম) হলো সেই ব্যক্তি, যে আমার মতে, আল কায়েদাকে সম্মুখ বাহিনী হিসেবে ব্যবহার করতে চাইবে।'
- নভেম্বর ৭, ২০০২, বুশ বলেন, 'সাদ্দাম একটি হুমকি। কারণ, সে আল কায়েদার সঙ্গে কার্যক্রম চালাচ্ছে।'
- জানুয়ারি ২৮, ২০০৩, স্টেট অব দ্যা ইউনিয়ন এড্রেসে বুশ দাবি করেন, 'ইন্টেলিজেন্স সোর্স-এর প্রমাণাদি, গোপন যোগাযোগ ও কাস্টডিতে থাকা ব্যক্তিদের জবানবন্দি প্রমাণ করে যে, সাদ্দাম হোসেন আল কায়েদা সহ (অন্যান্য) সন্ত্রাসী গ্রুপকে অর্থায়ন ও সুরক্ষা প্রদান করে' (Bush G. W., 2003)।

- জানুয়ারি ৩১, ২০০৩, বুশ বলেন, 'কোনো সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে আক্রমণ ও হত্যা করা এবং কোনো প্রমাণ পেছনে ফেলে না রাখার চাইতে বেশি কিছু সাদ্দাম হোসেন আশা করে না।'
- মার্চ ১৬, ২০০৩, চিনী বলেন, 'আমাদের এই প্রশ্নও উত্থাপিত করতে হবে যে, সন্ত্রাসীরা কোথা থেকে মারণাস্ত্র, কেমিক্যাল অস্ত্র, বায়োলজিক্যাল অস্ত্র, পারমাণবিক অস্ত্র লাভ করবে। এ ক্ষেত্রে সাদ্দাম হোসেন প্রধান সন্দেহভাজনে পরিণত হয়। কারণ আমরা জানি, সে প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের সক্ষমতা, কেমিক্যাল ও বায়োলজিক্যাল অস্ত্রাদি অর্জন করেছে। আমরা জানি, সে কেমিক্যাল অস্ত্র ব্যবহার করেছে। আমরা জানি, সে উপসাগরীয় যুদ্ধ থেকে এই প্রোগ্রামগুলো পুনরায় চালু করেছে। আমরা জানি, সে আবারও পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদনের চেষ্টা করেছে এবং আমরা জানি আল কায়েদা সহ অন্যান্য দলের সঙ্গে তার দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক রয়েছে।'
- মার্চ ১৭, ২০০৩, বুশ বলেন, 'বিপদ সুস্পষ্ট : কেমিক্যাল, বায়োলজিক্যাল বা একদিন ইরাকের সহায়তায় পাওয়া পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করে সন্ত্রাসীরা তাদের ব্যক্ত করা অভিলাষ পূর্ণ করবে এবং হাজারও কিংবা লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষকে হত্যা করবে, হয়তো আমাদের রাষ্ট্রে বা অন্য কোথাও' (Bush G. W., 2003d)।
- মে ১, ২০০৩, যুদ্ধে আপাত বিজয় লাভের পর বুশ তার কুখ্যাত 'মিশন সফল' স্পীচ-এ বলেন, 'আমরা আল কায়েদার এক মিত্র, সন্ত্রাসী অর্থায়নের একটি উৎসকে (সাদ্দাম) হারিয়েছি।' (Bush G. W., 2003c)।
- সেপ্টেম্বর ১৪, ২০০৩, চিনী বলেন, 'ইরাকি ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের আল কায়েদার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে, যা ৯০-এর দশকে বিকশিত হয়। এটি সুস্পষ্ট অফিসিয়াল পলিসি।'

ইরাক আক্রমণের পর সেখানকার ৬০০,০০০ ডকুমেন্ট ও গ্রেফতারকৃত ইরাকি কর্মকর্তাদের জবানবন্দি যাচাই করেও তারা ইরাক ও আল কায়েদার মধ্যে কোনো সংশ্লিষ্টতা খুঁজে পাননি (Schor, 2008)। পাবে কোথা থেকে, যে মিথের সৃষ্টি অ্যামেরিকার যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদীদের মগজে, সেটি কি আর ইরাকের মাটিতে খুঁজে পাওয়া যাবে? পরবর্তীকালে বুশের সাবেক টপ কাউন্টার টেররিজম উপদেষ্টা ক্লার্ক বুশ ও রামস্ফেল্ড-এর বিরুদ্ধে ইরাক ও আল কায়েদার সম্পর্কহীনতার তথ্যকে ইচ্ছাকৃতভাবে অবহেলা করার কথা প্রকাশ করেন। এর আগে বুশ যখন ইরাক-আল কায়েদা সংযোগ খুঁজে বের করার জন্য তাকে ব্যক্তিগতভাবে চাপ প্রয়োগ করেছিল, তখন তিনি এ ব্যাপারে রিপোর্ট পেশ করেন। ক্লার্কের ভাষায়—

> আমরা সকল এফবিআই বিশেষজ্ঞ, সকল সিআইএ বিশেষজ্ঞ একত্রিত হলাম।... সিআইএ ও এফবিআই-তে আমরা রিপোর্ট পাঠালাম। ... তারা রিপোর্টকে ত্রুটিমুক্ত সাব্যস্ত করল। অতঃপর আমরা সেটি প্রেসিডেন্টের কাছে পাঠালাম, আর সেটি জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার মাধ্যমে ফেরত এল। সেটি ফেরত পাঠিয়ে বলা হলো : 'ভুল উত্তর। ... কাজটি আবার করো' (Leung, 2004)।

তারা 'সঠিক' উত্তর বা সোজা ভাষায় আল কায়েদার সঙ্গে ইরাকের কাল্পনিক সম্পর্কের তথ্য চাচ্ছিল। ইন্টেলিজেন্স এজেন্টদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ওপর ভিত্তি করে পুলিৎজার পুরস্কার বিজয়ী সাংবাদিক সাসকিন্ড[১] বলেন, 'ওয়াইট হাউস (ইরাকি ইন্টেলিজেন্স প্রধান তাহির জলিল) Habbush-এর পক্ষ থেকে সাদ্দামের নিকট ১ জুলাই, ২০০১ তারিখে লেখা একটি ভুয়া চিঠি সাজায়। এটিতে বলা হয়, সেপ্টেম্বর ১১ ঘটনার নায়ক মুহাম্মাদ আত্তা[২] তার মিশনের জন্য ইরাকে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। এভাবে পরিশেষে দেখানো হয়, সাদ্দাম ও আল কায়েদার মধ্যে অপারেশনের যোগসূত্র ছিল...।' ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে Habbush-এর বৈঠকের পর বুশকে যখন জানানো হলো সেখানে কোনো মারণাস্ত্র নেই, তখন তিনি বেপরোয়া হয়ে বলেন, 'তারা (সিআইএ) ওকে আমাদের "কেইস" তৈরিতে সহায়ক কিছু (তথ্য) দেয়ার কথা জিজ্ঞেস করে না কেন' (Suskind, 2009)?

ইরাক যুদ্ধে বৈশ্বিক 'জনসমর্থন'

মার্কিন প্রশাসন ও মিডিয়ার প্রোপাগান্ডায় অ্যামেরিকানরা কী পরিমাণ বিভ্রান্ত হয়—তার দৃষ্টান্ত দেখা যায় ইরাক যুদ্ধের জরিপগুলোতে। মার্চ ২০০৩-এর এক জরিপে ইরাক যুদ্ধের ব্যাপারে বৈশ্বিক মনোভাবের ব্যাপারে প্রশ্ন করলে মাত্র ৩৫% মার্কিন নাগরিক এই সঠিক উত্তরটি প্রদান করতে সক্ষম হয় যে, বিশ্বের অধিকাংশ জনগণই ইরাক-যুদ্ধের বিরোধী। আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০০৩-এ প্রায় ৪৮% অ্যামেরিকানদের ধারণা ছিল, মুসলিম বিশ্ব মার্কিন যুদ্ধনীতিকে সমর্থন করে (!)। অথচ এই ধারণা (এক মাত্র কুয়েত ব্যতীত) প্রায় সকল মুসলিম রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ভুল (Kull, 2003)।

অর্থাৎ, ইরাকের বিধ্বংসী অস্ত্র, 'সন্ত্রাসী' সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ততা, বৈশ্বিক জনসমর্থন, পরবর্তীকালে ইরাকি বিদ্রোহ, অ্যামেরিকার তথাকথিত 'জাতি গঠন প্রক্রিয়া'—প্রায় সব ক্ষেত্রে অ্যামেরিকান প্রশাসন ও মার্কিন মিডিয়া তাদের জনগণকে পুরোপুরি অন্ধকারে রাখে। একদিকে সর্বাধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত সন্ত্রাসী

[১] Ron Suskind
[২] Muhammad Atta

কোয়ালিশন ফোর্স ইরাকে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালাতে থাকে। অন্যদিকে ইরাকের জনগণের প্রাণরক্ষার্থে সৃষ্ট বিদ্রোহকে তারা 'সন্ত্রাসী', 'শত্রু' হিসেবে প্রচার করে। বিশ্বের কাছে তাদেরকে পশু হিসেবে চিত্রায়িত করে। মার্কিনীরা মানব-জাতির পাতা থেকে তাদের নাম-নিশানা মুছে ফেলার প্রাণপণ চেষ্টা অব্যহত রাখে।

ইউনাইটেড স্টেট হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস কমিটি অন গভর্নমেন্ট রিফর্ম এর রিপোর্ট অনুযায়ী, (ঐ রিপোর্ট পাবলিশ হওয়ার পূর্বে) বুশ, চিনী, রামস্ফেল্ড, কলিন পাওয়েল, রাইস মিলে ইরাকের ব্যাপারে সর্বমোট ২৩৭টি বিভ্রান্তিকর বিবৃতি দিয়েছেন। এই বিবৃতিগুলো ১২৫টি ভিন্ন ভিন্ন উপস্থিতিতে দেয়া হয়েছে, যার মধ্যে ৪০টি ভাষণ, ২৬টি প্রেস কনফারেন্স ও ব্রিফিং, ৫৩টি সাক্ষাৎকার, ৪টি লিখিত বিবৃতি, ২টি কংগ্রেশনাল টেস্টিমনি[১] (২০০৪)।

দ্বিতীয় ইরাক যুদ্ধের পথ পরিষ্কারের এ প্রোপাগান্ডার সূচনা হয় মার্চ ২০০২-এ; যখন চিনী বলেন, 'আমরা জানি তাদের (ইরাকের) কাছে বায়োলজিক্যাল ও কেমিক্যাল অস্ত্র রয়েছে।' ২৩৭টি বিবৃতির মধ্যে ১৬১-টিই করা হয় যুদ্ধ শুরু হবার পূর্বে, যুদ্ধের সম্মতি আদায়ের লক্ষ্যে। সেপ্টেম্বর ১২, ২০০২ থেকে জুলাই ১৭, ২০০৩-এর মধ্যে বুশ ৫৫টি; মে ২২, ২০০২ থেকে নভেম্বর ০২, ২০০৩ এর মধ্যে রামস্ফেল্ড ৫২ টি; এপ্রিল ০৩, ২০০২ থেকে অক্টোবর ৩, ২০০৩ এর মধ্যে Powell ৫০ টি; এবং সেপ্টেম্বর ৮, ২০০২ থেকে সেপ্টেম্বর ২৮, ২০০৩ এর মধ্যে Rice ২৯ টি 'বিভ্রান্তিকর' বিবৃতি প্রদান করে (২০০৪)।

প্রোপাগান্ডা সমরের সম্মুখ সারির এই পাঁচ সৈনিক সম্মিলিতভাবে ইরাকের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক হামলার আশঙ্কার ব্যাপারে ১১টি , ইরাকের নিউক্লিয়ার কার্যক্রমের ব্যাপারে ৮১টি, কেমিক্যাল ও বায়োলজিক্যাল অস্ত্রের ব্যাপারে ৮৪টি এবং ইরাকের সঙ্গে আল কায়েদার সম্পৃক্ততার ব্যাপারে ৬১টি মিথ্যা বিবৃতি প্রদান করে (২০০৪)।

বলা যায়, এই প্রোপাগান্ডা প্রজেক্ট পরিচালনার প্রায় পুরোটা সময় মিডিয়া সম্পূর্ণরূপে তাদের সহায়তা করে। যুদ্ধ শুরুর পরে টিভি নিউজ চ্যানেলগুলোর ওপর করা এক জরিপে দেখা যা, যুদ্ধ সংক্রান্ত টিভি নিউজে উপস্থিত হওয়া দুই-তৃতীয়াংশ সংবাদ অতিথি ছিলেন সাবেক বা তৎকালীন সরকারি কর্মকর্তা। যুদ্ধবিরোধী অতিথির সংখ্যা ছিল মাত্র ১৬ জন; যা মোট অতিথির মাত্র ১%। এদের মাঝে কেউই সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন না। অ্যামেরিকার ৭১% অতিথি ও ৯৭% সংবাদের উৎস ছিল যুদ্ধপন্থী। ব্রিটিশ নিউজ সোর্সের ৯৫% উৎস ছিল সরকারি, বাকি ৫%-ও ছিল সাংবাদিক। ইরাকের ক্ষেত্রে সংবাদে যে-সকল সাধারণ নাগরিকের বক্তব্য তুলে ধরা হয়, তাদের ৪৯% সাদ্দামবিরোধী বক্তব্য রাখে, ঐ সময়ে মাত্র ১৮% যুদ্ধ বিরোধী বক্তব্য প্রচার

[১] সাক্ষ্য বা বিবৃতি।

করা হয়। সংবাদ-মাধ্যমে দেখানো ৩% মার্কিন যুদ্ধবিরোধী মতামতের বদলে ঐ সময়ে প্রকৃতপক্ষে ২৭% আমেরিকান যুদ্ধবিরোধী মনোভাব পোষণ করতেন। পার্থক্যটা বিশাল, প্রায় নয় গুণ (Rendall, 2003)।

সামগ্রিকভাবে, অ্যামেরিকায় প্রতিষ্ঠিত মতাদর্শ আর ১৯৯১ থেকে চলমান প্রোপাগান্ডার কারণে মার্কিন জনমত বুশের ইরাক এজেন্ডার প্রতি আগে থেকেই পজিটিভ ধারণা রাখত। তবে, প্রশাসনিক প্রোপাগান্ডা আর মিডিয়া প্রোপাগান্ডার কম্বিনেশনে যুদ্ধের প্রতি সমর্থন অধিকতর তীব্রতর হয়। ২০০২-এর সেপ্টেম্বর থেকে ২০০৩-এর মার্চে হামলা শুরুর সময় পর্যন্ত জনমত জরিপ করলে তাতে রাজনৈতিক-মিডিয়া সংযোগের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রোপাগান্ডা ক্যাম্পেইনের শুরুর সময়টাতে ৫৫% নাগরিক সামরিক আগ্রাসনের মাধ্যমে সাদ্দাম হোসেনকে সরানোর সিদ্ধান্ত যথার্থ মনে করতেন। সেখানে মার্চ ২০০৩-এ যুদ্ধের আগ মুহূর্তে আক্রমণে সমর্থনের হার প্রায় ১০% বৃদ্ধি পায়। এর মাঝে ডেমোক্রেটদের যুদ্ধ বিরোধিতার সময় জনসমর্থন হ্রাস পেয়েছিল। পরবর্তীকালে আক্রমণের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবার পর প্রচার-প্রচারণায় সমর্থন আবারও বৃদ্ধি পায় (DiMaggio, 2015, p. 92, Figure 2.10)।

ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০০৩-এ পিউ রিসার্চ-এ প্রকাশিত তথ্যে দেখা যায়, যারা ইরাকের সংবাদ মনোযোগের সঙ্গে অনুসরণ করছিলেন এবং যারা ততটা মনযোগী ছিলেন না, এই দুই শ্রেণির নাগরিকদের মধ্যে যুদ্ধের ব্যাপারে অধিক মনযোগী অর্থাৎ ১ম শ্রেণির সমর্থন প্রদান করার হার বেশি (DiMaggio, 2015, p. 101, Figure 2.16)। অন্যদিকে বুশের প্রতি পজিটিভ ধারণা করার দৌড়েও তারা বেশ এগিয়ে (প্রায় ২০% বেশি)।

এসকল তথ্য-প্রমাণ এই দাবিকে আরও পাকাপোক্ত করে যে, জনগণের মতামতকে প্রভাবিত করা যায় এবং সেটিকে নেতিবাচক উপায়ে কাজে লাগিয়ে ফায়দা তোলা সম্ভব। আর এভাবেই মিডিয়ার সহায়তায় তারা এমন কিছু মিথ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়, যার ভুক্তভোগী হয় কয়েক মিলিয়ন অসহায় মুসলিম।

যুদ্ধ শুরুর পরবর্তী পর্যায়ে প্রোপাগান্ডা

ইরাক যুদ্ধের শুরুতে মার্কিনীদের যে উদ্যম ছিল, পরবর্তীকালে সেটি হ্রাস পেতে খুব বেশি সময় নেয়নি। মাত্র এক বছর পরই অধিকাংশ মার্কিনী যুদ্ধের ব্যাপারে নেতিবাচক ধারণা প্রকাশ করতে আরম্ভ করে। বুশ প্রশাসন এটি ভালো করেই জানত যে, ইরাক যুদ্ধ চলমান রাখতে চাইলে জনসমর্থন খুবই জরুরি। তাই, যুদ্ধ সূচনার পরও তাদের প্রোপাগান্ডা ক্যাম্পেইন থাকে অব্যাহত। পরবর্তীকালে তাদের প্রোপাগান্ডার ব্যাপারে

যখন সত্যটা প্রকাশ হয়ে যায়, তখন ইরাকে যুদ্ধ করার ব্যাপারে মারণাস্ত্র-এর বদলে গণতন্ত্র আর মানবাধিকার তাদের প্রধান লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়।

ওয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি Scott McClellan-এর ভাষ্যমতে, তাদের লক্ষ্য ছিল 'প্রতিটি সংবাদমাধ্যম জয় (দখল)' (McClellan, 2008, p. 174)। তাদের কাজ ছিল 'জাতীয় নিরাপত্তা ও বিশেষ করে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ফোকাস অব্যহত রাখা, যেটি প্রেসিডেন্টের পুনঃনির্বাচন ক্যাম্পেইনের প্রধান থিমে রূপান্তরিত হবে। এই দৃষ্টিতে দেখল, ইরাক যুদ্ধ শুধু সমর্থনযোগ্যই নয়; বরং অপরিহার্য।' (McClellan, 2008)।

যুদ্ধ শুরুর পর মার্কিন প্রোপাগান্ডা ও এর বিপরীতে প্রকৃত তথ্যগুলো ছিল অনেকটা এইরকম :

- May ২৯, ২০০৩-এ বুশ এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'আমরা মারণাস্ত্র খুঁজে পেয়েছি। আমরা বায়োলজিক্যাল অস্ত্রের ল্যাবরেটরিসমূহ খুঁজে পেয়েছি।' (Bush G. W., 2003b)।
- জুন ৭, ২০০৩, অ্যামেরিকা ও ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স বিশেষজ্ঞরা মরণঘাতী রহস্যজনক ট্রেলারের সত্যতার ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেন (Miller & Broad, 2003b)।
- জুন ৮, ২০০৩, কলিন পাওয়েল বলেন, 'আমরা 'মোবাইল-ভ্যান'[১] উন্মোচিত করেছি...। আমরা জানি যে, তারা (ইরাকিরা) প্রতারণা ও এই সকল বস্তু লুকানোয় পারদর্শী। তাই সামান্য ধৈর্য প্রয়োজন' (Powell, 2003a)।
- জুন ১৫, ২০০৩, ইরাকে পাওয়া দুটি বহনযোগ্য কার্গোর অনুসন্ধানের পর ব্রিটিশ টিম সিদ্ধান্তে আসে যে, সেগুলো জৈব অস্ত্রের ল্যাব ছিল না, যেমনটি বুশ ও টনি ব্লেয়ার দাবি করে আসছিলেন। বরং সেগুলো আর্টিলারি বেলুনে ভরার জন্য হাইড্রোজেন উৎপাদনে ব্যবহৃত হতো। আর ইরাকিরাও এই কথা বহু আগে থেকেই বলে আসছিল (Beaumont et al., 2003)।
- সেপ্টেম্বর ৮, ২০০৩, সাবেক জাতিসঙ্ঘ অস্ত্র নিরীক্ষক স্কট রিটার বলেন, 'ইরাকে প্রাপ্ত দুটি চলমান বায়োলজিক্যাল অস্ত্রের ল্যাবরেটরির কথা বুশ মজুদকৃত অবৈধ অস্ত্রের সুস্পষ্ট প্রমাণ হিসেবে চালিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। এটি এখন পরিষ্কার যে, এসকল তথাকথিত 'ল্যাবগুলো' আশির দশকে ব্রিটিশদের কাছ থেকে পাওয়া হাইড্রোজেন উৎপাদনকারী ল্যাব ছাড়া আর কিছুই নয়' (Ritter, 2003)।

অর্থাৎ, ইরাকের মারণাস্ত্র-এর ব্যাপারে প্রকৃত সত্য সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে যাবার

[১] স্থানান্তর যোগ্য চলমান ভ্যান, যেগুলোকে মার্কিনীরা জৈব অস্ত্রাগার বলে অভিহিত করে

পরও নির্লজ্জ মার্কিন কর্মকর্তারা তাদের প্রোপাগান্ডা বন্ধ করার কথা ভাবেনি। সেপ্টেম্বর ১৪, ২০০৩ এও চিনী নির্লজ্জের মতো বলেছিলেন, সাতটি চলমান ল্যাবের মধ্যে দুটি পাওয়া গেছে (Cheney, 2003)।

ইরাক যুদ্ধে পেন্টাগন কর্মকর্তারা মিডিয়া রিপোর্টারদেরকে সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে ফিক্স করে দেয়ার[১] পলিসি গ্রহণ করে। মার্কিন কর্মকর্তারা ৬০০-এর মতো সাংবাদিকদের বাছাই করে তাদেরকে সামরিক ইউনিটের সঙ্গে যুক্ত করে দেয় (Pew Research Center, 2003)। এর ফলে যুদ্ধের ময়দানের সংবাদ পুরোটাই মার্কিন বাহিনীর সমর্থনে কাজ করে। কারণ, বিদ্রোহীদের হামলা মার্কিন বাহিনীর সাথে সাথে রিপোর্টারদের ওপরও হতো, যেহেতু তারা একই সঙ্গে ইরাকে নিজেদের কাজ করত।

সংবাদপত্রের মতোই আরেকটি চমকপ্রদ প্রোপাগান্ডার সোর্স ছিল সামরিক 'বিশেষজ্ঞ'রা। যুদ্ধকালীন সময়ে তারা প্রায় প্রতিটি সংবাদমাধ্যমে হাজির হতো নিয়মিত অতিথি হিসেবে। তারা তাদের বক্তব্যে আপাতদৃষ্টিতে নিরপেক্ষ মতামত পেশ করত। কিন্তু, পেন্টাগন এই সকল বিশেষজ্ঞদেরকে যুদ্ধের ময়দানে অ্যামেরিকার 'পারফরমেন্স'-এর ব্যাপারে ইতিবাচক সংবাদ পরিবেশনের লক্ষ্যে নিয়োগ করে। ইরাক যুদ্ধের সূচনালগ্নে চালু হওয়া এই প্রকল্পের অধিকাংশ বিশেষজ্ঞরাই মিলিটারি কন্ট্রাক্টরদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ছিল, যে কন্ট্রাক্টররা খোদ ইরাক যুদ্ধে অর্থলগ্নি করেছে। বিশেষজ্ঞদের এই দল ১৫০টিরও বেশি মিলিটারি কন্ট্রাক্টরের লবিস্ট, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ বোর্ড মেম্বার অথবা কনসাল্টেন্ট হিসেবে দায়িত্বরত ছিল। ছোট-বড় কোম্পানি মিলিয়ে মিলিটারি কন্ট্রাক্টরগুলো সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকে শত শত বিলিয়ন অর্থ কামানোর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ছিল। যে প্রতিযোগিতায় 'প্রশাসনের ভিতরকার তথ্য' আর 'সিনিয়র অফিসারদের নিকট প্রবেশাধিকার'-এর মূল্য ছিল অত্যন্ত বেশি।

বিশেষজ্ঞরা সিনিয়র মিলিটারি লিডারদের সঙ্গে শত শত গোপন বৈঠক করে। তাদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে ইরাক, গুয়ান্তানামোতে ভ্রমণ করানোর ব্যবস্থা করা হয়, ক্লাসিফাইড তথ্যে প্রবেশাধিকার দেয়া হয়। কখনো কখনো হোয়াইট হাউস, স্টেট ও জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের চিনী, আলবার্তো গঞ্জালেস[২]-এর মতো হেভিওয়েট ব্যক্তিরা ও তাদের ব্রিফিং দিত। এ সকল সুবিধার বিনিময়ে বিশেষজ্ঞরা মিডিয়ায় তাদের বক্তব্যে 'সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি'র প্রতিফলন ঘটাতে শুরু করল। যদিও প্রায়শই তারা সন্দেহ করত যে, তাদেরকে সরবরাহ করা তথ্যে গড়মিল রয়েছে। কিন্তু তাদেরকে দেয়া সুবিধা হারাবার ভয়ে তারা স্বীয় সন্দেহগুলোকে দাবিয়ে রাখত। গুয়ান্তানামো কারাগারে নির্যাতনের ঘটনা যখন ফাঁস হলো, সেখান থেকে ঘুরে এসে বিশেষজ্ঞরা

[১] তারা এর নাম দেয় Embedded পলিসি, যার অর্থ বেঁধে দেওয়া।
[২] Alberto Gonzales

গুয়ান্তানামোর পরিবেশকে 'পেশাদার' আর মিডিয়ায় প্রকাশিত রিপোর্টগুলোকে দাবি করে 'সম্পূর্ণ মিথ্যা' হিসেবে।

মিলিটারি এক্সপার্টদের পরিচালিত এই প্রোপাগান্ডার ফলাফল কী? জনসংযোগ কর্মকর্তা ক্লার্কের জ্যেষ্ঠ সহকারী ব্রেন্ট[১৭]-এর ভাষায়, কোনো কোনো দিন 'বিশেষজ্ঞরা প্রতিটি [টিভি] স্টেশনে হাজির হতে সক্ষম হয়। আর তাদের প্রত্যেকেই প্রশাসনের মতবাদ প্রচারে সফল হয়।' ক্লার্কের উদ্দেশ্যে দেয়া রামস্ফেল্ড-এর এক মেমোতে দেখা যায়, তিনি বিশেষজ্ঞদের কাজে খুশি হয়ে বলেন, '...যারা বক্তা হিসেবে ভালো দক্ষতা দেখিয়েছে, তাদের নিয়ে ভাবা যায়' (Barstow, 2008)। পরবর্তীকালে নিউ ইয়র্ক টাইমস অ্যামেরিকার ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট থেকে ৮০০০ পৃষ্ঠা ইমেইল, ট্রান্সকিপ্ট, প্রাইভেট ব্রিফিং-এর রেকর্ড ও গুয়ান্তানামো, ইরাকে যাত্রার তথ্য আইনগত প্রক্রিয়ায় উদ্ধার করতে সমর্থ হয়। অতঃপর নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর পুলিৎজার পুরস্কারপ্রাপ্ত সাংবাদিক ডেভিড বারস্টো এ পরিকল্পিত প্রজেক্টের বিস্তারিত রিপোর্ট পাবলিশ করেন।

এই ধরনের সমন্বিত প্রোপাগান্ডাগুলো সংবাদ গ্রাহকদের প্রাপ্ত সংবাদের বৈশিষ্ট্যকে আমূল পরিবর্তন করে দেয়। ফলে বিশেষ বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে জনগণের মনে সৃষ্ট ধারণায় পড়ে নেতিবাচক প্রভাব। ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দে ৮০% অ্যামেরিকানদের প্রাথমিক সংবাদ উৎস হিসেবে ছিল টিভি ও রেডিও; অন্যদিকে মাত্র ১৯% জানায়, তাদের সংবাদ গ্রহণের প্রধান উৎস প্রিন্ট মিডিয়া। ইরাক যুদ্ধে বৈশ্বিক জনমত অ্যামেরিকার পক্ষে থাকার ব্যাপারে উত্তরদাতাদের 'ভুল ধারণা'র ব্যাপারটা বিভিন্নভাবে প্রমাণিত হয়। দেখা যায়, ৮০% *ফক্স নিউজ* দর্শক এক/একাধিক বিষয়ে ভুল ধারণা রাখেন, *সিবিএস* ৭১%, *এবিসি* ৬১%, *এনবিসি* এবং *সিএনএন* ৫৫%, প্রিন্ট মিডিয়ার অনুসারীদের ক্ষেত্রে ভুল ধারণা শতকরা ৪৭% (Kull, 2003)।

কেউ হয়তো ভাবতে পারেন, এখানে দোষটা অনেকাংশে ভোক্তাদেরও হতে পারে। হতে পারে, সংবাদে গ্রাহকের মনোযোগের অভাব কিংবা অপর্যাপ্ত সংবাদ গ্রহণের কারণে এরকমটি হয়েছে। কিন্তু, জরিপের ফলাফল সেরকম কোনোকিছুর ইঙ্গিত দেয় না। অধিকাংশ নিউজ কোম্পানির ক্ষেত্রেই বাড়তি মনোযোগ 'ভুল ধারণা' সৃষ্টির সম্ভাবনা হ্রাস করে না। ওপরন্তু, ফক্স নিউজ যাদের সংবাদের প্রাথমিক উৎস, তাদের ক্ষেত্রে সংবাদে অধিক মনোযোগ 'ভুল ধারণা' সৃষ্টির সম্ভাবনা আরও বাড়িয়ে তোলে (Kull, 2003)।

মার্কিন প্রশাসনের পরিচালিত প্রোপাগান্ডা তাদের কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সামগ্রিক ক্ষেত্রে ঠিক কতটা 'সফল' হয়? ২০০৩ এর জানুয়ারিতে PIPA/KN এর

[১৭] Brent T. kruger

পোলের ফলাফলে দেখা যায়, ৬৮% নাগরিক ইতিমধ্যেই বিশ্বাস করে ফেলেছিল যে, ৯/১১-এর হামলায় ইরাক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে! এছাড়াও ১৩% নাগরিক ধারণা করতেন যে, ইতিমধ্যেই ইরাক ও ৯/১১-এর মধ্যে সংযোগ খুঁজে পাওয়া গেছে! এর পরের মাসের জরিপে দেখা যায়, মাত্র ৭% নাগরিক মনে করতেন, ইরাক ও ৯/১১ এর মাঝে কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। আগস্টের জরিপে ৬৭% বলেন যে, সাদ্দাম হোসেন ব্যক্তিগতভাবে ৯/১১-এর সঙ্গে জড়িত। জুন থেকে আগস্টের মধ্যে পরিচালিত জরিপে করা প্রশ্ন—'অ্যামেরিকা কি আল কায়েদা এবং সাদ্দাম হোসেনের ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার সুস্পষ্ট প্রমাণ পেয়েছে?'-এর উত্তরে প্রতিবারই ৪৫%-৫২% মার্কিন নাগরিক জবাব দেন, অ্যামেরিকা সেরকম প্রমাণ পেয়েছে (Kull, 2003)।

২০০২-এ যখন সম্ভাব্য ইরাক যুদ্ধের বিষয়ে সর্বপ্রথম মিডিয়া রিপোর্ট শুরু হলো, তখন থেকে আফগানিস্তান যুদ্ধ হেডলাইন থেকে চলে যায় দৃশ্যপটের আড়ালে। পরবর্তীকালে ওবামা জনমন থেকে হারিয়ে যাওয়া আফগান যুদ্ধকে গতিশীল করে তালিবানদের হারানোর পরিকল্পনা ব্যক্ত করেন। কিছু রিসার্চে দেখা যায়, মার্কিনীদের যুদ্ধের বিরোধিতার প্রধান কারণ ছিল এই ধারণা যে, অ্যামেরিকা লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হবে। আবার কোনো স্কলার বলেন, সেনা হতাহতের সংখ্যা যুদ্ধের বিরোধিতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে। John Mueller বলেন, ইরাক যুদ্ধে সহজ একটা প্যাটার্ন লক্ষ্য করা যায়—হতাহতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে সমর্থন হ্রাস পায়। জনগণের মনের উদ্যম ধীরে ধীরে কমে আসে (Mueller, 2005)। ২০০৯-এ যখন আফগানিস্তানে মার্কিন সৈন্য হতাহতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল, তখন মিডিয়া পুনরায় আফগানিস্তানে তাদের ক্যামেরা তাক করে। ঐ সময়ে আফগানিস্তানে সহিংসতা ও মার্কিন হতাহতের সংখ্যা বৃদ্ধিতে মার্কিনীদের যুদ্ধবিরোধিতা পুনরায় বৃদ্ধি পায়। পরবর্তীকালে ওবামা ২০০৯-এর শেষে যুদ্ধ অ্যামেরিকার নিয়ন্ত্রণে নেয়ার দাবি করেন। এই দাবির মাধ্যমে আবারও মার্কিন জনগণের যুদ্ধবিরোধিতা কমে আসে (DiMaggio, 2015, p. 11)।

জানুয়ারি ২০০৯-এ অ্যামেরিকান নাগরিকরা আফগানিস্তান যুদ্ধের সমর্থনের বিষয়ে সমান অংশে দ্বিধাবিভক্ত ছিল। ৪৫% মনে করত যে, যুদ্ধ 'ভালো' যাচ্ছে, আর ৪৫% মনে করত যে, যুদ্ধ 'ভালো' যাচ্ছে না। এক মাস পর CNN/ORC-এর পোলে দেখা যায়, ৪৭% যুদ্ধের সমর্থন করেন, আর ৫১% করেন যুদ্ধের বিরোধিতা (Quinnipiac University Poll, 2021)। ঐ সময়ে সাংবাদিকরা যুদ্ধের হতাহতের বিষয়ে নিয়মিত রিপোর্ট করত। ফলে, জনমত যুদ্ধের বিপরীতে ঝুঁকে পড়ে (DiMaggio, 2015, p. 29, Figure 1.8)।

জনমতের ওপর মার্কিন হতাহতের সংখ্যার প্রভাব ওবামা ক্ষমতাসীন হবার পর বেশ ভালোভাবেই অনুধাবন করেন। ডিসেম্বর ২০০৯-এ ওবামা ১৮ মাসের টাইমলাইন ঘোষণা করে বলেন, সৈন্য অপসারণ শুরু করা হবে। বুশ যেরকম

সন্ত্রাসের ভয়কে পুঁজি করে যুদ্ধে জড়িয়েছেন, ওবামা তেমনি প্রত্যাশার কৌশল[১] খাটানো আরম্ভ করেন। তিনি মার্কিনীদের অনুধাবন করানোর চেষ্টা করেন, অ্যামেরিকা আফগানিস্তানে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা ছড়িয়ে দিচ্ছে। কিন্তু, তালিবানের কারণে আফগানের 'বৈধ' (পুতুল) সরকারের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। তাই আফগানিস্তানকে সুরক্ষা দিতে ওবামা আফগান নিরাপত্তা বাহিনীকে প্রশিক্ষণের প্রতিশ্রুতি দেন।

২০০৯-এর নিউজ ও মিডিয়ায় প্রকাশিত মতামত যাচাই করলে দেখা যায়, সংবাদমাধ্যমগুলো ২০০৯-এর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত যুদ্ধের ব্যাপারে নেগেটিভ সংবাদ প্রচার করছিল। কিন্তু বছরের শেষার্ধে ওবামার প্রতি তাদের সমর্থন বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে ২০০৯-এ অ্যামেরিকার জনমত পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, শুরুর দিকে মার্কিনীদের হতাহতের সংবাদ জনমতকে যুদ্ধবিরোধী করে তোলে। আর পরবর্তীকালে ইতিবাচক সংবাদ যুদ্ধের সমর্থন আবারও বৃদ্ধি করে (DiMaggio, 2015, pp. 51-52, Figure 1.12)।

সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটি স্টাডিস অ্যাট মেরিল্যান্ড-এর রিপোর্টে সুসান (২০০৪) যুদ্ধ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সংবাদ বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে আসেন যে, রিপোর্টাররা ইরাক যুদ্ধের সময় বেশ কয়েকটি বিষয়ে তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন :

১. তারা মারণাস্ত্র-কে একটি একক বৃহৎ হুমকি হিসেবে প্রচার করেন। মিডিয়া কেমিক্যাল, বায়োলজিক্যাল, নিউক্লিয়ার অস্ত্রের পার্থক্য সঠিকভাবে প্রচার করেনি;
২. প্রশাসনের তথাকথিত ওয়ার অন টেররকে তারা মারণাস্ত্র বিরোধী ক্যাম্পেইন হিসেবে গ্রহণ করে নেয়;
৩. সরকার প্রচারিত তথ্যকে কোনো সমালোচনা ছাড়াই প্রচারের মাধ্যমে তারা মার্কিন প্রেসিডেন্টের জন্য তার এজেন্ডা বাস্তবায়ন সহজ করে দেয়;
৪. অফিসিয়াল পজিশন বিরোধী খুব কম সংখ্যক সংবাদ-ই নিউজ মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়।

আর মিডিয়ার এই প্রোপাগান্ডার দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবের উদাহরণ হিসেবে অ্যামেরিকার নাগরিকদের চিন্তাধারা উৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে প্রদর্শন করার যোগ্য। ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে এসে যখন ৫৩% মার্কিন নাগরিক মনে করতেন বুশ প্রশাসন তাদেরকে পরিকল্পিতভাবে বিভ্রান্ত করেছে, তখনো ৪২% বিশ্বাস করত তাদেরকে ইরাকের ব্যাপারে বিভ্রান্ত করা হয়নি(!) (Gallup, 2017)। এর তিন বছর পর, ২০১১ সালে এসেও ৩৮% মার্কিন নাগরিক বিশ্বাস করত যে, অ্যামেরিকা আল

[১] Rhetoric of Hope

কায়েদার সঙ্গে সাদ্দাম হোসেনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের 'পরিষ্কার' প্রমাণ পেয়েছে। ১৫% 'সুশীল' নাগরিক তখনো মনে করত, ইরাক ৯/১১-এর হামলার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিল। এছাড়াও আধা 'সুশীলমনা' আরও ৩১% মার্কিনী মনে করত, ইরাক আল কায়েদাকে শক্তিশালী সমর্থন প্রদান করেছে (Telhami & Kull, 2011)। এমনকি ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দেও ফেয়ালি ডিকিনসন ইউনিভার্সিটি পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায়, তৎকালীন ৪২% অ্যামেরিকান নাগরিক বিশ্বাস করতেন, ইরাকে মারণাস্ত্র পাওয়া গেছে(!) (Ignorance, Partisanship, 2015)।

অ্যামেরিকার ফেরি করা স্বাধীনতার প্রকৃত রূপ

ইরাকে হামলা চালানোর পূর্বে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন বুশ। তিনি দাবি করেন, তারা '(ইরাক) এর জনগণকে মুক্ত করার জন্য এবং মারাত্মক বিপদ থেকে বিশ্বকে রক্ষা করার জন্য' (Saleh, 2021, p. 21), 'বিপদের এই সময় পার করতে এবং শান্তি (প্রতিষ্ঠা)র কাজ চালিয়ে যেতে' (Bush G. W., 2003a), ইরাকে হামলা চালাতে যাচ্ছে। এর পরের দিন জাতির উদ্দেশ্যে বুশ তার বক্তব্যে বলেন, 'সমস্যা জর্জরিত বিশ্বের শান্তি ও নির্যাতিত মানুষের আশা' অ্যামেরিকার সামরিক বাহিনীর ওপর নির্ভর করছে (Bravin, 2013, p. 64)।

আসলেই কি তাই? বুশ প্রশাসন আর মার্কিন মিডিয়া কি সত্যিই বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করেছে? ইরাক, আফগানিস্তানে কি পশ্চিমারা শান্তি আর সুখের বন্যা বইয়ে দিয়েছে? সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধতে ইরাক ও আফগানিস্তানের অবস্থার পরিবর্তন যাচাই করলে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই, যুদ্ধ আরম্ভ করার অজুহাত হিসেবে অ্যামেরিকা যেমন মিথ্যা বলেছিল; তেমনি 'শান্তি' প্রতিষ্ঠার প্রশ্নেও অ্যামেরিকা আর তার দোসরদের ঘোষিত প্রায় সবগুলো ঘোষণা ছিল একরাশ প্রবঞ্চনার অংশ। অন্যদিকে, অফিসিয়াল প্রোপাগান্ডা-ব্যাখ্যার বাইরে যাওয়াটাও সাংবাদিকদের জন্য 'স্বাভাবিক' কোনো বিষয় ছিল না। কারণ, তারা অফিসিয়াল সংবাদের 'পরিবেশনকারী' হিসেবে কাজ করতেই বেশি স্বচ্ছন্দবোধ করতেন। ইরাক ও আফগান যুদ্ধে সাংবাদিকরা যেভাবে নিজেদের স্বার্থবাদী মতবাদ অনুসারে সংবাদ পরিবেশন করেছেন, তাতে সংবাদ হয়ে ওঠে ভারসাম্যহীন মিথ্যার জাল। জনগণ যেন তাদের প্রণীত নীতিমালাকে সমর্থন দেয়, সেই লক্ষ্যে সরকার মিডিয়াকে ব্যবহার করেছে গণসমর্থন সৃষ্টির শক্তিশালী উপকরণ হিসেবে।

যুদ্ধ শেষে মার্কিন সেনারা যখন স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে, তখন তারা প্রকৃত বাস্তবতা অনুভব করতে সক্ষম হয়।[১] ঐ মুহূর্তে তারা চতুর্দিকে বিদ্যমান পৃথিবী

[১] যুদ্ধের ময়দানেও অবশ্য অনেকেই প্রকৃত চিত্র অনুভব করতে সক্ষম হয়, তবে জীবন-মরণ

(রাষ্ট্র) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, যে পৃথিবীর নাগরিকরা তখনো অন্ধভাবে নিজ রাষ্ট্রের সর্বোৎকৃষ্ট 'নৈতিকতা'র মিথের ওপর বিশ্বাসী। তখন তারা অনুধাবন করতে পারে, নৈতিকতার ওপর তাদের কোনো একাধিপত্য নেই। তারা যে 'বর্বরতা' আর 'আদিম সভ্যতা'র বিরুদ্ধে বিশ্বজুড়ে বয়ান দিয়ে বেড়ায়, যুদ্ধের ময়দানে খোদ তারাই সেই বৈশিষ্ট্যগুলো আপাদমস্তক ধারণ করে। বিশ্বাসের জগতে এটি সৃষ্টি করে চরমতম এক সংকট। এই দৃশ্য তাদের জাতিগত সকল মিথ ভেঙে চুরমার করে দেয়। বস্তুত, তখনই প্রথম তারা তাদেরকে বলা মিথ্যাগুলোর আড়ালে প্রকৃত বাস্তবতা ধরতে পারে। যুদ্ধের ময়দানে নির্ঘুম রাত কাটিয়ে আসা সৈন্যরাই আমাদের যুদ্ধের সবচেয়ে বিশুদ্ধ 'গল্প' শোনাতে পারে (Hedges & Al-Arian, 2008)। নিরপরাধ মানুষদের ওপর চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধের পেছনের মিথ্যাটা তারা তখন সকলের সামনে প্রকাশ করে দেয়—কথায় কিংবা কাজে।

আফগানিস্তান যুদ্ধ

ইরাক যুদ্ধের ডামাডোলে অনেকেই আফগানিস্তান যুদ্ধের কথা ভুলে যায়। কিন্তু, পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোর পশুসভ্যতার 'সাইড ইফেক্ট' ইরাকীদের তুলনায় আফগানীরা কোনো অংশেই কম 'ভোগ' করেনি। সোভিয়েত ইউনিয়নকে ইতিহাসের সেরা 'শিক্ষা' দিয়ে যখন তালিবানরা নিজেদের দেশের জনগণের ঈমান, আমল ও বৈষয়িক জীবনের উন্নতির লক্ষ্যে কাজ করা শুরু করল, তখনই 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'-এর নামে যুদ্ধবিধ্বস্ত এক দেশে সাম্রাজ্যবাদী অ্যামেরিকা হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। যদিও এর শেষটা নিকৃষ্ট পাশ্চাত্য-সভ্যতার বর্তমান অগ্রনায়ক অ্যামেরিকার জন্য কোনোভাবেই সুখকর ছিল না। তবে চলে যাবার আগে পুরো সমাজটাকে তারা জুলুমের বিষবাষ্পে পূর্ণ করে দিয়ে যায়।

আফগানিস্তানে হামলা করে তালিবান সরকার হটানোর পর সেখানে অ্যামেরিকা ও তাদের তাঁবেদাররা কায়েম করে এক ত্রাসের রাজত্ব। আফগানিস্তান যুদ্ধ শুরুর পর অ্যামেরিকা সেখানে মানুষ হত্যা করে লাশের পাহাড় জমাতে শুরু করে, যাদের সংখ্যার কোনো হিসেবই তারা রাখত না। মার্চ ২০০২-এ রামস্ফেল্ড সিবিএসকে বলেন, '... (অ্যামেরিকা) ভিয়েতনামে (মৃতদেহ গণনার) চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সেটি (আল্টিমেটলি) কাজ করেনি।' পরে আফগানিস্তানের দায়িত্বে থাকা চিফ জেনারেল টমি ফ্র্যাঙ্কস বলেন, 'তোমরা তো জানোই, আমরা মৃতদেহ গণনা করি না' (Moses, 2010)। ২০০৩-এ হিউম্যান রাইট্স ওয়াচ-এর রিপোর্টে দেখা যায়, আফগানিস্তানে মার্কিন সমর্থিত বাহিনী কিভাবে আফগানিস্তানকে ধর্ষণ, খুন, অরাজকতার স্বর্গরাজ্যে

যুদ্ধের ময়দানের মাঝে এত জটিল বিষয়ে ভাবার সময় কোথায়!

পরিণত করে। তারা যখন-তখন যে-কারও বাসায় হামলা করে ধর্ষণ, লুটতরাজ চালাত। এমনকি আন্তর্জাতিক দাতব্য সংস্থার মহিলা কর্মীকে ধর্ষণ করেও তারা থেকে যায় ধরাছোঁয়ার বাইরে। আফগানিস্তানে অ্যামেরিকার কায়েম করা সন্ত্রাসের রাজ্যের যে চিত্র আমাদের সামনে দৃশ্যমান, তার সাথে সেক্যুলার আগ্রাসী অ্যামেরিকা-ব্রিটেন ও তাদের সেবাদাসদের ঘোষিত প্রতিশ্রুতির কোনো মিল নেই (HRW, 2003)। পুতুল সরকারের সঙ্গে সম্পৃক্ত মিলিশিয়া বাহিনীরা তখনো দেদারসে সাধারণ জনগণকে হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট করত। হিউম্যান রাইট্স ওয়াচ এ সকল নির্যাতন নিয়ে বিশদ রিপোর্ট-ও পাবলিশ করে (HRW, 2015)।

শুধু প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষই নয়; ছোট ছোট বাচ্চা ছেলেরাও অ্যামেরিকা আর তাদের পোষা বাহিনীর হাত থেকে রেহাই পায়নি। আফগানিস্তানে মার্কিনীদের সহযোগী আঞ্চলিক যুদ্ধবাজরা তালিবানের বিদায়ের পর তালিবানের লুপ্ত করা ছেলেশিশুদের বলাৎকার করার সংস্কৃতি পুনরায় 'উজ্জীবিত' করে। মার্কিনীদের কাছে তারা এতটাই 'স্বাধীনতা' পায় যে, মিলিটারি বেইসেও তারা এ ঘৃণ্য অপরাধটি করত। কোনো মার্কিন সৈন্য এ বিষয়ে বিরোধিতা করলে তাকে নির্দেশ দেয়া হতো চুপ থাকতে (Goldstein, 2015)। আফগানিস্তানে এই অপসংস্কৃতিকে বলা হয় 'বাচ্চাবাজি'। অ্যামেরিকান মিলিটারিরা আঞ্চলিক সহায়তাকারী যুদ্ধবাজদের বিভিন্ন গ্রামের কমান্ডার হিসেবে নিয়োগ দিত—সেখানে তারা শিশু ধর্ষণের মৃত 'সংস্কৃতি'র গোঁড়ায় পানি ঢালে।

ড্যান কুইন নামের সাবেক এক স্পেশাল ফোর্স ক্যাপ্টেন বলেন, তারা আফগানিস্তানে যুদ্ধ করতে যায়; কারণ তারা শুনেছিল, তালিবানরা 'মানবাধিকার' কেড়ে নিয়েছে। 'কিন্তু এখন আমরা এমন লোকদের ক্ষমতায় এনেছি, যারা তালিবানদের থেকেও বাজে কাজ করছে...'। অ্যামেরিকা-সমর্থিত এক মিলিশিয়া কমান্ডার এক ছেলেশিশুকে শেকল দিয়ে ওর বিছানার সঙ্গে যৌনদাস হিসেবে বেঁধে রেখেছিল। কুইন এজন্য ঐ কমান্ডারকে ধরে পেটায়। তাকে পেটানোর 'অপরাধে' অ্যামেরিকান আর্মি কুইনকে তার ক্যাপ্টেন্সি থেকে অব্যাহতি দেয় এবং তাকে অ্যামেরিকায় ফেরত পাঠায়। এছাড়া অ্যামেরিকান কন্ট্রাক্টররাও আফগান শিশুদের পেছনে অর্থ ব্যয় করত, যাদেরকে তারা বলত 'ড্যান্সিং বয়েজ'। মিডিয়াতে এ খবর প্রকাশ হলে আফগানিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হানিফ আতমার[১] মার্কিন দূতাবাসে এ সংবাদ জোরপূর্বক ধামাচাপা দেয়ার অনুরোধ জানায়। পরে ইউকিলিকস সে তথ্য ফাঁস করে দেয় (Boone, 2010)। ড্যান্সিং বয়েজদের কাজ কী ছিল? এই ছোট ছোট ছেলে শিশুদের নারী সাজিয়ে পুরুষদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে মনোজ্ঞ 'সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা'য় নাচানো হতো, আর তারপর তাদেরকে করা হতো ধর্ষণ।

[১] Hanif Atmar

শিশুগামিতা সমর্থন করা এক জাতি যখন মুসলিমদের সভ্যতা শেখাতে যায়, তখন তা আশ্চর্যের কারণই বটে! তালিবানদের শাসনামলে 'বাচ্চাবাজি'র শাস্তি ছিল প্রাণদণ্ড। পরবর্তীকালে অ্যামেরিকা আফগানিস্তানে গিয়ে মৃতপ্রায় এই কুকর্মকে পুনরায় বাঁচিয়ে তুলল[১]। আর মুসলিমদের জনপদগুলোতে এইসব শিশুধর্ষকদের সেবাদাস, (বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে ধর্ষিত) সেক্যুলার-লিবারেল মতাদর্শে বিশ্বাসী তথাকথিত 'সংস্কৃতিমনা' লেজকাটা (পটেন)শিয়াল (রেপিস্ট)গুলো আজ শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির কর্তাব্যক্তি সেজে বসে আছে। আর নিজেদের মতাদর্শকে দাবি করছে সার্বজনীন!

অক্টোবর ২০০৯, তৎকালীন আফগান ভাইস প্রেসিডেন্ট আহমাদ জিয়া মাসউস—সোভিয়েতবিরোধী যুদ্ধের সাবেক নেতা আহমাদ শাহ মাসউস-এর ছোট ভাই—$৫২ মিলিয়ন অর্থসহ দুবাই বিমানবন্দরে আটক হন। পরবর্তীকালে কোনো জবাব দেয়া ছাড়াই তাকে যেতে দেয়া হয়। এই সংবাদ পরে ফাঁস করে উইকিলিকস (Steele & Boone, 2010)।

জানুয়ারি ১৫, ২০১০, কান্দাহারে গুলমুদ্দিন[২] নামক এক পনেরো বছর বয়সী আফগান কিশোরকে অ্যামেরিকান সৈন্যরা যুদ্ধের 'মঞ্চ' সাজিয়ে নাটকীয়ভাবে হত্যা করে। তারা গুলমুদ্দিনকে একটি মাটির দেয়ালের পেছনে দাঁড়াবার নির্দেশ দিয়ে তার দিকে গ্রেনেড ছুড়ে মারে, অতঃপর কাছ থেকে গুলি করে তাকে হত্যা করে। শিকারীরা পশু শিকারের পর যেভাবে ফটোশুট করে, তার অনুকরণে তারা গুলমুদ্দিনের লাশকে উলঙ্গ করে চুল টেনে ধরে হাস্যোজ্জ্বল ছবি তোলে।



তাদের মধ্যে একজন, সার্জেন্ট গিভস ছুরি দিয়ে ওর আঙুল কেটে ট্রফি বা স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে সংগ্রহ করে। পরে গিভস শহীদ গুলমুদ্দিনের আঙুলটি আফগানিস্তানে তার প্রথম 'হত্যা'র স্মৃতি হিসেবে প্রাইভেট ফার্স্ট ক্লাস হোমসকে উপহার দেয়। হোমস

[১] প্রচুর 'প্রগতি' হলো।
[২] Gul Mudin

সে আঙুলটি সংরক্ষণ করে তার ব্যাগে রেখে দেয়।



গিভস আফগান মুক্তিযোদ্ধাদের শহীদ করার পর তাদের সঙ্গে কোনো অস্ত্র পেলে সেটি সংরক্ষণ করে রাখত। যাতে করে পরবর্তীকালে কোনো বেসামরিক নাগরিক হত্যা করলে সেই অস্ত্র পাশে রেখে তাদেরকে 'তালিবান যোদ্ধা' বলে চালিয়ে দেয়া যায়। অ্যামেরিকান সৈন্যরা যখন গাড়িতে করে গ্রামে যেত, অনেকেই ছোট বাচ্চাদের চকলেট ছিটিয়ে দিত। বাচ্চারা চকলেট নিতে ছুটে আসলে কখনো কখনো তাদের দিকে ছোড়া হতো গুলি। কখনো হয়তো বাচ্চাদের ওপরই গাড়ি তুলে দেয়া হতো। আবার কখনো সাধারণ কৃষকদের হত্যা করে প্রচার করা হতো তালিবান হিসেবে (Rolling Stone, 2011)।

২০০৯-২০১০, এই সময়ে অ্যামেরিকান পাঁচজন সৈন্য—যারা নিজেদের 'কিল টীম' হিসেবে পরিচয় দিত—'অন্তত' তিনজন বেসামরিক নাগরিককে হত্যা করে, যাদের মধ্যে গুলমুদ্দিন একজন। পরে হত্যার দায়ে এই পাঁচজনকে এবং ঘটনাগুলো ধামাচাপা দেয়ার দায়ে আরও সাতজনকে অভিযুক্ত করা হয়। নির্মম হত্যার দায়ে দায়ী এই পাঁচজন নিকৃষ্ট খুনির কী সাজা হয়, জানেন?

- স্টাফ সার্জেন্ট ডেভিড[১]: তিন বছর চার মাস পর প্যারোলের[২] অপশন-সহ পাঁচ বছরের কারাদণ্ড (Porterfield, 2011)।
- স্টাফ সার্জেন্ট গিভস[৩]: দশ বছর পর প্যারোলের অপশন-সহ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড (Oppmann, 2011)।
- প্রাইভেট ফার্স্ট ক্লাস হোমস[৪]: সেপ্টেম্বর ২০১১-তে সাত বছরের সাজা ঘোষণার পর ২০১৫ সালেই বের হয়ে যায় (Idaho soldier convicted, 2015)।
- স্পেশালিষ্ট মোরলক[৫]: সাত বছর পর প্যারোলের সুবিধা-সহ ২৪ বছরের সাজা (Reuters Staff, 2011)।
- স্পেশালিষ্ট উইনফিল্ড[৬]: তিন বছরের সাজা (Cole, 2011)।

[১] David Bram
[২] সাজার মেয়াদ পূরণ হবার আগেই শর্তাধীন মুক্তি। মুক্তির শর্ত পূরণ হচ্ছে কি না, তা তদারকি করেন একজন 'প্যারোল অফিসার'। শর্ত ভঙ্গ করলে আবার কারাগারে ফেরত আনা হয়।
[৩] Calvin Gibbs
[৪] Andrew Holmes
[৫] Jeremy Morlock
[৬] Adam Winfield

অবশ্য শুধু এই পাঁচজনের বেলায়ই নয়, যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষমা করার ক্ষেত্রে আমেরিকার আগে থেকেই যথেষ্ট 'সুখ্যাতি' রয়েছে। মার্কিন সেনাবাহিনীর যে সংস্কৃতি, তাতে অপরাধ প্রকাশ হয় কম, আর হলেও তারা খুব বেশি সাজাপ্রাপ্ত হয় না। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তার ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ে ৭০ জনের মতো যুদ্ধাপরাধীকে ক্ষমা করেন। ব্ল্যাকওয়াটার[১]-এর মতো প্রাইভেট ভাড়াটে খুনি প্রতিষ্ঠানের সন্ত্রাসীদের যেসব খুনের ঘটনা (কোনো কারণ ছাড়া সতেরো জন হত্যা, বিশজন আহত) প্রকাশ হয়ে পড়ে, সেগুলোতেও খুনিদের নিঃশর্ত ক্ষমা ঘোষণা করা হয় (VanLandingham & Corn, 2020; Haberman & Schmidt, 2020)।

চলুন, পুরো চিত্রটা আরও একবার আমরা কল্পনা করি। কোনো ভিনদেশী বাহিনী এসে আপনার ভাইয়ের সন্তানকে খেলাচ্ছলে হত্যা করে। তার আঙুল কেটে নিয়ে শিকারের 'ট্রফি' হিসেবে সংরক্ষণ করে। আর এত বড় অপরাধের পর তাদের সাজা হয় কয়েক মাস জেল। অথচ দিনশেষে ওরাই আবার নিজেদের ঘোষণা করে 'স্বাধীনতা' আনয়নকারী হিসেবে! কী, দৃশ্যটা স্বাভাবিক মনে হচ্ছে? এর উত্তরে কেউ যদি বলেন এগুলো স্বাভাবিক কিংবা বিচ্ছিন্ন ঘটনা, তাহলে তিনি সত্যিকার অর্থেই একজন খাঁটি, বিকৃত মস্তিষ্কের পশ্চিমা সভ্যতার গোলাম। গৃহপালিত পশুর গলায় বাঁধা শেকল খালি চোখে দেখা যায়, কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক দাসদের গলায় থাকা শেকল হয় অদৃশ্য, ওরা আল্লাহর পরিবর্তে ভিনদেশী জাতির গোলামির চিহ্ন নিজেদের কথায়-কাজে ফুটিয়ে তোলে। কিন্তু, কোনো স্বাভাবিক মানুষের কাছে এই দৃশ্য স্বাভাবিক, সহনীয় মনে হবে না। আর এই দৃশ্যগুলোই আফগান যুদ্ধ জুড়ে আফগানিস্তানের মানুষদের নিকট পরিচিত আর 'স্বাভাবিক' ছিল।

২০১৩ খ্রিষ্টাব্দে *ওয়াশিংটন পোস্ট* জানায়, অ্যামেরিকার ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি একটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের সকল জাতীয় (ও আন্তর্জাতিক) ফোনকল রেকর্ড ও স্টোরিং করছে। পরবর্তীকালে উইকিলিস প্রকাশ করে, নির্দিষ্ট সেই দেশটি হলো আফগানিস্তান (Assange, 2014)। স্বীয় 'নৈতিক উচ্চমর্যাদা'র ব্যাপারে লিবারেল সেক্যুলারদের ধারণার স্বরূপ দেখুন। তারা আফগানিস্তানের সকল জনগণের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘন করে। তার ওপর তারা জানায়, উক্ত রাষ্ট্রের নাম প্রকাশ করলে 'সহিংসতা' বৃদ্ধি পাবে, তাই তারা নাম প্রকাশ করবে না। অর্থাৎ, আফগানিস্তানের মতো কোনো রাষ্ট্রের নাগরিকদের গোপনীয়তা যে লঙ্ঘিত হচ্ছে, সেটা জানার অধিকার পর্যন্ত তাদের নেই। এই হলো লিবারেল-সেক্যুদের 'হিউম্যান রাইটস'।

১১ মার্চ, ২০১৬, মার্কিন সার্জেন্ট রবার্ট বেলস[২] তাদের ঘাঁটি থেকে আফগান

[১] Blackwater , পরবর্তীকালে নাম পরিবর্তন করে Xe Services রাখা হয়
[২] Robert Bales

বসতিতে গিয়ে ষোলো জন বেসামরিক নাগরিককে হত্যা করে, এর মধ্যে নয়জনই শিশু। বেলস তাদের হত্যা করে তাদের দেহ আগুনে পুড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। ষোলো জন তরতাজা অসহায় 'মানুষ' হত্যার আসামি বেলস-এর সাজা দেয়া হয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড (Healy, 2013)।

আদিবাসীদের ওপর গণহত্যা চালিয়ে 'সভ্য' হওয়া আরেক রাষ্ট্র অস্ট্রেলিয়ার ডিফেন্স ফোর্সের লিক হওয়া গোপন ফাইলের শত শত পাতা জুড়ে দেখা যায়, ২০০৯-২০১৩ এই পাঁচ বছরে 'অন্তত' দশটি ঘটনায় অস্ট্রেলিয়ান সৈন্যরা আফগান যোদ্ধাদের সাথে সাথে বেসামরিক পুরুষ ও নারী হত্যা করে (see Oakes & Clark, 2017c, for more details)। ২০১২, কান্দাহারে অস্ট্রেলিয়ান সৈন্যরা এক কিশোর ছেলেকে হত্যা করে এবং সে তথ্য উচ্চপদস্থ অফিসারদের কাছ থেকে গোপন করে। সেপ্টেম্বর ২০১৩, উরুজগান প্রদেশে বিসমিল্লাহ আজাদি ও তার ছেলে সাদিকুল্লাহ বিছানার চাদর জড়িয়ে এক সঙ্গে ঘুমাচ্ছিল। অস্ট্রেলিয়ান সৈন্যরা সেই অবস্থাতেই তাদের দুজনকে একত্রে শহীদ করে দেয় (Oakes & Clark, 2017c)।

১৬ নভেম্বর ২০২০, অস্ট্রেলিয়ান ডিফেন্স ফোর্সের প্রধান আফগানিস্তানে তাদের সেনাদের খেলাচ্ছলে হত্যা/খুনের বিস্তারিত রিপোর্ট হাতে পান (Afghanistan Inquiry, ২০২০)। কী ছিল সেই রিপোর্টে? সেখানে ছিল পশ্চিমা মানবাধিকার পৌঁছানোর অস্ট্রেলিয়ান ভার্শনের বিবরণ। অস্ট্রেলিয়ান সৈন্যরা—

- হত্যার সংখ্যা গণনার প্রতিযোগিতা করত,
- হেলিকপ্টারে করে আফগান গ্রামে আক্রমণ করত, অতঃপর পলায়নপর বেসামরিক নাগরিকদের ওপর চালাত গণহত্যা,
- হেলিকপ্টার হামলার পর স্পেশাল ফোর্স পুরো গ্রাম ঘিরে ফেলে গ্রামের পুরুষ ও ছেলেদেরকে গ্রামের শেষ প্রান্তে 'গেস্ট হাউসে' নিয়ে যেত।[১] তারপর তাদের দিনের পর দিন নির্যাতন করা হতো। অবশেষে স্পেশাল ফোর্স যখন 'অতিথিদের আপ্যায়ন' শেষ করে চলে যেত, তখন ছেলে ও পুরুষদের পাওয়া যেত মাথায় গুলিবিদ্ধ কিংবা চোখবাঁধা, গলা কাটা অবস্থায় (2020, p. 120)।

২০১৭ সালে নিউজিল্যান্ডের সাবেক ডিফেন্স মিনিস্টার স্বীকার করেন, ২০১০ এর ২২ মে নিউজিল্যান্ডের সৈন্যরা এক হামলায় ছয় জন বেসামরিক অসহায় আফগানকে হত্যা ও পনেরো জনকে আহত করে। তার দাবি অনুযায়ী, তিনি ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দে এসে টিভিতে দেখতে পান, তার সৈন্যরা তিন বছর বয়সী এক বাচ্চাকে হত্যা করছে। তারপরও তিনি বলেন, যুদ্ধে এরকম হতেই পারে। এসব কথাও তিনি স্বীকার করেন অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের বই *Hit and Run*-এ উল্লিখিত ঘটনার বিস্তারিত প্রকাশ

[১] বাংলাদেশের সন্ত্রাসীরা আবরার ফাহাদকে যেভাবে হত্যা করেছিল, ঠিক যেন সেরকম ঘটনা।

হবার পর (Oakes, 2017a)। পরবর্তীকালে পলিটিশিয়ান ও সামরিক অগ্রনায়করা সম্মিলিতভাবে এ ঘটনা ধামাচাপা দেয় (Oakes, 2017b)।

লক্ষ্য করার একটি বিষয় হলো, ইরাকের নির্যাতনের সংবাদ (পরবর্তী অনুচ্ছেদ) প্রকাশিত হবার পর চারিদিকে যেভাবে হাহাকার পড়ে যায়, আফগানিস্তানে ঠিক সেরকম নির্যাতনই হয়েছে। বরং নির্যাতনের শুরুটাই হয়েছে আফগানিস্তানে। কিন্তু পশ্চিমা সভ্যতা আফগানিস্তানের ক্ষেত্রে তাদের 'কথিত মানবতা'র কোনো অংশ বরাদ্দ রাখেনি। এমনকি অনেক স্কলার ইরাকের ক্ষেত্রে যেসব অকথ্য নির্যাতনকে অবৈধ মনে করতেন, তারা সেই নির্যাতনগুলোকে শুধু আফগানিস্তানের জন্য 'খাস' হিসেবে বৈধ ধরে নিয়েই ইরাকে নির্যাতনের বিরোধিতা করেন।

এই ছিল আফগানিস্তানে পশ্চিমা স্বাধীনতা আর গণতন্ত্রের প্রকৃত চেহারা। হত্যা, নির্যাতন আর ধর্ষণের যে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল তারা, তার শেষটা হয়েছে নিদারুণ অপমানের মধ্য দিয়ে। সর্বাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত অ্যামেরিকার সৈন্যরা হালকা অস্ত্র নিয়ে লড়াই করা তালিবানদের অপসারণের চেষ্টায় বিশটি বছর জান-মাল অপচয় করে যুদ্ধ চালিয়ে গেছে। কিন্তু 'সাম্রাজ্যের কবরস্থান' আফগানিস্তান থেকে বিজয় ছিনিয়ে আনতে পারেনি। পরাজিত হয়ে নতমস্তকে ফিরে গেছে নিজ দেশে। তালিবানদের বিজয়ে একটা বিষয় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে, সেটি হলো— মুমিনরা যদি একতাবদ্ধ হয়ে, নিজেদের লক্ষ্যে অটল থেকে লড়াই চালিয়ে যায়, তাহলে শক্তির ভারসাম্যহীনতা তখন গৌণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, আল্লাহ যাকে সাহায্য করেন, পৃথিবীর কোনো শক্তি তার বিরুদ্ধে বিজয়ী হবার সক্ষমতা রাখে না।

একটা ঘটনা বলে আফগানিস্তানের বীরত্বগাথা শেষ করি। ২১ সেপ্টেম্বর, ২০০১, পবিত্র জুমাবার। আমিরুল মুমিনিন মোল্লা মুহাম্মদ ওমর রহিমাহুল্লাহর বারো মিনিটের এক ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়। সেখানে সাংবাদিক মোল্লা ওমরকে প্রশ্ন করেন, আপনি কি জানেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে?

এর জবাবে তিনি তাঁর জীবনের অন্যতম স্মরণীয় উক্তিটি বলেন। তিনি উত্তর দেন, [আজ] আমার সামনে দুইটি ওয়াদা রয়েছে। এক আল্লাহর ওয়াদা, অন্যটি বুশের। আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করেছেন যে, আমার জমি বিশাল। যদি তুমি রবের পথে জিহাদ করো, তুমি পৃথিবীর যেখানেই থাকো না কেন, তুমি [আল্লাহর] নিরাপত্তা লাভ করবে... আর বুশ শপথ করেছে, দুনিয়ায় এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে তুমি লুকিয়ে থাকলে আমি তোমাকে খুঁজে বের করতে পারব না। আমরা দেখব এই ওয়াদা দুটির মধ্যে কার ওয়াদা সত্যি হয় (Guardian, 2001)।

তার সেদিনের কথার উত্তর আজ আমরা জানি। মার্কিনীদের নাকের ডগায় আরও এক দশক বাস করে আল্লাহর ওয়াদার বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করে স্বাভাবিকভাবে তিনি

মারা যান। আর বুশের পর আরও তিন প্রেসিডেন্ট এসেও আফগানিস্তানে বিজয়ের মুখ দেখতে পায়নি।

ইরাক যুদ্ধ

সাংবাদিক রন সাসকিন্ড বুশ প্রশাসনের একজন অফিসিয়ালের বক্তব্য উদ্ধৃত করেন, যিনি গর্ব করে বলেছিলেন,

> 'বর্তমানে আমরাই একটি সাম্রাজ্য। কাজ করার সময় আমরা আমাদের নিজস্ব বাস্তবতা সৃষ্টি করে নিই। আর তোমরা [সাংবাদিক, লেখক, বুদ্ধিজীবী] যখন বিচক্ষণ দৃষ্টিতে সেই বাস্তবতা সম্পর্কে অধ্যয়ন করবে, আমরা পুনরায় অন্যান্য নতুন সব বাস্তবতা সৃষ্টিতে লিপ্ত হবো। সেগুলোও তোমরা অধ্যয়ন করবে, আর এভাবেই বিষয়গুলো নির্ধারিত হয়। আমরা ইতিহাসের [মঞ্চে] অভিনেতা... আর তোমরা, তোমাদের প্রতিটি ব্যক্তি সেখানে পড়ে থাকবে শুধুমাত্র আমরা কী করি তা অধ্যয়ন করার জন্য' (Robinson, 2015)।

ইরাক যুদ্ধ শুরুর পূর্বে বুশ প্রশাসন বারবার অ্যামেরিকার সৈন্যদেরকে 'মুক্তিদাতা' ও 'শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী' হিসেবে ঘোষণা করত। যারা জীবন বাজি রেখে ইরাকে শান্তি, প্রগতি আর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে এবং নির্যাতিত ইরাকি নাগরিকগণ তাদেরকে দু'বাহু মেলে সাদর আমন্ত্রণ জানাবে। যুদ্ধের পূর্বাপর সময়ে মার্কিনীরা কিছু বিমূর্ত পরিভাষা ব্যবহার করে। যেমন : দেশপ্রেম, গৌরব, শৌর্য-বীর্য, বীরত্ব—যেগুলোর প্রত্যেকটি ছিল বাস্তবতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। কিন্তু, বুশের এসকল বাগ্‌চাতুর্যকে প্রশ্নের সম্মুখীন করার পরিবর্তে মার্কিন মিডিয়াগুলো মহিমান্বিত করে তুলে।

প্রথমে ফেব্রুয়ারি ২৮ (Bush G. W., 2003e) ও পরে মার্চ ১, ২০০৩-এ প্রেসিডেন্ট বুশ বলেন, 'ইরাকি জাতি তাদের গৌরবময় ঐতিহ্য, প্রচুর সম্পদ আর দক্ষ ও শিক্ষিত জনগণকে সঙ্গে নিয়ে গণতন্ত্রের দিকে এগোবার ও স্বাধীনতার সঙ্গে বসবাস করার পূর্ণ সক্ষমতা রাখে' (Carruthers, 2016)। মার্চ ১৭, ২০০৩, যুদ্ধ শুরুর দুই দিন পূর্বে বুশ ইরাকি জনগণকে 'ভরসা' দেয়ার লক্ষ্যে বলেন, 'যদি আমাদের সামরিক কার্যক্রম শুরু করতেই হয়, (তাহলে) সেটি হবে চরমপন্থী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যারা তোমাদের শাসন করে। (এই হামলা) তোমাদের বিরুদ্ধে নয়' (Bush G. W., 2003)।

এপ্রিল ৯, ২০০৩, একদল ইরাকি বাগদাদে সাদ্দাম হোসেনের মূর্তিতে ভাঙচুর শুরু করে। এক ইরাকি হাতুড়ি নিয়ে সেটাতে আঘাত করতে শুরু করে, আরও কিছু লোক তার সাথে যোগ দেয়। পরে অ্যামেরিকান মেরিন সদস্যদের সাহায্যে

মূর্তিটি ভূপাতিত করা হয়। মার্কিন মিডিয়াতে মূর্তি ভাঙার এই ঘটনাটি যুদ্ধ জয়ের প্রতীক হিসেবে উদযাপিত হয়। যদিও 'প্রকৃত' যুদ্ধ, অর্থাৎ অ্যামেরিকা আর ব্রিটিশ আগ্রাসীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কিন্তু তখনো পুরোদমে শুরু হয়নি। মিডিয়াতে মূর্তির ঘটনাটিকে ইরাকের জন-সমর্থিত বিশাল ঘটনা হিসেবে দেখানো হয়।[১] কিন্তু, পরবর্তীকালে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, ঘটনায় সময় সেখানকার অধিকাংশ স্থান ছিল ফাঁকা। আর সেখানে উপস্থিতও ছিল মাত্র কয়েকশত মানুষ, যাদের মধ্যে সাংবাদিক আর অ্যামেরিকান সৈনিকদের সংখ্যাই ছিল বেশি। আর মূর্তিতে আক্রমণ করা ইরাকি বাসিন্দাদের অধিকাংশই ছিল মার্কিন সমর্থিত ইরাকি ন্যাশনাল কংগ্রেস পার্টির সদস্য, যার নেতা ইরাকের কুখ্যাত গাদ্দার আহমেদ চালাবি। এই লোকটি ইরাকে মারণাস্ত্র থাকার ব্যাপারে মিথ্যা সংবাদ প্রচারে অ্যামেরিকাকে সহায়তা করে (Kellner, 2007)।

এইদিন সকাল এগারোটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত *সিএনএন* প্রতি ৭.৫ মিনিট পরপর, *ফক্স নিউজ* প্রতি ৪.৪ মিনিট পরপর ভিডিওটি পুনঃপ্রচার করে (ProPublica, 2010)। পরের দিন সকল পত্রিকায় বিজয়ের 'সুসংবাদ' ছাপা হয়। *সান ফ্রান্সিস্কো ক্রনিকেলস*[২]-এর সম্পাদক ও রিপোর্টার রবার্ট কলিয়ার-এর রিপোর্ট পরিবর্তিত করে ইরাকিদের অনুভূতি প্রকাশের ভাষা হিসেবে লিখে : 'বিজয়! আমরা স্বাধীন!' জনগণ (উল্লসিত হয়ে) চিৎকার করছে। 'ধন্যবাদ! প্রেসিডেন্ট বুশ!' (Collier & Squatriglia, 2003)। এই আর্টিকেলের সঙ্গে যুক্ত ছবিতে দেখা যায়, ইরাকি শিশুরা হাস্যোজ্জ্বল মুখে মার্কিন সেনাদের গালে চুমু দিচ্ছে। নিউ ইয়র্ক টাইমস এ ঘটনাকে বর্ণনা করে 'সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত প্যারিসবাসীদের মিত্রপক্ষের ট্যাংকে ফুল ছিটিয়ে দেয়ার মতো, সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত জার্মানদের বার্লিন ওয়াল ভাঙার মতো, ... সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ইরাকিরা তাদের অত্যাচারীর মূর্তি ধ্বংস করেছে, সাদ্দাম হোসেনের মুখে জুতো ঘষে দিয়েছে' (Safire, 2003)।

কিন্তু, আসল পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। পরবর্তীকালে, ঐ দিনের ঘটনার সময়

---

[১] বাংলাদেশের শাহবাগে নাস্তিকরা রাষ্ট্রীয় মদদে যে পৈশাচিক নাটক মঞ্চায়িত করে, বঙ্গীয় সেক্যুলার মিডিয়াও লজ্জাহীনতার চরমতম উদাহরণ দেখিয়ে সে ঘটনাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে সে নষ্টামিতে সারাদেশের সমর্থন রয়েছে বলে প্রচার করে। শাহবাগের ঘটনার পরও বহুবার দেখা গেছে, শাহবাগে দেশীয় সেক্যুলারদের দুইজনের মানববন্ধনকে ক্যামেরার অ্যাঙ্গেলের কারসাজিতে 'বিশাল জনমিছিল' হিসেবে প্রচার করতে। আর মুসলিমদের দশ হাজারের মিছিলকে কয়েক শত, এক লক্ষের মিছিলকে কয়েক হাজার, বেশ কয়েক লক্ষের মিছিলকে বেশ কয়েক হাজার বলার উদাহরণ ভুরি ভুরি দেখানো যাবে। আবার কখনো-বা ইসলাম অবমাননার বিচারের দাবিতে মুসলিমদের বিক্ষোভ মিছিলকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে সংঘটিত ইনসাইড জবকে 'হাজার হাজার' মুসলিমদের 'বীভৎস সাম্প্রদায়িক হামলা' হিসেবে প্রচার করাও দেশে বহুল প্রচলিত (will be described later in this book)।

[২] San Francisco Chronicles

সাদ্দাম হোসেনের মূর্তিতে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করা খাদিম আল-জাব্বুরি আফসোস করে বলেন, 'সাদ্দাম হোসেন মানুষ হত্যা করত, কিন্তু সেটি এখনকার সরকারের তুলনায় কিছুই নয়। সাদ্দাম বিদায় নিয়েছে, কিন্তু তার স্থানে এখন এক হাজার সাদ্দাম রয়েছে' (BBC News, 2016)। সাদ্দামের মূর্তি ভাঙার এক মাস পর বুশ 'লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে[১]' ব্যানার পিছনে রেখে ঘোষণা দেয়, গুরুত্বপূর্ণ লড়াই সমাপ্ত হয়েছে। ২০০৩-এর এপ্রিলে অ্যামেরিকা নির্বাসিত ইরাকি নেতা চালাবিকে ইরাকে ফেরত পাঠায়, তাদের আশা ছিল চালাবি ইরাকে তাদের সফল পুতুল সরকার প্রতিষ্ঠা করবে। কিন্তু জনগণ তার ও অ্যামেরিকার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারেনি। কারণ, ইরাকে অ্যামেরিকার ধ্বংসযজ্ঞ ইরাকি জনগণের সকল আশঙ্কাকে ছাড়িয়ে যায়।

ভিয়েতনামের মতো ইরাক যুদ্ধেও অ্যামেরিকা বেসামরিক নাগরিকদের ওপর নাপাম ব্যবহার করে। শুরুতে পেন্টাগন তাদের চিরায়ত স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নাপাম ব্যবহারের কথা অস্বীকার করে, পরবর্তীকালে অ্যামেরিকান পাইলট ও কমান্ডাররা প্রকৃত সত্য ফাঁস করে দেয় (Buncombe, 2003)।

ইরাকের ফাল্লুজাহ শহরে ২০০৪-এর রক্তাক্ত যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে অ্যামেরিকান সৈন্যরা বিদ্রোহীদের গ্রেফতার করতে সেখানকার হাসপাতালগুলোতে আক্রমণ করে। হাসাপাতালের অ্যাম্বুলেন্সগুলো মার্কিন হামলায় আহত বেসামরিক নাগরিকদের সেবা দিতে চাইলে তারা অ্যাম্বুলেন্সে গুলি করত। এমনকি সেবাদান বাধাগ্রস্ত করতে সন্তান জন্মদানের টেবিলে কর্মরত থাকাকালীন ডক্টরদেরকেও তারা গ্রেফতার করে (Jamail, 2004)।

২০০৪ সালে ইরাকি নাগরিকদের ওপর পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায়, প্রায় ৬০% নাগরিক তাদের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত। ৯২% নাগরিক কোয়ালিশন ফোর্সকে 'দখলদার' হিসেবে সাব্যস্ত করে, মাত্র ২% ইরাকি সেক্যুলার-উচ্ছিষ্টভোগী রাজাকার তাদেরকে 'ত্রাণকর্তা/মুক্তিদাতা' হিসেবে ঘোষণা দেয়। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশ-ই (৫৫%) জানায়, কোয়ালিশন ফোর্স যদি তাৎক্ষণিক ইরাক ত্যাগ করে, তাহলেই তারা অধিক নিরাপদ অনুভব করবে (Global Policy Forum, 2004)।

পরবর্তীকালে এই চিত্র তেমন বদলায়নি। ২০০৭-এ ইরাকিদের নিরাপত্তা পরিস্থিতির ক্ষেত্রে ৫৬%, চাকরির ক্ষেত্রে ৮০%, বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে ৯২%, বিশুদ্ধ পানির ক্ষেত্রে ৭৫%, স্বাস্থ্যসেবার প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে ৬৭%, মৌলিক জিনিস প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে ৬১%, চলাচলের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ৭৪% ইরাকি জানায় যে, উল্লিখিত বিষয়ে পরিস্থিতি 'বেশ খারাপ' বা 'খুবই খারাপ' (Global Policy Forum, 2007)। ৮৫% নাগরিক জানায়, কোয়ালিশন ফোর্সের ওপর তাদের কোনো

[১] Mission Accomplished

আস্থা নেই।

তাহলে, এ কেমন স্বাধীনতা, যেখানে 'স্বাধীন' হওয়া ব্যক্তিরা স্বাধীনতার বিরোধিতা করে? আর কেনই-বা অ্যামেরিকান আগ্রাসীরা ইরাকি নাগরিকদের মতামত যাচাই করে দেখল না, 'অধিকাংশ' ইরাকিরা অ্যামেরিকানদেরকে ইরাকি ভূখণ্ডে 'স্বাধীনতা' আনয়নকারী হিসেবে চায় কি না? জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয়া এই শাসনব্যবস্থাকে 'স্বাধীনতা' বলার সাইন্সটা কী?

নভেম্বর ১৯, ২০০৫, 'কমপক্ষে' ২৪ জন ইরাকি বেসামরিক (নারী, শিশু-সহ) নাগরিককে মার্কিন সৈন্যরা হত্যা করে। আটজন মেরিন সেনাকে এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার কারণে অভিযুক্ত করা হয়। অথচ, আটজন আসামীর মধ্য থেকে মাত্র একজনকে ২০১২ খ্রিস্টাব্দে ৯০ দিন জেলে থাকার 'শাস্তি' প্রদান করা হয় (CNN Editorial, 2021)।

অ্যামেরিকার আগ্রাসনের সূচনার তিন বছর পর, ইরাকি শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ সামিরা তার কর্মস্থল প্রসূতি বিভাগে কিছু 'সমস্যা' লক্ষ করলেন। তার হাসপাতালে মহিলারা তাদের এমনসব বাচ্চা নিয়ে আসতে শুরু করল, যাদের পেট থেকে অভ্যন্তরীণ অঙ্গ বের হয়ে আছে, পা দুটি জোড়া লেগে লেজের আকৃতি গঠন করেছে। কারও দেহের চামড়া সাপের মতো দেখতে। কোনো শিশু শ্বাসগ্রহণে প্রায় অক্ষম থাকার কারণে মুমূর্ষু অবস্থায় শয্যাসীন। কারও বাচ্চা মস্তিষ্কে ব্রেইন সুরক্ষিত রাখার স্কাল বা খুলি ছাড়াই জন্ম নেয়, ফলাফল—জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তাৎক্ষণিক মৃত্যু (Gottesdiener, 2020)।

এই বিশেষ সমস্যার অন্যতম প্রধান কারণ মার্কিন বাহিনীর ব্যবহৃত ইউরেনিয়াম[১]। একবার চিন্তা করুন তো, ভয়াবহ মরণবাহী যুদ্ধের মাঝে নবজীবনের জয়গান গেয়ে দীর্ঘ দশ মাস গর্ভধারণ করার পর যখন কোনো মা তার প্রাণপ্রিয় সন্তানকে জন্ম দিয়ে দেখতে পান, তার সন্তানের এই নির্মমতম পরিণতি, তখন তার ঠিক কেমন বোধ হয়? কতটা নির্মম সেই মুহূর্তটা? একবার সেই অনুভূতিটা কল্পনা করার চেষ্টা করুন; আর যদি পুরুষ হয়ে থাকেন, তাহলে মাহরাম কোনো নারীকে ছবিগুলো দেখিয়ে এই প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করতে পারেন, তারা হয়তো তাদের সেই অকথ্য কষ্টের কিছুটা ধারণা করতে পারবে।

[১] Depleted Uranium হলো Enriched Uranium উৎপাদনের সময় প্রাপ্ত বাই প্রোডাক্ট। এই উপাদানটি বসনিয়া, আফগানিস্তান, ইরাকের জনগণের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয় (Lundy, 2011)।





১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের যুদ্ধেও মার্কিন বাহিনী ইরাকে মিলিয়ন রাউন্ড ইউরেনিয়াম ব্যবহার করে। পরবর্তীকালে ইরাকি জনগণের ওপর যখন এর বিরূপ প্রভাবের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়, তখন পেন্টাগন দাবি করে যে, এটি সিরিয়াস কোনো স্বাস্থ্যঝুঁকি বহন করে না। সেই দাবির ওপরই তারা অটল থাকে। হোয়াইট হাউস দাবি করে, ইরাকি সরকার সিম্প্যাথি আদায়ে মিথ্যা রিপোর্ট প্রকাশ করছে; তাই তারা সুনিশ্চিতভাবে এটির ব্যবহারে ঝুঁকির সম্ভাব্যতা নাকচ করে দেয় (Apparatus of Lies, 2003)। অথচ, অ্যামেরিকান বহু সৈন্যও পরবর্তীকালে ইউরেনিয়ামের কারণে অসুস্থ হয়ে পড়ে। ধারণা করা হয়, ১৯৯১-এর আক্রমণে ইউরেনিয়াম ব্যবহারের পরিমাণ ছিল কমপক্ষে ২৮৬ টন[১], আর ২০০৩-এর আগ্রাসনে তা ছিল ১৩০ টন (Hastings, 2006)।

ইরাকের তিকরিত শহরে যুদ্ধ করা সার্জেন্ট মিলার্ড[২] নামক এক সৈনিক যুদ্ধে ঘটা এক নির্মম ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ১৮ বছর বয়সী এক মার্কিন সেনা

[১] ১৯৯১-এর উপসাগরীয় যুদ্ধে কুয়েত থেকে পলায়নপর ইরাকি সেনাদের ওপর 'Highway of Death'-এ মার্কিন বাহিনী Depleted Uranium সমৃদ্ধ অস্ত্র ব্যবহার করে। পরবর্তীকালে সে এলাকার জনগণের মধ্যে Birth defect ও Cancer-এ আক্রান্ত হবার হার বৃদ্ধি পায় (Smith A. , 2005/2015)।

[২] Geoffrey Millard

হামভি[১] নিয়ে ট্রাফিক কন্ট্রোল পয়েন্টে বসে ছিল। রাস্তা দিয়ে এক ইরাকি গাড়ি দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছিল। মুহূর্তের মধ্যে ঐ সৈন্য 'সিদ্ধান্ত' নিয়ে ফেলল, এটি একটি আত্মঘাতী বোমা হামলাকারী গাড়ি। পরের এক মিনিটে সে গাড়িটি লক্ষ্য করে মোট 'দুইশত' রাউন্ড গুলি ছুড়ে। পরে দেখা গেল, গাড়িতে অবস্থানকারী বাবা, মা, দুটি ছোট্ট শিশু—চার বছরের ছেলে ও তিন বছরের মেয়ে—গুলির আঘাতে ঐ জায়গাতেই তাৎক্ষণিক নিহত হয়। ঊর্ধ্বতন দায়িত্বশীল কর্নেলকে এ ব্যাপারে জানালে তিনি বলেন, 'যদি এই বদমাশ ইরাকীরা গাড়ি চালাতে শিখত, তাহলে এরকম হতো না' (Hedges & Al-Arian, 2008, pp. XIV-XV)। ব্যস, ওইটুকুই। সেখানেই ঘটনার সমাপ্তি, আর কোনো তদন্ত নেই, নেই কোনো সাজা।

যুদ্ধের পরিস্থিতি যখন তিক্ত হতে শুরু করে, তখন সেনাদের অনেকেই নিজেদেরকে আর 'মুক্তিদাতা', 'বিজয়ী' মনে করত না। এক মার্কিন সেনা মিডলটন[২] বলেন, 'অনেক ব্যক্তিই (সেনা) এই পুরো ব্যাপারটাকে সমর্থন দেয় যে, যদি তারা আমাদের মতো ইংরেজি বলতে না পারে, এবং তাদের ত্বক কালো হয়, (তাহলে) তারা আমাদের মতো মানুষ নয়। তাই আমরা যা ইচ্ছা তাই করতে পারি।' এটিই ছিল পুরো ইরাক ও আফগানিস্তানে মার্কিনীদের মনস্তাত্ত্বিক চিন্তার নমুনা। যুদ্ধের পুরোটা সময় জুড়েই অ্যামেরিকানরা শারীরিক আর বস্তুগত অগ্রসরতা অক্ষুণ্ণ রাখে, কিন্তু নৈতিকতার জায়গায় গিয়েই তারা হেরে বসে। অপ্রয়োজনীয়, এলোপাথাড়ি অভিযানে গ্রেফতারকৃত হতভম্ব ইরাকি বন্দিদের কাপড় খুলে নগ্ন করে তাদেরকে তপ্ত রোদে দাঁড় করিয়ে রাখা হতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা। অসহায় বন্দিদের নিপীড়ন করাটা কোয়ালিশন বাহিনীর জন্য পরিণত হয় একটা বিকৃত খেলায় (Hedges & Al-Arian, 2008)।

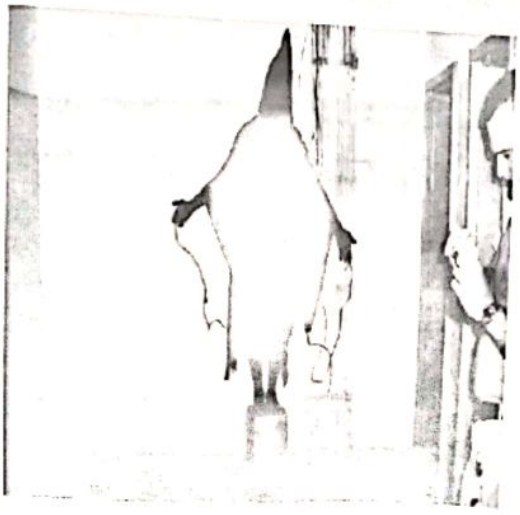
অনেক সৈন্যই যুদ্ধে অংশগ্রহণ শেষে স্বদেশে ফিরে হৃদয়ে চেপে রাখা সত্যের ভার সইতে না পেরে তাদের দেখা নির্মম হত্যাকাণ্ডের ঘটনা বর্ণনা করেন। সার্জেন্ট ফ্লাট জানুয়ারি ২০০৫-এর একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, মসুলের হাইওয়েতে এক মার্কিন কনভয় তাকে অতিক্রম করে এগিয়ে যায়। এর পিছনে থাকা একটি গাড়ি দুর্ভাগ্যবশত তাদের বহরের বেশ কাছে চলে গিয়েছিল; আর তখন মার্কিন কনভয় থেকে সেনারা গাড়িটি লক্ষ্য করে গুলি করে। গাড়িতে বসা এক নারীর মুখমণ্ডলে গুলি লেগে তিনি তৎক্ষণাৎ নিহত হন। মহিলাটির ছেলে গাড়ির ড্রাইভিং সিটে ছিল, আর মহিলার তিনটি ছোট ছোট কন্যা শিশু পেছনের সিটে বসেছিল। ফ্লাট ঐ সময় মসুলের প্রধান হাসপাতালের পাশেই অবস্থান করছিলেন, গাড়িটি দ্রুত

[১] High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle বা Humvee মিলিটারিতে বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত একটি যান।
[২] Spc. Josh Middleton

সেখানে পৌঁছুলে তিনি ঘটনাটি জানতে পারেন। তিনি তখন দেখতে পান, ছোট ছোট বাচ্চাগুলো তখন তাদের সদ্য খুন হওয়া মায়ের জন্য কান্না করছে (Hedges & Arian, 2008)।

পশ্চিমা সভ্যতার এই নগ্ন চেহারা সচেতন কোনো ব্যক্তির পক্ষে উপেক্ষা করা অসম্ভব। ইরাক যুদ্ধের ব্যাপারে বুশের সাবেক প্রেস সেক্রেটারি স্কট মেকলিল্যান্ড মন্তব্য করেন, ইরাকে আক্রমণের সিদ্ধান্ত একটি 'পলিটিকাল প্রোপাগান্ডা' মেশিন-এর মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছিল। যেটি মার্কিন নাগরিকদের ইরাক যুদ্ধে যোগদানের ব্যাপারে ভুল পথে পরিচালিত করেছে (McClellan, 2008)। বিশ্বের সুপারপাওয়ার রাষ্ট্রের কর্ণধাররা স্বাধীনতার বুলি প্রচার করে ইরাককে এমন এক ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে, যে অবস্থা থেকে ইরাকি জনগণ আজও উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হয়নি। এক সময়ে জ্ঞানের রাজধানী বিবেচিত হওয়া সুপ্রাচীন বাগদাদ আর ইরাককে অ্যামেরিকা রূপান্তরিত করে মৃত্যুপুরীতে। যেখানে জীবনের অনিশ্চয়তাই যেন এক সুনিশ্চিত বাস্তবতা।

আবু গারিব, গুয়ান্তানামো | অসভ্যতার সীমা কোথায়



সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বন্দিদের ওপর নির্যাতন পরিচালনার পথকে বাধাহীন করতে ডোনাল্ড রামস্ফেল্ড অ্যামেরিকান মিলিটারিতে রিফর্মেশন নিশ্চিত করে। জেনারেল ও জয়েন্ট চিফ অব স্টাফরা তাতে সম্মতি দিক বা না-দিক। রামস্ফেল্ড টিমের সঙ্গে দ্বিমত পোষণকারী যেকোনো সিনিয়র অফিসার হয় ওনাদের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে, নয়তো-বা তাদেরকে অবসর গ্রহণে বাধ্য করা হয়েছে (Clarke, 2008, p. 52)। ১৭ জানুয়ারি ২০০২, অফিস অব পাবলিক অ্যাফেয়ার্স থেকে দেয়া পেন্টাগনের ব্রিফিং-এ অ্যামেরিকান মিলিটারির সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে বিশ্বকে জানিয়ে দেয়া হয়, তারা

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধতে ধৃত ব্যক্তিদের যুদ্ধবন্দি[১]-এর বদলে প্রচলিত আন্তর্জাতিক নিয়মের বাইরে গিয়ে ডিটেইনি[২] হিসেবে বিবেচনা করবে। তারা দাবি করে, এসকল বন্দিরা খুবই বিপজ্জনক। তাদের নিজেদের এবং অ্যামেরিকার 'সুরক্ষা' নিশ্চিত করতে তাদেরকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে বিশ্বের অপর প্রান্তে কিউবার গুয়ান্তানামো-বে নৌঘাঁটিতে নেয়া হবে।

যুদ্ধনীতি আর জেনেভা কনভেনশন ছুড়ে ফেলা হলো ডাস্টবিনে। আফগানিস্তানের বাগরাম, ইরাকের আবু গারিব, কিউবার গুয়ান্তানামো বে কারাগার এবং বহির্বিশ্বে সিআইএ-র অন্যান্য গোপন কারাগারে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের স্থানান্তরিত করা হলো। উল্লিখিত প্রতিটি কারাগারে চালানো শুরু হলো পাশবিক নির্যাতনের স্টিমরোলার। মার্কিন সরকার দাবি করল, তালিবান কারাবন্দিরা যুদ্ধে শত্রুপক্ষের বন্দি (EPW)[৩] হিসেবে বিবেচিত হবে না। কারণ মুক্তিযোদ্ধা তালিবান বাহিনী আফগান সরকারকে 'উপস্থাপন' করে না। তারা দাবি করল, আফগানিস্তান ছিল একটি 'ব্যর্থ রাষ্ট্র', তাই ১৯৪৯ জেনেভা কনভেনশন-এর সুরক্ষা প্রদানকারী বিধানসমূহ[৪] তাদের জন্য প্রযোজ্য নয় (Greenberg & Dratel, 2005, pp. 38-79)। ২৫ জানুয়ারি, ২০০২, ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিস-এর আলবার্তো গঞ্জালেস—পরবর্তীকালে এটর্নি জেনারেল—এক মেমোরান্ডামে মত প্রকাশ করেন যে, প্রেসিডেন্ট চাইলে জেনেভা কনভেনশনকে 'বৈধভাবে' বাইপাস করতে পারেন (Greenberg & Dratel, 2005, pp. 118-121)। ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিস পরামর্শ দেয় যে, গুয়ান্তানামো প্রিজন উচ্চ পর্যায়ের তালিবান ও আল কায়েদা বন্দিদের জন্য নিরাপদ বন্দিশালা হিসেবে আদর্শ একটি স্থান। কারণ, বন্দিরা সেখানে তাদের বিরুদ্ধে নির্যাতনের কোনো আইনি প্রতিবাদ করতে পারবে না। তাদের কাছে আইনজীবীদের পৌঁছানোর রাস্তাও বন্ধ করে দেয়া হবে।

৭ ফেব্রুয়ারি, ২০০২, প্রেসিডেন্ট বুশ সরাসরি বলেন, 'জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট-এর চূড়ান্ত ফয়সালা অনুযায়ী অ্যামেরিকার শত্রুদের বিরুদ্ধে জেনেভার কোনো বিধানই প্রযোজ্য নয়। তবে, পলিসি অনুযায়ী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীসমূহ "বন্দীদের" সঙ্গে 'মানবিক' আচরণ করবে, সামরিক প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ

[১] prisoner of war, POWs বা যুদ্ধবন্দি।

[২] Detainee বলতে এমনসব বন্দিদের বোঝানো হয়, যাদের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক কোনো অভিযোগ ছাড়াই তাদেরকে কাস্টডিতে বন্দি করে রাখা হয়। এই শ্রেণির ব্যক্তিদেরকে কোনো অপরাধে অভিযুক্ত কিংবা POW হিসেবে বিবেচনা করা হয় না, অনেক সময় তাদেরকে বছরের পর বছর বিনা অভিযোগে আটক করে রাখা হয়।

[৩] Enemy prisoner of war, EPW বা যুদ্ধে শত্রুপক্ষের বন্দি। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় থেকে অন্যদের থেকে মার্কিন যুদ্ধবন্দিদেরকে আলাদা করতে অ্যামেরিকার হাতে বন্দি যুদ্ধবন্দিদের জন্য EPW টার্ম বা পরিভাষা ব্যবহার করা হয়।

[৪] Provision

ও যথার্থ উপায়ে, যে পদ্ধতি জেনেভার নীতিমালার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ' (Greenberg & Dratel, 2005, p. 135)।

অ্যামেরিকানরা বন্দীদের সঙ্গে ঠিক কোন পর্যায়ের 'মানবিক' আচরণ করেছে, সেটি একটু পর বিস্তারিত বর্ণিত হবে ইনশাআল্লাহ। এ ধরনের আরও কিছু মেমোরান্ডাম বুশ প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে লেনদেন হয়, যার মাধ্যমে তারা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে 'বৈধ' উপায়ে নির্যাতনের উপায়গুলো খুঁজে বের করেন। অবশেষে, বিচার বিভাগের সহায়তায় বুশ প্রশাসন ১৯৪৯ জেনেভা কনভেনশনকে কার্যত বাতিল ঘোষণা করে। ইরাক আক্রমণের পর অ্যামেরিকা সাদ্দাম হোসেনের ব্যবহৃত প্রিজন সিস্টেম নিজেদের নির্যাতন পরিচালনার কাজে ব্যবহার করতে শুরু করে। ২২ এপ্রিল ২০০৩ তারা আবু গারিব কারাগার দখল করে নেয়। আগস্টের ৪ তারিখে এটির নাম বদলে রাখা হয় বাগদাদ ডিটেনশন সেন্টার[১]। মার্কিনীরা এখানকার কোনো বন্দিকে 'বিশেষ বিপজ্জনক' মনে করলে তাকে পাঠিয়ে দেয়া হতো গুয়ান্তানামো বে-তে।

নির্যাতনের স্বরূপ

সেপ্টেম্বর ১২, ২০০২, জাতিসংঘের ভাষণে বুশ বলেছিলেন, সাদ্দাম হোসেন মানবাধিকার চরমভাবে লঙ্ঘন করেছে এবং ইরাকে নির্যাতন সর্বাত্মক রূপ ধারণ করেছে। তিনি সাদ্দাম হোসেনের 'অবাধ গ্রেফতার ও কারাগারে বন্দি করা, তাৎক্ষণিক হত্যা[২], প্রহার ও পোড়ানোর মাধ্যমে নির্যাতন, ইলেকট্রিক শক, অনাহার, অঙ্গচ্ছেদ ও ধর্ষণের মাধ্যমে নির্যাতন'-এর সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, 'ইরাকে স্ত্রীদেরকে তাদের স্বামীর সামনে, সন্তানদেরকে তাদের বাবা-মার সম্মুখে নির্যাতন করা হয়— এই ধরনের সকল ভয় (সৃষ্টিকারী ঘটনা) সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রযন্ত্রের সাহায্যে বিশ্ব থেকে গোপন রাখা হয়'[৩] (Bush G. W., 2002c)।

সাদ্দাম হোসেনের নির্যাতনের বিরুদ্ধে জোর আওয়াজ তোলা অ্যামেরিকা ইরাক ও আফগানিস্তানের নাগরিকদের সঙ্গে যে আচরণ করে, সেটি সাদ্দামের করা নির্যাতন থেকে কোনো অংশেই কম নির্মম ছিল না। বরং সকল ক্ষেত্রেই মার্কিনীরা নৃশংসতার সীমা অতিক্রম করেছে। সবচেয়ে পরিহাসজনক বিষয় হলো, জাতিসংঘে সাদ্দামের বিরুদ্ধে বুশ যে অভিযোগের ফিরিস্তি দিল, তার প্রত্যেকটি অপরাধ অ্যামেরিকা পুনরায় করে দেখিয়েছে ওয়ার অন টেররে। সেটিও তারা করেছে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার বুলি আওড়িয়ে।

---

[১] Baghdad detention center
[২] Summary execution: অপরাধের অভিযোগ এনে কোনো ট্রায়াল ছাড়াই তাৎক্ষণিক হত্যা।
[৩] উল্লিখিত প্রতিটি অপরাধ অ্যামেরিকা ওয়ার অন টেররে মঞ্চায়িত করে।

যুদ্ধের আহ্বানে হাজারও উজ্জীবিত মার্কিন তরুণ-তরুণীদের একজন নারী সেনা সাবরিনা হারম্যান ২০০৩-এর অক্টোবরের শুরুর দিকে আবু গারিবে পৌঁছান। প্রথম কয়েকদিন তিনি চুপচাপ সেখানে চলা নির্যাতনকে 'দায়িত্ব' হিসেবে পালন করেন। আবু গারিব থেকে তিনি কেলী নামের এক নারীকে নিয়মিত ইমেইল করতেন। গতানুগতিক কয়েকটি মেইল নিয়মিত পাঠাবার পর অক্টোবর ২০, ২০০৩-এ তার লেখা একটি মেইলে বেশ চাঞ্চল্যকর ভাষা ফুটে উঠে। তার ভাষ্যমতে, মেইলটি তিনি লিখেছিলেন তার 'স্ত্রী' কেলীর কাছে[১]। মেইলটিতে লেখা কথাগুলো ছিল এরকম—

অক্টোবর ২০, ২০০৩

রাত ১০: ৪০

কেলী

ওকে (Okay), আমি আর এসব (নির্যাতন) পছন্দ করি না। শুরুতে এগুলো (বেশ) মজাদার ছিল, কিন্তু এরা (মার্কিন সৈন্য) খুবই সীমালঙ্ঘন করছে। আমি গত রাতে তোমাকে চিঠি লেখা শেষ করে দিয়েছিলাম। কারণ, এমআই[২] বন্দিদের জাগানো এবং তাদের সঙ্গে 'অসভ্যতা' করার সময় হয়েছিল। কিন্তু সীমা খুব বেশি অতিক্রম করা হচ্ছে, এমনকি যা চলছে তা আমিও (মানসিকভাবে) সামাল দিতে পারছি না। এগুলো আমি আমার মাথা থেকেই বের করতে পারছি না। হুইসেল দেয়ার পর আমি সিঁড়ি দিয়ে হেঁটে নিচে যাই আর Asp[৩] দিয়ে সেলগুলোতে আঘাত করতে করতে গিয়ে 'ট্যাক্সি ড্রাইভার'কে খুঁজে পাই (মাথার ওপর দিয়ে হাত) পেছনের দিকে জানালার সঙ্গে হাতকড়া লাগানো, নগ্ন অবস্থায়, তার অন্তর্বাস তার মাথা ও মুখমণ্ডলে রাখা। তাকে যীশু খ্রিস্টের মতো লাগছিল। শুরুতে আমার হাসি পায়, তাই ক্যামেরা দিয়ে আমি তার ছবি তুললাম। আমি ভাবলাম, এটা হাস্যকর। (কিন্তু) তারপর সেটি আমাকে (হৃদয়ে) আঘাত করল, এটা এক প্রকার নির্যাতন। তুমি এটা করতে পারো না। তারা (নির্যাতনকারীরা) তার (ট্যাক্সি ড্রাইভার) সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। শুরুতে সে বলছিল, 'আমি শুধুই একজন ট্যাক্সি ড্রাইভার, আমি কিছুই করিনি।' সে দাবি করছিল সে কখনোই মার্কিন সৈন্যদের আহত করার চেষ্টা করেনি। তারপর সে চুপ করল। তাকে রেখে তারা সেল #০৪ এ গেল। (সেল #০৪-এর) এই ব্যক্তি এতটাই আহত ছিল যে, যখন তারা সেলের গরাদ দিয়ে তার পা ধরল, সে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে কাঁদতে আরম্ভ করল। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা (দুআ) করার পর সে কয়েক সেকেন্ড পর সারারাত একটানা ক্ষুদ্র 'আহ, আহ' গোঙানির শব্দ করছিল। তারা এ (ব্যক্তি)কে কী করেছে আমার জানা নেই। প্রথম

[১] খুব সম্ভবত লেসবিয়ান
[২] মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স (MI) অফিসার
[৩] লাঠি সদৃশ সামরিক অস্ত্র

(ড্রাইভার) লোকটা দেড়-দুই ঘন্টা হাতকড়া বাঁধা অবস্থায় ছিল। তারপর সে আল্লাহর নাম নিয়ে আর্তনাদ করছিল। তাই তারা ফিরে গিয়ে তাকে উভয় দিকের বিছানার উঁচু পাটাতনের সঙ্গে হাতকড়া পরাল, সে তখন (উভয় বিছানার) পার্শ্বদেশে দাঁড়াল। এক ঘন্টার কিছু সময় পর সে আবারও আল্লাহর নাম বলে বলে আর্তনাদ শুরু করল। খুব বেশি মানুষ জানে না এখানে কী পরিমাণ অনাচার হচ্ছে। আমি জানি না এসব আমি মানসিকভাবে নিতে পারব কি না। যদি আমি তাদের স্থানে থাকতাম তাহলে কী হতো! কেলী, এটা ভয়ংকর, তুমি জানো! আমি আমার চিন্তাভাবনায় কতটা হতবিহ্বল। আমার উভয়সত্তা-ই মনে করে এটা ভুল। আমি ভাবতাম আমি সবকিছু সামলাতে পারব। (কিন্তু), আমি ভুল ছিলাম।

সাবরিনা

(Gourevitch & Morris, 2008)

জুন ২০০৩, আবু গারিবে নির্যাতন নিয়ে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল প্রথম রিপোর্ট প্রকাশ করে। নভেম্বরে *অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস*-ও এ ব্যাপারে রিপোর্ট পাবলিশ করে। ১৩ জানুয়ারি, ২০০৪, মিলিটারি পুলিশ বিগ্রেড-এর স্পেশালিষ্ট ডার্বি[১] রিপোর্ট প্রদান করেন যে, আবু গারিবে বন্দি নির্যাতন হচ্ছে। নির্যাতন শুরু হবার এতগুলো মাস পর আর্মির সিআইডি[২] তদন্ত শুরু করে। কিন্তু, হাই কমান্ড তখন তদন্তে হস্তক্ষেপ করে, লেফটেন্যান্ট জেনারেল রিকার্ডো সানচেজ সুপারিশ করে, যেন ইউএস সেন্ট্রাল কমান্ড এ ঘটনার তদন্তের দায়িত্ব নেয় (Doyle, 2010)। ফেব্রুয়ারি ২০০৪, জেনারেল McKiernan মেজর জেনারেল অ্যান্টোনিও তাগুবা[৩]-কে তদন্তের দায়িত্ব প্রদান করেন। তাকে তদন্তের যে আদেশপত্র দেয়া হয়, সেখানে তাকে শুধু নিম্ন পদমর্যাদার সৈন্যদের তালিকা প্রস্তুত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। এর কারণ ছিল একেবারেই স্পষ্ট—নির্যাতনের আদেশ আসলে এসেছিল সর্বোচ্চ দায়িত্বশীলদের কাছ থেকে। ৩ মার্চ, ২০০৪, তাগুবা টিম McKiernan-এর কাছে প্রাথমিক রিপোর্ট পেশ করে। ঐ রিপোর্টে ছয়জন ননকমিশনড অফিসারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়। সিবিএস-এর ৬০ Minutes II প্রোগ্রামে নির্যাতনের ঘটনাপ্রবাহ সম্প্রচারিত হওয়ার কথা ছিল, এয়ারফোর্স জেনারেল মায়ার্স[৪]—জয়েন্ট চিফ অব স্টাফ-এর প্রধান এবং অ্যামেরিকার তৎকালীন সবচেয়ে সিনিয়র অফিসার—সিবিএসকে অনুরোধ করেন আবু গারিবের ওপর তৈরিকৃত তাদের রিপোর্টটির প্রচার পিছিয়ে দেয়ার জন্য। সিবিএস তার অনুরোধ রক্ষা করে। ১ মে, সিমোর হার্শ, তাগুবা রিপোর্ট নিয়ে প্রথম

[১] Joseph M. Darby
[২] Criminal Investigation Division (CID)
[৩] Antonio M. Taguba
[৪] Richard Myers

অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন প্রকাশ করেন এবং পরবর্তীকালে এর ওপর আরও দুটি প্রতিবেদন লিখেন।

দায়িত্বশীলদের নিকট এই নির্যাতনের জবাব চাইল মার্কিন কংগ্রেস। ৭ মে ও ১১ মে. রামস্ফেল্ড ক্যাপিটল হিল-এ কংগ্রেসের সঙ্গে সংলাপে যোগদান করে। তিনি সিনেটরদের বললেন, 'কঠোর' তদন্ত পদ্ধতিগুলো তারা অনুমোদন করেছেন, এবং পেন্টাগনের আইনজীবীরা নিশ্চিত করেছে যে, সেগুলো জেনেভা কনভেনশনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ! প্রেসিডেন্ট বুশ নির্যাতনের ঘটনাকে উড়িয়ে দিতে চাইলেও পরবর্তীকালে রামস্ফেল্ডকে সিনেট আর্মড সার্ভিসেসের সামনে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে হয় (Doyle, 2010)।

আবু গারিবে কী ধরনের নির্যাতন ঘটেছিল, যার কারণে পুরো পৃথিবীতে অ্যামেরিকার সমালোচনা শুরু হয়? তাগুবা রিপোর্ট অনুযায়ী, অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর ২০০৩-এর মধ্যবর্তী সময়ে আবু গারিবের অনেক বন্দির ওপর অবাধ অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হয়। নির্যাতনের অভিযোগ সাক্ষীদের বিস্তারিত বিবৃতি আর অত্যন্ত দৃষ্টিকটু ফটোগ্রাফি ও ভিডিও দ্বারা প্রমাণিতও হয়। তাগুবা টিম নিম্নোক্ত অপরাধগুলোর প্রমাণ খুঁজে পায় :

- ঘুষি, থাপ্পড়, লাথি; নগ্ন পায়ের ওপর লাফানো
- নগ্ন পুরুষ ও মহিলা বন্দির (Detainee) ছবি তোলা ও ভিডিও করা
- বন্দিদের ছবি তোলার জন্য তাদেরকে নানা রকম অশ্লীল যৌন পজিশনে সাজানো; তারপর ছবি তোলা
- বন্দিদের কাপড় খুলতে বাধ্য করা এবং টানা বহুদিন এভাবে কাপড় ছাড়া থাকতে বাধ্য করা
- বহু পুরুষ বন্দিদেরকে নারীদের অন্তর্বাস পরতে বাধ্য করা
- পুরুষ বন্দিদের ছবি তোলা ও ভিডিও করার সময়ে হস্তমৈথুনে বাধ্য করা
- নগ্ন পুরুষ বন্দিদের স্তূপের মতো জড়ো করে তাদের ওপর লাফানো
- একজন নগ্ন পুরুষ বন্দিকে বক্সের ওপর দাঁড় করিয়ে মাথায় বালুর বস্তা পরিয়ে, তার হাত ও পায়ের আঙুলে, এবং পুরুষাঙ্গে তার জড়িয়ে ইলেকট্রিক শক দেয়ার ভান করা
- নগ্ন বন্দির গলায় কুকুরের চেইন বেঁধে তাকে নিয়ে নারী সেনার ছবির জন্য পোজ দেয়া
- নারী বন্দিকে জোরপূর্বক ধর্ষণ
- কুকুর দিয়ে ভয় দেখানো, 'অন্তত' একজনকে কুকুর দিয়ে কামড়িয়ে আহত

করা

- ইরাকি বন্দির মৃতদেহের সঙ্গে হাস্যোজ্জ্বল ছবি তোলা

(Taguba, ২০০৪)।



এসকল নির্যাতন ছাড়াও তাগুবা অতিরিক্ত কিছু নির্ভরযোগ্য প্রমাণভিত্তিক নিপীড়নের ব্যাপারে রিপোর্ট করেন :

- কেমিক্যাল লাইট ভেঙে বন্দির গায়ের ওপর ফসফরিক লিকুইড ঢেলে দেয়া
- নগ্ন বন্দিদের ওপর ঠাণ্ডা পানি ঢালা
- বন্দিদের চেয়ার ও ব্রুম-হ্যান্ডল দিয়ে প্রহার
- পুরুষ বন্দিকে ধর্ষণের হুমকি
- বন্দির মলদ্বার দিয়ে কেমিক্যাল লাইট এবং (সম্ভবত) ব্রুম স্টিক প্রবেশ করানো (Taguba, 2004)।

আবু গারিবের বন্দি নং-১৯৪৪৬-এর সঙ্গে তাগুবা টিমের প্রশ্নোত্তর পর্বটি ছিল এরকম—

প্র : আপনার সঙ্গে যখন গার্ডরা এভাবে আচরণ করছিল তখন আপনি কেমন অনুভব করতেন?

উ : আমি নিজেকে মেরে ফেলতে চাইতাম, কিন্তু আমার কাছে এটা করার কোনো রাস্তা ছিল না।

প্র : গার্ডরা কি আপনাদের হাত ও হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে হামাগুড়ি দিতে বাধ্য করেছিল?

উ : হ্যাঁ, তারা আমাদের এসব করতে বাধ্য করত।

প্র : আপনারা যখন হামাগুড়ি দিতেন তখন গার্ডরা কী করত?

উ : তারা আমাদের পিঠের ওপর চড়ে বসত, যেভাবে কোনো পশুর ওপর চড়ে।

(Taylor, 1990/2003)।

সাঈদ আল শেইখ[১] নামের এক সিরিয়ান বন্দি তাগুবাকে জানায়, অন্যান্য নির্যাতনের পাশাপাশি তাকে শূকরের গোশত খেতেও বাধ্য করা হয়। অ্যামেরিকানরা তাকে হাতকড়া পরিয়ে বিছানায় ঝুলাত। তারপর তাকে বলত ইসলামকে অভিশাপ (গালি) দিতে। সেনারা তার ভাঙা পায়ে আঘাত করতে শুরু করলে সে ইসলামকে অভিশাপ দিতে বাধ্য হয় (Otterman, 2007)।

২০১৪-তে ইরাকের আবু গারিব ও অন্যান্য কারাগারে তোলা অপ্রকাশিত ২,১০০টি ছবি ওবামা প্রশাসন প্রকাশ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ACLU-এর স্টাফ এটর্নি অ্যালেক্স বলেন, 'এ ছবিগুলো কমপক্ষে সাতটি ভিন্ন ভিন্ন কারাগার থেকে এসেছে। আমরা (সাধারণ মানুষ) মনে করি, আবু গারিব (হয়তো) বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল—এই বিশ্বাসকে এটি (ছবিগুলো) চিরতরে মিটিয়ে দেবে।' তার ভাষায়, 'এই নির্যাতন ছিল অবশ্যই অফিসিয়াল পলিসি। বিভিন্ন কারাগারে বিভিন্ন কমান্ডারের অধীনে এই (ঘটনাগুলো) ছিল ব্যাপক' (Walker, 2014)।



মামদু হাবিব[২], ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে মিশরে জন্ম নেয়া এক অস্ট্রেলিয়ান নাগরিক। ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে সিডনিতে স্থানান্তরিত হয়ে সেখানকার নাগরিক মাহাকে বিয়ে করা হাবিব পরবর্তী বছরগুলোতে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হন। ধর্মীয় বিধিবিধান মানা শুরু করেন এবং বিশ্বে মুসলিমদের সমস্যা নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করেন। সংক্ষেপে তার সাথে যা ঘটে তা হলো, ১৯৯১ সালে, অস্ট্রেলিয়ান সিকিউরিটি অ্যান্ড ইন্টেলিজেন্স অর্গানাইজেশন[৩] বা এএসআইও সিডনির মুসলিম সম্প্রদায়ের 'ভেতরের' একজন লোক রাখতে চায়, যে তাদের মাঝে গুপ্তচরবৃত্তি করবে। হাবিব তাদের জানায়, সে এতে আগ্রহী নয়। ১৯৯৩, এএসআইও তার বাসায় এসে তাদের বিজনেস কার্ড রেখে যায়। এবারে তারা হাবিবের বাবা-মা'কে মিশর থেকে অস্ট্রেলিয়ায়

[১] Sa'eed Al-Sheikh
[২] Mamdouh Habib
[৩] Australian Security and Intelligence Organization (ASIO)

নিয়ে আসার অফার দেয়, এবং হাবিবকে বিশ্বব্যাপী ভ্রমনে পাঠাবার প্রতিশ্রুতিও দেয়। কিন্তু এবারও হাবিব তাদের অফার খারিজ করে দেয়। পরবর্তীকালে সেখানকার ডিফেন্স হাউজিং অথরিটির সঙ্গে তার তিন বছরের লাভজনক চুক্তি রহস্যজনকভাবে বাতিল করে দেয়া হয়। হাবিবের বিশ্বাস, তাতে এএসআইও-এর হাত ছিল। অতঃপর, হাবিবের ব্যবসা শীঘ্রই দেউলিয়া হয়ে যায় (Otterman, 2007)।

হাবিব সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি তার পরিবারকে অন্য দেশে স্থানান্তরিত করবেন। ২৯ জুলাই ২০০১, হাবিব পাকিস্তানে পৌঁছায়। 'আমি সেখানকার পরিস্থিতি দেখতে চাচ্ছিলাম', হাবিব বলে। 'আর বাচ্চাদের জন্য ভালো ধর্মীয় স্কুল খুঁজছিলাম।' ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১, হাবিব যখন ৯/১১-এর ঘটনা জানতে পারে, সে তৎক্ষণাৎ তার স্ত্রী মাহাকে কল করল। সিডনিতে তখন রাত ১১.৩০, তাই ক্লান্ত মাহা জানায়, সে পরে এ বিষয়ে কথা বলবে। কিন্তু, পরের বার কথা বলার পূর্বেই এএসআইও তাদের বাসায় হানা দেয়। হাবিব তার স্ত্রীকে আতংকিত হতে মানা করে, কারণ তাদের লুকানোর কিছুই ছিল না। এর পরের তিন বছর হাবিব তার স্ত্রীকে আর দেখতে পায়নি।

আরেকজন অস্ট্রেলিয়ান ডেভিড হিকস[১], ধর্মান্তরিত মুসলিম, যিনি তালিবানদের সঙ্গে ট্রেনিং-এ অংশগ্রহণ করেছিলেন। অ্যামেরিকার অবৈধ হামলাকে সে সমর্থন দিতে অস্বীকার করে। তাই অস্ট্রেলিয়ায় ফিরে যাওয়ার জন্য আফগানিস্তানে তার ব্যক্তিগত সম্পদ সংগ্রহ করতে গেলে আফগান নর্দার্ন অ্যালায়েন্স তাকে ধরে অ্যামেরিকার হাতে তুলে দেয়। হিকসকে প্রথমে আরব সাগরে নোঙর করা USS Peleliu নামক মার্কিন যুদ্ধ জাহাজে নেয়া হয়। এখান থেকে তাকে নিকটবর্তী সামরিক ঘাঁটিতে নেয়া হয় দশ ঘণ্টা পেটানোর জন্য। সেখানে তাকে অনেক ধরনের অচেনা ঔষধ জোরপূর্বক খাইয়ে দেয়া হয়। অন্যান্য বন্দিদের ওপর গোয়েন্দাগিরির দায়িত্ব নিলে সৈন্যরা তাকে ১৫ মিনিটের জন্য পতিতার সার্ভিস অফার করে, সে ঐ প্রস্তাব নাকচ করে দেয় (Otterman, 2007)।

হাবিবকে গ্রেফতারের পর ১৫ দিন তাকে পাকিস্তানের কারাগারে নির্যাতন করা হয়। তারপর তাকে অ্যামেরিকান ঘাঁটিতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে নিয়ে প্রথমেই তার দেহ থেকে কাপড় কেটে ফেলে দেয়া হলো। অতঃপর কিছু একটা তার মলদ্বারে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হলো; তারপর জাম্পস্যুট পরিয়ে অন্য একটা ফ্লাইটে তাকে তুলে দেয়া হলো। হাবিব এসে পৌঁছুল কায়রোতে। সেখানে ওমর সুলায়মান, মিশরীয় সিকিউরিটি বাহিনীর প্রধান তাকে বলল—স্বীকারোক্তি দেয়া প্রতি 'সন্ত্রাসী'কে অ্যামেরিকার হাতে তুলে দেয়ার জন্য মিশর $10 মিলিয়ন করে অর্থ পায়। ওমর সুলাইমান তাকে একটি প্রস্তাব দেয়। হাবিব স্মৃতিচারণ করে,'আমি যদি নিজেকে টেরোরিস্ট হিসেবে স্বীকার করি, তাহলে সে তার প্রাপ্ত অর্থের $৬ মিলিয়ন রেখে

[১] David Hicks

দিবে। তারপর সে আমাকে নতুন পরিচয় দিয়ে (বাকি $৪ মিলিয়ন) অর্থগুলো আমাকে দিবে।' সম্ভবত, সুলাইমান হাবিবের পরিবর্তে অন্য কাউকে ধরিয়ে দিত। হাবিব সেই প্রস্তাবটিও নাকচ করে দেয় (Otterman, 2007)।

গরের মাস জুড়ে তাকে অবর্ণনীয় নির্যাতন করা হয়। মিশরে অ্যামেরিকানরা উপস্থিত থাকলেও টর্চারের দায়িত্বে ছিল মিশরীয়রা। মে ২০০২, হাবিবকে মার্কিনীরা নিজেদের দায়িত্বে নিয়ে নেয়। প্রথমে তাকে নেয়া হয় কুখ্যাত বাগরাম কারাগারে। সেখানকার নির্যাতন পদ্ধতি ছিল 'অ্যামেরিকান'। এর দশদিন পর তাকে নেয়া হলো কান্দাহারে। সেখানে 'সাধারণ' নির্যাতনের সঙ্গে যুক্ত হলো 'যৌন' নিপীড়ন। হাবিব বলেন, 'তারা আমাদের একজনের ওপর অন্যজনকে স্থাপন করে, যেমনটা আপনারা আবু গারিবে দেখেছেন, তারপর তারা ছবি তুলত। তারা এটা করা উপভোগ করত, কিন্তু তাদেরকে এরকমটি করতে (ঊর্ধ্বতন পক্ষ থেকে) নির্দেশ দেয়া হয়েছে।'

এরপর তাকে নেয়া হয় গুয়ান্তানামোতে। সেখানে তাকে সরাসরি আইসোলেশনে বন্দি করা হলো। হিকসের মতো তাকেও ইচ্ছার বিরুদ্ধে ড্রাগস দেয়া হয়। প্রতি দু সপ্তাহে তাকে ইঞ্জেকশন দেয়া হতো। 'ড্রাগস দেবার পর আমি (আজব) শব্দ শুনতাম, (অদ্ভুত) বিষয় দেখতাম', হাবিব বলেন। এক সময় তিনি সিদ্ধান্ত নেন, তিনি খাবার গ্রহণ বন্ধ করে দিবেন। কারণ, তার কাছে মনে হচ্ছিল খাবারেও ড্রাগ মেশানো। খাওয়া বন্ধ করার পর তিনি আগের চেয়ে ভালো অনুভব করেন। কিন্তু তারপর তারা তাকে জোর করে খাওয়ানো শুরু করল। হাবিব স্মৃতিচারণ করে, তারা যখন তার নাকে কোনো এনেস্থেশিয়া ছাড়াই টিউব প্রবেশ করায়, তখন তার প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। হাবিবের সামনে গার্ডরা নিয়মিত কুরআনকে অবমাননা করত। তারা কুরআনকে দেয়ালে ছুড়ে মারত, পাতা ধরে ধরে ছিঁড়ে ফেলত। একজন নারী অফিসার তার গায়ে লাল বর্ণের তরল ছুড়ে তাকে বলে, এগুলো মাসিকের রক্ত (Otterman, 2007)।

১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে ইউএস মিলিটারি SERE[১] প্রোগ্রামের সূচনা করে; প্রোগ্রামটি মূলত মার্কিন সেনাদের নির্যাতন প্রতিরোধী করে তোলার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল। তাদেরকে হুড পরিয়ে, পানিতে ডুবিয়ে মৃতপ্রায় পরিস্থিতির অভিজ্ঞতা দেয়া হতো, যন্ত্রণাদায়ক ও যৌন-অশ্লীল পজিশনে স্থির রাখা হতো। ধর্ম ও বর্ণকে টার্গেট করে নিপীড়ন চালানো হতো। ঐ সময়টাতে সিআইএ মন নিয়ন্ত্রণের ড্রাগ আবিষ্কারের প্রোজেক্ট পরিচালনা করে, যদিও তারা তাদের প্রত্যাশিত ফল পেতে ব্যর্থ হয় (Otterman, 2007)। অর্থাৎ, সিস্টেমেটিক নির্যাতনের সংস্কৃতি অ্যামেরিকায় আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল। পরবর্তীকালে আবু গারিবের সেনাদেরকে যখন নির্যাতনের দায়ে অভিযুক্ত করা হয়, তখন তারা এই কথা বলে নিজেদের বাঁচাতে চেয়েছিল যে,

[১] Survival, Evasion, Resistance and Escape

তাদের কার্যক্রম অ্যামেরিকান সৈন্যদের ট্রেনিং-এ সহ্য করা কাজগুলো থেকে ভিন্ন কিছু ছিল না।

মাহির[১], সিরিয়ান বংশোদ্ভূত কানাডিয়ান নাগরিক। তিউনিসে পরিবারের সঙ্গে অবকাশ যাপনের পর সে বাসায় ফিরে আসছিল। তার পাঁচ বছর আগের এক বন্ধু Nazih Almaki-এর ভাইকে সিআইএ, আল কায়েদার সঙ্গে সম্পৃক্ততার সন্দেহে গ্রেফতার করতে চাচ্ছিল। ফেরার পথে নিউইয়র্কে কেনেডি বিমানবন্দরে মাহিরকে পরিবার থেকে আলাদা করে ফেলা হয়। তারপর সেখান থেকে তাকে নেয়া হয় সিরিয়া। সিরিয়ায় দশ মাসের অধিক সময় একটি এক মিটারেরও কম চওড়া ও দু মিটার গভীর বেসমেন্টে তাকে বন্দি করে রাখা হয়। সেখান থেকে মাহির অন্য বন্দিদের নির্যাতনের শব্দ শুনতে পেত, বন্দিরা সেখানে নির্যাতনের যন্ত্রণায় চিৎকার করত অবর্ণনীয় কণ্ঠে। পরবর্তীকালে তার স্ত্রী তাকে বাঁচাতে পাবলিক ক্যাম্পেইন করে, সৌভাগ্যবশত সেগুলো সফলও হয়। অতঃপর তারা তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ ছাড়াই তাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

পরবর্তীকালে হোয়াইট হাউস এবং জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের ফাঁস হওয়া মেমোতে দেখা যায়, সিআইএ-র প্রধান চিন্তিত ছিল যে, নির্যাতনমূলক পদ্ধতিগুলো ওয়ার ক্রাইম অ্যাক্ট[২] (WCA) ১৯৯৬-এর অধীনে অভিযুক্ত করা হয় কি না। কেননা, এই আইনের মাধ্যমেই মার্কিন 'ল জেনেভা কনভেনশনের সঙ্গে সংযুক্ত। ডব্লিউসিএ জেনেভার কমন আর্টিকেল #৩ লঙ্ঘন নিষিদ্ধ করে। চিনী হোয়াইট হাউজ আইনজীবী ও জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের অ্যাটর্নিদের চাপ প্রয়োগ করেন WCA-কে ফাঁকি দেওয়ার পথ খুঁজে বের করতে। তারা তাকে সহজ সমাধান দেয়, জিপিডব্লিউ[৩] থেকে বের হয়ে আসা, যেখানে যুদ্ধবন্দিদের সুরক্ষা দেয়ার কথা বলা হয়েছে। আলবার্তো গঞ্জালেসের মতে, জিপিডব্লিউ থেকে বের হয়ে গেলে ডব্লিউসিএ-র অধীনে দেশীয় আইনের মুখোমুখি হওয়ার ঝুঁকি হ্রাস পাবে (Greenberg & Dratel, 2005, p. 119)।

অথচ জেনেভা কনভেনশন সকল সময়ে সব ধরনের লড়াইয়ে সকল মানুষকে অন্তর্ভুক্ত রাখে। কনভেনশনের চিফ এডমিনিস্ট্রেটর অর্গানাইজেশন আইসিআরসি[৪] জানায় যে–

'শত্রুর হাতে বন্দি প্রতিটি ব্যক্তির অবশ্যই আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে

---

[১] Maher Arar
[২] War Crimes Act (WCA)
[৩] (Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War), GPW, বন্দিদের সঙ্গে আচরণের বিষয়ে জেনেভা কনভেনশন।
[৪] International Committee of the Red Cross (ICRC)

কোনো 'স্ট্যাটাস'[১] নির্ধারিত থাকতে হবে। শত্রুর হাতে থাকা কোনো ব্যক্তি আইনের (আওতার) বাইরে থাকতে পারবে না' (Roberts, 2004)।

আইসিআরসি আরও জানায় যে, গ্রেফতারকৃত যোদ্ধা হয় একজন যুদ্ধবন্দি বা পিওডব্লিউ, যা তৃতীয় কনভেনশন (জিপিডব্লিউ)-এ উল্লেখ আছে; অথবা একজন সিভিলিয়ান, যা চতুর্থ কনভেনশন (GC)[২]-এ উল্লেখ রয়েছে। এর মধ্যবর্তী কোনো স্ট্যাটাস বা অবস্থান নেই (Roberts, 2004)। কোনো ব্যক্তির স্ট্যাটাস নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হলেও জিপিডব্লিউ-এর Article #5-এর মতে সে উক্ত কনভেনশনের সুরক্ষা লাভ করবে, যতক্ষণ না কোনো নির্ভরযোগ্য ট্রাইব্যুনাল তার স্ট্যাটাস নির্ধারণ করে (ICRC, n.d.)।

আফগানিস্তানের ক্ষেত্রে তারা জাস্ট 'ব্যর্থ রাষ্ট্র' শব্দদ্বয় ব্যবহার করে দাবি করে, তালিবানরা আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলোর শর্ত 'সম্পন্ন' করতে অক্ষম। জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের অফিস অব লিগ্যাল কাউন্সিল (OLC) বিবৃতি দেয়, তালিবান ও আল কায়েদা যোদ্ধারা জিপিডব্লিউ-এর সংজ্ঞায়িত যুদ্ধবন্দী নয়। বরং তারা 'অস্বাভাবিক শত্রু'[৩], যারা জানাশোনা সকল দেশীয় ও আন্তর্জাতিক আইনের বাইরে (Otterman, 2007)। অথচ জেনেভা কনভেনশনের কমন আর্টিকেল #১ অনুযায়ী স্বাক্ষরকারী সকলে সকল পরিস্থিতিতে কনভেনশনকে শ্রদ্ধা করতে দায়বদ্ধ। তাই, কমন আর্টিকেল #৩ তালিবান, আল কায়েদা-উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য।

সিআইএর নির্যাতনগুলোর মাঝে অন্যতম পাশবিক দুটি পদ্ধতি ছিল নিম্নরূপ—

১. বন্দিকে নগ্ন অবস্থায় ৫০° ফারেনহাইটে (১০° সেলসিয়াস) একটি কক্ষে দাঁড় করিয়ে রেখে তাকে ঠাণ্ডা পানিতে ভেজানো হতো।

২. ওয়াটার বোর্ডিং-এ বন্দিকে হেলানো এক তক্তা বা বোর্ডে বাঁধা হয়, যেখানে তার পা থেকে মাথা সামান্য নিচুতে অবস্থান করে। ঐ অবস্থায় তার মুখে সেলোফেন বেঁধে তাকে পানিতে ডুবানো হতো। এমন অবস্থার সৃষ্টি করা হতো যে, বন্দির মনে হতো তাকে ঐ অবস্থায় চুবিয়ে মেরে ফেলা হবে (Paust, 2007, p. 28)

পরবর্তীকালে জানা যায়, আফগানিস্তান যুদ্ধ শুরুর পূর্বেই ২০০১ সালে বুশ সিআইএ-র নির্যাতন পদ্ধতিগুলো অনুমোদন করেন। ২৮ মার্চ ২০০২, পাকিস্তান সেনাবাহিনী আবু জুবায়দাকে গ্রেফতার করে অ্যামেরিকার হাতে তুলে দেয়। পরবর্তীকালে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় থাইল্যান্ডে। সেখান থেকে নতুন তৈরিকৃত একটি সিআইএ ব্ল্যাক সাইটে। আবু জুবায়দা যখন নির্যাতনের মুখেও তাদের আকাঙ্ক্ষিত

[১] পদমর্যাদা বা অবস্থান।
[২] 1949 Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (GC)
[৩] Enemy aliens

'সহায়তা' করতে অস্বীকার করে, তখন সিআই কর্মকর্তারা ওএলসি আইনজীবী Yoo-এর কাছে যায় আরও নির্মম পদ্ধতি অনুমোদনের আশায় (Barry, 2004)।

সিআইএ-র ব্ল্যাক সাইটের নির্যাতন ছিল উপরিউক্ত নির্যাতনগুলোর চাইতেও নির্মম। সেখানকার আসল ইতিহাসও তেমন প্রকাশিত হয়নি। উদাহরণস্বরূপ, নভেম্বর ২০০২-এ একজন সিআইএ এজেন্ট ব্ল্যাক সাইটে কর্মরত আফগান গার্ডদের বলে কোনো এক আফগান বন্দির সকল কাপড় সরিয়ে তাকে বেঁধে সারারাত বাইরে কংক্রিটের ফ্লোরে ফেলে রাখতে। ঐদিন রাতেই ঐ ব্যক্তি প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় (Hypothermia) মারা গেলে পরের দিন তাকে গোপন কারাগারের পাশে মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়। এক রাতেই জলজ্যান্ত একটা লোক পৃথিবীর জমিন থেকে তার সম্পূর্ণ অস্তিত্ব নিয়ে উধাও হয়ে গেল। সেখানে যেহেতু নির্যাতন ছিল লাগামহীন, কেউই সেই এজেন্টকে অভিযুক্ত করেনি। পরে অবশ্য খুন করার পুরস্কারস্বরূপ তাকে প্রোমোশন দেয়া হয় (Otterman, 2007)।

গুয়ান্তানামোর একজন বন্দি শফিক রাসূলের মতে, তাদের টয়লেট ব্যবহার করার দরকার হলে প্রথমে গার্ডের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করতে হতো। প্রায়ই গার্ডরা তাদেরকে টয়লেটে নিয়ে যেতে অস্বীকার করত। ফলে বাধ্য হয়ে তারা তাদের কক্ষেই ধোঁয়ামোছার জন্য দেয়া বালতিকে টয়লেট হিসেবে ব্যবহার করত। সেখানে থাকা অনেক বন্দিই নির্যাতনের কারণে অসুস্থ হয়ে পড়ে। অনেকেই আমাশয় বা অন্যান্য রোগে আক্রান্ত ছিল। ফলে গার্ডের খেয়াল-খুশি অনুযায়ী অপেক্ষা করা তাদের জন্য সম্ভব হতো না। শফিক বলেন, গার্ডরা জানত পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা মুসলিমদের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ। তাই তারা মুসলিমদের এইরকম সংকটাপন্ন দেখে বিকৃত আনন্দ লাভ করত। আর গার্ডরা যদি তাদের টয়লেটে নিতে রাজি হতো, তাহলে প্রথমে বন্দিকে বেড়ি পরানো হতো, তারপর তাকে ডিটেনশন ব্লকের বাইরে পোর্টেবল টয়লেটে নেয়া হতো। সেখানে তাদের বেড়ি পরা অবস্থায় টয়লেট ব্যবহার করতে হতো দরজা খোলা থাকা অবস্থায়, গার্ডরা সরাসরি তাদের দিকে তাকিয়ে থাকা অবস্থায় (Otterman, 2007)। প্রগতিশীল পৃথিবীর স্বাধীনতা আর প্রগতিশীল মানবাধিকারের কি অপূর্ব এক দৃষ্টান্ত!

'Tipton Three' হিসেবে পরিচিতি পাওয়া এই তিন বন্দী—শফিক রাসূল, আসিফ ইকবাল এবং রুহেল আহমেদকে মূলত নর্দার্ন এলায়েন্স আফগান রিফিউজিদের মাঝে ত্রাণ বিতরণরত অবস্থায় গ্রেফতার করে। এরপর অ্যামেরিকানদের কাছে হস্তান্তর করে। এর পিছনে আর্থিক কারণও রয়েছে। আফগানিস্তানে অ্যামেরিকার ফেলা প্রোপাগান্ডা লিফলেটগুলোর মধ্যে একটিতে সম্মুখ পৃষ্ঠায় ছাপানো সাধারণ আফগান শহর ও হাস্যোজ্জ্বল আফগান প্রবীণের ছবির নিচে লেখা, 'তোমার স্বপ্নকে ছাড়িয়ে যাওয়া অর্থ-ক্ষমতার অধিকারী হও। আফগানিস্তানকে খুনি ও সন্ত্রাসীদের

হাত থেকে মুক্ত করতে (তালিবান-বিরোধী শক্তিকে) সহায়তা করো।' পেছনের পৃষ্ঠায় লেখা, আল কায়েদা ও তালিবান খুনিদের ধরতে তালিবান-বিরোধী শক্তিকে সাহায্য করে তুমি মিলিয়ন ডলার আয় করতে পারো' (Otterman, 2007)।

এছাড়াও সিনেট সিলেক্ট কমিটি অন ইন্টেলিজেন্সের এক রিপোর্ট অনুসারে, কমপক্ষে[১] পাঁচজন বন্দির মলদ্বার[২] দিয়ে খাদ্য বা পানীয় প্রবেশ করানোর মতো নিকৃষ্টতম পাশবিক আচরণ করা হয় (2014)। উইঘুরদের ওপর চীনের নির্যাতন ছাড়া সম্ভবত বিশ্বের আর কোথাও কোনো রাষ্ট্রযন্ত্রের এতটা পশুর পর্যায়ে নামার উদাহরণ নেই। আরও দুঃখের বিষয়, খোদ সিআইএরই ২০০২ সালের এক জরিপের ফল অনুযায়ী, গুয়ান্তানামোর অর্ধেকের বেশি বন্দি কোনোভাবেই অ্যামেরিকার সমস্যার সঙ্গে জড়িত নন। অন্যদিকে, এক ইউরোপিয়ান অনুসন্ধানী দলের ২০০৬-এর জরিপ অনুযায়ী মাত্র ৩০-৪০ জন 'প্রকৃত সন্ত্রাসী' সেখানে বন্দি, বাকি সবাই মানবাধিকারের এক্সপেরিমেন্টাল গিনিপিগ। এর চেয়েও অদ্ভুত ব্যাপার হলো, ৮৬% গুয়ান্তানামোর বন্দি অ্যামেরিকান বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হননি, বরং পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ কিংবা নর্দার্ন এলায়েন্স জেনারেলরা ডলারের আশায় তাদেরকে অ্যামেরিকার হাতে হস্তান্তর করে (Otterman, 2007)।

গুয়ান্তানামো বে কারাগার থেকে বের হয়ে আসা আফগান নাগরিকরা ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকেই অভিযোগ করে এসেছে যে, তাদেরকে অপমানিত করতে অ্যামেরিকান সৈন্যরা মহাপবিত্র কুরআনকে টয়লেটে ছুড়ে ফেলত। বন্দীদের অনেকেই ছিল কৃষক, ছাত্র বা ট্যাক্সি ড্রাইভার। কোনো কারণ ছাড়াই তাদেরকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। ২৯ বছর বয়সী এহসানউল্লাহ বলেন, মার্কিন বাহিনী কান্দাহারে জেরা করার সময় তাকে প্রচণ্ড প্রহার করত। টয়লেটে কুরআন ফেলে দিয়ে তারা তাকে মানসিক নির্যাতন করত। এহসানউল্লাহর ভাষায়, সে সময়টা ছিল খুবই মর্মান্তিক, 'আমরা প্রচণ্ডভাবে কাঁদছিলাম আর চিৎকার করে বলছিলাম, দয়া করে পবিত্র কুরআনের সঙ্গে এইরকম করো না।' কিন্তু, 'বধির'কে কি আর কথা শোনানো যায়? মীর্জা খান নামক আরেক বন্দিকে কান্দাহারে নির্যাতন করার সময় অ্যামেরিকান সৈন্য কুরআন মাটিতে ছুড়ে ফেলে কুরআনের ওপর আসন গেড়ে বসে (Kaufman & Witt, 2003)।

মার্কিন সেনাদের কাছে কুরআন অবমাননা ছিল খুবই 'স্বাভাবিক' বিষয়। আসিফ ইকবালের মতে, 'তারা (কখনো কখনো) কুরআনকে লাথি মারত, সেটিকে

[১] অ্যামেরিকার কোনো অপরাধের ব্যাপারে যখন তাদেরই কোনো কমিটি বা মিডিয়া তদন্ত করে, তখন সেখানে 'অন্তত/কমপক্ষে' পরিভাষার উপস্থিতি থাকা মানেই এটি প্রায় নিশ্চিত যে, প্রকৃত অপরাধের মাত্রা আরও বেশি; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনেক অনেক বেশি। একই কথা বাংলাদেশের সেক্যুলার মিডিয়ার ক্ষেত্রেও—মোট কথা, সেক্যুলার ভাবাপন্ন মিডিয়া—প্রযোজ্য। জোচ্চুরিতে তারাও কোনো অংশেই কম নয়।

[২] 'Rectal rehydration', 'Rectal feeding'

টয়লেটে ছুড়ে মারত, আর সচরাচর অবমাননা করত।' পেন্টাগন শুরুতে কুরআন অবমাননার কথা অস্বীকার করলেও পরে ব্যাপক সমালোচনার মুখে স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, মার্কিন সেনারা 'অন্তত' পাঁচবার কুরআন অবমাননা করেছে। এর মধ্যে একবার কুরআনে অশ্লীল দুটি শব্দ লেখা হয়; একজন সেনা কুরআনকে লাথি মারে, আরেকবার একজন গার্ডের মূত্র কুরআনে ছিটকে পড়ে। আসল বাস্তবতা হলো, তারা নিয়মিতই কুরআনের পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে টয়লেটে ফ্ল্যাশ করে দিত। এ নিকৃষ্ট কাজ দেখতে বাধ্য হওয়া ব্যক্তির হৃদয়ের রক্তক্ষরণ, তার প্রাণে অনুভূত অনুশোচনা, সৃষ্ট তীব্র তিক্ততার পরিমাণ পৃথিবীর কারো পক্ষে নির্ণয় করা সম্ভব নয় (Otterman, 2007)।

এ তো গেল ইসলাম অবমাননা আর পুরুষদের ওপর নির্যাতনের বর্ণনা। উম্মাহর সম্মানিতা নারীদের সাথে তারা যেসব অসভ্য আচরণ করেছে, তার ভার যদি কোনো পাহাড়ের ওপর ন্যস্ত করা হতো, সে পাহাড়ও ভার সইতে না পেরে ভেঙে চুরমার হয়ে যেত। ইন্টারন্যাশনাল অকুপেশন ওয়াচ সেন্টার[১] নামক এক এনজিও সাবেক এক বন্দিনীর জবানবন্দি থেকে জানায়, তিনি বন্দি থাকাকালীন তার সেলের এক নারীকে এক দিনে কমপক্ষে সতেরো বার ধর্ষণ করা হয়। পরে ঐ বন্দিনী টানা দুই দিন অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল।

ইরাক ভিত্তিক অন্য আরেকটি সংগঠন ইউনিয়ন অব ডিটেইনীস অ্যান্ড প্রিজনার্স[২] জানায়, আবু গারিবে চার সন্তানের জননী এক নারীকে মার্কিন সেনারা তার স্বামীর সামনে ধর্ষণ করে; পরে ঐ নারী লজ্জায় অপমানে আত্মহত্যা করে। সংগঠনটির প্রধান দাহাম[৩] বলেন, মহিলাটির বোন হতভাগা সেই নারীর দুর্ভাগ্যের ইতিহাস তাকে খুলে বলেছেন। ভদ্রমহিলার স্বামীকে জেলখানার বারের সঙ্গে আটকে রাখা হয়, অতঃপর একজন মার্কিন সেনা তার চুল টেনে ধরে তাকে তার স্বামীর দিকে তাকিয়ে থাকতে বাধ্য করে; এবং তার বস্ত্র হরণ করে তাকে সেখানেই ধর্ষণ করে। সেখানকার সাবেক বন্দি আমির[৪] জানায়, 'তাদেরকে (নারীদেরকে) আমাদের তাঁবুর সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে হতো, আর তারা চিৎকার করে বলত, আমাদের মেরে ফেলার একটা উপায় খোঁজো' (SBS News, 2013)।

মেজর তাগুবা তার রিপোর্টে আবু গারিবে বন্দি নির্যাতন ও ধর্ষণের কথা উল্লেখ করলেও বন্দি অপারেশন-এর মুখপাত্র লেফটেন্যান্ট কর্নেল ব্যারি জনসন দাবি করে, 'বন্দি সকল নারীদের সঙ্গে মানবতাপূর্ণ(!) আচরণ করা হয়েছে।' কী সহজে হয়ে গেল

[১] International Occupation Watch Centre
[২] Union of Detainees and Prisoners
[৩] Daham al-Mohammed
[৪] Amer Abu Durayid

বলা. কাঁপল না গলা। চলুন দেখা যাক, ওয়েস্টার্ন মানবতাবাদীরা মুসলিম নারীদের সঙ্গে আর কী কী 'সভ্য' আর 'প্রগতিশীল' আচরণ করেছে। ২০০৩-এ এক নারী বন্দি আবু গারিবের বাইরে তাদের দুর্দশার কথা নোটের মাধ্যমে সবাইকে জানাতে সক্ষম হয়। দুর্ভাগা সেই নারী—আজ যাকে সকলে 'নূর' নামে জানে—কারাগারের বাইরের অসহায় পুরুষদের জানায়, মার্কিন গার্ডরা ভেতরে তাদের মুসলিমাহ্ বোনদের ধর্ষণ করছে, যাদের মধ্যে অনেকেই গর্ভবতী হয়ে পড়েছে। বেগানা কাফিররা তাদেরকে পুরুষদের সামনে নগ্ন হতে বাধ্য করে। আমাল[১]—বন্দি নারীদের জন্য কাজ করা সাতজন নারী আইনজীবীর একজন—জানায় যে, এ ঘটনা শুধু আবু গারিবেই হচ্ছে না, বরং সমগ্র ইরাক জুড়েই ঘটছে। তিনি At Kharkh নামক এক মার্কিন মিলিটারি বেইসে গেলে এক নারী কান্নায় ভেঙে পড়ে তাকে জানায়, বহু অ্যামেরিকান সৈন্য তাকে ধর্ষণ করেছে। মহিলাটি তাকে অনুরোধ করে বলে, 'আমাদের কন্যা, স্বামী আছে। আল্লাহর দোহাই লাগে, কাউকে এ ব্যাপারে কিছু বলবেন না।'

এছাড়াও সত্তরোর্ধ্ব এক নারীকে অ্যামেরিকান ও ব্রিটিশ সৈন্যরা গ্রেফতার করে তাকে গাধার সাজে সাজিয়ে তার ওপর সৈন্যরা চড়ে বসে। ব্রিটিশ লেবার এমপি Ann Clwyd তদন্ত করে এ ঘটনার সত্যতা খুঁজে পান (Harding, 2004)। নির্যাতনের এই লোমহর্ষক ঘটনাগুলো ফাঁস হবার পরও নির্যাতন বন্ধ হয়নি। ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দেও জানা যায়, ইরাকী মুসলিম নারীদের গ্রেফতার করে পতিতাবৃত্তি, খুন আর সন্ত্রাসের মিথ্যা অভিযোগে বন্দি করে তাদেরকে ওয়েস্টার্ন স্টাইলে পাশবিক নির্যাতন করা হচ্ছে (Tarabay, 2006)।

২০১৪ খ্রিষ্টাব্দে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ-এর রিপোর্টে জানা যায়, ইরাকে অ্যামেরিকার পুতুল সরকার হাজার হাজার নারীকে অবৈধভাবে জেলে বন্দি করে রেখেছে, যাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগই নেই। নির্যাতিতাদের মধ্যে দু'জন নারী জানায়, মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা তাদেরকে পুলিশি হেফাজতে ধর্ষণ করে। অন্যদিকে, এক বন্দিনীর পরিবার জানায়, উচ্চপদস্থ এক পুলিশ অফিসার তাদের মেয়েকে ধর্ষণ করে, যখন তার মা পাশের রুমে আটক অবস্থায় ছিল (Evers, 2014)। ২০১৪ সালে এসেও ইরাকে মার্কিন পুতুল সরকার প্রায় ৪৫০০ নারী কারাগারে বন্দি করে রাখে। মাসের পর মাস কোনো অভিযোগ ছাড়াই তাদেরকে আটকে রেখে চালানো হয় অবর্ণনীয় নির্যাতন (Human Rights Watch, 2014)।

ফারাহ-রা[২] মা ২০০৪-এ আবু গারিবে বন্দি ছিল। ঐ সময়টাতে 'নূর' এর লেখা চিঠিতে নূর সবাইকে আকুতি জানিয়ে বলেছিল, 'দয়া করে আমাদের হত্যা করুন,... আমাদের প্রত্যেকে মার্কিন সেনাদের দ্বারা গর্ভধারণের শিকার।' চিঠিতে আরও

[১] Amal Kadham Swadi
[২] Farah Al-Azzawi

লেখা ছিল, 'প্রতিটি দিন তারা আমাদের উলঙ্গ করে সেনা ও অন্যান্য বন্দিদের সামনে দিয়ে হাঁটায়।'[১] অথচ ব্যারি জনসনের ভাষ্যমতে, বন্দি তিনজন নারীকে 'অন্য পুরুষ বন্দিদের থেকে আলাদা রাখা হয়েছে, তাদের নিজেদের "ভালোর" জন্য এবং তাদের গোপনীয়তাকে "পূর্ণ সম্মান প্রদর্শন" করতে'। ২০০৩-এর ডিসেম্বরে ফারাহর মা ও তার বোনকে (ফারাহর খালাকে) একত্রে গ্রেফতার করা হয়। এর পাঁচ মাস পরও ফারাহ জানতে পারেনি, তাদের অপরাধটা কী। ফারাহ তার বন্দি খালার মেয়েকে নিয়ে আবু গারিবে তার মামাকে দেখতে যান। তার মামাও সেখানে প্রহারের শিকার হয়ে নাক ভাঙা অবস্থায় পড়ে ছিল। তিনি তার ভাগ্নেদের জানান, ভেতরে তাদের দুজনের মা'কে চুল ধরে টেনে এখান থেকে সেখানে নেয়া হয়। ফারাহ আরও জানতে পারে, তার মা'কে টয়লেট থেকে খাবার খেতে বাধ্য করা হয়। এমনকি, মানবতাবাদী কোয়ালিশন বাহিনীর মুক্তিদাতা সৈন্যরা উনার গায়ের ওপর প্রস্রাব করে[২] (Ciezadlo, 2004)।

সাল ২০০৪, ইরাকি এক নারী তার আইনজীবীকে জানায়, তাকে পুরুষ কোয়ালিশন গার্ডদের সামনে পোশাক খুলতে বাধ্য করা হয়। অপর এক নারীকে অনেক অনুরোধ করার পর তিনি ধর্ষিত হওয়ার ঘটনা তার আইনজীবীর কাছে বর্ণনা করে। এই ঘটনা বর্ণনা করার পরপরই হতভাগা সেই নারী অজ্ঞান হয়ে যান। অ্যামেরিকানরা আর তাদের ইরাকি দাসেরা ইরাকি নারীদের ইজ্জত লুণ্ঠন করত বন্দুকের নলের মুখে। ইরাকি নারীরা সচরাচর ধর্ষণের কথা খুব কম ক্ষেত্রেই খুলে বলে, তাদের আইনজীবীরাও ধর্ষণের কথা সহজে প্রকাশ্যে নিয়ে আসেন না। ২০০৪-এর মার্চে আইনজীবীরা আবু গারিবে প্রবেশের অনুমতি পায়। আইনজীবীদের মধ্যে একজন সাহরা জানাবি জানায়, '(সেখানকার) নারীরা ছিল বিধ্বস্ত। তারা (আমাদের দেখেই) কান্নায় ভেঙে পড়ে।' এক মধ্যবয়সী নারী আইনজীবীদের বলে, তাকে পুরুষ গার্ডদের সামনে কাপড় খুলতে বাধ্য করা হয়[৩]। সেখানে উপস্থিত ইরাকি পুরুষ দোভাষীর কাছে এ ঘটনা এতটাই লজ্জাজনক ছিল যে, তিনি লজ্জায় তার মাথা অন্যদিকে ঘুরিয়ে ফেলেন।

চরম লজ্জাজনক এই ঘটনাগুলো ঘটানোর সেই সময়টাতে খোদ অ্যামেরিকান সৈন্যরাই স্বীকার করেছেন, তারা শুধুমাত্র পুরুষ আত্মীয়দের বন্দি করার ফাঁদ হিসেবে তাদের নারী আত্মীয়াদেরকে 'গ্রেফতার' করেন। অন্য আরেকজন আইনজীবী Amul

[১] রিপোর্টার Ciezadlo-এর মতে, চিঠিটি বানানোও হতে পারে। কিন্তু গার্ডিয়ান-সহ (Harding, ২০০৪) অন্যান্য ঘটনায় আমরা দেখতে পাই, পশু সভ্যতার এই দৃষ্টান্ত কাল্পনিক নয়, বাস্তব।

[২] ওপরেই দুই বোনের অ্যামেরিকান পশুদের হাতে গ্রেফতার হওয়া ও এক বোনের আত্মহত্যার ঘটনা আমরা দেখেছি। (SBS News, ২০১৩)। কিন্তু, আমরা জানি না, সেই হতভাগ্য নারীটি Azzawi-এর মা কিংবা খালাম্মা কি না।

[৩] ব্যাপারগুলো যে একবার ঘটে আর পুনরাবৃত্তি হতো না, তা কিন্তু নয়।

Suadi জানায়, তার মক্কেলও ধর্ষণ ও ছুরিকাহত হবার ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। এছাড়া পাঁচ জন সাবেক বন্দিনী ভেতরে প্রহারের কথা স্বীকার করলেও ধর্ষণের ব্যাপারে বলেন, 'আমরা আপনাকে বলতে পারব না। আমাদের পরিবার আছে। কী হয়েছে সে ব্যাপারে আমরা কিছুই বলব না' (Wilkinson, 2004)।

মি লাই-এর ঘটনা প্রকাশকারী সাংবাদিক সিমোর হার্শ জানায়, আবু গারিবে যে-সকল নারীদের বাচ্চাসহ গ্রেফতার করা হয়, তাদের বাচ্চাকে মলদ্বার দিয়ে ধর্ষণ করা হয়, আর সৈন্যরা সেগুলো বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে ক্যামেরায় ধারণ করে রাখে। হার্শের কাছে সবচেয়ে নির্মম লেগেছে এই বাচ্চাগুলোর কান্নার শব্দ (Sealey, 2004)। মাথায় হুডি পরানো সেই কুখ্যাত ছবিতে থাকা ইরাকি বন্দি আলী[১] এক বিশেষ নির্যাতনের ঘটনা উল্লেখ করেন; যেখানে মার্কিন সেনারা এক দশ বছর বয়সী ছেলে শিশুকে প্রস্রাব করা থেকে বিরত রাখে। এক সময় তার চোখ বেঁধে তাকে প্রস্রাব করতে দেয়া হয়। ছেলেটির প্রস্রাব করা শেষ হলে যখন তার চোখের বাঁধন খুলে দেয়া হলো, সে দেখতে পেল তাকে তার পিতার শরীরে প্রস্রাব করতে দেয়া হয়েছে। এছাড়াও তিনি আরেকটি ঘটনা উল্লেখ করেন, যেখানে নয় বছর বয়সী এক বাচ্চাকে তার পিতার সামনে প্রাইভেট সিকিউরিটি কোম্পানির দোভাষী ধর্ষণ করে (geneva International Centre for Justice, n.d.)।

ইরাকের মতো রক্ষণশীল রাষ্ট্রের নারীরা ধর্ষণকে তাদের পুরো পরিবারের অপমান হিসেবে মনে করে। কারণ, তারা পশ্চিমাদের পতিতা-সংস্কৃতি গ্রহণ করেনি; তাই ধর্ষণের চাইতে মৃত্যুই তাদের কাছে শ্রেয়। এছাড়াও ইরাকে সংঘটিত পৃথক পৃথক ঘটনায় জানা যায়, আবু গারিব কারাগারে 'কমপক্ষে' তিনজন গ্রাম্য তরুণী ধর্ষণের শিকার হয়ে গর্ভবতী হয়ে পড়ে। আর হাজারও অপ্রকাশিত ঘটনা, ভুক্তভোগী আর অন্যান্য কারাগারগুলোর কথা না হয় বাদই থাকল।

'নূর' নামে অসহায় সেই নারীর ভাগ্যে কী হয়েছে, আমরা জানি না। জানি না আরও হাজারও অসহায় ইরাকি, আফগান নারী, শিশু আর পুরুষের গল্প। আমরা জানি না, অসহায় সেই নারীদের পরিবারের সদস্যরা বুকে কতটুকু যাতনা নিয়ে দিনাতিপাত করেছে, করছে। কত নির্ঘুম রাত আমাদের এই বোনেরা চোখের জল ফেলে কাটিয়েছে বুকের মাঝে অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে, আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করেছে নিজের মৃত্যুর জন্য। ভেবেছে একমাত্র মৃত্যুই পারে তাকে এই জন্তুদের হাত থেকে মুক্ত করতে। তবে, এটুকু সুনিশ্চিতভাবে বলা যায়, এই অসভ্য জাতির পতন অতি সন্নিকটে; যারা ভব্যতার সকল সীমা বহু আগেই অতিক্রম করে ফেলেছে।

যারা এই নিদারুণ অপমানজনক ঘটনাগুলো জানতেন, তারা তো জানেনেই;

[১] Ali Shallal al-Qaysi

এখানে উল্লিখিত ঘটনাগুলো সব পশ্চিমা সোর্স থেকে কালেক্ট করা, বরং বলা চলে ঈষৎ 'পরিমার্জিত' ও 'সংক্ষেপিত'। আর যারা প্রথমবার জানলেন, আমাদের মা-বোন-ভাইয়েরা কী অপরিমাণযোগ্য-অকথ্য নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, তাদের উচিত এই ভয়াবহ নিষ্পেষণের গভীরতা, তীব্রতা, গাঢ়ত্ব হৃদয়ের গভীর থেকে অনুভব করা, অনুভব করার চেষ্টা করা। মুমিনরা তো একটি দেহের মতোই। আমাদের বোনের ইজ্জত নষ্ট হবে আর আমরা লজ্জিত হবো না—মুমিনের জন্য এটা তো অসম্ভব। এই নির্যাতনগুলোর কথা কেবল পড়েই অনেক দুর্বল-চিত্তের ব্যক্তিদের মানসিক ভারসাম্যও টলে যেতে পারে, আর যারা ভুক্তভোগী তাদের কেমন লেগেছিল? জানুন। ভাবুন। মুমিন কখনো এক গর্তে দুইবার দংশিত হয় না।

২০০৪-এ আবু গারিবের নির্যাতনের ছবি প্রকাশিত হলে বিশ্বব্যাপী নিন্দার ঝড় ওঠে। তখন বুশ প্রশাসন দাবি করে, অনেক ফলের মাঝে সেগুলো হলো কিছু 'পঁচা আপেল' বা নিম্নপদস্থ সামরিক সদস্যের অপকর্ম (Hersh, 2007)। কিন্তু, আসল বাস্তবতা ছিল, খোদ মার্কিন প্রশাসন সুস্পষ্ট নির্দেশের মাধ্যমে সকল টর্চার ক্যাম্পেইন প্রতিষ্ঠা করে, যা বিশ্বব্যাপী তাদেরই ফেরি করা মানবাধিকার বিষয়ক চুক্তিগুলোর সঙ্গে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক। পরবর্তীকালে Al-Hurra নেটওয়ার্ক এবং Al Arabiya টিভি চ্যানেলে দেয়া সাক্ষাৎকারে বুশ বলেন, 'ইরাকের জনগণের এটা অবশ্যই (!) অনুধাবন করতে হবে যে, আমি এই ধরনের আচরণকে জঘন্য হিসেবে দেখি। আর এই কারাগারে যা হয়েছে সেটা আমি যে অ্যামেরিকাকে জানি তার প্রতিনিধিত্ব করে না।'

পরবর্তীকালে সভ্য দুনিয়ার সুশীল সমাজ রক্ষণাত্মক বক্তব্যের পরিবর্তে 'ক্ষমা' চাওয়ার দাবি করল। পরের দিন হোয়াইট হাউজ মুখপাত্র স্কট[১] বললেন, কারাগারে যা হয়েছে তার জন্য প্রেসিডেন্ট 'দুঃখিত'। কন্ডোলিসা রাইসও ইরাক থেকে বুশের ব্যক্তিগতভাবে ক্ষমাপ্রার্থনা শুনতে চাইল। তাই সেই সপ্তাহে (মে, ২০০৪) বুশ বলেন, তিনি ইরাকি বন্দি ও তাদের পরিবারের সহ্য করা অপমানের জন্য দুঃখিত। তার ভাষায়, '...যেসকল জনগণ সেসব ছবি দেখছে, তারা অ্যামেরিকার হৃদয় ও প্রকৃত বৈশিষ্ট্য (!) অনুধাবন করতে পারছে না। এ জন্য আমি সমান ব্যথিত এবং... (আমি) যা দেখেছি, আমার মতো অ্যামেরিকানরা সেটির তারিফ করছে না এবং এটি আমাদের চরমভাবে অসুস্থ করে দিয়েছে' (Smith N. , 2008, pp. 36-37; CNN, 2004)। তিনি আরও বলেন, '...ইরাকে আমাদের যে সৈন্য রয়েছে তারা বিশুদ্ধদের মধ্যে বিশুদ্ধতম।' তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, এই অপরাধের জন্য দায়ীদের 'বিচারের আওতায় আনা হবে।' ৭ মে রামস্ফেল্ড মার্কিন সিনেট আর্মড সার্ভিসেস

[১] Scott McClellan

কর্নেলের সামনে শুনানিতে বলেন, '...ইরাকি বন্দিদের সাথে যা ঘটেছে সে বিষয়ে আমি অত্যন্ত মর্মাহত। তারাও তো মানুষ।'

আবু গারিবের ঘটনায় হাতেগোনা মোট এগারো জন সেনার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়। এর মধ্যে অধিকাংশের সাজাই হয় 'প্রতীকী'। একজন ব্যক্তিকেও হত্যার জন্য দায়ী করা হয়নি। চলুন তাদের সাজার ধরন দেখে আসি :

- কর্নেল থমাসকে তিরস্কৃত করা হয়, $8000 জরিমানা করা হয়, এবং দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয় (Associated Press, 2005)।
- চার্লস গ্রেইনারকে তাকে দশ বছরের কারাদণ্ড, সেনাবাহিনী থেকে অপসারণের সাজা দেওয়া হয় (CNN, 2005)। আর মাত্র সাড়ে ছয় বছর পর তাকে প্যারোলে মুক্তি দিয়ে দেয়া হয় (Dishneau, 2011)।
- আইভান ফ্রেডরিককে আট বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয় (BBC NEWS, n.d.)। কিন্তু, চার বছর পরই তাকেও প্যারোলে মুক্তি দেয়া হয় (Dishneau, 2007)।
- এছাড়াও সার্জেন্ট Javal Davis-কে ছয় মাস, স্পেশালিষ্ট Jeremy Sivits-কে এক বছর, Specialist Armin Cruz-কে আট মাস, সাবরিনা হারম্যানকে ছয় মাস, আর অন্যতম আসামী লিন্ডে ইংল্যান্ডকে—যে বন্দিদের গলায় কুকুরের মতো দড়ি লাগিয়ে হামাগুড়ি দিতে বাধ্য করত—সাজা দেয়া হয় দশ বছরের কারাদণ্ড। পরে সেই সাজা কমিয়ে তিন বছরে নিয়ে আনা হয়। সেখান থেকেও মাত্র এক বছর পাঁচ মাস পর সে প্যারোলে বেরিয়ে আসে (Beavers, 2007)।

এ তো গেল হুকুম পালনকারীদের সাজা দেয়ার নমুনা। আর নির্যাতনের মাস্টারপ্ল্যানারদের কী 'শাস্তি' হয়েছিল?

- নির্যাতন বাস্তবায়নে সহায়তা করে যে Jay Bybee, তিনি পরবর্তীকালে তিনি বুশ কর্তৃক 9th ইউএস সার্কিট কোর্ট অব আপিলস-এর মেম্বার হিসেবে নির্বাচিত হন (Tetreault, 2003)।
- Michael Chertoff, জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট-এর প্রধান ছিলেন, তিনিই সিআইএ-কে 'আইনগতভাবে' নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধির প্রক্রিয়া বাতলে দেন। পরবর্তীকালে বুশ তাকে সেক্রেটারি অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি হিসেবে মনোনীত করেন (Bush names new US security chief, 2005)।

আবু গারিব স্ক্যান্ডালের পর ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দে অ্যামেরিকার সুপ্রিম কোর্ট ঘোষণা করে, ডিটেইনীদের, বিশেষ করে 'সন্ত্রাসের' বিরুদ্ধে যুদ্ধে গ্রেফতারকৃতদের সঙ্গে অ্যামেরিকা জেনেভা কনভেনশনের আর্টিকেল ৩ অনুযায়ী আচরণ করতে বাধ্য (Doyle, 2010)। ৬ সেপ্টেম্বর ২০০২, পেন্টাগন তাদের নতুন আর্মি ফিল্ড ম্যানুয়ালে

সকল SERE টেকনিক বান করে, যেগুলো রামস্ফেল্ড ও রিকার্ডো সানচেজ অনুমোদন করেছিল। অতঃপর ঐদিনই বুশ সর্বপ্রথম সিআইএ-র ব্ল্যাক সাইটের অস্তিত্বের কথা স্বীকার করেন; যা সেদিনের আগ পর্যন্ত মার্কিন প্রশাসন স্বীকারই করেনি (Wagstaff, 2014, pp. 19-20)। কিন্তু, ২১ সেপ্টেম্বর ২০০৬, হোয়াইট হাউজ মিলিটারি কমিশন্স অ্যাক্ট অব ২০০৬[১] বা এমসিএ রিলিজ করে, যা কার্যত বহির্দেশে বন্দি সকল নাগরিকদের বন্দিত্বের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জের অধিকার বাতিল করে দেয়। এই বিধি অনুযায়ী, বন্দি কোনো ব্যক্তিই—অ্যামেরিকা কিংবা অন্যদেশের নাগরিক—জেনেভা কনভেনশনে উল্লিখিত অধিকার দাবি করতে পারবে না। একমাত্র মার্কিন প্রেসিডেন্টই নির্ধারণ করতে পারবে কোনটি যুদ্ধাপরাধ আর কোনটি যুদ্ধাপরাধ নয়!

ন্যাশনাল সিকিউরিটি এডভাইজার হ্যান্ডলী[২] কংগ্রেসে নতুন 'তদন্ত' পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে কোনোকিছু জানাতে অস্বীকার করেন। কিন্তু, তারপরও মার্কিন সিনেটে ৬৫-৩৪ ভোটে এমসিএ পাস হলো। আর এই অনুমোদনের মাধ্যমে মার্কিন কংগ্রেস বিশ্বজুড়ে সিআইএ-র গোপন বন্দিশালাগুলোতে SERE-পদ্ধতিগুলোকে বৈধতা দান করে। বুশ SERE টেকনিকগুলোকে দাবি করেন 'বিকল্প পদ্ধতির একটি সেট' হিসেবে (McCoy, 2012, p. 46)। তার মতে, এগুলো অ্যামেরিকার জনগণ ও তাদের মিত্রদের রক্ষা করতে প্রয়োজনীয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জাম, তাই সেগুলো নিষিদ্ধ করা যাবে না। ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দে অ্যামেরিকা যখন হাজারও বন্দি নির্যাতন অব্যাহত রেখেছিল, তখনো তারা দাবি করে যে, তারা বন্দিদের 'সন্ত্রাসের' বিরুদ্ধে যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত আটকে রাখতে পারবে। বিষয়টা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, নব্য-সাম্রাজ্যবাদীদের নির্যাতন আর জুলুমের বিপক্ষে যে-ই প্রতিবাদ করবে, তাকেই মনুষ্য সম্প্রদায় থেকে ছিটকে ফেলা হবে 'না-মানুষ'দের কাতারে। যেখানে তাকে কোনো কারণ ছাড়াই বন্দি করে নির্যাতন করা যাবে দশকের পর দশক। আর সেটি বৈধ করা হবে গণতন্ত্র আর স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে!

আবু গারিবে নির্যাতনের প্রকাশিত ছবিগুলোতে কিছু বিশেষত্ব ছিল। বন্দি ও কারারক্ষীদের দেহভঙ্গি, মুখের অভিব্যক্তি দেখে বোঝা যায় যে, তারা 'প্রমাণ' করতে চায়, Us vs Them যুদ্ধে অ্যামেরিকা জয়ী হচ্ছে। ছবিগুলোর অবজেক্ট—নির্যাতিত ব্যক্তিগুলো—অত্যাচারিত, অপমানিত, নগ্ন। তাদের পাশে বিজয়ী মার্কিন সেনাদের হাস্যোজ্জ্বল মুখ। বার্তা পরিষ্কার—তাদের যা ইচ্ছা তারা তা-ই করতে পারে। পৃথিবীর চালকের আসনে তারাই রয়েছে (Oliver, 2007, p. 03)। এতকিছুর পরও দেখা গেল, পরের নির্বাচনেই মার্কিনীরা আবারও বুশকেই প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত

[১] Military Commissions Act of ২০০৬ (MCA)
[২] Stephen J Handley

করলেন। ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দে এক জরিপেও দেখা যায়, অ্যামেরিকায় সাবেক প্রেসিডেন্ট বুশের সমর্থন বৃদ্ধি পেয়ে ৪৯%-এ এসে ঠেকেছে (Rubin, 2013)। লিবারেল সেক্যুলার মতবাদ বিষয়ক প্রোপাগান্ডার কার্যকারিতার এটাও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ যে, মার্কিনীরা অ্যামেরিকার ইরাকি ও আফগানীদেরকে নির্যাতনের প্রতিবাদ করলেও তাদের দখলদারিত্বকে মেনে নেয়। সভ্যতা আর প্রগতিশীলতার কি কুৎসিত, কদাকার এক চেহারা!

লাশের দীর্ঘ মিছিল

ইরাকি সরকারি কর্মকর্তাদের মতে, ২০০৩-২০০৮, এই পিরিয়ডে কমপক্ষে ১৪০,০০০ ইরাকি নিখোঁজ হয়। তবে এটা নিশ্চিত যে, প্রকৃত সংখ্যা আরও অনেক বেশি। নব্য প্রতিষ্ঠিত শিয়া পুলিশদের আতংক সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নি জনগণের মাঝে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। কারণ মিলিশিয়া ডেথ স্কোয়াডের সঙ্গে শিয়াদের আঁতাত ছিল (Kukis, 2011)। মার্চ ২০০৩-অক্টোবর ২০১৮—এই সময়ের ভিতর ইরাকে বেসামরিক নাগরিক নিহত হয় প্রায় ১৮২,২৭২- ২০৪,৫৭৫ জনের মতো। আর মোট মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ২৬৮,০০০- ২৯৫,০০০ (Crawford N., 2018)। সেই সঙ্গে উপসাগরীয় যুদ্ধে ধ্বংস করা ইরাকের নিষ্কাশন ব্যবস্থা, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যখাতকে পুনরায় আরও একবার প্রচণ্ডভাবে দুমড়ে মুচড়ে দেয় স্বাধীনতার ফেরিওয়ালা পশ্চিমা ও তাদের দোসররা।

ব্রাউন ইউনিভার্সিটি-র এক জরিপে দেখা যায়, ২০০১ থেকে এপ্রিল ২০২১—এই সময়ের মধ্যে আফগানিস্তান যুদ্ধে মোট হতাহতের সংখ্যা কমপক্ষে ২৪১,০০০ (Crawford et al., 2021b)। প্রকৃত সংখ্যা আরও বেশি হবার সম্ভাবনা রয়েছে, যেহেতু অ্যামেরিকা মৃতদেহ গণনা করেনি। লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ছাড়াও উদ্বাস্তু হয়েছে আট মিলিয়ন আফগান জনগণ, দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছে ২.৮ মিলিয়ন নাগরিক। দারিদ্র, অপুষ্টি, দুর্নীতি, স্বাস্থ্যখাতের বেহাল দশা, ভঙ্গুর পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা—দুই দশকের যুদ্ধে আফগানরা অ্যামেরিকার প্রকৃত চেহারা বেশ ভালো করেই অবলোকন করতে সক্ষম হয়। 'হিউম্যান রাইটস' নামক চকচকে শব্দের মোড়কে অ্যামেরিকা (ও ব্রিটেনসহ সহযোগী রাষ্ট্রগুলো) ইরাক, আফগানিস্তান-এ (সেই সঙ্গে সিরিয়া, লিবিয়া) জনগোষ্ঠীর জীবন যেভাবে ধ্বংস করে দিয়েছে, তার খেসারত ইরাকি-আফগানীদের আরও বহু বছর দিয়ে যেতে হবে। আজকের পৃথিবীতে যারা লিবারেল সেক্যুলারিজমের সমর্থক, বিশ্বের জনপদগুলো আর কতটা মানবিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলে তারা এই ভ্রান্ত মতবাদগুলোর সমর্থন পরিত্যাগ করবেন?

যুদ্ধের প্রকৃত সত্য (যুদ্ধাপরাধ) হয়তো একসময় প্রকাশিত হয়। তবে অধিকাংশ

সময়ই পশ্চিমারা সেগুলোকে প্রকাশ করে রাখঢাক রেখে, আর সেটিও হয় 'যথেষ্ট' সময় পর, যখন এসকল অপরাধের তথ্য প্রকাশিত হলে ততটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় না। দুটো জাতির জনগণকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়া অ্যামেরিকা ও তাদের দোসররা এই যুদ্ধ থেকে ঠিক কী পেয়েছে, আমার জানা নেই। তবে, ২০২১-এর আগস্টে যখন তালিবান পুনরায় কাবুল দখল করে নেয়, তখন এতদিন কল্পনার জগতে বাস করা পশ্চিমা নাগরিকরা লাভক্ষতির হিসেব কষে দেখতে পেল, তাদের নগদ কোনো 'লাভ'-ই হয়নি; বরং যুদ্ধে মারা গেছে প্রায় ৭,০০০ মার্কিন সেনা, (Crawford N. , 2018), আত্মহত্যা করে মারা গেছে ৩০,০০০-এরও বেশি মার্কিন যোদ্ধা, (Kube, 2021)। অ্যামেরিকার জনগণের পকেট থেকে বেরিয়ে গেছে ৮ ট্রিলিয়ন ডলার (Crawford N. C., 2021a)। যোদ্ধাদের ভাটা আর অন্যান্য খরচ মিলিয়ে ভবিষ্যতে অর্থ ব্যায়ের পরিমাণটি আরও বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু, যে দলটিকে পৃথিবী থেকে মুছে ফেলার টার্গেট নিয়ে এই যুদ্ধ শুরু হয়, সেই দলটি এখন পূর্বের যেকোনো সময় থেকে শক্তিশালী। আর আফগানিস্তানে তালিবান যেখান থেকে পিছু হটেছিল, ঠিক সেখান থেকেই তারা আবার ক্ষমতায় আসীন হয়েছে। কিন্তু লিবারেল-সেক্যুলারদের লাভের খাতায় বড় এক 'শূন্য'। মুসলিমদের ওপর তাদের এত অত্যাচারের পরও যখন দিনশেষে দেখা যায়, কাফিররা তাদের নিহত সঙ্গী-যোদ্ধা আর অর্থের ব্যাপারে তীব্র হতাশা লুকিয়ে রাখতে পারছে না, তখন কুরআনের সেই পবিত্র আয়াতের কথাই মনে পড়ে যায়, যেখানে আল্লাহ বলেছেন—

> 'নিশ্চয় যারা কুফরি করেছে, তারা নিজেদের সম্পদসমূহ ব্যয় করে, আল্লাহর রাস্তা হতে বাধা প্রদান করার উদ্দেশ্যে। তারা তো তা ব্যয় করবে। অতঃপর এটি তাদের ওপর আক্ষেপের কারণ হবে। এরপর তারা পরাজিত হবে। আর যারা কুফরি করেছে, তাদেরকে জাহান্নামে সমবেত করা হবে।' (সূরা আনফাল, ৮ : ৩৬)

সুবহানআল্লাহ। দয়াময় আল্লাহ সত্য বলেছেন। কাফিরদের যেসকল সঙ্গী মুসলিমদের হত্যা করতে গিয়ে নিহত হয়েছে, তারা তো জাহান্নামের অধিবাসী। আর তাদের হাজার কোটি ডলার খরচও আজ তাদের মনোবেদনার কারণ হয়েছে। সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে অপূর্ব সব নিদর্শনাবলি প্রদর্শন করে ঈমানকে দৃঢ় করার, তাঁর পথে শক্ত হয়ে টিকে থাকার শক্তি প্রদান করেন।

Bibliography

United States House Committee on Oversight and Reform. (2004, March 16). Iraq on the Record, the Bush Administration's Public Statements on Iraq. Retrieved from Cornell University: https://www.cs.cornell.edu/gries/howbushoperates/pdf_admin_iraq.pdf

Anderson, T. H. (2015). 9/11: Bush's Response. In B. Bailey, & R. H. Immerman, Understanding the U.S. Wars in Iraq and Afghanistan (pp. 54-74). New York University Press.

anonymous. (1992, January 15). Deception on Capitol Hill. Retrieved from The New York Times: https://www.nytimes.com/1992/01/15/opinion/deception-on-capitol-hill.html

anonymous. (2001, September 15). War Without Illusions. Retrieved from The New York Times: https://www.nytimes.com/2001/09/15/opinion/war-without-illusions.html

anonymous. (2002, August 27). EYES ON IRAQ; In Cheney's Words: The Administration Case for Removing Saddam Hussein. Retrieved from The New York Times: https://www.nytimes.com/2002/08/27/world/eyes-iraq-cheney-s-words-administration-case-for-removing-saddam-hussein.html

anonymous. (2010, January 22). Hans Blix warned Tony Blair Iraq might not have WMD. Retrieved from The Daily Telegraph: https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq/7051059/Hans-Blix-warned-Tony-Blair-Iraq-might-not-have-WMD.html

Apparatus of Lies: Saddam's Disinformation and Propaganda 1990-2003. (2003). Retrieved from White House Office: https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/ogc/apparatus/index.html

Arnove, A. (2000). Iraq Under Siege, Updated Edition: The Deadly Impact of Sanctions and War. South End Press.

Assange, J. (2014, May 23). WikiLeaks statement on the mass recording of Afghan telephone calls by the NSA. Retrieved from WikiLeaks: https://wikileaks.org/WikiLeaks-statement-on-the-mass.html

Associated Press. (2005, May 12). Colonel loses command for abuses. Retrieved from Washington Times: https://www.washingtontimes.com/news/2005/may/12/20050512-111801-2679r/

Bailey, B., & Immerman, R. H. (2015). Understanding the U.S. Wars in Iraq and Afghanistan. New York University Press.

Barry, J. (2004, June 20). A TORTURED DEBATE. Retrieved from Newsweek: https://www.newsweek.com/tortured-debate-128593

Barstow, D. (2008, April 20). Behind TV Analysts, Pentagon's Hidden Hand. Retrieved from The New York Times: https://www.nytimes.com/2008/04/20/us/20generals.html

BBC News. (2016, July 5). "I toppled Saddam's statue – now I want him back" BBC News. Retrieved from Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=z9wC6W7EJpg

BBC NEWS. (n.d.). Profile: Ivan Frederick. Retrieved from news.bbc.co.uk: http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/3763806.stm

Beaumont, P., Barnett, A., & Hinsliff, G. (2003, June 15). Iraqi mobile

labs nothing to do with germ warfare, report finds. Retrieved from The Guardian: https://www.theguardian.com/world/2003/jun/15/iraq

Beavers, L. (2007, March 25). England back in Mineral County. Retrieved from Cumberland Times-News: https://www.times-news.com/england-back-in-mineral-county/article_5919dee3-e19a-50c4-8ac8-f9c7b408c07d.html

Blitzer, W. (2003, January 10). Search for the 'smoking gun'. Retrieved from CNN.com: https://edition.cnn.com/2003/US/01/10/wbr.smoking.gun/

Boone, J. (2010, December 2). Foreign contractors hired Afghan 'dancing boys', WikiLeaks cable reveals. Retrieved from The Guardian: https://www.theguardian.com/world/2010/dec/02/foreign-contractors-hired-dancing-boys

Brands, H. (2008). From Berlin to Baghdad: America's Search for Purpose in the Post-cold War World. University Press of Kentucky.

Bravin, J. (2013). The Terror Courts: Rough Justice at Guantanamo Bay. Yale University Press.

Bricmont, J. (2006). Humanitarian Imperialism: Using Human Rights to Sell War. Monthly Review Press.

Buncombe, A. (2003, August 10). US admits it used napalm bombs in Iraq. Retrieved from The Independent: https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-admits-it-used-napalm-bombs-in-iraq-99716.html

Bush, G. H. (1990, October 09). The President's News Conference. Retrieved from The American Presidency Project: https://www.presidency.ucsb.edu/documents/the-presidents-news-conference-21

Bush, G. W. (2001a, September 12). Bush addresses nation: Full text. Retrieved from BBC News: http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/1539328.stm

Bush, G. W. (2001b, September 21). Transcript of President Bush's address. Retrieved from CNN.com: https://edition.cnn.com/2001/US/09/20/gen.bush.transcript/

Bush, G. W. (2002a, September 28). Radio Address by the President to the Nation. Retrieved from Bush White House Archives: https://gov/news/releases/2002/09/text/20020928.html

Bush, G. W. (2002b, September 28). Radio Address by the President to the Nation. Retrieved from Bush White House Archives: https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/09/text/20020928.html

Bush, G. W. (2002c, September 12). Text: Bush's Speech to U.N. on Iraq. Retrieved from The New York Times: https://www.nytimes.com/2002/09/12/politics/text-bushs-speech-to-un-on-iraq.html

Bush, G. W. (2002d, October 2). Text: Remarks from President Bush and Congressional Leaders. Retrieved from The New York Times: https://www.nytimes.com/2002/10/02/politics/text-remarks-from-president-bush-and-congressional-leaders.html

Bush, G. W. (2002e, October 7). President Bush Outlines Iraqi Threat. Retrieved from Bush White House Archives: https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/10/20021007-8.html

Bush, G. W. (2002f, September 12). President's Remarks at the United Nations General Assembly. Retrieved from Bush White House

Archives: https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/09/20020912-1.html

Bush, G. W. (2003, March 17). President Bush's Speech on Iraq. Retrieved from The New York Times: https://www.nytimes.com/2003/03/17/international/middleeast/president-bushs-speech-on-iraq.html

Bush, G. W. (2003, January 28). Text of President Bush's 2003 State of the Union Address. Retrieved from The Washington Post: https://www.washingtonpost.com/wp-srv/onpolitics/transcripts/bushtext_012803.html

Bush, G. W. (2003a, March 21). Global Message. Retrieved from Bush White House Archives: https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2003/03/20030321.html

Bush, G. W. (2003b, May 29). Interview of the President by TVP, Poland. (TVP, Interviewer)

Bush, G. W. (2003c, May 1). President Bush Announces Major Combat Operations in Iraq Have Ended. Retrieved from Bush White House Archives: https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2003/05/20030501-15.html

Bush, G. W. (2003d, March 17). President Bush's Speech on Iraq. Retrieved from The New York Times: https://www.nytimes.com/2003/03/17/international/middleeast/president-bushs-speech-on-iraq.html

Bush, G. W. (2003e, February 28). President George W. Bush Speaks at AEI's Annual Dinner. Retrieved from American Enterprise Institute - AEI: https://www.aei.org/research-products/speech/president-george-w-bush-speaks-at-aeis-annual-dinner/

Bush, G. W. (2003f, January 28). State of the Union address. Retrieved from The Washington Post: https://www.washingtonpost.com/wp-srv/onpolitics/transcripts/bushtext_012803.html

Byrd, R. C., & Reid, H. (2009, July 28). S. 1529 (IS) - Executive Accountability Act of 2009. Retrieved from govinfo.gov | U.S. Government Publishing Office: https://www.govinfo.gov/content/pkg/BILLS-111s1529is/pdf/BILLS-111s1529is.pdf

Carruthers, S. L. (2016). The Good Occupation: American Soldiers and the Hazards of Peace. Harvard University Press.

Cheney, D. (2002, August 27). Full text of Dick Cheney's speech. Retrieved from The Guardian: https://amp.theguardian.com/world/2002/aug/27/usa.iraq

Cheney, D. (2002, September 8). Transcript of Interview with Vice-President Dick Cheney on Meet the Press, 8. (T. Russert, Interviewer) Retrieved from LEADING TO WAR: https://www.leadingtowar.com/PDFsources_claims_aluminum/2002_09_08_NBC.pdf

Cheney, D. (2003, September 14). Transcript for Sept. 14. (T. Russert, Interviewer)

Ciezadlo, A. (2004, May 28). For Iraqi women, Abu Ghraib's taint. Retrieved from Christian Science Monitor: https://www.csmonitor.com/2004/0528/p01s02-woiq.html

Clarke, R. A. (2008). Your Government Failed You: Breaking the Cycle of National Security Disasters. HarperCollins e-books.

CNN. (2004, May 7). Bush 'sorry' for abuse of Iraqi prisoners. Retrieved from CNN.com: https://edition.cnn.com/2004/ALLPOLITICS/05/07/bush.apology/index.html

CNN. (2005, January 17). Parents defend convicted Abu Ghraib guard. Retrieved from CNN.com: https://edition.cnn.com/2005/LAW/01/17/graner.parents/index.html

CNN Editorial. (2021, March 1). Haditha Killings Fast Facts. Retrieved from CNN.com: https://edition.cnn.com/2013/10/30/world/meast/haditha-killings-fast-facts/index.html

Cohen, M. (2002, December 29). How Bush Sr. Sold the Bombing of Iraq. Retrieved from Scoop: https://www.scoop.co.nz/stories/HL0212/S00145/how-george-bush-sr-sold-the-1991-bombing-of-iraq.htm

Cole, M. (2011, August 5). 'Kill Team' Soldier Gets Three Years in Prison. Retrieved from ABC News: https://abcnews.go.com/Blotter/kill-team-soldier-years-prison/story?id=14239130

Collier, R., & Squatriglia, C. (2003, April 10). Baghdad falls / COLLAPSE / Hussein loyalists give way to U.S. troops -- and looters. Retrieved from SFGATE: https://www.sfgate.com/news/article/Baghdad-falls-COLLAPSE-Hussein-loyalists-give-2622903.php

Coyne, C. J. (2021). Manufacturing Militarism: U.S. Government Propaganda in the War on Terror. Stanford University Press.

Crawford, N. (2018, November). Human Cost of the Post-9/11 Wars: Lethality and the Need for Transparency. Retrieved from Watson Institute for International and Public Affairs: https://watson.brown.edu/costsofwar/files/cow/imce/papers/2018/Human%20Costs%2C%20Nov%208%202018%20CoW.pdf

Crawford, N. C. (2021a, September 1). The U.S. Budgetary Costs of the Post-9/11 Wars. Retrieved from Watson Institute for International and Public Affairs: https://watson.brown.edu/costsofwar/files/cow/imce/papers/2021/Costs%20of%20War_U.S.%20Budgetary%20Costs%20of%20Post-9%2011%20Wars_9.1.21.pdf

Crawford, N. C., Lauri, A. D., Fiederlein, S., Lutz, C., Rzegocki, S., & Suhrke, A. (2021b, April). AFGHAN CIVILIANS. Retrieved from Watson Institute for International and Public Affairs: https://watson.brown.edu/costsofwar/costs/human/civilians/afghan

Davis, D. (2012, FEbruary 12). Dereliction of Duty II: Senior Military Leaders' Loss of Integrity Wounds Afghan War Effort. Retrieved from Public Intelligence: https://info.publicintelligence.net/USArmy-Dereliction-of-Duty-II.pdf

DiMaggio, A. R. (2015). Selling War, Selling Hope: Presidential Rhetoric, the News Media, and U.S. Foreign Policy since 9/11. State University of New York Press.

Dishneau, D. (2007, October 1). Abu Ghraib Abuse Figure Paroled. Retrieved from oklahoman.com: https://www.oklahoman.com/article/3138373/abu-ghraib-abuse-figure-paroled

Dishneau, D. (2011, August 7). Abu Ghraib abuse ringleader freed early from military prison. Retrieved from Boston.com: http://archive.boston.com/news/nation/articles/2011/08/07/abu_ghraib_abuse_ringleader_freed_early_from_military_prison/

Doyle, R. C. (2010). The Enemy in Our Hands: America's Treatment of Prisoners of War from the Revolution to the War on Terror. University Press of Kentucky.

Evers, E. (2014). "No One is Safe": The Abuse of Women in Iraq's Criminal Justice System. Human Rights Watch.

Finnegan, L. (2007). No Questions Asked: News Coverage since 9/11. Praeger.

Gallup. (2017). Iraq. Retrieved from https://news.gallup.com/poll/1633/iraq.aspx

Geneva International Centre for Justice. (n.d.). Ali Shallal al-Qaysi. Retrieved from www.gicj.org: www.gicj.org/lest-we-forget/890-ali-shallal-al-qaysi

Global Policy Forum. (2004, May 14-23). Public Opinion in Iraq. https://doi.org/0022002706291054

Global Policy Forum. (2007). Iraq Poll September 2007. Retrieved from https://www.globalpolicy.org/: https://archive.globalpolicy.org/images/pdfs/09bbciraqipoll.pdf

Goldman, R. (2008, December 3). Is Bush the Worst President in the Last 50 Years? Retrieved from ABC News: https://abcnews.go.com/Politics/President44/story?id=6378032&page=1

Goldstein, J. (2015, September 20). U.S. Soldiers Told to Ignore Sexual Abuse of Boys by Afghan Allies. Retrieved from The New York Times: https://www.nytimes.com/2015/09/21/world/asia/us-soldiers-told-to-ignore-afghan-allies-abuse-of-boys.html

Gordon, M. R., & Miller, J. (2002, Spetember 8). THREATS AND RESPONSES: THE IRAQIS; U.S. SAYS HUSSEIN INTENSIFIES QUEST FOR A-BOMB PARTS. Retrieved from The New York Times: https://www.nytimes.com/2002/09/08/world/threats-responses-iraqis-us-says-hussein-intensifies-quest-for-bomb-parts.html

Gottesdiener, L. (2020, November 9). The Children of Fallujah: The Medical Mystery at the Heart of the Iraq War. Retrieved from The Children of Fallujah: The Medical Mystery at the Heart of the Iraq War: https://www.thenation.com/article/world/fallujah-iraq-birth-defects/

Gourevitch, P., & Morris, E. (2008, March 17). Exposure. Retrieved from The New Yorker: https://www.newyorker.com/magazine/2008/03/24/exposure-5

Greenberg, K. J., & Dratel, J. L. (2005). The Torture Papers: The Road to Abu Ghraib. Cambridge University Press.

Guardian, t. (2001, September 26). Mullah Omar - in his own words. Retrieved from the Guardian: https://www.theguardian.com/world/2001/sep/26/afghanistan.features11

Haberman, M., & Schmidt, M. S. (2020, December 22). Trump Pardons Two Russia Inquiry Figures and Blackwater Guards. Retrieved from The New York Times: https://www.nytimes.com/2020/12/22/us/politics/trump-pardons.html

Harding, L. (2004, May 20). The other prisoners. Retrieved from The Guardian: https://www.theguardian.com/world/2004/may/20/iraq.gender

Hastings, D. (2006, August 13). Sickened Iraq Vets Cite Depleted Uranium. Retrieved from The Associated Press: https://apnews.com/article/

d9890f9454beb5e64b6ec6bfb0410bae

Healy, J. (2013, August 23). Soldier Sentenced to Life Without Parole for Killing 16 Afghans. Retrieved from The New York Times: https://www.nytimes.com/2013/08/24/us/soldier-gets-life-without-parole-in-deaths-of-afghan-civilians.html

Hedges, C., & Al-Arian, L. (2008). Collateral Damage: America's War Against Iraqi Civilians. Nation Books.

Hersh, 2. (. (2007, June 18). The General's Report. Retrieved from The New Yorker: https://www.newyorker.com/magazine/2007/06/25/the-generals-report

Hinchey, M. (2007, August 4). H. Res. 625 (IH) - Censuring the President and Vice President. Retrieved from govinfo.gov | U.S. Government Publishing Office: https://www.govinfo.gov/content/pkg/BILLS-110hres625ih/pdf/BILLS-110hres625ih.pdf

HRW. (2003). "Killing You is a Very Easy Thing For Us": Human Rights Abuses in Southeast Afghanistan.

HRW. (2015). "Today We Shall All Die": Afghanistan's Strongmen and the Legacy of Impunity. Human Rights Watch.

Human Rights Watch. (2014). Iraq: Security Forces Abusing Women in Detention. Human Rights Watch.

ICRC. (n.d.). THE GENEVA CONVENTIONS OF 12 AUGUST 1949. Retrieved from International Committee of the Red Cross: https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-0173.pdf

Inspector-General of the Australian Defence Force Afghanistan Inquiry. (2020, November 6). Afghanistan Inquiry. Retrieved from Australian Government | Department of Defence: https://afghanistaninquiry.defence.gov.au/sites/default/files/2020-11/IGADF-Afghanistan-Inquiry-Public-Release-Version.pdf

Jamail, D. (2004, December 14). US Military Obstructing Medical Care in Iraq. Retrieved from Antiwar.com Original: https://original.antiwar.com/jamail/2004/12/14/us-military-obstructing-medical-care-in-iraq/

Kaufman, M., & Witt, A. (2003, March 26). Returning Afghans Talk of Guantanamo. Retrieved from The Washington Post: https://web.archive.org/web/20110514024216/http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn?pagename=article&contentId=A29276-2003Mar25&notFound=true

Kellner, D. (2007). Bushspeak and the Politics of Lying: Presidential Rhetoric in the "War on Terror". Presidential Studies Quarterly, 37(4), 622-645. https://doi.org/10.1111/j.1741-5705.2007.02617.x

Kube, C. (2021, July 21). Since 9/11, military suicides dwarf the number of soldiers killed in combat. Retrieved from NBC News: https://www.nbcnews.com/news/military/9-11-military-suicides-dwarf-number-soldiers-killed-combat-n1271346

Kucinich, D. (2008, June 10). H. Res. 1258 (IH) - Impeaching George W. Bush, President of the United States, of high crimes and misdemeanors. Retrieved from govinfo.gov | U.S. Government Publishing Office: https://www.govinfo.gov/content/pkg/BILLS-110hres1258ih/pdf/BILLS-110hres1258ih.pdf

Kukis, M. (2011). Voices from Iraq: A People's History, 2003-2009. Columbia

University Press.

Kull, S. (2003). Misperceptions, the Media and the Iraq War. Political Science Quarterly, 118(4), 569-598. https://doi.org/10.1002/j.1538-165x.2003.tb00406.x

Kurtz, H. (2004, August 12). The Post on WMDs: An Inside Story. Retrieved from The Washington Post: https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A58127-2004Aug11.html

LaMonica, G. (2014, December 12). 2003 CIA cable casts doubt on claim linking Iraq to 9/11. Retrieved from CNN.com: https://edition.cnn.com/2014/12/12/world/cia-cable-iraq-war/index.html

Landay, J. S. (2015, May 15). Doubts, dissent stripped from public version of Iraq assessment. Retrieved from McClatchy: https://www.mcclatchydc.com/news/special-reports/iraq-intelligence/article24439789.html

Legum, J., & Rupar, A. (2005, December 15). Caught on Tape: Bush Admits WMD Were Irrelevant. Retrieved from ThinkProgress: https://archive.thinkprogress.org/caught-on-tape-bush-admits-wmd-were-irrelevant-6361c1f5eb0f/

Leung, R. (2004, March 19). Clarke's Take On Terror. Retrieved from CBS News: https://www.cbsnews.com/news/clarkes-take-on-terror/#app

Lundy, C. (2011). Social Work, Social Justice, and Human Rights: A Structural Approach to Practice, Second Edition. University of Toronto Press.

Lynch, C. (2003, January 29). U.N. Finds No Proof of Nuclear Program. Retrieved from The Washington Post: https://www.washingtonpost.com/archive/politics/2003/01/29/un-finds-no-proof-of-nuclear-program/18532aa8-d142-4ea0-b1b9-145c74cac295/

MacArthur, J. R. (1992, January 6). Remember Nayirah, Witness for Kuwait? Retrieved from The New York Times: https://www.nytimes.com/1992/01/06/opinion/remember-nayirah-witness-for-kuwait.html

MacDonald, M. (2014). Overreach: Delusions of Regime Change in Iraq. Harvard University Press.

Manning, D. (2002, July 23). The Secret Downing Street Memo. Retrieved from The George Washington University: https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB328/II-Doc14.pdf

McClellan, S. (2008). What Happened: Inside the Bush White House and Washington's Culture of Deception. PublicAffairs.

McCoy, A. W. (2012). Torture and Impunity: The U.S. Doctrine of Coercive Interrogation. University of Wisconsin Press.

Mearsheimer, J. J. (2011). Why Leaders Lie: The Truth About Lying in International Politics. Oxford University Press.

Miller, J. (2002a, November 12). THREATS AND RESPONSES: CHEMICAL WEAPONS; IRAQ SAID TO TRY TO BUY ANTIDOTE AGAINST NERVE GAS. Retrieved from The New York Times: https://www.nytimes.com/2002/11/12/world/threats-responses-chemical-weapons-iraq-said-try-buy-antidote-against-nerve-gas.html

Miller, J. (2003a, March 19). THREATS AND RESPONSES: DISARMING SADDAM HUSSEIN; TEAMS OF EXPERTS TO HUNT IRAQ ARMS. Retrieved from The New York Times: https://www.nytimes.

com/2003/03/19/world/threats-responses-disarming-saddam-hussein-teams-experts-hunt-iraq-arms.html

Miller, J., & Broad, W. J. (2003b, June 7). Some Analysts Of Iraq Trailers Reject Germ Use. Retrieved from The New York Times: https://www.nytimes.com/2003/06/07/world/some-analysts-of-iraq-trailers-reject-germ-use.html

Miller, J., & Gordon, M. R. (2002b, September 13). THREATS AND RESPONSES: BAGHDAD'S ARSENAL; White House Lists Iraq Steps To Build Banned Weapons. Retrieved from The New York Times: https://www.nytimes.com/2002/09/13/world/threats-responses-baghdad-s-arsenal-white-house-lists-iraq-steps-build-banned.html

Moeller, S. D. (2004, March 9). Media Coverage of Weapons of Mass Destruction. Retrieved from Center for International & Security Studies at Maryland: https://spp.umd.edu/sites/default/files/2019-08/wmdstudy_short.pdf

Moses, P. (2010, October 24). 'We don't do body counts'. Retrieved from Commonweal Magazine: https://www.commonwealmagazine.org/we-dont-do-body-counts

Mueller, J. (2005). The Iraq Syndrome. Foreign Affairs, 84(6), 44-54. https://doi.org/10.2307/20031775

NYT. (n.d.). The New York Times/CBS News Poll. Retrieved from The New York Times: https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/packages/html/national/20020908_POLL/020908poll-results.html

Oakes, D. (2017a, March 22). Former NZ defence minister admits civilians were killed in bungled special forces raid. Retrieved from ABC News: https://www.abc.net.au/news/2017-03-22/former-nz-defence-minister-admits-civilian-deaths-for-first-time/8377546

Oakes, D. (2017b, March 21). Women, children killed in bungled NZ special forces raid in Afghanistan, investigation claims. Retrieved from ABC News: https://www.abc.net.au/news/2017-03-21/women-children-killed-raid-afghanistan-nz-sas-book/8373958

Oakes, D., & Clark, S. (2017c, July 10). Death in Kandahar. Retrieved from ABC News (Australian Broadcasting Corporation): https://www.abc.net.au/news/2017-07-10/elite-australian-soldiers-accused-of-covering-up-killing-of-boy/8466612?nw=0&r=HtmlFragment

Oliver, K. (2007). Women as Weapons of War: Iraq, Sex, and the Media. Columbia University Press.

Oppmann, P. (2011, March 24). Soldier pleads guilty in Afghan killing case. Retrieved from CNN.com: http://edition.cnn.com/2011/CRIME/03/23/washington.afghan.sport.killing/index.html

Otterman, M. (2007). American Torture: From the Cold War to Abu Ghraib and Beyond. Melbourne University Press.

Paust, J. J. (2007). Beyond the Law: The Bush Administration's Unlawful Responses in the "War" on Terror. Cambridge University Press.

Pew Research Center. (2003, April 3). Embedded Reporters. Retrieved from Pew Research Center: https://www.pewresearch.org/journalism/2003/04/03/embedded-reporters/

Pillar, P. (2011). Intelligence and U.S. Foreign Policy: Iraq, 9/11, and Misguided

Reform. Columbia University Press.

Pincus, W. (2006, September 15). CIA Learned in '02 That Bin Laden Had No Iraq Ties, Report Says. Retrieved from The Washington Post: https://www.washingtonpost.com/archive/politics/2006/09/15/cia-learned-in-02-that-bin-laden-had-no-iraq-ties-report-says/097f75d8-b7fe-4186-bd7b-a8dc6e7a45ba/

Porterfield, E. (2011, November 19). Army sergeant gets five years in Afghan misconduct probe. Retrieved from Reuters: https://www.reuters.com/article/us-soldiers-crimes-idUSTRE7AI09P20111119

Powell, C. (2003a, June 8). Colin Powell Holds Media Availability. (H. Collins, Interviewer)

Powell, C. (2003b, February 3). Transcript of Powell's U.N. presentation. Retrieved from CNN.com: http://edition.cnn.com/2003/US/02/05/sprj.irq.powell.transcript/

ProPublica. (2010, December 29). The Toppling: How the Media Created the Iconic Fall of Saddam's Statue [video]. Retrieved from Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=YDu7bXqx8Ig

Quinnipiac University Poll. (2021). Afghanistan. Retrieved from www.pollingreport.com: www.pollingreport.com/afghan.htm

Rendall, S. (2003, May 1). Amplifying Officials, Squelching Dissent. Retrieved from FAIR: https://fair.org/extra/amplifying-officials-squelching-dissent/

Reuters Staff. (2011, March 24). U.S. soldier gets 24 years for murdering Afghans. Retrieved from Reuters: https://www.reuters.com/article/us-soldier-crimes-idUSTRE72N0D320110324

Rich, F. (2006). The Greatest Story Ever Sold: The Decline and Fall of Truth in Bush's America. Penguin Press.

Risen, J. (2003, March 23). A NATION AT WAR: INTELLIGENCE; C.I.A. Aides Feel Pressure In Preparing Iraqi Reports. Retrieved from The New York Times: https://www.nytimes.com/2003/03/23/world/a-nation-at-war-intelligence-cia-aides-feel-pressure-in-preparing-iraqi-reports.html

Ritter, S. (2003, September 8). Weapons of Mass Destruction in Our Midst / America can be its is its own worst enemy. Retrieved from SFGATE: https://www.sfgate.com/opinion/openforum/article/Weapons-of-Mass-Destruction-in-Our-Midst-2590331.php

Roberts, A. (2004). Righting Wrongs or Wronging Rights? The United States and Human Rights Post-September 11. European Journal of International Law, 15(4), 721-749. https://doi.org/10.1093/ejil/15.4.721

Robinson, P. (2015). The Propaganda Model: Still Relevant Today? In A. Edgley, Noam Chomsky (pp. 77-96). Palgrave Macmillan.

Rolling Stone. (2011, March 28). The Kill Team Photos. Retrieved from Rolling Stone: https://www.rollingstone.com/politics/politics-lists/the-kill-team-photos-10864/

Rubin, J. (2013, June 12). Bush's ratings beat Obama's. Retrieved from The Washington Post: https://www.washingtonpost.com/blogs/right-turn/wp/2013/06/12/bushs-ratings-beat-obamas/

Ryan, M. (2004). Framing the War Against Terrorism: US Newspaper Editorials and Military Action in Afghanistan. International Communication, 66(5),

363-382. https://doi.org/10.1177/0016549204045918

Safire, W. (2003, April 10). Jubilant V-I Day. Retrieved from The New York Times: https://www.nytimes.com/2003/04/10/opinion/jubilant-v-i-day.html

Saleh, Z. (2021). Return to Ruin: Iraqi Narratives of Exile and Nostalgia. Stanford University Press.

SBS News. (2013, August 22). Iraqi women raped at Abu Ghraib: reports. Retrieved from https://www.sbs.com.au/: https://www.sbs.com.au/news/iraqi-women-raped-at-abu-ghraib-reports

Schor, E. (2008, March 13). Saddam Hussein had no direct ties to al-Qaida, says Pentagon study. Retrieved from The Guardian: https://www.theguardian.com/world/2008/mar/13/iraq.usa

Sealey, G. (2004, July 15). Hersh: Children sodomized at Abu Ghraib, on tape. Retrieved from Salon.com: https://www.salon.com/2004/07/15/hersh_7/

Senate Select Committee on Intelligence. (2014, December 9). The Senate Intelligence Committee Report on Torture: Committee Study of the Central Intelligence Agency's Detention and Interrogation Program. Retrieved from U.S. Senate Select Committee on Intelligence: https://www.intelligence.senate.gov/sites/default/files/documents/CRPT-113srpt288.pdf

Smith, A. (2005/2015). Conquest: Sexual Violence and American Indian Genocide. Duke University Press Books.

Smith, N. (2008). I Was Wrong: The Meanings of Apologies. Cambridge University Press.

Steele, J., & Boone, J. (2010, December 2). WikiLeaks: Afghan vice-president 'landed in Dubai with $52m in cash'. Retrieved from The Guardian: https://www.theguardian.com/world/2010/dec/02/wikileaks-elite-afghans-millions-cash

Suskind, R. (2009). The Way of the World: A Story of Truth and Hope in an Age of Extremism. HarperCollins e-books.

Taguba, A. M. (2004). Article 15-6 investigation of the 800th Military Police Brigade. Retrieved from http://hrlibrary.umn.edu/: http://hrlibrary.umn.edu/OathBetrayed/Taguba-Report.pdf

Tarabay, J. (2006, August 1). Iraqi Women Claim Abuse in Prison. Retrieved from NPR: https://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=5596961

Taylor, P. M. (1990/2003). Munitions of the mind: A history of propaganda. Manchester University Press.

Telhami, S., & Kull, S. (2011). The American Public on the 9/11 Decade: A Study of American Public Opinion. Program on International Policy Attitudes; Anwar Sadat Chair for Peace and Development.

Tetreault, S. (2003, March 29). Nevadan sworn in as U.S. judge. Retrieved from Web Archive: https://web.archive.org/web/20110604134143/http://www.reviewjournal.com/lvrj_home/2003/Mar-29-Sat-2003/news/20995147.html

VanLandingham, R. E., & Corn, G. S. (2020, December 23). Trump's Blackwater pardons erase the line between slaughter and justified wartime violence. Retrieved from USA Today: https://www.usatoday.com/story/opinion/2020/12/23/trump-pardons-american-war-criminals-

undermines-rule-law-column/4026014001/

Vlahos, K. B. (2015, May 19). Downing Street Memo Mostly Ignored in U.S. Retrieved from Fox News: https://www.foxnews.com/story/downing-street-memo-mostly-ignored-in-u-s

Wagstaff, R. H. (2014). Terror Detentions and the Rule of Law: US and UK Perspectives. Oxford University Press.

Walker, L. (2014, October 22). Remember the Abu Ghraib Torture Pictures? There are More That Obama Doesn't Want You to See. Retrieved from Newsweek: https://www.newsweek.com/remember-abu-ghraib-torture-pictures-there-are-more-obama-doesnt-want-you-see-279254

Walton, D. (1997). Appeal to Pity: Argumentum ad Misericordiam. State University of New York Press.

Warrick, J. (2003, March 8). Some Evidence on Iraq Called Fake. Retrieved from The Washington Post: https://www.washingtonpost.com/archive/politics/2003/03/08/some-evidence-on-iraq-called-fake/9b935f48-9124-4a69-9953-408001f768de/

Whitlock, C. (2019, December 9). AT WAR WITH THE TRUTH. Retrieved from Washington Post: https://www.washingtonpost.com/graphics/2019/investigations/afghanistan-papers/afghanistan-war-confidential-documents/

Wilkinson, T. (2004, May 11). A Double Ordeal for Female Prisoners. Retrieved from Los Angeles Times: https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2004-may-11-fg-stigma11-story.html

Williams, B. G. (2017). Counter Jihad: America's Military Experience in Afghanistan, Iraq, and Syria. University of Pennsylvania Press.

Wilson, J. C. (2003, July 6). What I Didn't Find in Africa. Retrieved from The New York Times: https://www.nytimes.com/2003/07/06/opinion/what-i-didn-t-find-in-africa.html

অধ্যায় ৯

বাংলাদেশে প্রোপাগান্ডা

বর্তমান সময়ে তথাকথিত 'সুশীল' ও রাজনীতিবিদরা নিজেদের ক্ষমতা সুসংহত করতে সকল ক্ষেত্রে তাদের মতাদর্শ প্রতিষ্ঠিত করার সর্বাত্মক চেষ্টা করে। অ্যামেরিকার মতো বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোতেও, বর্তমান পরিস্থিতিতে এমনটি ঘটা অস্বাভাবিক নয় যে, রাষ্ট্রের নাগরিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করবে, কিন্তু প্রচলিত মিথগুলোর অন্তর্দ্বন্দ্ব সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই থাকবে না। বাংলাদেশও তার ব্যতিক্রম নয়। ব্রিটিশরা বস্তুবাদী শিক্ষার যে ভিত এ দেশে স্থাপন করে গেছে, সেক্যুলারদের যত্ন, আনুকূল্য পেয়ে আজ সেই বিষবৃক্ষের শেকড় ছড়িয়ে গেছে পুরো দেশের সকল জেনারেল কারিকুলামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে।

একই সঙ্গে, সেক্যুলারীয় আদর্শের বিরুদ্ধে ইসলামি শিক্ষাকে অটুট ও সমুন্নত রাখতে যেটুকু নগণ্য চেষ্টা সচেতন মুসলিমরা চালিয়ে যাচ্ছে, সে চেষ্টার বাস্তবায়নে সেক্যুলার মিডিয়া অনেক বড় একটি বাধা। অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মতোই আমাদের এই বাংলাদেশেও সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও ব্রিটিশরা উপমহাদেশ ত্যাগের সময় যে সেক্যুলার সরকার প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে যায়, তার কাঁটাতারে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকা দেশটা এখনো সেক্যুলারীয় অন্ধকূপের অলিগলি থেকে বের হতে পারেনি। পশ্চিমা দেশগুলোর কথা চিন্তা করলে আমাদের দেশে হয়তো ইসলামের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা ঠিক ততটা প্রকট নয়, কিন্তু তার একেবারেই অস্তিত্ব নেই—তেমনটা দাবি করাও মিথ্যার নামান্তর। বরং কোনো কোনো বিষয়ে এই মিথ্যার বহর এতটাই নগ্ন থাকে যে, অনেক সেক্যুলারপন্থীরাও এর তীব্রতার মাত্রা দেখে লজ্জিত হন। সাম্প্রতিক একটি ঘটনাকে উদাহরণ ধরে বিশদ ব্যাখ্যা করলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে আশা করি।

২৬ এপ্রিল, ২০২১। সন্ধ্যার পর গুলশানের একটি অভিজাত ফ্ল্যাটে 'মুনিয়া' নামের এক তরুণীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় এইচএসসি পরীক্ষার্থী মুনিয়ার বড় বোন বাদী হয়ে মামলা করেন। পরের দিন জানা গেল, মুনিয়া যে ফ্ল্যাটে থাকত, তার ভাড়া ছিল মাসিক এক লক্ষ টাকা। ইয়াতীম, সামান্য কলেজের ছাত্রীর পক্ষে পরিবারের কারও সাহায্য ছাড়া এত টাকা ভাড়া দেয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। তাহলে, এত টাকা ভাড়া কে দিত? পরবর্তীকালে জানা গেল, সেই ফ্ল্যাটের ভাড়া

পরিশোধ করতেন বসুন্ধরা গ্রুপের এমডি সায়েম সোবহান আনভীর।

মুনিয়ার সঙ্গে আনভীরের সংশ্লিষ্টতার এই সংবাদ কিন্তু তাৎক্ষণিক প্রচারিত হয়নি। ২৬ এপ্রিল বাংলাদেশের প্রভাবশালী সংবাদ-মাধ্যমগুলোর সংবাদে কোথাও তার কথা সরাসরি উল্লেখ করা হয়নি। সেদিন বাংলাদেশের 'অসাম্প্রদায়িক'(!) গণমাধ্যমে সংবাদ পরিবেশনের ধরন কেমন ছিল? ঘটনার ঘনঘটা হয়তো অনেকেরই জানা, তবুও যারা জানেন না, তাদের জন্য কয়েকটি উদাহরণ দিই :

- **প্রথম আলো** (২৭ এপ্রিল) : 'উপকমিশনার সুদীপ বলেন, 'দেশের একটি শীর্ষস্থানীয় শিল্প গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সঙ্গে মোসারাত জাহানের পরিচয় ছিল।' (নিজস্ব প্রতিবেদক, ২০২১)।
- **যুগান্তর** (২৭ এপ্রিল) : 'মোসারাত জাহানের সঙ্গে এক ছেলের(!) পরিচয় ছিল।'
- **Somoy news** (২৭ এপ্রিল) : পুলিশের গুলশান বিভাগের ডিসি জানান, '...দেশের একটি শীর্ষস্থানীয় গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সঙ্গে মোসারাত জাহানের পরিচয় ছিল।'
- (২৭ এপ্রিল) : 'দেশের একটি শীর্ষস্থানীয় শিল্প গ্রুপের...' (মহানগর সময় ডেস্ক, ২০২১)।
- **সমকাল** (২৭ এপ্রিল) : সমকালের প্রতিবেদনে আনভীরের সংশ্লিষ্টতার কোনো উল্লেখ-ই নেই।
- **DW** (২৭ এপ্রিল) : 'তরুণীর সঙ্গে শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সম্পর্ক থাকার কথা জানা গেছে।'
- **মানবজমিন** (২৭ এপ্রিল) : '...দেশের একটি শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সঙ্গে মোসারাত জাহানের সম্পর্ক ছিল।'
- Jagonews24 [১] (২৭ এপ্রিল) : 'জানা গেছে, মামলার আসামী করা হয়েছে দেশের একটি শীর্ষ শিল্পগ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালককে (এমডি)।'
- **Ntv online** (২৭ এপ্রিল) : গুলশান জোনের এডিসির বরাত দিয়ে বলা হয়, 'মুনিয়ার সঙ্গে একটি শিল্পগোষ্ঠীর এক কর্মকর্তার প্রেমের সম্পর্ক ছিল। ... মুনিয়ার সঙ্গে যার প্রেমের সম্পর্ক ছিল, তিনি ওই বাসায় নিয়মিত যাতায়াত করতেন।' রাতে ডিএমপির এক কর্মকর্তা গণমাধ্যমকে ব্রিফিংকালে বলেন, 'মুনিয়ার বড় বোনের মামলার অভিযোগ হলো, ভিক্টিমের সঙ্গে একটি শিল্প গোষ্ঠীর এমডি—তাঁর[২] দু বছরের সম্পর্ক থাকা অবস্থায় এক বছর ভিক্টিমকে

[১] প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের AKC Private ltd.-এর একটি প্রতিষ্ঠান
[২] সম্মান প্রদর্শনপূর্বক 'তার' এর পরিবর্তে 'তাঁর' ব্যবহৃত হয়েছে!

তিনি বনানীর একটি ফ্ল্যাটে রাখেন।'

- Rtv Online (২৭ এপ্রিল) : 'মামলায় আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেয়ায় দেশের শীর্ষস্থানীয় একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালককে (এমডি) আসামী করা হয়েছে।' আরও পাবলিশ করা আরটিভির অন্যান্য নিউজও একই ধাচের।

এই 'শীর্ষস্থানীয় শিল্প গ্রুপের এমডি' যে বসুন্ধরা গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সায়েম সোবহান আনভীর, এটা ফাঁস হবার পরও যখন টিভি নিউজ, ওয়েবসাইট, ইউটিউব আর ফেসবুকে বসুন্ধরা ও আনভীরের নাম উল্লেখ ছাড়াই সংবাদ পরিবেশন করা হচ্ছিল, তখন সাধারণ জনগণের ক্ষোভ সবদিকে উপচে পড়ে। ফলে চাপে পড়ে পরবর্তীকালে গণমাধ্যম তাদের সুর বদলাতে বাধ্য হয়। কিন্তু, কাহিনী সেখানেই শেষ নয়। সবাই সবিস্ময়ে দেখতে পেলো, ভিক্টিমের ব্যাপারে মিডিয়ায় নোংরা ভাষা ব্যবহার করে অশ্লীল রিপোর্ট করা শুরু হয়েছে। চ্যানেল আই আরও এক ধাপ এগিয়ে আনভীরের ছবি ঝাপসা করে তার সঙ্গে থাকা ভিক্টিমের ছবি প্রচার করে[১]। অথচ, **বঙ্গীয় সেক্যুলার মিডিয়া যে ধরনের লিবারেল মতাদর্শ প্রোমোট করে, সেই মতাদর্শের মানদণ্ড অনুযায়ীও মুনিয়া শুধুই একজন ভিক্টিম।** এর আগে বহুবার মিডিয়া ও রাষ্ট্রযন্ত্র, নিরাপত্তাবাহিনী মিলে বহু পুরুষকে 'বিবাহের প্রলোভনে ধর্ষণ'-এর সত্য-নিথ্যা অভিযোগে হেনস্থা, মানহানি করেছে[২]। তাই বঙ্গীয় মিডিয়া গোষ্ঠী চাইলেই এ ঘটনা নিয়ে 'বিবাহের প্রলোভনে ধর্ষণ' ও হত্যা কিংবা 'আত্মহত্যায় প্ররোচনা'র মতো কঠোর আর 'আকর্ষণীয়' সব রিপোর্ট করতে পারত।

তারচেয়েও আশ্চর্যজনক ব্যাপার, অমুক ঘাতক, তমুক দালাল, সমুক নারী ক্ষমতায়ন সংগঠনগুলো এই ঘটনায় ছিল পুরো পহেলা বৈশাখের মিছিলের মূর্তিগুলোর মতো নিশ্চুপ। তারা বসুন্ধরা গ্রুপ নিষিদ্ধ করার কোনো দাবি করল না! মোটা দাগে, এই দুর্ঘটনার ব্যাপারে সকল তথাকথিত মানবাধিকার সংগঠনগুলো গর্তে লুকিয়ে পড়ে। একটি ঘটনায় বাংলাদেশের তাবত সেক্যুলার গোষ্ঠীর এহেন লুকোচুরি খেলার পেছনের আসল কারণ কী? ব্যাপারটা তো এরকম নয় যে, আনভীর জাতির কোনো মহাবীর বা মহামানব টাইপের কোনো কাল্ট, যার সমালোচনা করা আমাদের দেশের সেক্যুলার বা 'অলিখিত' কোনো আইনে বারণ। তাছাড়া এটি সরকারবিরোধী কোনো সংবাদও ছিল না যে, সংবাদটি প্রচার করলে পত্রিকা বন্ধ করে দেয়ার আশঙ্কা থাকবে। তবুও দেশের 'মূলধারার' মিডিয়া আর সেক্যুলার গোষ্ঠীগুলো এমন 'অন্ধের' মতো আচরণ কেন করল?

---

[১] পরে অবশ্য তারা জানায়, 'টেকনিকাল ভুল'-এর কারণে নাকি ভিক্টিমের পরিবর্তে অভিযুক্তের ছবি ঝাপসা করে প্রচার করা হয়েছে (anonymous, ২০২১)।

[২] ব্যাপারটা বিয়ের পূর্বের শারীরিক সম্পর্ককে প্রোমোট করার জন্য নয়, বরং শুধুমাত্র সেক্যুলারদের ভণ্ডামি তুলে ধরার জন্য বলা হয়েছে।

বঙ্গীয় সংবাদ-মাধ্যমের এই দ্বিচারিতার স্বরূপ বুঝতে হলে আমাদেরকে ঘটনাটি রেখে একটু পেছনের দিকে নজর দিতে হবে। কোনো ভূখণ্ডে রাষ্ট্রীয় কাঠামো, সামাজিক পরিস্থিতি, প্রতিষ্ঠিত শক্তি ও মিডিয়ার মতাদর্শ—এসব বিষয় বিবেচনা না করে শুধু সাংবাদিকদের গালি দিলে ব্যাপারটা কেবল অগভীর চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। বসুন্ধরা গ্রুপ বাংলাদেশের অন্যতম বৃহত্তম ব্যবসায়ী গোষ্ঠী। সেই সঙ্গে এ দেশে তাদের কয়েকটি সংবাদপত্র, টিভি চ্যানেল, অনলাইন পোর্টাল ও এফএম রেডিও স্টেশন রয়েছে। বসুন্ধরার পত্রিকার সংখ্যা তিনটি—বাংলাদেশ প্রতিদিন (২০২১ সালে[১] সম্পাদক: নঈম নিজাম), কালের কণ্ঠ (২০২১ সালে সম্পাদক: ইমদাদুল হক মিলন) এবং ডেইলি সান (২০২১ সালে সম্পাদক: এনামুল হক চৌধুরী); অনলাইন পোর্টাল বাংলানিউজ২৪-ও তাদের; নিউজ ২৪ নামক টেলিভিশন চ্যানেলও তাদের; রেডিও ক্যাপিটাল ৯৪.৮ FM-ও তাদেরই (২০২১)। উল্লিখিত পত্রিকা ও সংবাদমাধ্যমগুলোর একটিও মুনিয়ার ঘটনায় আনভীরকে নিয়ে কোনো নিউজ করেনি। সেটা না হয় বোঝা গেল। চাকরি তো সবারই প্রিয়, তা সে যত বড় প্রথিতযশা সাহিত্যিকই হোক না কেন। কিন্তু, বাদবাকি গণমাধ্যমগুলোর কী হয়েছিল?

প্রকৃত সত্য হলো, দেশীয় মিডিয়া এই ঘটনা ঘটার বহু আগে থেকেই দেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোকে 'জামাই আদর' করে আসছে। দেখা যায়, কোনো কর্পোরেট ফ্যাক্টরিতে আগুন লেগে শ্রমিক নিহত হলে নিউজ করা হয়, 'একটি জুসের কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চল্লিশ জন নিহত'[২], কিংবা 'একটি মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানির প্রোগ্রামে ওয়াইন পান করে এক ব্যক্তির মৃত্যু' কিংবা এই শ্রেণির লুকোচুরি করা সংবাদ। মুনিয়ার ঘটনায় ঠিক একই রকম নিউজের সমালোচনার জবাবে কয়েকজন সাংবাদিক নিজেদেরকে ডিফেন্ড করতে গিয়ে বলেন, সকল মিডিয়া তাদের 'বেস্ট জাজমেন্ট' অনুসারে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বাংলাদেশের সেক্যুলারদের কেবলা অ্যামেরিকার মতো এ দেশের 'মূলধারার' অধিকাংশ গণমাধ্যমও কর্পোরেট বা রাজনৈতিক মালিকানাধীন। বাংলাদেশের মিডিয়ার মালিকানায় কারা আছে (২০১৩) তা খুঁজতে গেলে দেখা যায়—

- **একাত্তর** : বাংলাদেশের সবচেয়ে বিতর্কিত এই টিভি চ্যানেলটির মালিক মোজাম্মেল বাবু ও তার আত্মীয়-স্বজন অর্ধেক মালিকানা (২৫,০০০ শেয়ার) বিক্রি করে দেয় মেঘনা গ্রুপের চেয়ারম্যান মোস্তফা কামালের কাছে।

[১] বই লেখা কালীন সময়ে

[২] নয় জুলাই ২০২১ এ 'নারায়ণগঞ্জে কারখানার আগুনে অন্তত ৫২ জন নিহত' শিরোনামে করা বিবিসির সংবাদে দেখা যায়, পুরো সংবাদ জুড়ে কোথাও কারখানার নাম বা স্বত্বাধিকারীর কোনো তথ্যই নেই।

- চ্যানেল নাইন : সাবেক মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের ভাই মেজর জেনারেল (অব.) সৈয়দ শাফায়েতুল ইসলামের স্ত্রী ও পরিবারের অন্য সদস্যদের কাছ থেকে ৮৫% শেয়ার কিনে নেন এনটিভি'র সাবেক এমডি এনায়েতুর রহমান।
- সময় টিভি : সময় টিভির লাইসেন্স দেয়া হয় সাবেক আইন প্রতিমন্ত্রী কামরুল ইসলামের ভাই চলচ্চিত্রকার মোর্শেদুল ইসলাম ও তিনজন টিভি সাংবাদিককে। পরে ২০১০-এর ০৮ জুন, ৫০ শতাংশ বিক্রি করে দেয়া হয় সিটি গ্রুপের কাছে।
- মোহনা টিভি : সাবেক সাংসদ আহমেদ মজুমদার মোহনা টিভির লাইসেন্স নেন। এর সঙ্গে সাংসদ হামিদা বানু ও সজীব কর্পোরেশনের মালিক এম এ কাসেমও সম্পৃক্ত রয়েছেন।
- ইন্ডিপেন্ডেন্ট টিভি : ইন্ডিপেন্ডেন্ট টিভি'র মোট এক লাখ শেয়ারের মধ্যে বেক্সিমকো গ্রুপের চেয়ারম্যান সোহেল এফ রহমান ও ভাইস চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমানের নামেই রয়েছে ৪০,০০০ করে মোট ৮০,০০০ শেয়ার। প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমানের ছেলে ভৈরবের সাংসদ নাজমুল হাসানের নামে রয়েছে আরও ২০,০০০।
- এসএ (SA) টিভি : এসএ টিভি'র লাইসেন্স দেয়া হয় এসএ পরিবহনের মালিক সালাউদ্দিন আহমেদকে। মালিকানায় তিনি ও তার পরিবারের সদস্যরা রয়েছেন।
- মাছরাঙা টিভি : স্কয়ার গ্রুপ।
- জিটিভি : গাজী গ্রুপ।[১]
- DBC News : এটির চেয়ারম্যান ইকবাল সোবহান চৌধুরী, প্রধানমন্ত্রীর মিডিয়া উপদেষ্টা (Staff Correspondent, 2016)।
- Daily Star : এই পত্রিকার সংশ্লিষ্টতা ট্রান্সকম গ্রুপের সাথে (২০১৪)।
- চ্যানেল আই : রেডিও ভূমি'র মালিক ইমপ্রেস গ্রুপ (Channel i, n.d.; Impress Group, 2019)।

২০১৩ সালে বেসরকারি টেলিভিশন নিয়ে *প্রথম আলো* গুরুত্বপূর্ণ একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। তাদের সে রিপোর্টে জানা যায়, বেসরকারি টিভি চ্যানেল 'চ্যানেল ৫২'-এর লাইসেন্স দেয়া হয়েছিল তৎকালীন ক্ষমতাসীন দলের প্রয়াত নেতা আবদুল মালেক উকিলের ছেলে বাহারউদ্দিন খেলনের স্ত্রীর নামে; তার সঙ্গে ছিল বেঙ্গল গ্রুপ। এ বেঙ্গল গ্রুপ আরটিভির মালিকানার সঙ্গেও জড়িত।

বাহারউদ্দিন তখন ছিলেন বিটিভি'র উপপরিচালক (বার্তা)। একটি টিভি চ্যানেল

[১] টিভি চ্যানেলের মালিকানার নিউজটি ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দের। এরপর কোনো চ্যানেলের মালিকানায় রদবদল যদি হয়েও থাকে, তাহলে সে বিষয়ে যথেষ্ট তথ্য প্রকাশিত হয়নি।

স্থাপন কিংবা পরিচালনা করা—কোনোটির সামর্থ্যই তার ছিল না। আবার সরকারি কর্মকর্তা হিসেবেও তিনি লাইসেন্স পাবার যোগ্য নন। তাই তিনি 'বেঙ্গল টেলিভিশন চ্যানেল লিমিটেড' নামের এক কোম্পানি গঠন করেন, যার পেছনে অর্থায়ন করে বেঙ্গল গ্রুপ। এই কোম্পানির নামেই ১ অক্টোবর, ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দে লাইসেন্স দেয় তথ্য মন্ত্রণালয়। ওই সময় বাহারউদ্দিনের স্ত্রী ছিলেন চ্যানেলটির চেয়ারম্যান, আর বেঙ্গল গ্রুপের মোর্শেদ আলম ছিলেন সেটির এমডি। বাহারউদ্দিন, মোর্শেদ আলম উভয়ে এ ঘটনা স্বীকারও করেন।

২০০৮-এ ক্ষমতায় আসার পর ক্ষমতাসীন সরকার (২০ অক্টোবর ২০১৩ পর্যন্ত) মোট ষোলোটি (১৬) টিভি চ্যানেলের লাইসেন্স দেয়। লাইসেন্স মালিকদের বেশিরভাগেরই চ্যানেল স্থাপন ও পরিচালনা করার সক্ষমতা কিংবা পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না। কিন্তু তাদের লাইসেন্স পাবার একমাত্র 'যোগ্যতা' ছিল রাজনৈতিক যোগাযোগ। লাইসেন্স নিয়ে অনেকেই পরে উঁচু দরে মালিকানা বিক্রি করে দেন (ইসলাম, ২০১৩)।

আনভীরের ঘটনায় সেক্যুলার সাংবাদিক আনিস আলমগীর বাংলাদেশের মিডিয়া সিস্টেম সম্পর্কে মন্তব্য করেন, 'আজ যেসব পত্রিকায়, এবং গতকাল পর্যন্ত যেসব অনলাইন বা টেলিভিশনে বসুন্ধরার এমডিকে নিয়ে সংবাদ প্রকাশিত-প্রচারিত হয়নি, আপনি নিশ্চিত ধরে নিন, তারা মিডিয়ার মালিক হয়েছেন আপনাকে সংবাদ সরবরাহ করার জন্য নয়; নিজেদের অবৈধ ব্যবসা, নিজেদের এবং পরিবারের অপরাধ, অবৈধ কর্মকাণ্ড ঢাকার জন্য। অন্যের মিডিয়া তাকে কামড়ে দিলে পালটা কামড়ে দেয়ার[১] জন্য' (anonymous, 2021)।

সাংবাদিক রেজোয়ান হক (২০২১-এ মাছরাঙা টিভি'র বার্তা প্রধান) বলেন, 'সাংবাদিকরা শুধু তথ্য সংগ্রহ এবং তা পরিবেশনের জন্য তৈরি করে দিতে পারেন; তা প্রচার বা প্রকাশ করার নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতে নেই। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এখন অনেক ক্ষেত্রেই তা নিয়ন্ত্রণ করে বিজ্ঞাপনদাতা এবং মালিকপক্ষের ব্যবসায়িক বা গোষ্ঠীস্বার্থ। বিশেষত গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্শকাতর ঘটনাগুলোর বেলায়।' তার মতে, 'কর্পোরেট হাউজগুলোর মালিকানা এবং নিয়ন্ত্রণ থাকা মূলধারার গণমাধ্যমকে গোষ্ঠীস্বার্থে ব্যবহারের প্রবণতা কারও কারও মধ্যে খুবই প্রকট। এতে বাকিদের প্রভাবিত হওয়ার আশঙ্কাও প্রবল। এরকম চলতে দিলে সাংবাদিকতার মৃত্যু আসন্ন' (হক, ২০২১)।

অর্থাৎ, দেশীয় মিডিয়ার অবস্থা আজ সংকটাপন্ন। সেক্যুলারিজমের দুষ্টচক্রে পড়ে পূর্ব থেকেই ক্যান্সারে আক্রান্ত মিডিয়া দিনদিন ফেঁসে যাচ্ছে কর্পোরেট-রাজনৈতিক ফাঁদে, যেখান থেকে আদৌ বের হওয়ার কোনো পথ সামনে দৃশ্যমান

১। এর অর্থ, পরস্পর স্বার্থ-বিরোধী মালিকানাধীন পত্রিকায় অপর গ্রুপের দুর্নীতির সংবাদ ফলাও করে প্রচার করা।

নেই। বাংলাদেশের মুসলিমরা খুবই সহজ-সরল বলে এখনো মিডিয়ার কাছে ভালো কিছু আশা[১] করে। কিন্তু, মালিকানার কুপ্রভাবের প্রমাণ আমাদের সকলের চোখের সামনে উন্মুক্ত। সংবাদের বৈশিষ্ট্যে রদবদল করার ব্যাপারে বিজ্ঞাপনেরও বিশাল প্রভাব রয়েছে। এ রাষ্ট্রে মিডিয়ার ভিতরের খবর তত ফাঁস হয় না, নয়তো দেশীয় মিডিয়ার ডাটা যাচাই করলে হয়তো দেখা যেত, মিডিয়ার পরিবেশিত সংবাদের ওপর বিজ্ঞাপনের কী প্রভাব।

কর্পোরেট মিডিয়া নিয়ে ডয়চে ভেলের সহজ স্বীকারোক্তি, 'সংবাদপত্র, নিউজ চ্যানেল, পত্রিকা, ডিজিটাল নিউজ প্লাটফর্ম সবই হলো ব্যবসা, নিখাদ ব্যবসা। আর পাঁচটা ব্যবসার মতো এখানেও মন্ত্র একটাই, প্রোডাক্ট বেচতে হবে। বিজ্ঞাপন পেতে হবে। লাভের কড়ি ঘরে আনতে হবে। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর জন্য কেউ বড় আকারের খবরের কাগজ করেন না। সাংবাদিকতাও নয়। তবে অন্য ব্যবসার সঙ্গে (এর) ফারাকটা হলো, মিডিয়া জনমত গঠন করতে পারে, কোনো একদিকে ঘুরিয়ে দিতে পারে। যেটা আর পাঁচটা ব্যবসা পারে না। আর তাই কর্পোরেট, রাজনৈতিক নেতাদের নজর পড়েছে মিডিয়ার ওপর। এই সব কর্পোরেটের কাছে মিডিয়া প্রধান ব্যবসা নয়, এটা হলো সহায়ক ব্যবসা' (হোড়, ২০২১)।

মিডিয়ার প্রোপাগান্ডা মডেলের তৃতীয় যে ফিল্টারিং সিস্টেমটি ছিল, সেটি হচ্ছে সোর্স বা উৎস। এটির ব্যাপারেও দেশে উল্লেখযোগ্য তেমন কোনো জরিপ করা হয়নি। তবে, এ দেশের সংবাদমাধ্যম তাদের কেবলা পশ্চিমা মিডিয়া থেকে এ বিষয়ে স্বতন্ত্র তেমন কোনো বৈশিষ্ট্য ধারণ করে না। যেহেতু মিডিয়ার মালিকপক্ষগুলো বড় বড় কর্পোরেশন হাউজ, তাই জরুরি বিষয়ে সমালোচনা করার পূর্বে বিজ্ঞাপন লাভ, নিজেদের স্বার্থোদ্ধার আর পত্রিকা বিক্রিই তাদের প্রধান লক্ষ্য। 'সত্য প্রচার'-এর মতো দায়িত্ব তাই তখন গুরুত্ব হারায়। তাই, বঙ্গীয় মিডিয়ার নিউজগুলোতে সোর্স হিসেবে সচরাচর সরকার গঠনকারী দল, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী আর কর্পোরেট লিডারদের প্রভাব অনস্বীকার্য বিষয়; যেকোনো গুরুতর ঘটনা-নির্ভর সংবাদগুলোতে যে ব্যাপারটা বারবার ফুটে উঠে। তাই, একাডেমিক ইনফো না থাকলেও এটি অস্বীকার বা অবিশ্বাস করার মতো কোনো বিষয় নয়।

বাংলাদেশে ফ্ল্যাক বা সমালোচনার উপস্থিতি আছে, এবং সেটির উপস্থিতি বেশ ভালো করেই অনুভব করা যায়। একটি ছোট উদাহরণ দিলে বিষয়টা ভালো করে বুঝতে পারবেন। ধরুন, ওমর নামের একজন ছাত্র কোনো একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। ছেলেটির আদব-আখলাক অনেক উত্তম আলহামদুলিল্লাহ, কোনো ধরনের বাজে কাজে তাকে পাওয়া যায় না। তো, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়

[১] দাবি করা যায়, তাদেরকে নিয়ে ঠাট্টা-মশকরা করা যায়। কিন্তু আশা করাটা একটু বাস্তবতা বিবর্জিত বলেই মনে হয়।

মানেই হলো ক্যাম্পাসে এক বিশেষ ছাত্র-সংগঠনের মারাত্মক প্রভাব। ধরুন, একদিন ওই সংগঠনের কোনো নেতা ইসলাম-বিরোধী বক্তব্য দিল। কিংবা রাষ্ট্রে মুসলিম বনাম সেকুলারদের মাঝে সৃষ্ট কোনো বিতর্কে ওই সংগঠনের সাম্প্রতিক অবস্থান ইসলামের দাবির বিপরীত। এই পরিস্থিতিতে ওমর ফেসবুকে পোস্ট দিল, তিনি ইসলামের পক্ষে; বরং ইসলামের দাবির কাছে শর্তহীন আনুগত্য করা শুধু তার নয়, বরং প্রতিটি মুসলিমের দায়িত্ব।

ঘটনা এইখানে শেষ হলেই ভালো হতো। কিন্তু, সচরাচর ঘটনা এইখানে শেষ হয় না। ভার্সিটিকে নিজেদের অপকর্মের সাম্রাজ্য বানিয়ে ফেলা এই সংগঠনের নেতৃবৃন্দ তখন ওমরের ব্যাপারে 'পদক্ষেপ' নেয়। কখনো তাকে পোস্ট ডিলিট করতে বলা হয়, নয়তো 'সমস্যা হবে'; কখনো-বা ওমরদেরকে নিয়ে যাওয়া হয় 'গেস্টরুম'-এ। সেখানে নিয়ে শেখানো হয় 'ম্যানার' বা আচরণ। আর তাদের এই ধরনের অপকর্মের অধিকাংশই বাইরে প্রকাশিত হয় না। শিক্ষকদেরকে ছাত্র-নির্যাতনের ঘটনা জানালে তারা বলে, 'চেপে যাও'। নতুবা উলটো ওমরদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দেয়া হয়, সে অমুক 'বিরোধী' দলের সদস্য। তাই তাকে 'ম্যানার' শেখানো বৈধ[১]। আর কখনো কখনো স্বয়ং শিক্ষকদের ওপরও চলে নির্যাতন। এমনকি তাতে শিক্ষক নিহত হবার মতো ঘটনাও ঘটে 'অসাম্প্রদায়িক' বাংলাদেশে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় জন্ম নিয়ে যে দানব চালিয়ে যায় নারকীয় তাণ্ডব, তাকে থামানোর মতো আর কোথাও কেউ থাকে না।

এবার এই ঘটনার প্রধান চরিত্রগুলোকে মিডিয়া ও প্রতিষ্ঠিত শক্তি দিয়ে প্রতিস্থাপিত করুন। তাহলে ফ্ল্যাক বিষয়টা কী, সেটা আন্দাজ করা সহজ হবে। ক্ষমতালোভী 'কালচারালদের' কালচারও আজ ঠিক এরকমই। বাস্তবিকভাবে, দেশে মিডিয়ার ওপর চাপ প্রয়োগ নতুন কোনো বিষয় নয়। দিগন্ত টিভির মতো সংবাদ প্রতিষ্ঠানকে এই কারণে বন্ধও করে দেয়া হয়েছে (যদিও বঙ্গীয় মিডিয়ার প্রধান চরিত্রগুলো ওমরের মতো পরিচ্ছন্ন নয়)। বাদবাকি কেউ একটু এদিক সেদিক করলে ভিতরে কী হয়, সেটা হয়তো গণমাধ্যমে প্রকাশ পায় না। তবে অদূর ভবিষ্যতে 'পরিস্থিতি' বদলে গেলে হয়তো-বা মিডিয়ার অন্দর মহলের আসল ঘটনাগুলো জানা যাবে। সেদিন সবাই বুঝতে পারবে ভেতরে ভেতরে কোথায় কতটুকু 'চাপ' প্রয়োগ করা হতো।

আইডোলজি বা মতাদর্শ এ দেশেও মিডিয়ার নিউজের ক্ষেত্রে বিশাল ভূমিকা রাখে। দেশের প্রভাবশালী সেক্যুলার ব্যক্তি/সংগঠনগুলোর স্বার্থে আঘাত করে—এরকম কোনো ইসলামি বিষয় প্রচার ও প্রসার করতে চাইলে তারা তার ভয়ংকর পর্যায়ের

[১] হালাল না কিন্তু। এ ধরনের ব্যক্তি ও সংগঠনের নিকট হালাল-হারাম অপরিচিত শব্দ। তারা চেনে 'বৈধতা'।

সমালোচনা শুরু করে দেয়। দেশের প্রতিষ্ঠিত শক্তিও যেহেতু তাদের পৃষ্ঠপোষক, সেহেতু রাষ্ট্রযন্ত্রও তাদেরকেই সহায়তা করে। এই মতাদর্শের[১] ফাঁদে পড়ে বন্ধ হয়ে গেছে ইসলামিক টেলিভিশন, পিস টিভি'র মতোর চ্যানেল। এই চ্যানেল দুটির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল, নিজেদের ফিল্ডে চ্যানেল দুটি আক্ষরিক অর্থেই ছিল অদ্বিতীয়, অন্য কোনো চ্যানেল তাদের আশেপাশে ছিল না, যারা কিনা সেক্যুলার-রাষ্ট্রযন্ত্রের চাপ একসাথে সামাল দিবে। ফলে, 'যে বনে বাঘ নেই সে বনে শেয়ালই রাজা'—এই প্রবাদ বাক্য বাস্তবায়িত করে প্রতিনিয়ত নির্বিঘ্নে ইসলামের সঙ্গে সাংঘর্ষিক মতাদর্শ প্রচার করে যাচ্ছে সেক্যুলার গণমাধ্যম।

❁ মিডিয়ার পক্ষপাতিত্বের আরও কিছু উদাহরণ

দুইজন মাদ্রাসা ছাত্র সীতাকুণ্ডের চন্দ্রনাথ পাহাড়ে গিয়ে আযান দিয়ে সে ভিডিও প্রচার করায় সেক্যুলার গোষ্ঠীর গায়ে যেন আগুন লেগে যায়। এটা নিয়ে তারা শুরু করে মায়াকান্না। পরে তাদের দুজনকে করা হয় গ্রেফতার। পত্রিকায় লেখা হয়, 'তারা সীতাকুণ্ডের চন্দ্রনাথ পাহাড়ে গিয়ে ধর্মীয় উসকানিমূলক কর্মকাণ্ডের ছবি ফেসবুকে পোস্ট করেছে, তাই তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে' (নিজস্ব প্রতিবেদক, ২০২১)। সেক্যুলারিজম ধর্মীয় স্বাধীনতা দেয়—এই বেদবাক্য জপতে থাকা সেক্যুলারদের কাছে পাহাড়ে আযান দেয়া কেন 'ধর্মীয় উসকানিমূলক কর্মকাণ্ড', সেই প্রশ্নের জবাব কে দেবে? অথচ, হজের 'তালবিয়া' দিয়ে সেক্যুলার ব্যান্ডদলের সদস্যরা ঢাবি এরিয়ায় 'কনসার্ট' করে। হজের সময় লাখো মুসলিম যে 'তালবিয়া' উচ্চারণ করে আল্লাহর দরবারে উপস্থিতি জানান দেয়, সেটিকে গাঁজাখোর মদ্যপদের দল তাদের প্রিয় নেশা গান হিসেবে ব্যবহার করে (বিনোদন ডেস্ক , ২০২১)। জাহান্নামের কীটদের গাওয়া এই চরম অবমাননাকারী গানটির কিছু বাক্য হলো—

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ

মানুষ কোরবানি মাশাল্লাহ'

নিজেদের অসাম্প্রদায়িক দাবি করা দেশীয় মিডিয়া এ বিষয়ে সামান্যতম কোনো সমালোচনা করেনি। সমালোচনা তো বহু দূরের বিষয়, নিউজই করা হয়নি। আর যেসব গণমাধ্যম নিউজ পাবলিশ করে, তারা উল্টো অপরাধীদেরকে সমর্থন দেয়। এমনটি প্রায়শই দেখা যায় যে, দেশের কোথাও ইসলামের কোনো বিষয়ে কোনো মুরতাদ বা সেক্যুলার ধৃষ্টতামূলক আচরণ করলে তাদেরকে মিডিয়ায় 'ভিক্টিম' হিসেবে শো করা হয়, তাকে নেয়া হয় রাষ্ট্রীয় 'হেফাজতে'[২]।

[১] ওপরে ওপরে দেখানো হয়েছে সিকিউরিটি ইস্যু, ৯/১১-এর পর যেটি প্রবলভাবেই সেক্যুলার ওয়ার্ল্ডের মিডিয়া ফিল্টারিং প্রসেস হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

[২] আমি বলছি না, উত্তেজিত জনতার হাতে ইসলামকে কটাক্ষকারী ব্যক্তিকে ছেড়ে দিতে। কিন্তু,

আনভীর ও মুনিয়ার ঘটনার সময় মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকা ইমদাদুল হক মিলনের কালের কণ্ঠের একটি সংবাদের কথাই ধরুন। 'পূজায় নতুন জামা পেয়ে মুখে তার বিশ্বজয়ের হাসি' শিরোনামে একটি প্রতিবেদনে ছাপা ছবিতে দেখা যায়, দুর্গাপূজা উপলক্ষে বিদ্যানন্দের দশ টাকায় পূজা বাজারের আয়োজনে এক কওমি শিশু পাঞ্জাবি পেয়ে অত্যন্ত খুশি। সেই সংবাদে সাংবাদিক দাবি করে,'মাদ্রাসা-পড়ুয়া এই ছেলেটিও এসে দাঁড়িয়েছিল পূজার বাজারের সামনে। সে বুঝতে পারছিল না, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের বাজারে তার জন্য একটি পাঞ্জাবি জুটবে কি না। কারণ, ইতিমধ্যে তার মাথায় হয়তো সাম্প্রদায়িক বিষ ঢুকিয়ে দিয়েছে কেউ' (বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট, ২০২০)। বিষয়টা একবার চিন্তা করুন, কাফিরদের বাজারে মুসলিমদের পাঞ্জাবি না থাকাটা স্বাভাবিক একটা ব্যাপার। আর এরকমটা চিন্তা করাও স্বাভাবিক। গাঁয়ের বাজারের দোকানগুলোতে বা শহরে, কোথাও সচরাচর হিন্দুরা মুসলিমদের পাঞ্জাবি, আতর, মিসওয়াক বিক্রি করে না। এই স্বাভাবিক বিষয়টি জানা কিভাবে সাম্প্রদায়িক বিষ হতে পারে?

আসল বাস্তবতা হলো, দেশ ভাগের পর থেকেই দেশীয় মিডিয়া আর ভুঁইফোঁড় সুশীল সমাজ আলেম সমাজ ও কওমি মাদ্রাসাগুলোর বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে যাচ্ছে। কারণ কওমি মাদ্রাসা থেকেই দেশের আলিম সমাজ তৈরি হয়, যাদের হাতে থাকে বাংলার মুসলমানদের নেতৃত্ব আর ঈমানি ঝাণ্ডা। তাই, দেশের জনগণকে ইসলাম থেকে পরিপূর্ণ দূরে সরাতে চাইলে সবার আগে আলিম সমাজকে বিলুপ্ত কিংবা অন্তত পক্ষে কোণঠাসা করা সেক্যুলারদের অপরিহার্য কর্তব্য। কারণ, তাদের 'আগুনের উৎসের মতো' ভোগবাদী জীবনের দিকে তরুণ সমাজ যেভাবে 'পতঙ্গের মতো' ধেয়ে যাচ্ছে, আলিম সমাজ তাদেরকে সেই আগুনে ঝাঁপ দেয়া থেকে বাঁচাতে তাদের জীবন উৎসর্গ করে দেয়। বঙ্গীয় বস্তুবাদী, ভোগবাদী সেক্যুলারদের কাছে আলিমদের মৌলিক ইসলাম চর্চা তাই এক আতংকের নাম, একে তারা ব্যাঙ্গ করে বলে 'মৌলবাদী ইসলাম'। তাদের কাছে ইসলাম মানেই সাম্প্রদায়িকতা, আর পশ্চাৎপদ জীবন ব্যবস্থা, জীবনের কোনো পর্যায়ে ইসলামের কোনো নিয়ম নীতি পালন করলেও সেটা তারা করে সামাজিকতা হিসেবে, আল্লাহর বিধান হিসেবে নয়। সেজন্য গরু কুরবানি তাদের কাছে বর্বরতা, আর পৌত্তলিক উপাদানে ভরপুর আনুষ্ঠানিকতা যেমন : 'পুষ্পস্তবক অর্পণ', মোমবাতি/মশাল প্রজ্বলন, গ্রাফিতি অঙ্কন, মঙ্গল শোভাযাত্রা—ইত্যাদি তাদের কাছে অসাম্প্রদায়িকতা, সংস্কৃতি,

যারা এই ধরনের অপকর্ম করে, তাদেরকে যথোপযুক্ত শাস্তি দেয়া হয়েছে—এমন কোনো উদাহরণ এ দেশের অর্ধ-শতাব্দীর ইতিহাসে নেই, যেটি মুসলিমদের অন্তরকে প্রশান্ত করবে। অথচ দেখা যায়, অন্য অনেকের সমালোচনা করেও বহু মানুষ বাংলাদেশে গুম, খুন, নির্যাতন, জেল-জুলুমের শিকার হয়েছে। আর রাসূল (য়ীতদ্বি' য়াপ ধপিউ রিক্তত্বিব য়িদে লাগি কে-(
।র'দ্ধায়ক্তেমুি রন্মজেপ্র

পরিচয়ের প্রতীক।

কল্পিত এক অসাম্প্রদায়িকতার মুখোশ পরে সেক্যুলার 'সুশীল' আর মিডিয়া তাদের স্বার্থরক্ষায় এমন এক প্রজন্ম তৈরি করতে চায়, যারা নামে হবে মুসলিম; কিন্তু চিন্তায়-কর্মে আর মনে-মননে হবে কল্পিত 'অসাম্প্রদায়িক', অর্থাৎ হিন্দুয়ানি সংস্কৃতি আর পশ্চিমা লিবারেল কালচারের ককটেল—এমন আজব এক 'প্রাণী'। যাদের থাকবে না কোনো শেকড় আর পূর্বপুরুষদের পরিচয়। তারা না থাকবে মুসলিম, না হবে বিশুদ্ধ হিন্দু, না হবে খাঁটি পশ্চিমা। ঠিক যেমনটা সেক্যুলাররা বলে, আমাদের নাকি 'মানুষ' হতে হবে। এমন কিম্ভূতকিমাকার মানুষ, যার শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতির সকল উপাদান গৃহীত হিন্দু ধর্ম, পাশ্চাত্য সভ্যতা আর মানুষের ধারণা-কামনা-বাসনা থেকে, তবুও তাদেরকে বলতে হবে 'অসাম্প্রদায়িক'!

বঙ্গীয় মিডিয়ার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ইস্যুভিত্তিক সমালোচনাতেই আমাদের কাজ শেষ হয়ে যায় না। মিডিয়া খুবই শক্তিশালী মাধ্যম, এটা এ দেশের মুসলিমরা যত দ্রুত উপলব্ধি করবে ততই উত্তম। সংবাদমাধ্যম যে কী মারাত্মক একটি 'অস্ত্র', এটা সবসময় হয়তো সরাসর উপলব্ধি করা যায় না। কিন্তু যখনই সেক্যুলারদের সাথে ইসলামপন্থীদের কোনো দ্বন্দ্ব হয়, আর সেক্যুলাররা মুসলিমদের বিপক্ষে সেটি ব্যবহার করে, তখনই এটা আমাদের উপলব্ধি হয়, মিডিয়ার দালালির বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিবাদ চলে কিছুদিন ধরে। দুদিন পরই আমরা আবার সব ভুলে যাই। দেশের ইসলাম-বিরোধী রাষ্ট্রীয় ও সরকারি কাঠামো বিবেচনা করলে অফলাইনে মিডিয়া প্রতিষ্ঠা বেশ কষ্টসাধ্য বিষয়; কারণ দিগন্ত টিভি, পিস টিভি আর ইসলামিক টিভি'র মতো বড় তিনটি মিডিয়ার পরিণতির উদাহরণ আমাদের সামনে; যেগুলোর শেষের দুটি আবার প্রচলিত সংবাদমাধ্যমও ছিল না। তাই, এ কথা সত্য, পথ মসৃণ হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। বরং প্রতিকূল আবহাওয়ায় দীর্ঘ কণ্টকাকীর্ণ পদযাত্রার প্রস্তুতি নেওয়াই হবে বুদ্ধিদীপ্ত সিদ্ধান্ত। অনলাইনে মুসলিমদের সংবাদের চাহিদা মেটাতে এবং সেক্যুলার প্রোপাগান্ডা মেশিনগুলোকে কাউন্টার দিতে দীর্ঘমেয়াদে নিজেদের বহুমুখী মিডিয়া হাউজ প্রতিষ্ঠার প্ল্যান যদি বাস্তবায়িত কয়া যায়, তাহলে ঈমান ও কুফরের এ লড়াইয়ে মুসলিমদের বিশাল ফায়দা হবে ইনশাআল্লাহ। আমরা কি আজ এতই পথহারা হয়েছি যে, এত এত টাকা দিয়ে রাজকীয় প্রাসাদসম মসজিদ হয়, অথচ মিডিয়ার জন্য অর্থ-ব্যয় করার মতো বুঝদার-দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বিত্তশালী, উম্মাহর জন্য ফিকির করে—এমন কয়েকজন মুখলিস বান্দা কি আল্লাহর জমিনে বেঁচে নেই?

'সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প' এবং মিডিয়ার মিথ্যাচার

দেশে ধর্মীয় উত্তেজনা সৃষ্টি ও সংকটের বিষয়ে মিডিয়ার রিপোর্ট বনাম প্রকৃত বাস্তবতার ফারাক যাচাই করলে যেকোনো ব্যক্তি বিস্মিত হতে বাধ্য। বাংলাদেশে গত কয়েক বছরে, বিশেষ করে শেষ দশকে পূজামণ্ডপে বেনামি হামলা আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। তারচেয়েও কয়েকগুণ বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে ইসলামের অনেক সম্মানিত ব্যক্তিত্ব আর বিষয় নিয়ে সেক্যুলারদের নোংরা অবমাননা। যদিও বাংলাদেশের পরিস্থিতি ভারতের মতো এতটা বাজে নয়; এ দেশের মুসলিমরাও ভারতের হিন্দুদের মতো ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের কারণে-অকারণে হত্যা করবার মতো জাতিবিদ্বেষের 'সংস্কৃতি' ধারণ করে না। তারপরও দেশে কুরআন অবমাননা হয়, পরিণামে মুসলিমদের বিক্ষোভ মিছিল হয়, মিছিলে পুলিশের গুলিতে মুসলিমরা শহীদ হয়, এই ডামাডোলের ফাঁকে মন্দিরে হামলা হয়, ভাস্কর্য-মূর্তি ভাঙা হয়।

শুরুটা কে করেছে, সেটা তখন আর কেউ উচ্চারণ করে না। দিনশেষে সংবাদমাধ্যমে আমরা দেখতে পাই, তথাকথিত 'অসাম্প্রদায়িক', 'সাম্যবাদী', 'ধর্মনিরপেক্ষ', খ্রিস্টান-হিন্দু-বৌদ্ধ পরিষদ টাইপের সংগঠনগুলো, জাতির তথাকথিত বিবেক হিসেবে পরিচিত ব্যক্তিত্বরা, সর্বোপরি পুরো সেক্যুলারপাড়া সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্টের দায় চাপায় মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর। অপরপক্ষে, শহীদ মুসলিমদের ব্যাপারে মিডিয়া মুখে কুলুপ এঁটে রাখে। রাজনীতির মারপ্যাঁচ না বোঝা মুসলিমরা নিন্দা জানিয়ে বলে, 'আমি মুসলিম হিসেবে লজ্জিত', যদিও কুরআন অবমাননার সময় তাদের কোনো খোঁজ থাকে না। মোটা দাগে, এই প্যাটার্নটাই গত এক দশক ধরে দেশে চলে এসেছে, খুব দ্রুত বদলানোর কোনো সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না।

কিন্তু, এই যে এক দশক জুড়ে এত হামলা-আক্রমণ, সেগুলোর পরে করা মামলাগুলোর শতকরা পাঁচ ভাগেরও বিচার হয়েছে কি না, সন্দেহ রয়েছে। অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থা এগুলোর বিচার কেন করছে না? বর্তমান পরিস্থিতি তো এমন নয় যে, ইসলামপন্থীরা ক্ষমতায়, তাই তারা ইসলামপন্থি 'অপরাধী'দের বিচার করছে না; কিংবা এমনও আশঙ্কা নেই যে মূর্তি ভাঙার বিচার করলে মুসলিমরা গণঅভ্যুত্থান ঘটিয়ে ফেলবে। তাই, কারা এই ধরনের হামলা করছে, কাদের ইন্ধনে হামলা করছে, তাদের মোটিভ কী, সেসব বিষয়ে প্রশ্ন ওঠা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপারে। এ সকল হামলার ক্ষেত্রে দুটো সম্ভাবনা রয়েছে—

- ১. উগ্রবাদীরাই প্রধানত মূর্তি ভাঙচুর করে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে অন্যান্য দুর্বৃত্তরা এবং সাধারণ উত্তেজিতরা এই অপকর্ম করে থাকে।
- ২. (যেহেতু কোনো হামলারই বিচার হয় না, তাই ধরে নেয়া যায়) অন্য

কোনো গোষ্ঠী তাদের দলীয়/ব্যক্তিগত স্বার্থে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা করে, যাদের বিচারের মুখোমুখি করলে 'সমস্যা'র সৃষ্টি হবে। সেই সঙ্গে সাধারণ মুসলিমদেরকেও অনেক ক্ষেত্রে 'ফায়দা' লুটতে উত্তেজিত করে হামলা করানো হয়।

এই ধরনের হামলাগুলোর পিছনে প্রকৃত দায়ী কে, তার সবটা হয়তো রাষ্ট্রীয় সদিচ্ছা ব্যতীত জানা সম্ভব নয়; তথাপি, কয়েকটি সংবাদ বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে হামলার সঙ্গে বর্তমান ক্ষমতাসীন[১] দলের নেতাকর্মীদের সংশ্লিষ্টতা আছে। যেমন—

১৩ মে ২০১৪ (প্রথম আলো'র রিপোর্ট) : নওগাঁয় শ্মশানের জমি দখলে নিতে সেখানকার মন্দিরে অগ্নিসংযোগ ও মূর্তি ভাঙচুর করেন দলটির নিয়ামতপুর উপজেলার সদর ইউনিয়ন সভাপতি (আদমদীঘি-বগুড়া প্রতিনিধি, ২০১৪)।

১০ নভেম্বর ২০১৬ (ডয়চে ভেলের রিপোর্ট) : ২০১৬-এর ৬ নভেম্বর গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে রংপুর সুগার মিলের বিরোধপূর্ণ সাহেবগঞ্জ ইক্ষু খামারের জমিতে বসতি স্থাপনকারী সাঁওতালদের উচ্ছেদ করে মিল কর্তৃপক্ষ। উচ্ছেদের সময় সাঁওতালদের সাথে মিল শ্রমিক ও পুলিশের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয় তিনজন সাঁওতাল। হামলার পর সেখানকার মাদারপুর গ্রামের ক্ষতিগ্রস্ত রুমিলা কিসকু বলেন, 'আমরা গরিব মানুষ। কৃষি কাজ করে সংসার চলে। গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি শাকিল আলম বুলবুলের কথামতো বাপ-দাদার জমি ফেরত পাবার আশায় ধার-দেনা করে চালা ঘর তোলা হয়েছিল। আবার তার নেতৃত্বেই চালানো হয় উচ্ছেদ...'।

গ্রামবাসী জানায়, সাপমারা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি ও 'ইক্ষু খামার ভূমি উদ্ধার সংহতি কমিটি'র সভাপতি শাকিল আলম বুলবুলের ইন্ধনে সাঁওতালরা বাপ-দাদার জমি ফেরত পাওয়ার আশায় ওখানে চালাঘর তোলে। আবার সেই শাকিলের নেতৃত্বেই চালানো হয় উচ্ছেদ অভিযান (দে, ২০১৬)।

- **১৭ নভেম্বর ২০১৬** (বাংলা ট্রিবিউনের রিপোর্ট) : সাঁওতালদের ভূমি বেদখল নিয়ে করা এক গবেষণায় ঢাবির অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত বলেন, 'স্বাধীনতার আগে থেকেই সাঁওতালদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে। স্বাধীনতার পরও তাদের ভিটেমাটি উচ্ছেদ করা হয়েছে। তাদের এই উচ্ছেদ অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছেন ভূমি কর্মকর্তা। আর নেপথ্যে কলকাঠি নেড়েছেন রাজনৈতিক নেতারা।' (বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট, ২০১৬)।
- **১২ ডিসেম্বর ২০১৬** (ডয়চে ভেলের রিপোর্ট) : হামলার কদিন পর ফাঁস হওয়া

[১] ২০২১ সালে বইটি লেখার সময়ে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন ছিল।

ভিডিওতে দেখা যায়, সাঁওতালদের ওপর হামলার সময় পুলিশ সদস্যরা সাঁওতালদের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল (স্বপন, ২০১৬)।

- **১৮ নভেম্বর ২০১৭** (বিডিনিউজ২৪ এর রিপোর্ট) : নওগাঁয় প্রতিমা ভাঙচুরের পর বিশেষ দলটির নেতাসহ আটক ছয় (নওগাঁ প্রতিনিধি, ২০১৭)।
- **১৯ নভেম্বর ২০১৭** (ইত্তেফাকের রিপোর্ট) : একই সংবাদ ছাপা হয় ইত্তেফাকে (নওগাঁ প্রতিনিধি; আত্রাই সংবাদদাতা, ২০১৭)।
- **২৭ জানুয়ারি ২০১৯** (সমকালের রিপোর্ট) : নেত্রকোনার প্রতিমা ভাঙচুরের অভিযোগে বিশেষ দলটির নেতার ছেলে আটক (কলমাকান্দা সংবাদদাতা, ২০১৯)।
- **১৭ অক্টোবর ২০১৯** (সমকালের রিপোর্ট) : সোনারগাঁয়ে দলটির দুই পক্ষের দ্বন্দ্বে প্রতিমা ভাঙচুর (সোনারগাঁ প্রতিনিধি, ২০১৯)।
- **৪ মে ২০২০** (ডেইলি স্টারের রিপোর্ট) : চট্টগ্রামে লোহাগড়ার একদল লোক বৌদ্ধ বিহারে হামলা করে বৌদ্ধমূর্তি ভাঙচুর করেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন গ্রামবাসী জানায়, হামলার সঙ্গে চট্টগ্রাম-১৫ আসনের সংসদ সদস্যের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। তাদের মতে, ওই এমপির কর্মী দলটির স্থানীয় নেতা হেলাল ও তার অনুসারীরা এই হামলা করে। অবশ্য এমপি যথারীতি বলেন, তিনি কিছু জানেন না। এক্ষেত্রে পুলিশ সুপারও কারও বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়ার কথা বললেন না (বড়ুয়া, ২০২০)।
- **১৯ ডিসেম্বর ২০২০** (যুগান্তরের রিপোর্ট) : বাঘা যতীনের ভাস্কর্য ভাঙচুর, সেই একই দলের যুব সংগঠনের নেতাসহ গ্রেফতার ৩ জন রিমান্ডে (কুষ্টিয়া ও কুমারখালী প্রতিনিধি , ২০২০)। সেই দিনেরই আরেক রিপোর্টে দেখা যায়, এই ঘটনায় আটক ওই নেতাকে দল থেকে 'সাময়িক' বহিষ্কার করা হয়েছে (কুষ্টিয়া প্রতিনিধি, ২০২০)।
- **১৬ এপ্রিল ২০২১** (ডিবিসি নিউজের রিপোর্ট) : সাতক্ষীরাতে শ্যামনগর উপজেলায় মন্দিরের প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনায় জড়িত থাকায় সেই একই দলের নেতা আকবর পাড়কে 'সাময়িক' বহিষ্কার করা হয়েছে (সাতক্ষীরা প্রতিনিধি, ২০২০)।
- **১ নভেম্বর ২০২০** (সমকালের রিপোর্ট) : শেরপুরে প্রতিমা ভাঙচুর করে পালানোর সময় সেই একই দলের নেতার ছেলে আটক (শেরপুর প্রতিনিধি, ২০২০)।
- **২০ মার্চ ২০২১** (DW-এর রিপোর্ট) : সুনামগঞ্জের শাল্লায় হিন্দুদের গ্রামে হামলায় সেই চিরচেনা দলের যুব সংগঠনের সভাপতি শহীদুল ইসলাম স্বাধীনকে

গ্রেফতার করে পুলিশ। এর আগে সতেরো মার্চ হেফাজত নেতা মাওলানা মামুনুল হকের 'সমালোচনা' করে পোস্ট দেয়ার জের ধরে শাল্লায় ৬০-৭০টি বাড়িঘর ভাঙচুর করে 'দুর্বৃত্তরা'[১]। পুলিশ প্রথমে জানায়, 'হেফাজতে ইসলামির অনুসারীরা' এই হামলা চালিয়েছে। পরে হামলায় নেতৃত্বদানকারী হিসেবে বেরিয়ে আসে স্বাধীনের নাম (শাল্লায় হামলা, ২০২১)।

- **২৮ মার্চ ২০২১** (সময় নিউজের রিপোর্ট) : পাবনার সাঁথিয়ায় সংখ্যালঘু হিন্দু জেলে পরিবারের ওপর হামলা-ভাঙচুর ও মারধরের ঘটনায় হামলার শিকার ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, উপজেলা করমজা ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের আওয়ামীপন্থী ইউপি সদস্য মোহাম্মদ আলী মুন্সী আসন্ন সম্মেলনে জেলে সম্প্রদায়ের নেতা বিমল রাজবংশী সাধারণ সম্পাদক পদে প্রার্থী হবার ঘোষণা দেয়ার কারণে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনকে হুমকি-ধামকি দিয়ে আসছিলেন। পরবর্তীকালে শতাধিক সন্ত্রাসী হিন্দু পাড়ায় হামলা চালিয়ে ভাঙচুর ও মারপিট করে তাদেরকে দেশছাড়া করার হুমকি দিয়ে চলে যায় (পাবনা প্রতিনিধি, ২০২১)। বিমল রাজবংশী বলেন, মুন্সী মেম্বার ও তার লোকজন হামলার ঘটনা থানায় জানালে হিন্দুপাড়া জ্বালিয়ে দিয়ে সবাইকে দেশছাড়া করার হুমকি দেন। ভয়ে আমি বিষয়টি থানায় জানানোর সাহস পাইনি। এতে হিন্দুপাড়ায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে (পাবনা প্রতিনিধি, ২০২১)।
- **০৫ অক্টোবর ২০২১** (প্রথম আলোর রিপোর্ট) : কুরআন অবমাননার ঘটনার মাত্র এক সপ্তাহ পূর্বে রাজশাহীর বাগমারার গোবিন্দপাড়া ইউনিয়নের হিন্দু ভোটারদের জন্য 'মশলা' তৈরি করে রেখেছেন বলে জানান সেখানকার আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম সারওয়ার। তাদের দলের প্রার্থীকে ভোট না দিলে উচিত শিক্ষা দেয়ার ঘোষণা দেন তিনি। ২ অক্টোবর দেয়া ভাষণে তিনি বলেন, এই ইউনিয়নে হিন্দু সম্প্রদায়ের ২৮০০ ভোট রয়েছে। তাদের ভোট ওই দলের প্রার্থীদের নিশ্চিত করতে হবে। হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজাতে দলীয় নেতারা সহযোগিতা করে থাকেন। অথচ তারা ওই দলের প্রার্থীদের ভোট দেন না। এ সময় তিনি বলেন, 'যদি তারা ঠিক না হন, তাহলে এবার আমাদের মশলা আছে। তাদের উচিত শিক্ষা দেয়া হবে।' (বাগমারা প্রতিনিধি, ২০২১)।
- **১৩ অক্টোবর ২০২১** (ডেইলি স্টার'এর রিপোর্ট) : ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে মন্দিরে হামলার ঘটনায় করা মামলার অভিযোগপত্রভুক্ত তিন আসামীকে

[১] দেখা যায়, ইসলামপন্থী কোনো ব্যক্তির কোনো 'ভুল' খুঁজে পেলে তাদেরকে 'উগ্রবাদী', 'সাম্প্রদায়িক' আখ্যায়িত করা হয়। আর সেক্যুলার বা তাদের আশ্রয়দাতাদের সাথে সম্পৃক্ত কারও কোনো অপরাধ ফাঁস হলে কোনো এক অজানা কারণে সে হয়ে যায় 'দুর্বৃত্ত'।

দলটির মনোনয়ন প্রদান। সেই তিনজনকে মনোনয়ন দেয়ার ব্যাপারে দলটির নাসিরনগর উপজেলা সভাপতি ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান রাফি উদ্দীন আহমেদ দ্য ডেইলি স্টারকে বলেন, মামলার আসামীকে মনোনয়ন দিয়েছে কেন্দ্রীয় বিভাগ। এ নিয়ে তার কোনো বক্তব্য নেই (হৃদয়, ২০২১)।

- **২৩ অক্টোবর ২০২১** (প্রথম আলোর রিপোর্ট) : কুমিল্লায় কুরআন অবমাননাকে কেন্দ্র করে রংপুরের পীরগঞ্জে হিন্দুপাড়ায় অগ্নিসংযোগের ঘটনায় র‍্যাবের হাতে আটক সৈকত মণ্ডল ছাত্রলীগ নেতা। অবশ্য গ্রেফতারের পর কারমাইকেল কলেজ থেকে জানানো হয়, 'দলীয় শৃঙ্খলার পরিপন্থী কার্যকলাপের' সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে এই ঘটনার আগেই সৈকত মণ্ডলকে ছাত্রলীগ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। মজার ব্যাপার হলো, আঠারো অক্টোবর তাকে 'অব্যাহতি' দেয়া হলেও সেটি প্রচার পায় ২৩ অক্টোবর প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে (২০২১)। এছাড়াও ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১২-তে রামুতে হামলার পর এতগুলো বছর পেরিয়ে গেল। রামুর ঘটনায় জানা গিয়েছিল, বাংলাদেশের প্রধান দুটি দলের নেতাকর্মীরাই হামলার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এরপর বিচার কতটুকু হলো, কিংবা আদৌ বিচার কি হয়েছে?
- **২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮** (প্রথম আলোর রিপোর্ট) : প্রভাবশালী আসামীরা জামিন নিয়ে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাদের ভয়ে মামলার সাক্ষীরা আদালতের চৌকাঠ মাড়াতেও সাহস পাচ্ছেন না। ১৮টি মামলার মধ্যে বিচার সম্পন্ন হয়নি একটিরও (আব্দুল কুদ্দুস, ২০১৮)।
- **২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০** (বাংলা ট্রিবিউনের রিপোর্ট) : রামুর ঘটনার আট বছর পরও বিচার হয়নি একটি মামলারও (আবদুল আজিজ, ২০২০)।

ওপরে উল্লিখিত বিশটি সংবাদ ভালো করে খেয়াল করুন। হিন্দুদের ওপর হামলাগুলোর মাঝে কিছু কমন বৈশিষ্ট্য দেখতে পাবেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হামলার সঙ্গে জড়িত রাজনৈতিক দলের নেতারা, কিন্তু প্রতিবার দায় হয় মুসলিমদের। আর, যেগুলোতে সরকারদলীয় নেতাকর্মীদের সম্পৃক্ততা 'ভুলবশত' প্রকাশ হয়ে পড়ে, সেগুলোতে মিডিয়া লাগাতার কোনো ক্যাম্পেইন করে না। সচরাচর উপরিউক্ত সংবাদগুলোর অধিকাংশই (বৃহৎ হামলাগুলো ব্যতীত) হাতেগোনা একটি বা দুটি পত্রিকায় ছাপা হয়। আর বাদবাকি বড় বড় মূলধারার পত্রিকাগুলো তখন উটপাখির মতো বালিতে মাথা গুঁজে থাকে। যেন কোথাও কিছু হয়নি। অন্যদিকে, কখনো কোনো মাদ্রাসায় শিক্ষক ছাত্রদের বখাটে স্টাইলে রাখা চুল কেটে দিলেও সেটা নিয়ে সকল পত্রিকায় প্রতিদিন নিউজ আপডেট পাওয়া যায়, গ্রেফতারের দাবি জানানো হয়। এহেন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মিডিয়াকে আপনি কিভাবে 'অসাম্প্রদায়িক' বলবেন?

তবে, এখানে কিছু কথা থেকে যায়। সাধারণ জনগণের মন্দিরে হামলায় অংশ নেয়ার অভিযোগ অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। এই ধরনের হামলায় অংশ নিলে উত্তেজিত মুসলিমদের দায় এড়াবার কোনো সুযোগও নেই। তবে, এই অপরাধের জন্য ঢালাওভাবে মুসলিম দলসমূহ এবং দলগুলোর নেতৃবৃন্দকে দোষ দেবার পূর্বে ভাবা দরকার, এই হামলাগুলোতে নেতৃত্ব কারা দেয়। কারণ বিগত দিনগুলোতে আমরা হামলায় নেতৃত্ব দানকারী আর মিডিয়ায় অভিযুক্তদের মাঝে কোনো মিল দেখতে পাইনি। প্রকৃত বাস্তবতা হলো, গত এক দশকে এ দেশের প্রধান সব ইসলামি দল কিংবা গোষ্ঠীর কোনোটির বিরুদ্ধে হিন্দুদের ওপর হামলার কোনো রেকর্ড নেই; সাক্ষ্য-প্রমাণ যা আছে তা সবই সেক্যুলার দলগুলোর বিপক্ষে যায়। আর, কোথাও কোথাও সাধারণ জনগণ অনেকেই এই শ্রেণির নেতাদেরকে এই অপকর্মে অনুসরণ করে। এর প্রধান কারণ—আল্লাহর বাণীর ওপর আমল না করা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন,

> 'হে ঈমানদারগণ, যদি কোনো ফাসিক তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ নিয়ে আসে, তাহলে তোমরা তা যাচাই করে নাও। এ আশঙ্কায় যে, তোমরা অজ্ঞতাবশত কোনো কওমকে আক্রমণ করে বসবে, ফলে তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে।'[১]

এই হামলাগুলোতে যেসব ফাসিকরা নেতৃত্ব দেয়, তারা কখনো কোনো আলিমের ওয়াজ-উসকানিতে হামলা করে না। হামলাকারী দলগুলোতে বিরোধী দলের অনুসারী থাকতেই পারে, খুঁজলে ক্ষমতাসীন দলের অনুসারীও ভূরিভূরি মিলবে। হামলা যেহেতু রাজনৈতিক কারণেই হয়, আর ক্ষমতাসীন দলের পক্ষ থেকেও যেহেতু এই ধরনের হামলার পর দায়সারাভাবে বিরোধী দল ও ইসলামি গোষ্ঠীর ওপর দায় চাপিয়ে দেয়া যায়, তাই এই ধরনের ঘটনার বিচার কখনোই হতে দেখা যায় না।

যদিও প্রতিকূল পরিবেশের কারণে পরিকল্পিতভাবে বিশুদ্ধ ইসলামের প্রচার বাংলাদেশে ঠিক সম্ভব হয়ে উঠছে না; তবুও বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় সম্মানিত আলিম-উলামাদের উচিত এ ব্যাপারে সাধারণ মুসলিমদের সতর্ক করা। আজ সেক্যুলার রাষ্ট্রযন্ত্রের কাছে গোটা বাংলাদেশের মুসলিম সম্প্রদায় এতটাই কোণঠাসা যে, যখনই মন্দিরে হামলার মতো জুলুমের ব্যাপারে সতর্ক করা হয়, তখন অনেক সাধারণ মুসলিমই বিতৃষ্ণ হয়ে যায়। কারণ—রাজনৈতিক হামলার পর মিডিয়া কর্তৃক ক্রমাগত মুসলিমদের ওপর অপবাদ দেয়া এবং হামলার দায় গোটা মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর নিজেরাই টেনে নিয়ে শিক্ষিত মডারেট মুসলিমদের টিপিক্যাল 'ক্ষমাপ্রার্থনা'। যদিও আবেগের বশীভূত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সর্বদা দীর্ঘমেয়াদে কল্যাণকর হয় না।

[১] সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ৬

যাইহোক, হিন্দুদের ওপর হামলার ক্ষেত্রে আমাদের মাথায় রাখা দরকার, এ দেশীয় হিন্দুরা ভারতীয় হিন্দুদের মতো উগ্র নয়। কিছু দুষ্কৃতিকারী উভয় জাতিতেই পাওয়া যাবে, তবে মুসলিম জাতি হিসেবে আমাদের উচিত কারও ওপর জুলুম করা থেকে বিরত থাকা এবং বিচক্ষণতা ও সতর্কতার সঙ্গে বিপদসংকুল পরিস্থিতির সামাল দেয়া। সেই সঙ্গে আমাদের নিজেদেরকেও নিজের কাছে সৎ হতে হবে। আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

> 'তারা তোমাকে হারাম মাস সম্পর্কে, তাতে লড়াই করা বিষয়ে জিজ্ঞেস করে। বলো, তাতে লড়াই করা বড় পাপ; কিন্তু আল্লাহর পথে বাধা প্রদান, তাঁর সাথে কুফরি করা, মসজিদুল হারাম থেকে বাধা দেয়া এবং তার অধিবাসীদেরকে তা থেকে বের করে দেয়া আল্লাহর নিকট অধিক বড় পাপ। আর ফিতনা হত্যার চেয়েও বড়।' (সূরা বাকারাহ, ২ : ২১৭।)

বর্তমান পরিস্থিতিতে কোনো তথ্য পেয়েই যাচাই না করে হিন্দুদের ঘরবাড়ি আর মন্দির ভাঙা কোনোমতেই সমীচীন নয়। আর কেউ এ জুলুম করে থাকলেও তাদের ব্যাপারে নিঃশর্ত সহানুভূতি দেখানো আমাদের ভাবমূর্তি নষ্ট করে; জুলুমকে সমর্থনের গুনাহ তো রয়েছেই। রাজনৈতিক মারপ্যাঁচে বাংলাদেশের মুসলিম ও হিন্দু—উভয় জাতিই ক্ষমতাসীনদের জুলুমের শিকার। তাই এই সময়ে আবেগাপ্লুত হয়ে কথা ও কাজের বদলে মুসলিমদের উচিত নিজেদের করণীয় ঠাণ্ডা মাথায় ঠিক করা এবং বিজ্ঞতা বজায় রেখে কাজ করা।

দিনশেষে কী হয় দেখুন। এতগুলো হামলার ঘটনা ঘটেছে, অথচ অধিকাংশ ঘটনাগুলোই থেকে গেছে লোকচক্ষুর আড়ালে। দেশীয় মিডিয়া ঘটনাগুলোকে দেখায় 'সাম্প্রদায়িক' হামলা হিসেবে, হামলার পর দেশীয় মিডিয়ার কভারেজ অনুসরণ করলে যেকোনো ব্যক্তি ভাববে, বাংলাদেশের মৌলবাদীরাই সবসময় মন্দিরে হামলা করে; সব সমস্যার মূলে মুসলিমরাই। অথচ সাধারণ জনগোষ্ঠীকে কারা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করছে সেটা নিয়ে মিডিয়ার তেমন কোনো মাথাব্যথা নেই। আজ যেই সংবাদগুলো পত্রিকায় ছাপা হয়, বিশ-ত্রিশ বছর পর সেগুলোই হবে 'ইতিহাস', অতঃপর গতকাল যারা পাক বাহিনীর কাছে মুরগি সাপ্লাই দিত, আগামীকাল তাদের ঔরসজাত-বুদ্ধিবৃত্তিক বংশধররাই জাতির বিবেক সেজে সেসব তথ্য মুসলিমদের বিপক্ষে ব্যবহার করবে। বলা হবে, অতীতে এ দেশের সকল সাম্প্রদায়িক হামলার জন্য মৌলবাদী মুসলিমরা দায়ী ছিল। চিন্তা করুন তো, এসব কথা যারা লিখবে, সে-সকল 'বুদ্ধিজীবী'র হাতে কি আপনাদের সন্তানরা নিরাপদ, ইসলামের ওপর আঘাত এলেই যারা ঢুকে যায় গর্তে? এভাবেই কি যুগ যুগ ধরে চলবে মুসলিমদের রক্তে মিথ্যার চাষাবাদ?

মিডিয়া-ব্যক্তিত্বদের কাছে প্রশ্ন, এই ধরনের নির্যাতনমূলক হামলার ঘটনাগুলোর ব্যাপারে ভেতরের খবর পত্রিকাগুলোতে আসে না কেন? ওপরে উল্লিখিত সংবাদগুলোর অধিকাংশই শুধুমাত্র এক/দুইটি সংবাদ প্রতিষ্ঠানে প্রকাশিত হয়েছে, বাকি প্রতিষ্ঠানগুলো তখন কী করে? ভারতে মুসলিম নির্যাতন হলে দেশের মিডিয়াগুলো সচরাচর সেগুলো নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করে না, যেন মুসলিম নির্যাতন স্বাভাবিক একটা বিষয়। সাম্প্রদায়িকতা কি শুধু মুসলিমদের জন্য অবৈধ, আর রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য সাম্প্রদায়িকতা বৈধ? তারা হামলা করলে সেটা কি স্বাভাবিক হিসেবে মেনে নিতে হবে? এই ধরনের আচরণকে সাম্প্রদায়িকতা বলা যাবে না কেন? এই ঘটনাগুলো নিয়ে সুশীলরা রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করার দাবি করে না কেন? মানবাধিকার রক্ষাকারী সংগঠনগুলো ওই সময় কোথায় থাকে? এটা কোন শ্রেণির সাম্যবাদ?

মুক্তিবাহিনীদের বিজয়ে সেক্যুলার মিডিয়ার মৃগীরোগ

দীর্ঘ বিশ বছরের রক্তাক্ত সংগ্রাম, লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন, বহু নারীর ইজ্জত এবং অগণিত শিশুর শৈশব ধ্বংস করার পর ২০২১ সালে পরাজয়ের লজ্জা মাথায় নিয়ে আফগান থেকে পিছু হটতে বাধ্য হয় অ্যামেরিকা। এটি ছিল এমন এক অভূতপূর্ব ঘটনা, যা নাড়িয়ে দেয় অ্যামেরিকার আত্মবিশ্বাস আর মোড়লপনার গদিকে। গোটা বিশ্বের মুসলিমদের মাঝে এই বিজয় যেন হারানো প্রাণ ফিরিয়ে এনেছে নব উদ্যমে। তারা আবারও বিশ্বাস করতে শুরু করেছে, মুসলিম জাতি তার হারানো সম্মান পুনরুদ্ধারের পথে পা বাড়িয়েছে, যার সূচনা আফগানিস্তানের নগ্ন-পা, শতচ্ছিন্ন কাপড়ের ছাত্র ভাইদের হাত ধরে।

কিন্তু, তাদের এই অবিস্মরণীয় বিজয়ে যেখানে বিশ্বের তাবত মুসলিম উম্মাহ-র সঙ্গে সঙ্গে গোটা বাংলাদেশের মুসলিম জনপদ উল্লসিত, তখন গণতান্ত্রিক চেতনার 'কোড' মেনে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের চিন্তাকে সমর্থন না দিয়ে এ দেশের মিডিয়া শুরু করে তালিবানদের নামে মিথ্যা প্রোপাগান্ডার এক বিশাল ক্যাম্পেইন। কারণ, বাংলাদেশের মিডিয়া যে সেক্যুলার লিবারেল মতাদর্শ প্রচার করে, সেই এজেন্ডার সঙ্গে তালিবানদের বিজয়টা ঠিক যায় না। তো, তালিবানদের বিজয়ের প্রতিক্রিয়ায় 'হিস্টেরিয়া পেশেন্ট'—বাংলাদেশের মিডিয়ার 'শিরোনাম', 'তথ্য'গুলো কীরকম ছিল সেগুলোর কয়েকটি নমুনা দেখা যাক।

প্রথম আলো :

এক সময়ে সোশালিস্ট পত্রিকা চালানো মতিউর রহমানের *প্রথম আলো* যে

এখন 'লাল' আলখেল্লা বদলে রঙধনুর সপ্তবর্ণা সেক্যুলার-লিবারেল আইডিওলজি প্রোমোট করছে, এতে অবাক হবার কিছু নেই। বর্তমান জমানায় রাজনীতিতে শেষ বলে কোনো কথা নেই। তো, মুক্তিবাহিনী তালিবানদের বিজয়ে *প্রথম আলোয়* সৃষ্ট জরুরি অবস্থায় কিছু 'তথ্য' ছিল এরকম—

'হেরাত এখন "ভুতুড়ে নগরী"' শীর্ষক সংবাদের ফেইসবুক পোস্টে *প্রথম আলো* ক্যাপশন দেয়, 'তালেবান যোদ্ধারা বন্দুক নিয়ে টহল দিচ্ছেন, যা মানুষের মনে ভয়ের সৃষ্টি করছে...' (Prothom Alo, 2021)।

প্রথম আলো সম্ভবত বলতে চেয়েছে, অ্যামেরিকান দখলদাররা কিংবা আফগান রাজাকাররা গোলাপ ফুল হাতে নিয়ে টহল দিত, পথেঘাটে আফগানিস্তানের সবার মনের বাগানে ফুটে উঠত গোলাপি প্রেমের পদ্মফুল[১]। এই যদি হয় দেশের অন্যতম প্রধান পত্রিকার তথ্য বিবরণের অবস্থা, তাহলে দেশের মিডিয়ার এই ক্রান্তিকালে সামগ্রিক হাল কী ছিল, সেটা বোঝা খুব কঠিন কোনো কাজ নয়।

তাদের আরেক শিরোনাম, 'নারীদের মানুষ মনে করে না তালেবান।' (প্রথম আলো ডেস্ক, ২০২১)।

মুনিয়ার মৃত্যুতে *প্রথম আলোর* রিপোর্টের গল্প নিশ্চয়ই কেউ এত দ্রুত ভুলে যায়নি। এ দেশে 'শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানের এমডি'র ভাড়া করা ফ্ল্যাটে নারীর মৃত্যু আর এই ধরনের ঘটনা ঘটানোর অভয়ারণ্য সৃষ্টি করে দিয়েছে এই *প্রথম আলো* গংরা-ই। বিবাহ-বহির্ভূত যৌনতা প্রোমোট করা *প্রথম আলো* যখন কাশবনে নারীদের বিয়ে-বহির্ভূত শারীরিক মিলনকে সমর্থন জানাতে মন্তব্য করে, 'অশ্লীলতা কাশবনে, নাকি মনে' (বর্মন, ২০২১)। আর অন্যদিকে লিভ-টুগেদার করা কোনো নারী যখন আনভীরদের ফ্ল্যাটে মারা যায়, তখন তারা কিভাবে গিরগিটির মতো রূপ বদলায়, সেই ডাবল স্ট্যান্ডার্ড সচেতন মুসলিমদের উচিত সর্বদা মাথায় রাখা।

- আফগানিস্তানে 'ব্রিটিশ সেনাদের সঙ্গে পরিবারের সদস্যদের মতো কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অনেক টহল ও মিশনে কাজ' করা দোভাষী আফগান রাজাকার আহমেদকে (ছদ্মনাম) নিয়ে *প্রথম আলোর* আবেগাপ্লুত রিপোর্ট 'এক আফগান দোভাষীর আকুতি' (প্রথম আলো ডেস্ক, ২০২১)।

আফগানিস্তানে 'মানবিক বিপর্যয়'-এর পিছনে আহমেদের মতো বিশ্বাসঘাতকদের ভূমিকাই ছিল সবচেয়ে ন্যাক্কারজনক। যেখানে ভিনদেশীরা আক্রমণ করে তাদের ভাইদের হত্যা করছে, মা-বোনদের ধর্ষণ করেছে, সেখানে তারা সামান্য অর্থের

[১] অ্যামেরিকানরা ফুল হাতে টহল দিলেও তালেবানদের নিরাপত্তা জোরদার করা কোনো নিন্দামূলক কাজ হবে না। সদ্য স্বাধীন করা দেশে ভয়ার্ত জনগণ যথেষ্ট আতংকের মাঝে বসবাস করে। যে কোনো বিজয়ী বাহিনীর জন্যই এটা কর্তব্য, তারা দেশবাসীর মনে নিজেদের সুরক্ষার [illegible] করবে।

বিনিময়ে দেশের জনগণের শত্রুদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। এইসব বিশ্বাসঘাতকদের বেলায় প্রেম উথলে পড়ার সময় সেক্যুলারদের 'দেশপ্রেম'-এর মানদণ্ড কোথায় হারালো?

❁ যুগান্তর :

- আরেক 'অসাম্প্রদায়িক' পত্রিকা যুগান্তর নিউজ প্রকাশ করে, আফগানিস্তানের নারী ফুটবলাররা নাকি যৌনদাসী হবার আতঙ্কে রয়েছেন। দলটির গোলকিপিং কোচ উইদা জেমারাই সুইডিশ গণমাধ্যম এক্সপ্রেসেনকে জানায়, তালেবানরা নাকি মেয়েদের যৌনদাসী হিসেবে বেছে নেয় (যুগান্তর ডেস্ক, ২০২১)।

যুগান্তরের অবস্থাটা একবার ভেবে দেখুন। যেখানে তাদের পশ্চিমা প্রভুরা 'বাচ্চাবাজি'র সংস্কৃতি পুনর্জীবিত করে, আর তালেবানরা সেটি নির্মূল করতে যুদ্ধ করে; সেখানে তারা যত সব কাল্পনিক সংবাদ কোনো যাচাই-বাছাই ছাড়াই প্রচার করে বেড়ায়।

এছাড়াও তাদের আরও কিছু সংবাদ ছিল এরকম :

- 'বিয়ে পাগল তালেবানদের আতঙ্কে ঘুম হারাম বিধবাদের' (কামাল, ২০২১)।
- আরও একটি মিথ্যা সংবাদ, সরাসরি পশ্চিমা প্রভুদের থেকে কপি পেস্ট করে প্রচার করা হয়।
- যুগান্তরের আরেকটি শিরোনাম : "চাকরি-স্মার্টফোনের লোভ দেখিয়ে তরুণদের দলে টানছে তালেবান" (যুগান্তর ডেস্ক, ২০২১)। তাবত পৃথিবী জুড়ে চাকরি আর স্মার্টফোনকে অধিকার হিসেবে প্রচার করা সেক্যুলারদের কাছে হঠাৎ করেই এই দুটি বিষয় লোভ দেখানোর বস্তুতে পরিণত হয়ে গেল। সেই রিপোর্টেই আশরাফ ঘানির ভাইস প্রেসিডেন্ট আমারুল্লাহ সালেহর দাবির সূত্র ধরে তারা সরাসরি দাবি করে বসল, পঞ্জশিরে গণহত্যার চেষ্টা করছে তালেবান! অথচ তাদের কাছে এর নির্ভরযোগ্য কোনো প্রমাণ নেই, একমাত্র আমারুল্লাহ সালেহর দাবি ছাড়া। আমারুল্লাহ সালেহ পালিয়ে যাবার পর বাসা থেকে তালেবান যোদ্ধারা ৬৫ লাখ ডলার উদ্ধার করেন (News Desk, 2021)।
- তালেবানদের বিজয়ে হতাশ যুগান্তরের 'সবেধন নীলমণি', একমাত্র আশা— পঞ্জশিরে দুর্নীতিবাজ সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট আহমাদ জিয়া মাসউদের ভ্রাতুষ্পুত্র আহমেদ মাসউদকে নিয়ে যুগান্তরের 'ভরসা জাগানিয়া' রিপোর্ট, "আলেকজান্ডারের আমল থেকেই হারেনি পঞ্জশির' (হোসেন জ. , ২০২১)।
- লক্ষ লক্ষ আফগানের মৃত্যুতে যখন 'বিশ্ববিবেক' কুম্ভকর্ণের নিদ্রায় শায়িত ছিল, অ্যামেরিকার পলায়নের সময় আফগান রাজাকারদের পাততাড়ি গুটিয়ে

'সাদা প্রভু' অ্যামেরিকানদের সঙ্গে পালানোর চেষ্টা করার সময় রাজাকারদের সন্তান অ্যামেরিকান সৈন্যদের হাতে দেয়ার দৃশ্য দেখে সেটি যেন হঠাৎ করে জেগে উঠল। যুগান্তরের ভাষায়, 'তালেবানদের রাঙা তলোয়ারের ভয়ে অনেক বাবা-মা তাদের দুধের সন্তানকে মার্কিন সেনাদের হাতে তুলে দিচ্ছেন। ... যেটি বিশ্ববিবেককে নাড়া দিয়েছে' (যুগান্তর ডেস্ক, ২০২১)।

- ব্রিটিশ ট্যাবলয়েড 'সান'-এর বরাত দিয়ে যুগান্তরের আরেকটি উদ্ভট দাবি, 'তারা (তালেবানরা) পর্ণোগ্রাফির নিন্দা করার ভান করে কিন্তু আফগান পতিতালয়ের ভিডিও খুঁজে পেতে সবচেয়ে অস্পষ্ট ও গভীরভাবে লুকানো এডাল্ট সাইটগুলোতে বিশেষভাবে খোঁজাখুঁজি করছে; যাতে সেখানে কাজ করা নারীদের শনাক্ত করতে পারে এবং তাদের হত্যা বা ক্রীতদাস করতে পারে।' (অনলাইন ডেস্ক, ২০২১)।

ইসলাম যেখানে নারীকে দিয়েছে 'গৃহের রানী'র মর্যাদা, সেখানে সেক্যুলারগুলো আজ নারীদের বানিয়ে রেখেছে 'যৌনকর্মী'। তাদেরকে বানিয়ে ফেলেছে যৌনপণ্য, বিক্রয় করছে অনলাইনে, অফলাইনে। অথচ তালিবানদের ব্যাপারে তারা অবিরত দাবি করে যায়, তারা নাকি নারীদের ক্রীতদাস বানাবে। তালিবানরা নাকি অশ্লীলতার নিন্দা করার ভান করে! বঙ্গীয় সেক্যুলার দালাল মিডিয়া এমন এক ভাব করে যেন তালিবানরা সব চরিত্রহীন আর বঙ্গীয় সেক্যুলাররা সবাই ফুলের মতো পবিত্র। এই একটা প্রতিবেদনে কতগুলো মিথ্যা লুকিয়ে আছে, সেটি পর্যবেক্ষণ করলে সংবাদ-মাধ্যমগুলোর প্রোপাগান্ডা সম্পর্কে একটা বিশদ ধারণা পাওয়া সম্ভব।

- মেয়েদের পড়াতে তালেবানদের নারী শিক্ষিকা কিংবা সচ্চরিত্র পুরুষ শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্তে যুগান্তর হতাশ হয়ে মন্তব্য করে, "দীর্ঘ দু দশক পর তাদের দ্বিতীয় পর্বের শাসনেও ওই পুরনো ব্যবস্থাই ফিরে আসতে চলেছে আফগানিস্তানে" (অনলাইন ডেস্ক, ২০২১)।

এসকল সংবাদ দেখে ধারণা হয়, সচ্চরিত্রের পুরুষ না খুঁজে বাংলাদেশের শিক্ষাকাশের 'উজ্জ্বল তারকা' পরিমল জয়ধরের মতো পুরুষ খুঁজলে বঙ্গীয় সেক্যুলারদের হৃদয়-দহন হয়তো-বা কিছুটা হ্রাস পেত।

- ভারতীয় মিডিয়ার বরাতে যুগান্তর রিপোর্ট করে, তালেবান মৃত নারীদেরও ধর্ষণ করেছে বলে দাবি করেছেন আফগানিস্তান থেকে পালিয়ে আসা সাবেক আফগান নারী পুলিশ সদস্য (যুগান্তর ডেস্ক, ২০২১)।

আস্তাগফিরুল্লাহ! মিথ্যা অপবাদের-ও একটা সীমা থাকে, যা অতিক্রম করতে চরম পর্যায়ের নিকৃষ্ট অপরাধীও লজ্জা পায়। এ ধরনের সংবাদ দেখলে ধারণা হয়, বাংলার সংবাদ-মাধ্যমগুলো সে পর্যায়টা বহু আগেই পেরিয়ে এসেছে।

এ তো গেল প্রধানতম দুটি পত্রিকার সংবাদ। মুনিয়ার 'নিহত' হবার সময় গার্ডিয়ান অবস্থান করা কালের কণ্ঠ ও অন্যান্য প্রায় সকল সংবাদপ্রতিষ্ঠানগুলোর হালও মোটা দাগে এমনই ছিল। তালিবানদের ব্যাপারে যা কিছু ইতিবাচক সংবাদ আন্তর্জাতিক সংবাদে উঠে আসে, সেগুলোকে যথাসম্ভব কম প্রচার করে তারা। এর চেয়ে পরাজিত ব্রিটেন-অ্যামেরিকার সংবাদমাধ্যমের নিকৃষ্ট মিথ্যা দাবিগুলো বিনা বাক্য ব্যয়ে প্রচার করা হয়। যেমন ধরুন: প্রোপাগান্ডার এক বড় সাম্রাজ্য ভারতেরই এক শিক্ষক তমাল ভট্টাচার্য যখন আফগানিস্তান থেকে দেশে পৌঁছে তাদের দেশীয় মিডিয়ায় প্রচারিত সকল প্রোপাগান্ডা নিউজের বিপরীতে তালিবানদের ভালো দিকগুলো তুলে ধরে, এবং তালিবানদের ভূয়সী প্রশংসা করে, বাংলাদেশের কোনো নিউজ চ্যানেলে এই ঘটনার বিস্তারিত আপনারা খুঁজে পাবেন না। পরবর্তীকালে উনার মুখ থেকে তালিবানবিরোধী কিছু একটা হলেও বের করার আশায় অনেক চ্যানেলই উনার সাক্ষাৎকার নেয়, কিন্তু তাদেরকে হতাশ করে উনি যথারীতি বাস্তব চিত্রই তুলে ধরেন। হ্যাঁ, বঙ্গীয় 'অসাম্প্রদায়িক' মিডিয়া যে এসব নিকৃষ্ট কাজ করে চলেছে, এতে সন্দেহের আর কোনো অবকাশই নেই।

এখানে কিছু কথা বলে রাখা ভালো, তালিবানদের বিজয়ের অব্যবহিত পরই ধারণা করেছিলাম, এবারে সেক্যুলার ওয়ার্ল্ডে আফগান বিজয়ের বিপক্ষে একটা ম্যাসিভ প্রোপাগান্ডা ক্যাম্পেইন চালানো হবে। কারণ, এই বিজয় বর্তমান পৃথিবীর শোষণমূলক শাসনব্যবস্থার স্রোতের বিপরীতে আসা বিজয়। এই বিজয়ে অনেক হিসেব-নিকেশ পালটে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যদিও তাতে হয়তো বেশ সময় লাগবে। তাই এই বিজয়কে কলুষিত করতে না পারলেও প্রোপাগান্ডা নিউজের মাধ্যমে শরীয়া আইন আনয়নকারী ব্যক্তিদের বিপক্ষে লিবারেল-সেক্যুলার রাষ্ট্রগুলোর মিডিয়া কাদা ছুড়ে বাধা দিবে, নিন্দা জানাবে, ষড়যন্ত্র করবে—সেটা পানির মতো সহজ সমীকরণ।

কিন্তু বাংলাদেশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমের দেশ। এখানে অধিকাংশ মুসলিমই অন্য রাষ্ট্রের মুসলিমদের প্রতি সহমর্মিতা অনুভব করে। এমন একটি রাষ্ট্রের মিডিয়া যখন কাফিরদের মিথ্যা দাবিগুলো দাড়ি-কমাসহ কপি-পেস্ট করে, তখন সেটি কি 'গণতান্ত্রিক' চেতনার প্রতিফলন ঘটায়? এই ধরনের অপবাদদাতা, মিথ্যাবাদীদের জন্যই আল্লাহ তাআলা চাবুক মেরে অপমানিত করার ব্যবস্থা রেখেছেন। যাতে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট কুলাঙ্গাররা 'জাতির বিবেক' সেজে বসে ইসলামের বিপক্ষে, ইসলামপন্থীদের বিপক্ষে মিথ্যা অপবাদের গোলা ছোড়ার প্রতিযোগিতা শুরু করতে না পারে। আর এত এত তথ্য-প্রমাণ পাবার পরও দেশীয় মিডিয়ার ভণ্ডামিকে যারা আদর্শ সংবাদ হিসেবে গ্রহণ করবে, তাদের জন্য রইল 'শুভকামনা'।

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা

বর্তমানে বাংলাদেশের অধিকাংশ শিশু-কিশোরই সেক্যুলার কারিকুলামে পড়াশোনা করে. তাই এই কারিকুলামের শিক্ষার ব্যাপারে কিছু কথা বলা দরকার। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এই দেশে স্বাভাবিকভাবেই স্কুল-কলেজের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী মুসলিম। সুতরাং তাদের জন্য সঠিক ও মানসম্মত ইসলামি শিক্ষার ব্যবস্থা করা শাসকের দায়িত্ব। মুসলিম অভিভাবকদের দাবিও সেরকমই হওয়া দরকার। অল্পসংখ্যক অন্যান্য ধর্মের যে-সকল শিশুরা রয়েছে, শাসকের কর্তব্য হচ্ছে তাদের জন্যও তাদের ধর্মের সঠিক শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করা, যেন শিশুরা তাদের প্রাপ্য অধিকার লাভ করে ও সঠিক কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়। যেকোনো স্বাভাবিক মস্তিষ্কের অধিকারী ব্যক্তিই এই দাবিগুলোর সাথে একমত হবেন বলেই আশা করি।

কিন্তু স্কুল-কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের সন্তানরা কী ধরনের শিক্ষা পাচ্ছে? মুসলিম ভূখণ্ডে সম্পদ লুটতে আসা ব্রিটিশদের রেখে যাওয়া গোলাম বানানোর শত বছরের পুরনো শিক্ষাব্যবস্থার মৌলিক ভিত্তির মাঝে আদৌ কি কোনো পরিবর্তন এসেছে?

২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৫-এ T. B. Macaulay ভারতীয় উপমহাদেশের শিক্ষার ব্যাপারে তার রাখা প্রস্তাবনায় (১৮৩৫) বলেন,

> '...আমাদের ক্ষুদ্র সামর্থ্য দিয়ে (ভারতীয়) জনগণের পুরো কাঠামোকে (পাশ্চাত্য শিক্ষায়) শিক্ষিত করার চেষ্টা করা অসম্ভব। [তাই] এই মুহূর্তে আমাদের অবশ্যই এমন এক শ্রেণি গঠনে সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে, যারা আমাদের এবং আমাদের শাসন করা লক্ষ লক্ষ জনগণের মাঝে দোভাষী হিসেবে কাজ করবে—এমন এক শ্রেণির মানুষ, যারা রক্তবর্ণে ইন্ডিয়ান; কিন্তু রুচি, মন-মর্জি, নৈতিকতা এবং বুদ্ধিবৃত্তিতে হবে ইংরেজ।'

অর্থাৎ, ব্রিটিশদের প্রস্তাবিত এবং পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল—এ দেশে তাদের তৎকালীন গোলামদেরকে 'মননে ইংরেজ' হিসেবে তৈরি করা, যারা ইউরোপীয় নৈতিকতা ও মূল্যবোধ গ্রহণ করবে। আর বাকি ভারতীয়দেরকে গোলামির পাঠশালায় পাঠদানে নেতৃত্ব দান করবে। দুঃখের ব্যাপার হলো, আজ দুই শতাব্দী পর এসে তাদের এ আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন চূড়ান্ত হয়েছে। ব্রিটিশরা চলে যাওয়ার সত্তর বছর পরও ব্রিটিশদের রেখে যাওয়া শিক্ষা ব্যবস্থার কিছু পরিমার্জন, সংকোচন, পরিবর্ধন ছাড়া তেমন কোনো মৌলিক পরিবর্তন আমরা দেখতে পাইনি। ফলে ব্রিটিশদের রেখে যাওয়া 'দেহে বাঙালি, মননে ইংলিশ' শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে সাধারণ নাগরিকদের মাঝেও ছড়িয়ে যাচ্ছে পশ্চিমা মূল্যবোধ।

কিন্তু, ইসলামের বিধান, বিশ্বাস আর নৈতিকতার ধারণার সঙ্গে পশ্চিমা সভ্যতার ধারণাসমূহের একেবারে মৌলিক অনেক সাংঘর্ষিক বিষয় রয়েছে। যার ফলে পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলিমদের অন্তরে ইসলাম ও পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষ (বলা যায় ধর্ম বিরোধী)—উভয় ধরনের বিশ্বাসের মাঝখানে সৃষ্টি হয় এক গভীর সংকট[১]। আর অভ্যন্তরীণ এই সংকটের ফলাফল কয়েক ধরনের হয়ে থাকে—

- কেউ ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য অনুসন্ধান করে, অনুধাবন করে, তারপর রবের পথে করে প্রত্যাবর্তন। সে তার পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে মহান আল্লাহ ও তাঁর নাযিলকৃত বিধানের ওপর।
- কেউ কেউ ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার উপাদানের কারণে সৃষ্ট মানসিক দ্বন্দ্বে কোনটি উত্তম—সেটি নির্ধারণ করে উঠতে পারে না। তাই, সে উভয় সভ্যতাকে নিজের ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিনিয়ত আংশিক গ্রহণ-বর্জন করে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট কোনো আদর্শের ওপর সে অটল নয়।
- আর সবচেয়ে হতভাগা তারা, যারা ইসলামকে সন্দেহ করতে শুরু করে। ইসলামের বিধানগুলোকে পশ্চিমা মানদণ্ড দিয়ে বিচার করতে গিয়ে তার মনে হয়, ইসলাম সেকেলে কিংবা পশ্চিমা সভ্যতা থেকে অনুত্তম। অনেকে ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিজেদের মতো করে রদবদল করে নেয়, অনেকে পা বাড়ায় ইরতিদাদের দিকে। অস্বীকার করে বসে রবের সাথে তাদের রূহের সম্পর্ক।

মোটা দাগে, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলিমরা এই তিন শ্রেণির ভিতরেই পড়ে। অনেকেই এই শ্রেণিগুলোর মাঝামাঝি পর্যায়ে ঝুলে থাকেন, কেউ-বা জীবনের কোনো এক পথের বাঁকে এ পাশ থেকে চলে যান ওপাশে। যাই হোক, ইসলামের কষ্টিপাথর দিয়ে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার অবস্থা যদি যাচাই করি, তাহলে তার কী রকম চিত্র আমরা দেখতে পাই?

অপ্রিয়—কিন্তু সত্য—বাস্তবতা হলো, সময় যত যাচ্ছে, শিশুদের দেয়া শিক্ষার গুণগত মান ততই হ্রাস পাচ্ছে[২]। কিছুকাল পূর্বে ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দে তো অবস্থা এমন হয়েছিল, পাঠ্য পুস্তকের পাতায় পাতায় ছিল মুরতাদ আর ইসলাম-বিদ্বেষীদের জয়জয়কার (মুহাম্মদ আবদুল কাহহার, ২০১৬)। পরে হেফাজতের অভিযোগে সরকার লালনের রতি বিষয়ক কবিতা 'সময় গেলে সাধন হবে না' (আজাদুর রহমান, ২০১৪) কিংবা নারীর সন্তানধারণকে পশুর পশুত্বের সঙ্গে তুলনা করা হুমায়ুন আজাদের কুরআন-বিদ্বেষী কবিতা 'বই'-সহ বেশ কিছু গল্প-কবিতা বাদ

[১] As I've encountered earlied; maybe in Bangladesh, thousands more are fighting "battle of hearts and minds".

[২] গুণগত মান বলতে বস্তুবাদীদের মতো শুধুই বইয়ের উন্নত পাতা আর রঙিন কাগজ বোঝানো হয়নি, বরং ইসলামের মানদণ্ডে কতটুকু যোগ্যতাসম্পন্ন, তার কথা বলা হয়েছে।

দেয়া পরের বছর, ২০১৭-তে প্রথম শ্রেণির অক্ষর পরিচয়তে 'ও-তে ওড়না' কেন দেয়া হয়েছে, তা নিয়ে আবার শুরু হলো সেক্যুলারদের চিৎকার-চেঁচামেচি। তাদের অভিযোগ, 'ওড়না' শব্দটি ব্যবহারের মাধ্যমে একটি জেন্ডার বৈষম্য প্রকাশ পেয়েছে' (হোসেন আ., ২০১৭)।

বিবিসিতে 'বিশিষ্টজনেরা' মত প্রকাশ করেন, এই সমালোচনাকে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করতে হবে। অথচ, সেক্যুলারদের প্রতিনিধিদের কেউই কিন্তু হেফাজতের কিংবা মুসলিম চিন্তাবিদদের সমালোচনাকে ইতিবাচকভাবে নেয়নি। কখনো নেয়ও না। *প্রথম আলোর* মতে, 'হেফাজত পাঠ্যপুস্তক থেকে যেসব কবিতা বা গদ্য বাদ দিতে বলেছে, তা মেনে নেয়া ধর্মান্ধতা, হিন্দুবিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িকতাকে মেনে নেয়া।' তাদের মতে, হুমায়ুন আজাদের 'বই' কবিতাটি 'খুবই উৎকৃষ্ট কবিতা'। (রনো, ২০১৭)। অপর এক প্রতিবেদনে বলা হয়, '... প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পাঠ্যে 'ও' বর্ণের পরিচয়ে 'ওল' এর পরিবর্তে 'ওড়না'কে উপস্থাপন করা হলো, যা মূলত মুসলিম কিশোরীরা বয়ঃসন্ধির সময় থেকে ব্যবহার শুরু করে। কিছু বুদ্ধিজীবীর কাছে এগুলো ইসলামি মৌলবাদের দিকে সরকারের ধাবিত হওয়ার অশনি সংকেত বলে প্রতীয়মান হয়েছে।'

এরপর *প্রথম আলো* দাবি করল, '১৯৭১ সালে পাকিস্তানের কাছ থেকে স্বাধীন হয় বাংলাদেশ এবং পরবর্তী দশকগুলোতে নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে এ দেশ।[১]' কিন্তু তারা দুঃখ প্রকাশ করে বলে, 'বেশ কয়েক বছর ধরে ... বাংলাদেশের মানুষের মন থেকে ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তাভাবনা দ্রুত অপসারিত হচ্ছে[২]'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক আমেনা মোহসিন বলেন, "দেখে মনে হচ্ছে, এই ইস্যুতে ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধীদের মধ্যে দারুণ ঐক্য হয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠতার গণতন্ত্রে লোকরঞ্জনবাদের কাছে নতিস্বীকার করতে হয়" (নিউইয়র্ক টাইমস, ২০১৭)। বাঙালি সেক্যুলারদের ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ঠিক কী পর্যায়ের—ভেবে দেখুন। যখন সংখ্যাগরিষ্ঠদের কোনো সিদ্ধান্ত তাদের পক্ষে যায়, তখন গণতন্ত্রই সর্বোত্তম শাসনব্যবস্থা, আর যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণ সেক্যুলারদের স্বার্থবিরোধী কোনো মনোভাব পোষণ করে এবং সরকার তাদের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটায়, তখন তাদের ভাষায় গণতন্ত্র হয়ে যায় 'লোকরঞ্জনবাদ'।

প্রথম শ্রেণির ক্লাসে সাম্প্রদায়িকতা খুঁজে পাওয়া সুশীলরা কিন্তু 'র-তে রথ টানি' কিংবা 'ঋ-তে ঋষি ওই বসে আছে' নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করেননি (রিয়াজ, ২০১৭)। এই দ্বিমুখী স্বভাবের কারণ কী? তাদের আকাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যতের

[১] খুব(!) গণতন্ত্র চলছে দেশে।

[২] অতীব দুঃখের সংবাদ। এ উপলক্ষে শাহবাগে শোক পালনের ব্যবস্থা করা হোক (with Biriyani)

অসাম্প্রদায়িক বাচ্চারা রথটানা শিখলে ওড়না পরিধান করা শিখতে পারবে না কেন? তাছাড়া ওড়না শুধু মুসলিম কন্যারাই ব্যবহার করে না, অন্য ধর্মাবলম্বীরাও করেন। কিন্তু কোনো মুসলিম কখনো রথ টানতে যায় না। প্রথম শ্রেণির শিশুরা রথটানা শিখে কী করবে, সেটা নিয়ে সিলেক্টিভ 'অভিভাবক' আর 'বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ'রা কোনো প্রশ্ন তুললেন না, রথ-ঋষিকে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করে নিলেন।

সামগ্রিকভাবে, কোনো সচেতন মুসলিম ব্যক্তি যদি প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক শ্রেণির বইগুলো পর্যবেক্ষণ করে, তাহলে তিনি বেশ কিছু অসঙ্গতি দেখতে পাবেন—

- ইসলামের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বাচ্চাদেরকে শেখানো হয় বটে, তবে অনেক মৌলিক ও অত্যাবশ্যকীয় বিষয়াবলি বাদ থেকে যায়।
- অনেক সামাজিক বিষয়ের ব্যাখ্যা তো বটেই, গুরুত্বপূর্ণ কিছু ইসলামি বিষয়ের বর্ণনাও ইসলামের 'বিশুদ্ধ' শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক।
- যেসব বিষয়ে ইসলামের প্রকৃত বিধান লুকানো হয়, সেগুলোর অনেকগুলোকেই আবার অন্য কোনো পাঠ্যবইতে বা পাতায় উপস্থাপিত তথ্য খারিজ করে দেয়।
- অনেক বিষয়ে পাঠ্যপুস্তকে যে শিক্ষা দেয়া হয়, দেখা যায় সমাজে সেসব শিক্ষা প্রয়োগ করার চেষ্টা করলে আবার সেই বঙ্গীয় মিডিয়া আর প্রতিষ্ঠিত শক্তিই প্রয়োগকারীদের বিপক্ষে ওঠেপড়ে লাগে। কোটা-বিরোধী আন্দোলন, নিরাপদ সড়ক আন্দোলনে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর সন্ত্রাসীদের হামলা এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

২০১৪ খ্রিষ্টাব্দের শুরুতে দেশের সরকার অনুমোদিত দশ হাজার আলিয়া মাদ্রাসায় অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সরকার প্রণীত পাঠ্যবই পড়ানো অত্যাবশ্যক করা হয়। আশা করা হয়, এতে করে শিশু-কিশোরেরা 'রক্ষণশীল' পটভূমি থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে[১] (নিউইয়র্ক টাইমস, ২০১৭)। আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদেরকে সরকারি সিলেবাসে ঠিক কী শেখানো হচ্ছে, আর রক্ষণশীল পটভূমি থেকে বেরিয়ে ছোট ছোট কোমলমতি শিক্ষার্থীরা যে দাদাদের কোন 'উদার' সাগরে ভেসে বেড়ানো শিখছে, তা জানতে তাদের পাঠ্যসূচীর বিভিন্ন শ্রেণির বই পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে দেখা যায়—

❁ ক্লাস ফোর :

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় এই বইটিতে নারী-পুরুষের বৈশিষ্ট্য শেখাতে গিয়ে বলা হয়, *'নারী ও পুরুষ উভয়ের সব ধরনের কাজ করার যোগ্যতা রয়েছে।... নারী*

[১] হাজার বছরের বিয়ের রক্ষণশীল সংস্কৃতি ভেঙে ছেলেরা সবাই আনভীরের মতো 'উদার' হবে, 'যৌনদাসী' রাখবে। মৌলবাদীদের ন্যায় বিয়ের মতো রক্ষণশীল সংস্কৃতির প্রয়োগ করতে চাইলে তাদেরকে 'দমন' করা হবে।

ও পুরুষের মাঝে কোনো বৈষম্য করা উচিত নয়' (নাসরীন et al., বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় ইবতেদায়ি চতুর্থ শ্রেণি, ২০২০, পৃ. ০৬)। নারী, পুরুষ উভয়ের সব ধরনের কাজ করার যোগ্যতা থাকলে সন্তান গর্ভধারণ রাষ্ট্রীয়ভাবে পুরুষদের দায়িত্ব ঘোষণা করা হোক। বাস্তবতা তো এটাই যে, আল্লাহ মানুষকে যেভাবে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের সুবিধামতো সেভাবেই তাদের কর্তব্য নির্ধারণ করেছেন। কোনো কলাবিজ্ঞানী যদি হুট করে বলে নারী-পুরুষ উভয়ের যোগ্যতা (শারীরিক, মানসিক) সমান, তাদের উচিত তাদের এ দাবির প্রমাণ উপস্থাপন করা।

তারা দাবি করে নারী পুরুষ সমান, অথচ নারীদের জন্য আলাদা কোটার ব্যবস্থা করে রাখে। সকলের জন্য সমানাধিকার থাকলে তো কোটা থাকার কথা নয়, যে যোগ্য সে-ই যোগ্যতর পদে অধিষ্ঠিত হবার অধিকার রাখে। ধরে নিলাম, সেক্যুলারদের বিশ্বাস অনুযায়ী, নারী-পুরুষ সমান সুযোগের অধিকার দেয়া যেতেই পারে। কিন্তু উভয়ের জন্য সমান ফলাফলের অধিকার আগে থেকে নির্ধারণ করে রাখাটা কি লিঙ্গবৈষম্য নয়?[১] সমান সুযোগ কখনোই সমান ফলাফলের নিশ্চয়তা দেয় না, আইন করে সেটা জোরপূর্বক প্রয়োগ সুস্পষ্টরূপে যোগ্যদের প্রতি জুলুম। আবার, একদিকে অবাধ যৌনতার সমর্থনে আইন করে রাখা হয়েছে। অপরদিকে বহু বছর ধরে নারীদের জন্য 'বিয়ের প্রলোভনে ধর্ষণ'-এর মতো উদ্ভট মামলার সুব্যবস্থা রাখা ছিল[২]। পুরুষদের বাদ দিয়ে নারীদের জন্য আলাদা 'নারী ও শিশু নির্যাতন আইন' করা হয়েছে কেন? এই প্রশ্নের উত্তর কে দিবে?

প্রকৃত বাস্তবতা হলো, আল্লাহ নারী ও পুরুষের মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য রেখেছেন। এই সাইন্সকে অস্বীকার করা কূপমণ্ডূক কলা-বিজ্ঞানীরা যতই বলুক নারীর সবকিছু করার যোগ্যতা রয়েছে, তাদের সেই দাবি তারা নিজেরাই বিশ্বাস করে না। আধুনিক বিজ্ঞান সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা আছে, এমন ব্যক্তি কখনোই দাবি করবে না—নারী-পুরুষের ফিজিওলজি, সাইকোলজি, কাজ করার সক্ষমতা এক ও অভিন্ন। অথচ, নারী পুরুষ সমান দাবি করা 'প্রথম বিশ্বে'র দেশগুলোর নিরাপত্তা বাহিনীতেই দেদারসে নারী নির্যাতন চলছে। অন্যদিকে, এ দেশীয় সেক্যুলাররা আজ নিজেদের ইচ্ছামতো আইন করে নারীদের অন্যায্য সুযোগ সুবিধা দিয়ে যাচ্ছে। কিছু নারী সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে বিনা অপরাধে পুরুষদের জেল-জরিমানা করাচ্ছে[৩]। আর এইসব

---

[১] ধরুন, কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে আগে থেকেই নারীদের জন্য পঞ্চাশ শতাংশ কোটা বরাদ্দ। নারী-পুরুষ সকলেই সেখানে ভর্তির জন্য প্রয়োজনীয় গাইডলাইন পেল। ভর্তি পরীক্ষার পর দেখা গেল, সর্বশেষ মেয়েটি যে মার্ক পেয়ে সেখানে চান্স পেল, তার চেয়ে অনেক বেশি মার্ক পেয়েও অনেক ছেলে সেখানে ভর্তি হবার সুযোগ পেল না। এটাকে কী বলবেন? সমান অধিকার না কি লিঙ্গ-বৈষম্য?

[২] বর্তমানে এ ধরনের মামলার বিপক্ষে রায় হয়েছে।

[৩] নারী নির্যাতন মামলার ৮০ শতাংশই মিথ্যা: আইনমন্ত্রী, প্রথম আলো বিশেষ প্রতিনিধি (২২ জুন

ঘটনায় দিনদিন বিয়ের প্রতি নতুন প্রজন্মের বিতৃষ্ণা জন্ম নিচ্ছে। একে অপরের পরিপূরক হবার বদলে নারীবাদীদের আবিষ্কৃত প্রতিযোগিতার ফাঁদে পড়ছে নারীরা, সহযোগী হবার বদলে তারা স্বামীকে ভাবছে প্রতিদ্বন্দ্বী। আর উভয় জাতির মনেই সৃষ্টি হচ্ছে প্রচণ্ড পুরুষ আর নারী-বিদ্বেষ, যার দায় লিবারেল-সেক্যুলার, কর্পোরেট সোসাইটির 'টিস্যু' ফেমিনিস্ট আর এই তথাকথিত শিক্ষাবিদদের।

পরমতসহিষ্ণুতার ব্যাপারে বলা হয়েছে, *'যেকোনো বিষয়ে বিভিন্নজনের বিভিন্ন মত থাকতে পারে। তবে অধিকাংশ মানুষ যে মতটি সঠিক মনে করে সেটিই গ্রহণ করা উচিত। এই প্রক্রিয়াকে গণতন্ত্র বলা হয়'* (নাসরীন et al., ২০২০, পৃ. ২৮)। আজ আমরা নতুন একটা বিষয় শিখতে পারলাম—সত্য হলো গণতান্ত্রিক। যেকোনো বিষয়ে অধিকাংশের মতকেই সঠিক হিসেবে গ্রহণ করা উচিত? অধিকাংশের মত যে সঠিক হবে, তার ভিত্তি কী? এমনও তো হতে পারে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অধিকাংশের জ্ঞানই নেই। ইরাক যুদ্ধের সময় যেই বিষয়টি স্বচ্ছ জলের মতো প্রমাণিত হয়ে গেছে। কিংবা ধরুন, ভারতের নাগরিকরা গণভোটে কিংবা অধিকাংশ জনপ্রতিনিধি কাশ্মীরে নির্যাতন চালানোর পক্ষে মত দিলেই সেটি সঠিক হয়ে যাবে? গণতন্ত্র আর সংখ্যাগরিষ্ঠতা আবার সত্য-মিথ্যা আর নৈতিকতার মানদণ্ড হলো কবে থেকে?

ইসলামি খিলাফত আর গণতন্ত্র—উভয়ের মাঝে মৌলিক পার্থক্যও রয়েছে। উভয়েই আলাদা স্বতন্ত্র দুটি শাসন পদ্ধতি। ইসলামি খিলাফত সিস্টেমে রাজ্যের সকল প্রজার ভোটে শাসক নির্বাচিত হয় না, হয় মুসলিম সমাজের মুত্তাকী, বিশ্বস্ত, জ্ঞানী ও বিচক্ষণদের পরামর্শের ভিত্তিতে। গণতান্ত্রিক সিস্টেমে বুদ্ধিমান ও নির্বোধ উভয়কে একই পাল্লায় মাপা হয়। যে সিদ্ধান্ত ইতিপূর্বে বহুবার ভুল প্রমাণিত হয়েছে, ভবিষ্যতেও হবে। ইরাক যুদ্ধ আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বতন দায়িত্বে থাকা গোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থে জনমত বদলাতে সক্ষম। তাছাড়া গণতন্ত্র নির্ভর করে মনুষ্যসৃষ্ট সেক্যুলার আইনের ওপর, আর খিলাফত নির্ভর করে আল্লাহপ্রদত্ত আইনের ওপর। সেক্যুলার আইনের ওপর আল্লাহর আইন নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। আজ অর্থের অসীম প্রবাহ সত্ত্বেও পশ্চিমা সমাজে হতাশা বৃদ্ধি, সুইসাইড মহামারি, বিয়ে ও পরিবার ব্যবস্থার ভাঙন তার উজ্জ্বল প্রমাণ। তাই, ইসলামি খিলাফত এক্ষেত্রে গণতন্ত্র থেকে অধিক নির্ভুল হবার দাবি রাখে।

তাছাড়া খিলাফত ব্যবস্থায় রাষ্ট্র পরিচালিত হয় কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াসের ভিত্তিতে। আধুনিক সেক্যুলার গণতান্ত্রিক শাসনে এরকম কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। ইসলামি খিলাফতে প্রতিটি ধর্মের অধিকার তাদের ধর্মমতে নিশ্চিত করা হয়।

২০১৩),

নারী নির্যাতন মামলার অধিকাংশই বানোয়াট, যুগান্তর ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

ছুয়া যৌতুকের মামলার শিকার সিংহভাগ পুরুষ, ডিবিসি নিউজ ৯ই সেপ্টেম্বর, ২০২০

অপরদিকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় মানুষের মনগড়া আইন বানিয়ে সকল ধর্মের নাগরিককে সেই একই আইনে মাপা হয়। আল্লাহর আইনের ওপর প্রাধান্য দেয়া হয় মানুষের ভুলেভরা বোধশক্তিকে—যেটি সুস্পষ্ট জুলুম।

অনেকেই অধুনালব্ধ মনুষ্যসৃষ্ট আইনের ওপর আল্লাহর আইনের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি ঠিক অনুধাবন করে উঠতে পারেন না। অনেকেই দেখা যায়, নিজেকে মুসলিম দাবি করেন, কিন্তু সেক্যুলার আইনের ওপর তার অগাধ আস্থা। অথচ একটা সহজ প্রশ্ন দিয়েই এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। আল্লাহ তাআলা কুরআনকে শুধু ষষ্ঠ শতাব্দীর জন্য প্রেরণ করেননি; বরং কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের জন্যই ইসলামকে মনোনীত করেছেন। তাই বর্তমান সময়ে কেউ যদি মনে করেন, খিলাফত-শারীয়া চৌদ্দ শ বছর আগে এসেছিল, এখন সেগুলো পুরোনো হয়ে গিয়েছে, তাই আমাদের নিজেদের বিচার-বুদ্ধিকেই অধিক প্রাধান্য দেয়া দরকার; তাহলে তার এই চিন্তার মানে দাঁড়ায়—আল্লাহ কুরআন নাযিলের সময় বর্তমান সময়ের কথা চিন্তা করেননি; কিংবা আল্লাহর জীবনব্যবস্থার চাইতে কাফিরদের মস্তিষ্কপ্রসূত জীবনব্যবস্থা উন্নত।

নাউযুবিল্লাহ! এরকমটি কি কখনো হতে পারে? আল্লাহ কি পূর্বাপর সকল মানুষের অধিকার কোন শাসন-ব্যবস্থায় সর্বোত্তমভাবে নিশ্চিত হবে সেটি জানেন না? এই পৃথিবীর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন থেকে অনন্ত মহাকাশ যে মহান রব সৃষ্টি করেছেন, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নিয়মে সবকিছু সূক্ষ্মভাবে নিয়ন্ত্রণ করছেন, পরিচালনা করছেন, তিনি এই ছোট্ট পৃথিবীতে থাকা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিছু মানুষের তৈরি আইন থেকে উত্তম আইন প্রণয়নে সক্ষম নন, এই ধরনের চিন্তা আল্লাহর প্রতি কুধারণা। যিনি এই সমগ্র জাহানের স্রষ্টা, নিয়ন্ত্রক—একজন মুসলিমের পক্ষে তাঁর বিধানগুলো থেকে কাফিরদের সৃষ্ট বিধানসমূহকে উত্তম ভাবা কিভাবে সম্ভব? এই শ্রেণির চিন্তা আল্লাহর প্রতি বেইনসাফি। আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে আমাদের প্রকৃত ধারণা না থাকায় আমরা এই ধরনের বিদ্রোহী চিন্তায় পতিত হই। আর এই শ্রেণির চিন্তা-ভাবনা থেকেই হয় ধর্মত্যাগের সূচনা। আল্লাহ আমাদের সকল প্রকার কুফরি চিন্তাভাবনা থেকে রক্ষা করুন।

বইটিতে পরবর্তীকালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমানোর পদ্ধতিতে বলা হয়, *'জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমানোর ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। মেয়েদের যথাযথ শিক্ষা থাকলে তারা পরিবারের জন্য অর্থ উপার্জনের কাজ করতেন'* (নাসরীন et al., পৃ. ৬৮)।

শিক্ষা কাকে বলে? শিক্ষার উদ্দেশ্য কি অর্থ উপার্জন, নাকি প্রকৃত ধার্মিক মানুষ হওয়া—যা ব্যক্তিকে সত্য-মিথ্যা যাচাই করার যোগ্য করে তুলবে এবং নিজের ও জনগণের কল্যাণে কাজ করতে সক্ষম করে তুলবে? হ্যাঁ, অর্থ উপার্জন বেশ জরুরি

বিষয়, একটি পরিবার পরিচালনা করতে আয়ের বৈধ উৎস থাকা প্রয়োজন। তাই বলে কি নারীদেরও অর্থ উপার্জন করতে হবে? যেসকল নারীরা অর্থ উপার্জন করে না, তারা কি অশিক্ষিত? এটা কি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ নারীদের জন্য ফরয করে দিয়েছেন? ইসলামের ভিত্তিতে প্রকৃত শিক্ষা কাকে বলে? পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ চার নারী হলেন মারইয়া, আসিয়া, খাদীজা, ফাতিমা। তাঁদের কে অর্থ উপার্জন করতেন?[১] সালফে সালেহীনদের কয়জন নারী শারীয়া পূর্ণতা পাবার পর অর্থ উপার্জন করেছেন? একজন ব্যক্তি কতটুকু 'শিক্ষিত' সেটি নির্ণয়ের মানদণ্ড কি অর্থের পরিমাণ? এই মানদণ্ড কে নির্ধারণ করেছে? এত সব প্রশ্নের উত্তর কি কোনো প্রগতিশীল 'ফেমিনিস্ট' আমাদেরকে দিবে, নাকি সমাধান পাব ইসলামে?

'আমাদের সংস্কৃতি' শীর্ষক অধ্যায়ে বলা হয়েছে, শাড়ি বাংলাদেশের মেয়েদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক (নাসরীন et al., ২০২০a, p. ৮০)। কিন্তু, হাস্যকর বিষয় হলো, বোরকার কোনো উল্লেখই সেখানে নেই। অথচ বাংলাদেশের অতীত ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, বোরকা এ দেশের নারীদের পোশাক হিসেবে বহু শতাব্দী ধরে প্রচলিত, যার ব্যাপারে কোনো সংশয় নেই। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ শোষকশ্রেণির তাঁবেদার দেশীয় কিছু গোলামরা বর্গীদের কালচার বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করে এ দেশে পশ্চিমা নগ্ন-অর্ধ নগ্ন সংস্কৃতির গোড়াপত্তন করে।

❁ ক্লাস ফাইভ :

আমার বাংলা বই প্রথম অধ্যায়েই ঘোষণা করা হয়েছে, *'ধর্ম যার যার, উৎসব যেন সবার'* (মাসুদ et al., ২০২০)। অথচ আল্লাহ তাআলা কাফিরদেরকে এ কথা স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতে আদেশ করেছেন যে,

> 'তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন আর আমার জন্য আমার দ্বীন।' (সূরা কাফিরুন, ১০৯ : ০৬)

ব্যাঙের ছাতার মতো হঠাৎ গজিয়ে উঠা 'জাতীয় উৎসব' মঙ্গল (!) শোভাযাত্রায় পেঁচাসহ[২] অন্যান্য মূর্তি নিয়ে পালন করা প্রথাগুলোর উৎস কোথায়? মূর্তি নিয়ে মিছিল করে কার কাছে অশুভের বিনাশ, মঙ্গল কামনা[৩] করা হয়? পেঁচার কাছে, না কি অন্য কোনো মূর্তির কাছে? অথচ মুসলিমরা একমাত্র আল্লাহর কাছে কল্যাণ

[১] কিছু অপরিপক্ক ব্যক্তি কুরআন নাযিলের পূর্বে খাদীজা রাঃ-এর ব্যবসায় অর্থলগ্নির উদাহরণটি সামনে নিয়ে আসে, যেটি সম্পূর্ণ হাস্যকর দাবি। যদিও মডারেট আর সিওডো-সেক্যুলারদের সুবোধন নীলমণি এই তথ্যটি তারা বারবার ঘোষণা করতে খুবই ভালোবাসে।

[২] হিন্দুদের দেবী লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা।

[৩] মূর্তির মিছিলে অশুভের বিনাশ, মঙ্গল কামনা করার কথা তারা নিজেরাই স্বীকার করে, এটি কোনো কন্সপিরেসি থিওরি না। "বর্ণিল উচ্ছ্বাসে বর্ষবরণ: সব অশুভ অকল্যাণ দূর করার প্রত্যয়" সমকাল প্রতিবেদক (১৬ এপ্রিল ১৬)

কামনা করে; কোনো গাইরুল্লাহর কাছে নয়। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে মুয়াজ্জিন আমাদেরকে 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলে আহ্বান করেন প্রকৃত কল্যাণের পথে। মুসলিমদের কল্যাণ তো কেবল ইসলামেই। আল্লাহ ছাড়া কল্যাণ দানের ক্ষমতা আর কার রয়েছে? এইসব শিরকি উৎসবে মুসলিম শিশুদের উৎসাহিত করার পিছনে 'ফায়দা' কার?

দুই শতাব্দী ধরে ভারতীয় সম্পদ লুট করার সুবিধার্থে সড়ক ও রেলপথের যে উন্নয়ন করেছিল ব্রিটিশরা, *বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়* গ্রন্থে এখন সেটার ভালো দিক পড়ানো হয় (নাসরীন et al., পৃ. ১৬)। দুইশত বছর দাস হিসেবে খাটিয়ে ব্রিটিশরা তো চলেই গেছে, কিন্তু গোলামির শেকল এখনো অনেকে গলা থেকে খুলতে পারেনি। তাছাড়া, হিন্দুরা ব্রিটিশদের অধীনে জমিদার হয়ে মুসলিম প্রজাদের যে অকথ্য নির্যাতন করত, পূর্বের বইগুলোতে থাকা সেই তথ্যটিও বর্তমানে সব বই থেকে গায়েব হয়ে গেছে।

❁ ক্লাস সিক্স :

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বইটিতে সংস্কৃতির সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, *'সংস্কৃতি বা Culture যেকোনো শব্দেই তার পরিচয় করিয়ে দেওয়া হোক না কেন, সংস্কৃতি আসলে মানুষের জীবনধারা। ... মানুষ তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য, সমাজজীবনে কোনো উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে যা কিছু চিন্তা ও কর্ম করে তা-ই তার সংস্কৃতি।'* (পাটোয়ারী et al., ২০২০, পৃ. ৪৮)।

'বাঙালি সংস্কৃতির বৈচিত্র্যের মধ্যে যে সুরটি প্রধান, সেটিকে বলা হয় মানবতাবাদ। অর্থাৎ, মানুষের জন্য ভালোবাসা, মানুষে মানুষে সম্প্রীতি। এসব কথার প্রতিফলন আমরা পাই লালন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের গানে।' (পৃ. ৫০)।

পরবর্তীকালে বলা হয়েছে, *'সুতরাং প্রতিনিয়ত অন্য সংস্কৃতির উপাদান গ্রহণ, বর্জন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের মাধ্যমে আমরা আমাদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে চর্চা করব এবং পরিবর্তনের মাধ্যমে আমাদের সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যাব'* (p. ৫২) এ দেশে প্রায়শই দেখা যায়, বোরকা-নিকাবের মতো ইসলামের বিধানকে সেক্যুলাররা 'আরবীয় সংস্কৃতি' বলে অবজ্ঞা করেন এবং সেগুলোকে আগেকার ব্রাহ্মণ-হিন্দুদের মতো 'অচ্ছুৎ' হিসেবে গণ্য করেন। তাহলে, গ্রহণীয় 'অন্য সংস্কৃতি' কি শুধুই পাশ্চাত্য সংস্কৃতি, আর ইসলামের সংস্কৃতি গ্রহণ করা অপছন্দনীয়?

এছাড়াও আফগানিস্তানের শাসকরা বোরকাকে বাধ্যতামূলক করলে বাঙালি সেক্যুলার লিবারেলরা 'সংস্কৃতি গেল' বলে হায় হায় রব তোলেন। তাহলে, পশ্চিমা উপনিবেশীয় আমলে পশ্চিমারা এবং পরবর্তীকালে তাদের তাঁবেদার সেক্যুলার শাসকরা যে পশ্চিমা সংস্কৃতিকে মুসলিম জনগণের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল—যার

সবচেয়ে বড় উদাহরণ তুরস্ক—তাদের ক্ষেত্রে সেক্যুলাররা পশ্চিমা ও পশ্চিমা গুণমুগ্ধ শাসকদের চাপিয়ে দেয়া সংস্কৃতিকে পূর্বের রূপে (ইসলামি শাসনামলে যেমনটি ছিল) ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার দাবি তোলে না কেন?

বাংলাদেশের আপামর নারীজাতি কখনোই নৃত্য কিংবা সংগীতের প্রতি অনুরক্ত ছিল না। ব্রিটিশরা আসার পূর্বে এ ধরনের কাজে যুক্ত ছিল নটী-বাইজীরা, সমাজ যাদেরকে দেখত ঘৃণার চোখে। বাঙালি সংস্কৃতির মূলধারার সঙ্গে এই সকল বিষয় কখনোই সংযুক্ত ছিল না। এই কাজগুলো নাটকীয় গতি পায় পাকিস্তানী শাসনামলে, ভেঙে দ্বিখণ্ডিত হওয়া যে সাবেক রাষ্ট্রকে আজ সেক্যুলাররা 'ইসলামি রাষ্ট্র' বলে দাবি করে। তাহলে, আজ কেন নর্তক-নর্তকী আর নট-নটীদের কাজকে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বলা হয়? অপরদিকে, বঙ্গভূমিতে অল্প বয়সে বিয়ের ইতিহাস হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসছে। তাহলে অল্প বয়সে বিয়েকে আজ কেন সংস্কৃতি বলা হয় না? এই ভূখণ্ডের হাজার বছরের ইতিহাসে তো কখনো বিবাহ বহির্ভূত শারীরিক সম্পর্কের প্রচলন ছিল না, তাহলে আজ কেন 'লিভ টুগেদার'কে বৈধ করা হয়েছে? লিভ টুগেদার বৈধ আর পছন্দনীয় হলে আমাদের প্রশ্ন, কোনটি সংস্কৃতি আর কোনটি অপ-সংস্কৃতি, এটার মানদণ্ড কী? এই মানদণ্ডগুলো কে বা কারা নির্ণয় করবে? গুটিকয়েক সেক্যুলারের কলকাতামুখী 'চেতনাই' যদি সবকিছুর মানদণ্ড হয়, তাহলে 'হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি' বলে চমকপ্রদ হাতসাফাই করার দরকার কী?

ব্রিটিশদের আগমনের পর ব্রিটিশ শিক্ষায় শিক্ষিত কিছু দেশীয় 'চামড়ায় বাদামী' আর মননে ব্রিটিশ, মানে এ দেশীয় দালালদের উত্তরসূরিরা গত শতাব্দী থেকেই ধর্মনিরপেক্ষ আর প্রগতিশীল সংস্কৃতির নামে মুসলিম বাঙ্গালীদের সংস্কৃতিতে পৌরাণিক ও পৌত্তলিক সংস্কৃতি এবং পশ্চিমা সংস্কৃতি চাপিয়ে দেয়ার, অনুপ্রবেশ করানোর নিরন্তর প্রচেষ্টা করে যাচ্ছে। আজকের মুসলিম তরুণসমাজকে সেই অপসংস্কৃতির ভয়াল থাবা থেকে রক্ষা করতে চাইলে আবারও সমৃদ্ধ করতে হবে ইসলামি সংস্কৃতি। ইসলামে অনুমোদিত সংস্কৃতির তুমুল প্রচার ও প্রসার করে পৌঁছে দিতে হবে প্রতিটি মুসলিম পরিবারে। ভুল হবে, সংশোধন চলবে—কিন্তু থেমে থাকা যাবে না। তরুণদের অনুধাবন করাতে হবে, বাঙালিয়ানা আমাদের সম্পত্তি, আমরাই বাঙালি। ব্রিটিশ আমলে বিষফোঁড়ার মতো আবির্ভাব ঘটা হিন্দু জমিদারেরা শত বছর আমাদের পূর্বপুরুষদের শোষণ করেছে। ব্রিটিশদের পতনের পর তাদের সেই শোষণব্যবস্থা এখন নেই বটে, তবে সেই জমিদারদের প্রেতাত্মা এখনো বাংলার বুকে ঘুরে বেড়ায়। তাদের উত্তরসূরিরা এখনো এ দেশকে নিজেদের জমিদারী মনে করে। তারা ভাবে, তারা যে কলকাতার সংস্কৃতি পালন করে, তাই সেরা আর অদ্বিতীয়। বাদবাকি 'অচ্ছুৎ' মুসলিমরা যদি সে সংস্কৃতি মানতে পারে, তাহলেই তারা 'জাতে' উঠতে পারবে।

আমাদের কাজ, তাদের এই জমিদারী চিন্তার মূলে কুঠারাঘাত করা। আমরা যেমন বখতিয়ার খলজির উত্তরসূরি, তেমনি এই মাটির আদি বাসিন্দাও আমরাই, ব্রিটিশদের গোলামি করা জমিদাররা নয়; তারাই আসল শেকড় কাঁটা, অত্যাচারী ব্রিটিশদের তাঁবেদারি করে এ মাটিকে তারা নিজেদের দাবি করার অধিকার হারিয়েছে। তাই, অযথা কলকাতার অনুসারী বাঙালি 'সাজতে' গিয়ে মূর্তি নিয়ে পৌত্তলিকদের মতো রাজহাঁস, প্যাঁচার কাছে অশুভের বিনাশ কামনা করলে ঈমান ভঙ্গ হয়ে মুশরিক হওয়ার কোনো প্রয়োজন আমাদের নেই। পথভ্রষ্ট মুসলিম তরুণ সমাজ ইসলামের আহ্বানে ফিরে আসতে চাইলে তারা যেন কোনো আইডেন্টিটি ক্রাইসিসে না ভোগে, তাকে সেই আত্মবিশ্বাস দেওয়ার মতো প্রয়োজনীয় উপাদান জোগান দেওয়ার দায়িত্ব আমাদেরই। আজ না হোক, কালকের দিনটি যেন আমাদের হয়, আমাদের উত্তরাধিকারীদের হয়। সেই সুন্দর সোনালি সমাজ প্রস্তুত করার লক্ষ্যে মুসলিমদেরই অবিরত কাজ করে যেতে হবে।

'বাংলাদেশে শিশু অধিকার' শীর্ষক অধ্যায়ে বলা হয়েছে, 'শিশুরা ছোট বলে তার গায়ে শক্তি কম। একই কারণে তার জ্ঞানও কম। কিন্তু ... তার ওপর কোনো ব্যাপারে জোর খাটানো চলবে না। শিশুও কতগুলো ব্যাপারে স্বাধীনতা ভোগের অধিকারী।' সেখানে জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদের উল্লেখ করে কয়েকটি ধারা তুলে ধরা হয়েছে। যেমন :

'১৮ বছরের কমবয়সী যেকোনো মানুষ শিশু' (পৃ. ৮২)। তো, দেশীয় আইনে শিশুদের কী ধরনের 'স্বাধীনতা' রয়েছে? 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০' এর ৯নং ধারার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, 'কোনো পুরুষ বিবাহবন্ধন ব্যতীত ষোলো বৎসরের অধিক[১] বয়সের কোনো নারীর সহিত তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে বা ভীতি প্রদর্শন বা প্রতারণামূলকভাবে তাহার সম্মতি আদায় করিয়া, অথবা ষোলো বৎসরের কম বয়সের কোনো নারীর সহিত তাহার সম্মতিসহ বা সম্মতি ব্যতিরেকে যৌনসঙ্গম করেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত নারীকে ধর্ষণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।' (২০১৯)।

অর্থাৎ, আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত সকলে শিশু, তাই তারা বিয়ে করতে পারবে না। কিন্তু ষোলো বছর বয়স হলেই তারা স্বেচ্ছায় শারীরিক সম্পর্ক করতে পারবে, সেটা তাদের অধিকার(!)। শারীরিক সম্পর্ক করা না করার ব্যাপারে তাদের ওপর জোর খাটানো যাবে না। যৌনতার ক্ষেত্রে আইন করে দিয়ে তাদেরকে দেয়া হয়েছে অবাধ স্বাধীনতা।

তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে—সতেরো বছর এগার মাস উনত্রিশ দিন হলেও যদি

[১] ২০০০ সালে সম্মতি ভিত্তিক 'বৈধ' যৌনতার সীমারেখা ছিল সর্বনিম্ন চোদ্দ বছর! কয়েক বছর পর তা ষোলো করা হয়।

সবাই 'শিশু'ই থাকে, তাদের বিয়ে করার অধিকার না থাকে, বিয়ে দিলে সেটা 'বাল্য বিবাহ' ও 'নারী নির্যাতন' হয়ে যায়, তাহলে ষোলো বছর বয়সী 'শিশু'র শারীরিক সম্পর্কের অধিকার কিভাবে হয়? তাদের সাথে কেউ শারীরিক সম্পর্ক করলে সেটা 'শিশু নির্যাতন' হবে না কেন? ষোলো বছর বয়সী কোনো মেয়ে 'শিশু'কে যদি আনভীরের মতো ব্যক্তিরা সুযোগ-সুবিধা, টাকার বিনিময়ে মাসের পর মাস ভোগ করে, তাহলে সেটিকে 'যৌনদাসত্ব' বলা হবে না কেন? যে-সকল সেক্যুলাররা এসবের প্রোমোটার তাদেরকে 'দাস/যৌন ব্যবসায়ী' বলা হবে না কেন? এটা তো বিনিময়ের মাধ্যমে শিশুর কাছ থেকে যৌন আচরণ কেনা, তাহলে এই ধরনের কাজকে 'শিশুশ্রম' বলা হবে না কেন? বৈবাহিক সম্পর্ক ছাড়াই যেসব সেক্যুলাররা শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হয়, আবহমান বাংলার হাজার বছরের সংস্কৃতি অনুযায়ী তাদেরকে পতিতা কিংবা রক্ষিতা বলা হবে না কেন? আর যারা এর প্রচার-প্রসার করে, তাদেরকে 'পতিতা'র ডিলার বলা উচিত নয়? এখানে এসে 'সংস্কৃতি রক্ষা'র তাগিদ কোথায় হারিয়ে যায়? এই ধরনের আইন করে ছেলেমেয়েদের ধর্মীয় অনুশাসন থেকে দূরে ঠেলে দেয়ার নাম কি ধর্মীয় স্বাধীনতা? এই যে এত 'কেন কেন কেন', নবপ্রজন্মকে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর কে দিবে? হয়তো-বা দেশীয় সেক্যুলার শিক্ষাবিদদের কাছ থেকে আমরা এ প্রশ্নগুলোর উত্তর আশা করতেই পারি।

❁ ক্লাস এইট :

গণিত- জেনারেল কারিকুলামে 'সুদ'কে মুনাফা নাম দিয়ে ছোট ছেলেমেয়েদের শেখানো হয় যে, এটি হলো ব্যবসা। বইতে লেখা আছে, *'ব্যাংকে টাকা রাখলে ব্যাংক সেই টাকা ব্যবসা, গৃহনির্মাণ ইত্যাদি বিভিন্ন খাতে ঋণ দিয়ে মুনাফা করে।'* (মতিন et al., ২০২০, পৃ. ১৪)। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি ব্যাংক ঋণ দিয়ে যেই নীতি অনুযায়ী টাকা ফেরত নেয়, তার সঙ্গে ব্যবসা আর ইসলামি অর্থনীতির ন্যূনতম সম্পর্কও নেই। তারা একটি নির্দিষ্ট সুদের হার ধার্য করে টাকা ধার দেয়। এমনকি বইতে মুনাফা নির্ধারণের যে রুলস শেখানো হয়েছে, সেটিও সুদ নির্ধারণেরই রুলস, ইসলামি অর্থনীতি অনুযায়ী ঋণগ্রহীতার লাভক্ষতি হিসেব করার পূর্বেই মুনাফা এভাবে নির্ধারিত হয় না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ সুস্পষ্টভাবে সুদের ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ২৭৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

> 'যারা সুদ খায়, তারা তার ন্যায় (কবর থেকে) উঠবে, যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল বানিয়ে দেয়। এটা এ জন্য যে, তারা বলে, বেচাকেনা সুদের মতোই। অথচ আল্লাহ বেচাকেনা হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন'।[১]

[১] সূরা বাকারাহ, ২ : ২৭৫

এরপর আল্লাহ আবারও বলেন,

> 'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যা অবশিষ্ট আছে, তা পরিত্যাগ করো, যদি তোমরা মুমিন হও। কিন্তু যদি তোমরা তা না করো, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা নাও। আর যদি তোমরা তাওবা করো, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই থাকবে। তোমরা জুলুম করবে না এবং তোমাদেরও জুলুম করা হবে না।'[১]

এই হলো বাংলাদেশের শিক্ষার বাস্তবতা। এখানে সুদকে মুনাফা নাম দিয়ে ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে যথাযথ 'শিক্ষা' প্রদানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিপক্ষে যুদ্ধের, আর সেটিও করা হয় শব্দের লুকোচুরির মাধ্যমে[২]।

এ তো গেল আলিয়া মাদ্রাসা ও জেনারেল কারিকুলামের সাধারণ বিষয়গুলো; আলিয়া ও জেনারেল—উভয়ক্ষেত্রেই যে বিষয়গুলোর বইয়ের মৌলিক উপাদান এক ও অভিন্ন। অন্যদিকে শুধু জেনারেল কারিকুলামের জন্য প্রণীত *ইসলাম শিক্ষা* বইয়ের নাম বদলে করা হয়েছে *ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা*। জেনারেল কারিকুলামের *ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা* বইগুলোতে খোলা চোখেই বেশ কিছু সমস্যা দেখা যায়। যেমন—

❁ পঞ্চম শ্রেণি :

অন্য ধর্মের প্রতি 'শ্রদ্ধাশীল' হওয়া শেখাতে দ্বিতীয় অধ্যায়ের সাতান্ন পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, *'হযরত মুহাম্মদ ﷺ মদিনায় হিজরত করেই মদীনা ও তার আশেপাশে বসবাসকারী গোত্রগুলোর সাথে একটি বিশ্বখ্যাত সনদপত্র সম্পাদন করেন ইতিহাসে যা 'মদীনা সনদ' হিসেবে খ্যাত। ... এ সনদের মাধ্যমে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা-নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকার তথা মানবাধিকার স্বীকৃত ও নিশ্চিত হয়।'* (তমীযুদ্দীন et al., ২০১৯, পৃ. ৫৭)।

এখানে লেখক মহোদয় শুভঙ্করের ফাঁকির আশ্রয় নিয়েছেন। বিশুদ্ধ সিরাহ গ্রন্থ *সীরাত ইবনু হিশাম*-এ মদীনা সনদের সকল ধারা সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত রয়েছে; যার মধ্যে কয়েকটি ধারা উপরিউক্ত দাবির সঙ্গে সরাসরি সাংঘর্ষিক। উল্লিখিত ধারাগুলো হলো—

- কোনো মুমিন ব্যক্তি কোনো কাফিরের জন্য কোনো মুমিন ব্যক্তিকে হত্যা করবে না বা কোনো মুমিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো কাফিরকে সাহায্য করবে না।

---

[১] ০২:২৭৮-২৭৯

[২] ব্যাংক ব্যবস্থার বিস্তারিত জানতে পড়ুন 'ব্যাংক ব্যবস্থা ও টাকার গোপন রহস্য', লেখকঃ অর্থনীতি বিশ্লেষক মোহাইমিন পাটোয়ারী, ঐতিহ্য প্রকাশন।

- আর কোনো মুশরিক বা পৌত্তলিক ব্যক্তি কোনো কুরাইশের সম্পদ বা প্রাণের আশ্রয়দাতা হবে না এবং কোনো মুমিন ব্যক্তিকে এ ব্যাপারে বাধা দিতে পারবে না।
- আর যে ব্যক্তি কোনো মুমিন ব্যক্তিকে হত্যা করবে আর সাক্ষ্য-প্রমাণে তা প্রমাণিতও হয়ে যাবে, তার ওপর থেকে কিসাস গ্রহণ করা হবে—হত্যার বদলে তাকে হত্যা করা হবে। হ্যাঁ, যদি নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী মুক্তিপণ নিয়ে তাকে ছেড়ে দিতে রাজি হয়, আর সমস্ত মুমিনের তাতে সায় থাকে, তাহলে স্বতন্ত্র কথা। এ ছাড়া আর কোনো বিকল্প ব্যবস্থা নেই (অর্থাৎ এটা অবশ্য করণীয়)।
- আর যখন তোমাদের মধ্যে কোনো বিরোধ উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ তাআলা ও মুহাম্মাদ ﷺ-এর নিকট তা উত্থাপন করতে হবে।
- বনু আওফের ইহুদিরা মুমিনদের সাথে একই উম্মতরূপে গণ্য হবে। ইহুদিদের জন্য তাদের ধর্ম, মুসলিমদের জন্য তাদের ধর্ম, তাদের গোলামদের এবং তাদের নিজেদের ব্যাপারে একথা প্রযোজ্য হবে। (ইবনু হিশাম, ২০০৭)

লেখক মহোদয় সম্ভবত এটাও ভুলে গেছেন, মদীনা সনদ ছিল অন্তর্বর্তীকালীন চুক্তি; এটিই শারীয়ার চূড়ান্ত রূপ নয়। শারীয়া মদীনা সনদের মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভ করেনি, বরং শারীয়া পরিপূর্ণতা লাভ করে বিদায় হজের সময়। আল্লাহ তাআলা ওই সময়ে নাযিলকৃত কুরআনের আয়াতে বলেন,

> 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের ওপর আমার নিয়ামাত সম্পূর্ণ করলাম, আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।'[১]

তাছাড়া, শারীয়া আইন অনুযায়ী কাফিররা ইসলামি খিলাফতে থাকবে যিম্মি হিসেবে[২]। তাদের নিরাপত্তার পুরো দায়ভার থাকবে মুসলিম শাসকের ওপর, ইসলামি ভূখণ্ডের নিরাপত্তা রক্ষার কর্তব্যভার থেকে তারা থাকবে মুক্ত। সেই সঙ্গে তাদের ব্যাপারে কিছু বিধি-নিষেধও রয়েছে। গনিমতের কোনো ভাগ কাফিররা লাভ করবে না। হ্যাঁ, তারা তাদের জন্য নির্ধারিত ইনসাফ লাভ করবে এবং কোনো মুসলিম তাদের ওপর জুলুম করলে ইসলামি বিধান অনুযায়ী সেই মুসলিম সাজা ভোগ করবে, মুসলিম বলে কেউ জুলুম করে পার পাবে না। তাছাড়া মদীনা সনদে মুসলিমসহ সকল ধর্মের জনগণ তাদের নিজস্ব ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করার সুযোগ পেত। বর্তমানে প্রচলিত সেক্যুলার রাষ্ট্রে রাষ্ট্রযন্ত্র ইসলামসহ, প্রতিটি ধর্মের ধর্মীয়

[১] ৩৩:০৩

[২] সপ্তম শ্রেণিতে উল্লেখকৃত এক হাদীসে শুধুমাত্র যিম্মি শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। (p. ৭৯)

বিধানকে দমন করে নিজেদের কল্পনাপ্রসূত বিধান সকল ধর্মের ওপর চাপিয়ে দেয়, যেটি মদীনা সনদের সঙ্গে সরাসরি সাংঘর্ষিক। এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আর বিষয়গুলো শিশুদের বইতে বিকৃত করে উপস্থাপিত হয়।

এর ঠিক পরের পৃষ্ঠায় দাবি করা হয়েছে, *'মহানবী ﷺ ও মুসলিমগণ আক্রান্ত না হলে কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন না।'* (পৃ. ৫৮)। এখানে মূলত ইকদামী জিহাদকে (আক্রমণাত্মক জিহাদ) সরাসরি অস্বীকার করা হয়েছে। যেটা আল্লাহ তাআলা'র বিধান নিয়ে নির্লজ্জ মিথ্যাচার; ইসলামের ব্যাপারে চূড়ান্ত পর্যায়ের জঘন্যতম ধৃষ্টতা। রাসূলুল্লাহ ﷺ জীবিত থাকতেই তিনি কিসরা ও কায়সারের পতনের সুসংবাদ দিয়ে গেছেন। উমার رضي الله عنه-এর সময়ে সাহাবিরা আক্রমণাত্মক জিহাদে নিজেদের জীবন আল্লাহর রাহে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। আক্রমণাত্মক জিহাদের মাধ্যমেই মুসলিম খলীফারা পূর্ব ইউরোপ থেকে সিন্ধু নদ পর্যন্ত ইসলামের বিজয়-কেতন উড়িয়েছিলেন। মুহাম্মাদ বিন কাসিমকে কি কেউ আক্রমণ করেছিল, যে তিনি নিজেকে 'রক্ষা' করতে গিয়ে সিন্ধু জয় করে ফেলেছিলেন? রক্ষণাত্মক জিহাদ ফরজে আইন[১], আর দ্বীনের শাসন ছড়িয়ে দিতে আক্রমণাত্মক জিহাদও ইসলামের সুস্পষ্ট বিধান। চৌদ্দশত বছরে ইসলামের পুরো ইতিহাস জুড়ে কোথাও সর্বজনগৃহীত কোনো ফকিহ, মুহাদ্দিস বা মুফাসসির ইক্বদামী জিহাদকে অস্বীকার করার নজির নেই। কিন্তু, 'ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা' বইটির 'সম্মানিত' লেখকগণ সালফে সালেহীনদের পালন করা ইসলামের

---

[১] ইমাম কুদূরী রহ. বলেন: জিহাদ হলো ফরজে কিফায়া (আক্রমণাত্মক জিহাদ)। একদল লোক পালন করলে অবশিষ্টদের থেকে ফরজ রহিত হয়ে যায়। কিন্তু কেউ তা পালন না করলে সকল মানুষ তা তরক করার কারণে গুনাহগার হবে, কেননা সকলের ওপরেই তা ওয়াজিব। যেহেতু আয়াত ও হাদিস নিঃশর্ত ও সাধারণ, সেহেতু কাফিররা সূচনা না করলেও (প্রয়োজন হওয়া মাত্র) তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা ফরজ। অপ্রাপ্তবয়স্ক, দাস, স্ত্রীলোক, অন্ধ, প্রতিবন্ধী, কর্তিত অঙ্গ ব্যক্তির ওপর ফরজ নয়।

কিন্তু শত্রুপক্ষ যদি কোনো শহরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন সকলের ওপর প্রতিরোধ ওয়াজিব হয়ে যাবে (রক্ষণাত্মক জিহাদ)। স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ছাড়া এবং দাস মনিবের অনুমতি ছাড়াই বের হয়ে পড়বে। কেননা তা ফরজে আইন হয়ে পড়েছে আর ফরজে আইনের মোকাবিলায় দাসত্ব ও বিবাহ বন্ধন বিবেচিত হবে না। যেমন সালাত ও সিয়ামের ক্ষেত্রে। [আল-হিদায়া ই.ফা. ২/৪২৯-৪৩০]

মুসলিম ভূখণ্ড এক বিঘত পরিমাণও কাফিরদের অধীনে চলে গেলে ঐ অঞ্চলের মুসলিমদের ওপর জিহাদ ফরজে আইন, বাকি মুসলিমদের জন্য ফরজে কিফায়া। তারা শত্রুর বিরুদ্ধে অপারগ হলে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জন্য ফরজে আইন, বাকিদের জন্য কিফায়া। এভাবে ক্রমান্বয়ে পাশের এলাকা, তারা না পারলে তার পাশের এলাকা, এভাবে ফরজে আইনের হুকুম বর্তাবে। এটা গেল রক্ষণাত্মক জিহাদ। কোনো আলিম বলে দিক বা না দিক, কেউ যাক বা না যাক, প্রত্যেকের ওপর এই হুকুম। (মাআরেফুল কুরআন, সূরা বাকারার ২১৬ নং আয়াতের তাফসির দ্রষ্টব্য)

আর নতুন এলাকা বিজয়ের জন্য আক্রমণাত্মক জিহাদ ফরজে কিফায়া। বছরে একবার বা দু'বার খলিফা যদি কাফেরদের রাষ্ট্রে মুজাহিদ বাহিনী পাঠান, তাহলে উম্মতের পক্ষ থেকে ফরজ আদায় হয়ে যাবে। যদি একবারও না পাঠান, তাহলে সবাই গুনাহগার হবে।

বিধানকে কী করে বেমালুম অস্বীকার করে বসলেন, তার 'কারণ' আঁচ করা আমার পক্ষে ঠিক সম্ভব হয়নি।

তৃতীয় অধ্যায়ে 'আখলাক বা চরিত্র ও নৈতিক মূল্যবোধ' অধ্যায়ে শুরুতেই শেখানো হয়েছে সৃষ্টির সেবা। এরপরই ব্যাখ্যা করা হয়েছে 'দেশপ্রেম'। সেখানে মক্কার প্রতি রাসূল ﷺ-এর ভালোবাসার বর্ণনা করতে গিয়ে হিজরতের সময় মক্কার দিকে তাকিয়ে বলা রাসূল ﷺ-এর কথাগুলো বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর তারা এক জাল হাদীস বর্ণনা করে বললেন,

'তাই তো জ্ঞানীরা বলেছেন, দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ।' (পৃ. ৬৮)। এই বাক্যের সাথে কোনো রেফারেন্স নেই। তাই কোন শ্রেণির জ্ঞানী ব্যক্তিরা এটা বলেছেন, সেটা বাচ্চারা জানতে পারছে না।

'দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ' কথাটি হাদীস হিসেবে বানোয়াট, মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। মোল্লা আলী কারীসহ পূর্ববর্তী বহু আলিম এটিকে বানোয়াট হিসেবে বাতিল করেছেন (জাহাঙ্গীর, ২০০২/২০১৭, পৃ. ৪৬৯)। রাসূল ﷺ-এর সময়ে বর্তমানে পশ্চিমাদের আবিস্কৃত জাতিরাষ্ট্র বা দেশভিত্তিক শাসন-ব্যবস্থা ছিল না। তখনকার শাসন-ব্যবস্থা ছিল গোত্র ভিত্তিক, এর সঙ্গে বড় বড় সাম্রাজ্যও ছিল। পরবর্তীকালে ইসলামই বিশ্বকে খিলাফতের মতো আদল ও ইনসাফভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে পরিচয় করায়। অন্যদিকে, বর্তমানে প্রচলিত পশ্চিমা জাতিরাষ্ট্র ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক ইসলামের রাষ্ট্রব্যবস্থার সাথে চূড়ান্ত পর্যায়ের সাংঘর্ষিক।

❁ ষষ্ঠ শ্রেণি :

ষষ্ঠ শ্রেণিতে দ্বিতীয় অধ্যায়ে একটি কৌতূহল জাগানো উদ্দীপক দেয়া আছে, উদ্দীপকটিতে বলা হয়েছে, *'লুতফুর সাহেব বেশ ভ্রমণপ্রিয় মানুষ। একদিন বেড়াতে গিয়ে সীতাকুণ্ডে একটি পাহাড়ের চূড়ায় উঠলেন। তখন আসরের সময় হয়ে গেছে। তখনই তিনি এক দলা মাটি দিয়ে নির্দিষ্ট নিয়মে সমস্ত মুখমণ্ডল ও কনুইসহ দুই হাত মাসেহ করে আসরের নামাজ আদায় করলেন।'* (মালেক et al., ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা ষষ্ঠ শ্রেণি, ২০২০)।

দুইজন মাদ্রাসাছাত্র কাকতালীয়ভাবে ঠিক এই গল্পের মতোই সীতাকুণ্ডে পাহাড়ে গিয়ে আযান দিয়ে নামাজ পড়েন। কিন্তু, সেখানে আযান দেয়ায় দেশের সেক্যুলার গোষ্ঠী 'ভীত' হয়ে পড়ে। পরে এই দুই মুসলিম ভাইকে গ্রেফতার করা হয়। আর এই ঘটনা আমাদেরকে বুঝিয়ে দেয়, বইয়ের শিক্ষা বইয়ের পাতায় রেখে দেয়াই 'বুদ্ধিমানের পরিচয়'। নৈতিক শিক্ষার নামে বইতে গেলানো অসাম্প্রদায়িক নীতি নিজ জীবনে প্রয়োগ করে মুসলিমরা যতই অসাম্প্রদায়িক সাজার চেষ্টা করুক না কেন, দিনশেষে রাষ্ট্রের সকলেই সাম্প্রদায়িক; কেউ 'সেক্যুলার' সম্প্রদায়ের, কেউ-

বা ধর্মীয়।

❁ সপ্তম শ্রেণি :

তৃতীয় অধ্যায়ের শেষে নৈতিক গুণাবলি বিষয়ক তিনটি হাদীসের শেষ হাদীসটি হলো ইসলামি খিলাফতে কাফির, মুশরিক অর্থাৎ যিম্মিদের অধিকার সম্পর্কিত। সেখানে বলা হয়েছে, *'অমুসলিমদের ধর্ম নিয়ে অবহেলা প্রদর্শন করা যাবে না।'* (মালেক et al., ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা সপ্তম শ্রেণি, ২০২০)। অতি উত্তম কথা, বাচ্চারা অন্য ধর্মকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করবে না। এই বিষয়টা ছোট বেলায়ই মুসলিম কিশোর-কিশোরীদের শিখে রাখা দরকার।

কিন্তু, রাসূল ﷺ তাঁর পুরো নবুওয়াতি জীবন ব্যয় করেছেন কাফির-মুশরিকদের ঈমানের ছায়াতলে নিয়ে আসার দাওয়াতি কাজে। আল্লাহ তাআলাও পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

> 'আর স্মরণ করো, যখন তোমার রব ফেরেশতাদেরকে বললেন, "নিশ্চয় আমি জমিনে একজন খলীফা সৃষ্টি করছি"...'[১]

রাসূল ﷺ পৃথিবীতে এসেছেন রিসালাত নিয়ে, কাফির-মুশরিকদের জাহান্নামের পথ থেকে আল্লাহর পথে ফিরিয়ে আনতে। এত গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ, যা প্রত্যেক দায়িত্বশীল মুসলিমের পালন করা প্রয়োজন; কারণ আল্লাহ আমাদের এই পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করেছেন, সেটার ব্যাপারে বইতে কোনো শিক্ষা নেই কেন? প্রতিটি কাফির অনবরত ধাবিত হচ্ছে প্রজ্বলিত অনন্ত আগুনের দিকে, তাদেরকে আগুনের বাসিন্দা হবার হাত থেকে রক্ষা করতে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার শিক্ষা কোথায়?

তাছাড়া, রাসূল ﷺ কি সাহাবিদেরকে তেইশটি বছর কাফিরদের সাথে কেবল মিলেমিশে চলার শিক্ষাই দিয়েছেন? নাকি রাসূল ﷺ স্বয়ং দাওয়াতি কাজ বন্ধ করে আবু জাহল, আবু লাহাব, হুয়াই ইবনু আখতাবের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে বসবাস করেছেন? মক্কার মুশরিকদের ধর্ম নিয়ে নাযিল হওয়া কুরআনের আয়াতগুলো শুনলে মুশরিকরা কষ্ট পাবে এই ভয়ে তিনি কি কুরআনের আয়াত কাফিরদের থেকে লুকিয়ে রাখতেন? আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন,

> 'হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ কোরো না।'[২]

এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো শিশু-কিশোরদের শেখানো হয় না। মুসলিম শিশুরা

[১] ০২: ৩০
[২] ০৩: ১১৮

যেন (প্রাপ্তবয়স্ক হবার পর) তাদের মুশরিক সহপাঠীদের আখিরাতের মুক্তির পথে আহ্বান জানাতে পারে, তাদেরকে সেই তাগিদ বা শিক্ষা দেয়া হয় না। শুধু শেখানো হয় মিলেমিশে শিন্নি আর প্রসাদ খাওয়া, আর হাতি-ঘোড়া বাঘ-সিংহ পেঁচার কাছে মঙ্গল প্রার্থনা করা। মুসলিমরা যদি মুশরিকদের ইসলামের দাওয়াত প্রদান আরম্ভ করে, তাহলে আল্লাহ চাইলে তারা হয়তো চিরস্থায়ী জাহান্নাম থেকে বাঁচার তাগিদ অনুধাবন করলেও করতে পারে। কিন্তু, মুসলিমরা যদি শুধু একসঙ্গে হুতোম পেঁচা নিয়ে অ-মঙ্গল শোভাযাত্রা করে, তাহলে মুশরিকরা তো এ কথাই চিন্তা করবে যে, 'ওদের আর আমাদের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই; তাহলে আর মুসলিম হয়ে আমাদের কী লাভ'? কথাগুলো শুনলে হাস্যকর মনে হতে পারে, তবে এতে চিন্তার অবকাশ রয়েছে—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই ধরনের ভারসাম্যহীন শিক্ষা কখনোই ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা হতে পারে না; এই শ্রেণির শিক্ষাকে বড়জোর 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' গোছের সেক্যুলার শিক্ষা বলা যেতে পারে।

❁ অষ্টম শ্রেণি :

আখলাক অধ্যায়ে দেশপ্রেমের পাঠে লেখা হয়েছে, *'দেশপ্রেম মানবজীবনের একটি মহৎ গুণ। দেশপ্রেমের মূলেই আছে দেশের ভূখণ্ডকে ভালোবাসা। দেশের জনগণকে ভালোবাসা, দেশের স্বাধীনতা ও স্বকীয়তা রক্ষা করা এবং দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, প্রথা, রীতি-নীতি, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান করা কর্তব্য।*[১] *... দেশপ্রেমের গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলাম দেশপ্রেমের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।'* (মালেক et al., ২০২০, পৃ. ৯৩)।

বদর থেকে শুরু করে মক্কা বিজয়ের পূর্বে প্রতিটি যুদ্ধে মুহাজিররা মক্কার যেসব কাফিরদের হত্যা করেছিলেন, তারা তো মুহাজিরদের নিজ ভূখণ্ডের (বইয়ের ভাষায় দেশের) জনগণ। মুহাজিররা কি নিজ দেশের জনগণকে (মক্কাবাসী কাফির) ঘৃণা করে ভুল করেছিল? মক্কা বিজয়ের সময়ে এবং এর পূর্বের যুদ্ধগুলোতে যে-সকল কাফিররা রাসূল ﷺ-এর বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, তারাও তো দেশের **'স্বাধীনতা'**, **'সার্বভৌমত্ব'** ও **'স্বকীয়তা'** রক্ষার উদ্দেশ্যেই যুদ্ধ করে। মক্কার ইতিহাস ছিল কুফরের ইতিহাস, মক্কার ঐতিহ্য ছিল সুদ আর ব্যাভিচারের ঐতিহ্য, মক্কার প্রথা ছিল উলঙ্গ হয়ে কাবাঘর তাওয়াফ করা, মক্কার রীতি-নীতি ছিল মেয়েশিশুদের জীবন্ত কবর দেয়া, মক্কার ধর্মীয় মূল্যবোধ ছিল কাবাঘরের বাইরে মূর্তি পূজা করা আর মুশরিকদের কাবায় প্রবেশের অনুমতি দেয়া, মক্কার সংস্কৃতি ছিল মদ্যপান করে নেশাগ্রস্ত হওয়া। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ এগুলোর প্রত্যেকটিকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে ইতিহাসের ছিন্ন পাতায় এগুলোর স্থান নির্ধারণ করে দেন। মক্কা বিজয়ের পর

[১] বারবার দেশপ্রেম শেখানোর আসল উদ্দেশ্য সম্ভবত এই বাক্যে উন্মোচিত হয়েছে।

সাহাবিরা কাবাঘরে থাকা মূর্তিগুলোকে কোনো সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাননি, ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছেন সেগুলোর নোংরা অস্তিত্ব। আমাদের শিশু-কিশোরেরা তাহলে কোনটা মেনে নিবে, ইসলামের ইতিহাসের শিক্ষা, নাকি সেক্যুলার কারিকুলামের দেওয়া শিক্ষা?

ইসলাম জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেম সমর্থন করে না; এমন দেশপ্রেম—যা মানুষকে তার স্রষ্টার চাইতে দেশকে বেশি প্রাধান্য দিতে শেখায়। হ্যাঁ, এটা মানুষের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য যে, সে তার জন্মভূমিকে ভালোবাসবে; ইসলাম সেটাকে নিষিদ্ধ করেনি। কিন্তু, যখন তার জনপদ ইসলামের বিপক্ষে চলে যায়, তখন একজন মুসলিম কখনোই তার জনপদের সঙ্গ দিতে পারে না। মক্কার মুহাজিররা যখন মদীনার আনসারদের সঙ্গে বদরের যুদ্ধে মুশরিকদের একে একে হত্যা করেছিলেন, তখন প্রশ্নটা দেশপ্রেমের ছিল না। প্রশ্ন ছিল ইসলামের। আর দেশপ্রেমকে যদি পজিটিভ অর্থে নিতে হয়, তাহলে 'নিজ জনপদে ইসলাম প্রতিষ্ঠা' করা আর নিজ ভূখণ্ডের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখা—এ দুটি বিষয়কে প্রকৃত দেশপ্রেমের সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। কারণ, রাসূল ﷺ তার জন্মভূমিতে যুদ্ধের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ বিষয়গুলো সঠিকভাবে ব্যাখ্যা না করে কেবল 'দেশের মাটি', 'সার্বভৌমত্ব', 'স্বাধীনতা'র মতো বিমূর্ত বিষয়ের উল্লেখ ছাত্রদের জ্ঞানকে সঠিকভাবে বিকশিত করে না; বরং তাদেরকে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের দিকে ঠেলে দেয়।

খিলাফতের অভ্যন্তরে সকল মুসলিম ছিল একটি অখণ্ড উম্মাহ। কিন্তু বর্তমান দেশপ্রেম আমাদেরকে শেখায় আরাকানিরা মিয়ানমারের নাগরিক, কাশ্মীরীরা ভারতীয়; ওরা নির্যাতিত হলে সেটা অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়। অন্য দেশের মুসলিমদের নির্যাতিত হবার ব্যাপারে চিন্তাভাবনাকে রাষ্ট্রযন্ত্র প্রচার করে উগ্রবাদ হিসেবে। বাস্তবতা হলো, খিলাফতের পরিবর্তে বর্তমানে পশ্চিমাদের এক্সপোর্ট করা জাতিরাষ্ট্র নিজেই একটি ধর্মে পরিণত হয়েছে; আর সবাইকে এই ধর্মের অনুসারী হতে করা হচ্ছে বাধ্য। এই ধর্মের নাম—নাগরিক ধর্ম[১]। এ ধর্মে 'প্রভু'র আসন দখল করেছে রাষ্ট্র; আসমানি কিতাবের জায়গা নিয়েছে সংবিধান আর জাতীয় নেতারা হয় এই ধর্মের পয়গম্বর। ইসলামি বিশুদ্ধ চেতনার সঙ্গে সাংঘর্ষিক পশ্চিমা সেক্যুলার জাতিরাষ্ট্রের ধারণাকে প্রোমোট করতে প্রতি ক্লাসেই দেশপ্রেমের অস্পষ্ট ধারণা আর জাল হাদীস শেখানোটা খুবই দুঃখজনক।

'সন্ত্রাস' শীর্ষক অনুচ্ছেদে সন্ত্রাসের সংজ্ঞায় বলা হয়, *'ভয় দেখিয়ে বা জোর খাটিয়ে মানুষের কাছ থেকে কিছু আদায় করা বা আদায়ের পরিবেশ সৃষ্টির নীতিকে সন্ত্রাস বলে'* (পৃ. ১০৪)। একটা দৃশ্যপট চিন্তা করুন। চিন্তা করবার দরকার নেই, আশেপাশের ঘটনাগুলোর দিকে একটু নজর বুলান। সেক্যুলার রাষ্ট্রগুলোতে

[১] Civic Religion

ক্ষমতা দখল করে নিজেদেরকে জাতির উদ্ধারকর্তা দাবি করে জেঁকে বসা অল্প কিছু দুর্নীতিবাজ ব্যক্তি গোটা জনপদকে কব্জা করে স্বার্থ আদায়ের উদাহরণ আমাদের চারিপাশে অহরহ দেখা যায়। হ্যাঁ, এই ব্যক্তিরা ডেমোক্রেটিক সিস্টেমেই নির্বাচিত হয়, আর তারপর কায়েম করে নিজেদের স্বর্গরাজ্য; যেখানে তারা বসে রাজার আসনে, আর বাকি সবাই হলো প্রজা, যাদের প্রধান কাজ ট্যাক্স-ভ্যাট দেয়া; ২০%, ৩০%, ৪০%, যেভাবে লুটেপুটে নেয়া যায়। কেউ প্রতিবাদ করলে তাকে 'উধাও' করে দেয়া হয়। তাদের লাঠিয়াল বাহিনীর হাতে অসহায় জনগণ জিম্মি। কেউ কেউ জনগণের অর্থ-সম্পদ লুট করে গড়ে তোলে অবৈধ সম্পদের পাহাড়। কিন্তু এই কাজগুলো যারা করে, তাদেরকে কেন যেন 'সন্ত্রাসী' বলা হয় না।

কিংবা ধরুন, বহির্বিশ্বের কোনো রাষ্ট্র আপনার দেশে হামলা চালিয়ে হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট, অরাজকতা চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের সাহায্য করছে স্বদেশীয় কিছু মীরজাফর, জগত শেঠ, রায় বল্লভ, উমিচাঁদের মতো ব্যক্তিরা। ভিনদেশী ওই শত্রুরা আপনার রাষ্ট্রে পুতুল সরকার প্রতিষ্ঠা করে নির্বিঘ্নে অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। ভিনদেশী গোষ্ঠী আর তাদের পুতুল সরকার—উভয়কে কী বলে সম্বোধন করা হবে? তাদের কার্যক্রমকে কি ইসলামি বিধান অনুযায়ী বিচার করা হবে না কি বর্তমান সেক্যুলার আইন অনুযায়ী?

ওই পৃষ্ঠাতেই বলা হয়েছে, 'ইসলাম সন্ত্রাস প্রতিরোধে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ থেকে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে।' এখন ওপরের দুটি প্রেক্ষাপটে—ধরুন ভারতের কাশ্মীরে কিংবা ইরাক, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, আফগানিস্তানে—যদি কোনো মুসলিম জনপদের অত্যাচারিত মজলুম মানুষগুলো অন্যায়কারী দলগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে ওই মুসলিম গোষ্ঠীকে কী বলা উচিত? দেশপ্রেমিক? না কি সন্ত্রাসী? দেশীয় মিডিয়া ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তাদের ব্যাপারে কি ধারণা প্রচার করে?

পরের পৃষ্ঠাতে সন্ত্রাসের কারণ হিসেবে পরোক্ষভাবে দারিদ্রতা, অশিক্ষা, বেকারত্ব ও নৈতিক অবক্ষয়কে দাবি করা হয়েছে। অথচ গত এক শতাব্দীতে বেসামরিক নাগরিক হত্যার কারণগুলোর মাঝে সবচেয়ে গুরুতর কারণ হলো রাষ্ট্রীয় যুদ্ধবিগ্রহ। ইরাক, আফগানিস্তান, ইয়েমেন, সিরিয়া, লিবিয়া, মিশর, উইঘুর—প্রতিটি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সরকারযন্ত্রগুলোই সবচে বেশি বেসামরিক মানুষ হত্যা করেছে এবং করছে। এসকল ভূখণ্ডে পরিচালিত সন্ত্রাসের পেছনে কোনো অশিক্ষিত, বেকার ও দরিদ্র লোক জড়িত ছিল না। অথচ বইতে রাষ্ট্রীয় এই সন্ত্রাসের ব্যাপারে কোথাও কোনো তথ্য নেই।

আদর্শ জীবনচরিত অধ্যায়ে মুহাম্মাদ ﷺ-এর জীবনীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় মক্কার সকলের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষভাবে আবু সুফিয়ান এবং তার স্ত্রী হিন্দাকে ক্ষমা করার

কথা সুন্দর করে বর্ণনা করা হয়েছে (পৃ. ১২১) অথচ যে দশজন চূড়ান্ত শ্রেণির অপরাধী কাফিরের বেলায় রাসূল ﷺ বলেছিলেন তাদেরকে কাবার গেলাফ জড়িত অবস্থায় পেলেও হত্যা করতে হবে, মহাক্ষমার দিনে সেই বিশেষ ঘটনার কোনো উল্লেখ নেই, যদিও সেটি ইসলামের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিধান। এই একটি বিধানের কারণেই আজ পর্যন্ত কাফির-নাস্তিকরা কুরআন ও ইসলাম অবমাননা করতে ভয় পায়।

১২৩তম পৃষ্ঠায় রাসূল ﷺ-এর ব্যক্তিগত আদর্শ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, *'...গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ,... অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি-সহ অনুসরণীয় গুণাগুণ রাসূল ﷺ-এর জীবনে বিদ্যমান ছিল।* ১২৫ পৃষ্ঠায় দাবি করা হয়েছে, *রাসূল ﷺ রাষ্ট্র পরিচালনায় আল-কুরআনের সার্বজনীন গণতন্ত্রের নীতি অনুসরণ করেন। ... রাসূল ﷺ দেশ পরিচালনায় জনগণের মতামতের স্বীকৃতি দেন। যা গণতন্ত্রের মূল কথা। ... রাষ্ট্রের সকলের সমঅধিকার ও মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করেন। ... আইনের চোখে মুসলিম-অমুসলিম, ধর্ম, বর্ণ-গোত্র সকলে সমান এ নীতির বাস্তবায়ন করেন'।*

কোনো কাফিরও রাসূল ﷺ এর নামে এরকম জঘন্যতম অপবাদ দিতে দুইবার ভাববে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ? এই মূল্যবোধ রাসূল ﷺ-এর জীবনের কোথায় ছিল? গণতন্ত্রের উৎপত্তি ইউরোপে, রাসূল ﷺ এর নুবুওয়াতি জীবন থেকে তেরোশত বছর মুসলিমদের শাসনব্যবস্থায় সেক্যুলার গণতন্ত্রের কোনো চিহ্নও কোথাও ছিল না। মক্কার সংখ্যাগরিষ্ঠ কাফিররা যখন তার ইসলাম প্রচারের বিরোধিতা করছিলেন, তখন যদি রাসূল ﷺ গণতন্ত্রের অনুসরণ করতেন, তাহলে তো রাসূল ﷺ ইসলাম প্রচারই বন্ধ করে দিতেন। চিন্তা করতে পারছেন, কত বড় নিকৃষ্ট এক অপবাদ দেয়া হয়েছে রাসূল ﷺ-এর নামে? রোমান আর পারস্য সাম্রাজ্যকে পরাজিত করার পর সেখানে ইসলামি খিলাফত কায়েম করা হয়, সেখানে তো মুসলিমরা সংখ্যালঘু ছিলেন, আর শাসনব্যবস্থা ছিল শারীয়াভিত্তিক, তাহলে সাহাবিরা কি রাসূল ﷺ-এর জীবনাদর্শ অনুসরণ করতেন না? আউযুবিল্লাহ। সূরা আনআমে আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন,

> 'সাবধান! হুকুম প্রদানের ক্ষমতা তাঁরই।'[১]

অর্থাৎ, আল্লাহর দেয়া হুকুমের বাইরে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ কী বলল, সেটা মুসলিমদের ধর্তব্য বিষয় নয়। আল্লাহ সে বিষয়ে তাঁর রাসূল ﷺ-কে সতর্ক করে বলেছেন,

> 'আর যদি তুমি যারা জমিনে আছে তাদের অধিকাংশের অনুসরণ করো, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। তারা শুধু ধারণারই

[১] সূরা আনআম ০৬ : ৬২

। অনুসরণ করে এবং তারা শুধু অনুমানই করে।'[১]

কুরআনের কোথায় সর্বজনীন গণতন্ত্রের নীতি বর্ণিত আছে? পবিত্র কুরআনে তো একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার প্রতি মানবজাতিকে আহ্বান করা হয়েছে এবং আল্লাহর আইন অমান্যের কঠোর পরিণতি স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্যক্তিরা মিলে 'সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতি'[২] অনুযায়ী হারামকে হালাল বা হালালকে হারাম করলে সেটি হালাল বা হারাম হয়ে যাবে, কুরআনের কোথাও কি এরকম কোনো ইঙ্গিত রয়েছে? দেশ পরিচালনায় জনগণের মতামতের স্বীকৃতিই যদি হয় গণতন্ত্রের মূল কথা, তাহলে রাসূল ﷺ মক্কা বিজয়ের দিনই কাবা চত্বরের ৩৬০টি মূর্তি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে গণতন্ত্রের মূলনীতিকেও ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন ঘোষণা করেছেন। কারণ, মক্কার অধিকাংশ জনগণ ছিল কাফির, মূর্তি ধ্বংস করতে রাসূল ﷺ তাদের কোনো পরামর্শ নেননি, ভোটের আয়োজনও করেননি।

প্রকৃত বাস্তবতা হলো, গণতন্ত্রের যে মূলনীতির কথা সেক্যুলাররা বলে, 'সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ', এ নীতিও এখন আর সবখানে সর্বদা মানা হয় না। রাসূল ﷺ দেশ পরিচালনায় আল্লাহর নির্দেশিত শারীয়া ভিত্তিক পথ অনুসরণ করেন, কাফিরদের আবিষ্কৃত কোনো তন্ত্রমন্ত্রের স্থান সেখানে ছিল না। কারণ, ঈমান ও কুফর কখনো একসাথে পথ চলতে পারে না। আর মজলিশে শূরার কথা যদি বলতেই হয়, তাহলে সেটিও গণতন্ত্রের কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কারণ, মজলিশে শূরা ইসলামের মৌলিক বিধান বা আইন বাতিল করার অধিকার রাখে না; কিংবা ইসলামের সুস্পষ্ট বিধানের পরিপন্থী কোনো আইন—যেমন : রাষ্ট্রীয়ভাবে পতিতালয়ের লাইসেন্স প্রদান—নতুন করে প্রণয়ন করতে পারে না। ইসলামে পরামর্শ করার বিধান রয়েছে, অনেক ক্ষেত্রেই রাসূল ﷺ সাহাবাদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন, কিন্তু সেই পরামর্শ পরিচালিত হতো আল্লাহ তাআলার বিধান অনুসারে, সেক্যুলার বৈধ-অবৈধের দর্শন অনুযায়ী নয়। এই মৌলিক পার্থক্যের বিষয়টি শিশু-কিশোরদের ছোটবেলা থেকেই শেখানো প্রয়োজন, অথচ সেটি না করে উল্টো রাসূল ﷺ এর নামে নিকৃষ্ট মিথ্যাচার করা হচ্ছে পাঠ্যবইতে।

রাসূল ﷺ রাষ্ট্রের সকলের 'সমঅধিকার' নিশ্চিত করেন—এই দাবি করার পরের প্যারাতেই দেখা যায়, বইতে স্বীকার করা হয়েছে, রাজস্বের উৎস হিসেবে রাসূল ﷺ মুসলিমদের থেকে যাকাত ও কাফির মুশরিকদের থেকে জিযিয়া গ্রহণ করতেন। যাকাত ও জিযিয়া—উভয়ের পরিমাণও ভিন্ন ছিল, সচরাচর যাকাতের পরিমাণ ছিল জিযিয়ার চাইতে অধিক (মিনার, ২০১৮)। অর্থাৎ, রাসূল ﷺ রাজস্বের ক্ষেত্রে ঈমান ও কুফরের মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য করেছেন। তাহলে এই দাবির উৎস কোথায় যে, রাসূল

[১] সূরা আনআম ৬ : ১১৬
[২] Majority Consent

এই দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অসাম্প্রদায়িক?[১] এটা অবশ্যই সত্যি যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ কাফিরদের জন্য নির্ধারিত অধিকার ভঙ্গের ব্যাপারে কঠিন হুঁশিয়ারি দিয়েছেন এবং তাদের অধিকার ক্ষুণ্নের ব্যাপারে কোনো শিথিলতা প্রদর্শন করেননি। কিন্তু, রাসূল ﷺ ছিলেন মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন,

> 'তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তার পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের কল্যাণকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়।'[২]

এছাড়াও আল্লাহ বলেন,

> 'মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু ও সিজদাহরত দেখবেন।'[৩]

সূরা মাইদায় আল্লাহ তাআলা বলেন,

> 'হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় দ্বীন থেকে ফিরে যাবে, অচিরেই আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালোবাসবে। তারা মুমিনদের প্রতি বিনম্র হবে এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ-তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী।'[৪]

অর্থাৎ, আল্লাহ সেই কওমকে ভালোবাসেন যারা মুমিনদের প্রতি বিনম্র হয় এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হয়। এছাড়াও আল্লাহ তাআলা সূরা তাওবাতে বলেন,

> 'হে নবি, কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন, তাদের প্রতি কঠোর হোন; এবং তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম, আর তা কতই-না নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল!'[৫]

আবার আল্লাহ তাআলা বলেন,

> 'হে নবি, কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন; আর তাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম এবং তা কত নিকৃষ্ট ফিরে

[১] আল্লাহ তাআলা কাফিরদের যতটুকু অধিকার দিতে নির্দেশ দিয়েছেন, রাসূল (ﷺ) সেই নির্দেশের কোনো অন্যথা করেননি।
[২] সূরা তাওবা ৯ : ১২৮
[৩] সূরা ফাতহ ৪৮ : ২৯
[৪] সূরা মাইদা ৫ : ৫৪
[৫] সূরা তাওবা ৯ : ৭৩

। যাওয়ার স্থান!'[১]

জিহাদ চলাকালীন কিংবা স্বাভাবিক—উভয় সময়েই রাসূল ﷺ মুমিনদের প্রতি ছিলেন স্নেহশীল ও কল্যাণকামী। অপরদিকে তিনি কাফিরদের কল্যাণও কামনা করেছেন—তাদেরকে ঈমানের পথে আহ্বান করার মাধ্যমে; যে সম্পর্কে কোনো ইঙ্গিত বইতে অনুপস্থিত। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর কাছে কাফির ও মুমিন সমমর্যাদার হতে পারে না; এটি অসম্ভব বিষয়।

তাই, 'আইন'-এর চোখে সকলে সমান—রাসূল ﷺ এই নীতির বাস্তবায়ন করেছিলেন—এটি একটি মিথ্যা অপবাদ। ইসলামে হক ও ইনসাফ স্বীকার করে, কাফিরদের জন্য নির্ধারিত অধিকার বাস্তবায়ন করে। কিন্তু সেক্যুলারদের আবিষ্কৃত তথাকথিত 'সমঅধিকার'কে ইসলাম স্বীকৃতি দেয় না। ইসলামি শারীয়া অনুযায়ী যার যার বিশ্বাস ও ধর্ম অনুসারে আইনের প্রয়োগ বাস্তবায়িত করা হয় এবং কেউ যদি ইসলামি আইনে বিচার প্রার্থনা করে, তখন তাকে ইসলামি আইনে বিচারের অনুমতি দেয়া হয়। তাই, এখানে 'আইন' বলতে বর্তমানের সেক্যুলার বিশ্বাসভিত্তিক আইন—যেমন : পরস্পর সম্মতিতে শারীরিক সম্পর্কের কোনো সাজা নেই—এই ধরনের কোনোকিছু রাসূল ﷺ বাস্তবায়ন করেননি এবং চার খলীফা-সহ পরবর্তী শাসকরাও এরকম কোনো আইন প্রণয়ন করেননি। এই ধরনের আইনকে বরং আকবরের 'দ্বীনে ইলাহি'র সঙ্গেই তুলনা করা যায়; যার অবস্থান ঈমানের সীমানার বাইরে।

আল্লাহর আয়াতের ওপর যাদের ভরসা নেই, তারা কুরআন, হাদীস, ফিকহ, শারীয়া, হুদুদ-এর কিতাব কিংবা সালফে সালিহীনদের জীবনাচরণ (আমল), কিতাবাদি খুলে যাচাই করে দেখুক, কোথাও পশ্চিমা গণতন্ত্র তো দূর, গণতন্ত্রের সমর্থক এমন কোনো শব্দও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যা রাসূল ﷺ ও তার পরবর্তী তিন প্রজন্ম অনুসরণ করতেন। আজ বাংলাদেশে অধিকারের মুলো ঝুলানো গণতান্ত্রিক শাসন-শোষণ ব্যবস্থা জারি। তাই বিদ্যমান ব্যাবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে রাসূল ﷺ-এর জীবনের সঙ্গে কাফিরদের আবিষ্কৃত মূল্যবোধকে জড়িয়ে দেয়া হচ্ছে[২]। আর সেটিও পড়ানো হচ্ছে ইসলাম শিক্ষার নামে। ইসলাম গ্রহণের পর সামগ্রিকভাবে মুসলিম বাঙালিদের ঈমানি জীবনে এত করুণ দুর্দিন এর পূর্বে কখনো এসেছিল কি? আমরা কি এতটাই দেউলিয়া হয়ে গেছি যে, ইংরেজদের শিখিয়ে যাওয়া মূল্যবোধের সাথে খাপ খাওয়াতে নবিজির জীবনীকে বিকৃত করতে হচ্ছে?

---

[১] সূরা তাহরিম ৬৬ : ৯

[২] কমিউনিজম কায়েম থাকলে হয়তো রাসূল (ﷺ)-এর জীবনের সঙ্গে তারা কমিউনিজমের মূল্যবোধের মিল খুঁজে পেতেন। গত শতাব্দীর ষাটের দশকে বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্রের যে জোয়ার এসেছিল, তখন অনেক মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের নেতা এবং কিছু সংখ্যক আলিম সমাজতন্ত্রের সঙ্গে ইসলামের 'মিল' খুঁজে পেয়েছিলেন।

নবম-দশম শ্রেণি :

নবম-দশম শ্রেণির বইতে জিহাদের ব্যাপারে বেশকিছু মিথ্যা অপবাদ দেয়া হয়েছে (মালেক, পৃ. ১১৯-১২১)। সেখানে বলা হয়,

'জিহাদ আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ পরিশ্রম, সাধনা, কষ্ট, চেষ্টা ইত্যাদি। আর ইসলামি পরিভাষায় জান-মাল, ইলম, আমল, লেখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় আল্লাহর দ্বীনকে (ইসলামকে) সমুন্নত করাই হলো জিহাদ। অনেকেই জিহাদ বলতে শুধু রক্তপাত ও কতল (হত্যা) বোঝেন। এটা সঠিক নয়। কেননা জিহাদ একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। পৃথিবীর যা কিছু 'উত্তম' তাতেই আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই শুধু জিহাদ হতে পারে[১]। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন, "তোমরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করো, যেভাবে জিহাদ করা উচিত।" (সূরা হজ, ২২ : ৭৮)

বস্তুত সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে এবং অসত্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সব ধরনের চেষ্টা, শ্রম ও সাধনাই হলো জিহাদ[২]।

পরবর্তীকালে জিহাদের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়—

ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদ তিন প্রকার-

১. *স্বীয় নফসের (প্রবৃত্তির) সাথে জিহাদ করা। যেমন : মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন-*

'প্রকৃত মুজাহিদ সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর আনুগত্য করার ব্যাপারে নিজের নফসের (কুপ্রবৃত্তির) সাথে জিহাদ করে।' (মুসনাদে আহমাদ)

এরূপ জিহাদকে রাসূলুল্লাহ ﷺ সবচাইতে বড় জিহাদ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বদর যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে বলেছেন-

'আমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের (কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ) দিকে ফিরে এসেছি।' (কানযুল উম্মাল)

২. *জ্ঞানের সাহায্যে জিহাদ করা। এরূপ জিহাদকে পবিত্র কুরআনে জিহাদে কাবির*

---

[১] অর্থাৎ, কাফির, মুশরিকরা দান করলে সেটাও জিহাদ হয়ে যাবে। কারণ, দান 'উত্তম' একটি কাজ, ন্যায়নিষ্ঠ কাজ। সেক্ষেত্রে উত্তম কাজ করলে কাফিরদেরকেও মুজাহিদ হিসেবে অভিহিত হবে, ক্রুসেডার থেকে পদোন্নতি পেয়ে তারা হয়ে যাবে মুজাহিদ! যেমন ধরুন: কোনো চ্যারিটিতে অর্থ সংগ্রহে বুশ সক্রিয় অংশগ্রহণ করার পর স্বয়ং কয়েক হাজার ডলার দান করলে আমরা বলতে পারি, 'মুজাহিদ বুশ জান ও মাল ব্যয় করে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করলেন!'

[২] ওপরের আয়াত দিয়ে তাদের এই দাবি কিভাবে সত্যায়িত হলো, সেটা ঠিক বোঝা গেল না। আল্লাহ সেভাবে জিহাদ করতে বলেছেন যেভাবে করা উচিত, এটা তো আর বলেননি যে, বাংলাদেশের নবম-দশম শ্রেণির 'ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা' বইতে যেভাবে বলা হয়েছে সেভাবে করা উচিত। জিহাদ কিভাবে করা উচিত, সেটি আমরা জানতে পারি রাসূল (ﷺ) ও পরবর্তী সর্বোত্তম তিন প্রজন্ম—সালফে সালেহীনদের আমল থেকে।

(বড় জিহাদ) বলা হয়েছে।

'সুতরাং আপনি কাফিরদের আনুগত্য করবেন না এবং আপনি কুরআনের (জ্ঞানের) সাহায্যে তাদের সাথে প্রবল জিহাদ চালিয়ে যান।' (সূরা আল-ফুরকান, আয়াত ৫২)

৩. *ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। এটি হলো জিহাদের সর্বোচ্চ স্তর। কেউ ধর্মদ্রোহী হয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে আঘাত হানলে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।*

ওপরে উল্লিখিত নফসের বিরুদ্ধে জিহাদকে বড় জিহাদ দাবি করা যে হাদীসটি উদ্ধৃত করা হয়েছে, সেটি সহীহ নয় (Al-Munajjid, 2001)। সন্দেহাতীতভাবে নফসের জিহাদ কুফরের বিরুদ্ধে জিহাদের আগে আসে; কারণ, স্বীয় নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ না করে কেউ কুফরের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশগ্রহণ করার সাহস করতে পারবে না। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

> 'তোমাদের ওপর লড়াই করাকে লিখে দেয়া হয়েছে, যদিও তোমাদের নিকট এটা অপ্রিয়। কিন্তু তোমরা যা অপছন্দ করো, হতে পারে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং যা ভালোবাসো, হতে পারে তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না।' (২ : ২১৬)

এরপর বইটিতে আবারও বলা হয়েছে,

'ইসলামি জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে এক শ্রেণির লোক জিহাদ ও সন্ত্রাসকে এক করে ফেলেছে। বস্তুত উভয়ের মাঝে বিশাল পার্থক্য বিদ্যমান। বলা যায়, এ দুটো পরস্পর বিপরীত। রাজ্য জয়, ক্ষমতা দখল, সম্পদের লোভ, খুন-খারাবি, লুটতরাজ এবং অন্যায় রক্তপাত জিহাদের উদ্দেশ্য নয়। বরং মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আল্লাহর দাসত্বে নিয়ে আসা এবং জুলুম ও শোষণের অবসান ঘটিয়ে ইনসাফ ও ন্যায়ের সুশীতল ছায়াতলে নিয়ে আসাই জিহাদের উদ্দেশ্য। ... আল্লাহ তাআলা বলেন—

এবং তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকবে, যতক্ষণ না ফিতনা দূরীভূত হয় এবং আল্লাহর দ্বীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। (সূরা আল-আনফাল, আয়াত ৩৯)

ইসলাম জিহাদের মাধ্যমে মুসলমানদের রক্তপাত করতে শেখায়নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় তিনি প্রায় একশত-এর কাছাকাছি জিহাদে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। সবগুলো জিহাদ মিলিয়ে উভয়পক্ষে পাঁচশ-এর কম লোকের প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়।

বর্তমান যুগে জিহাদের নামে যেভাবে বোমাবাজি, জঙ্গিবাদ, খুন-খারাবি ও

নিরীহ লোকজনকে হত্যা করে নৈরাজ্য সৃষ্টি করা হচ্ছে, তার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। বরং এটা সন্ত্রাসেরই নামান্তর। বস্তুত জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদ এক নয়।'

বিগত চৌদ্দশত বছরে জিহাদের মাসাইল অর্থাৎ জিহাদ সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, জিহাদের হুকুম, বিধিনিষেধ ও জিহাদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা অত্যন্ত সুবিন্যস্ত ও সুস্পষ্টভাবে অসংখ্য ফিকহের কিতাবসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে। সে-সকল ব্যাখ্যার সঙ্গে উপরিউক্ত সেক্যুলার ব্যাখ্যার যে বিশাল ফারাক বিদ্যমান, সেটির বিস্তারিত চিত্র বাংলাদেশের অন্যতম হাদীস বিশারদ জনাব মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক হাফি. সাহেবের বক্তব্যে তুলে ধরছি—

'জিহাদ শব্দটির একটি সাধারণ অর্থ এবং একটি পারিভাষিক অর্থ রয়েছে। জিহাদের সাধারণ অর্থ হলো, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে, শারীয়াতের শিক্ষা ও নির্দেশনা অনুযায়ী ইসলামের কালিমা বুলন্দ করার জন্য যে ত্যাগ, তিতিক্ষা, কষ্ট ও মুশাককাত সহ্য করা হয় তা-ই জিহাদ, তা যেকোনো পথেই হোক বা যেকোনো পন্থায়ই হোক না কেন।

কিন্তু 'জিহাদ' যা শারীয়াতের একটি বিশেষ পরিভাষা, তার অর্থ হলো, আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করা, ইসলাম ও মুসলিমদেরকে রক্ষা করা, মুসলিমদের শক্তি বৃদ্ধি করা ও কাফির-মুশরিকদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে চূর্ণ করার জন্য আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাফির-মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করা।

'জিহাদে শরয়ী'র আসল অর্থ তা-ই। যা সাধারণ অবস্থায় ফরযে কিফায়া এবং বিশেষ অবস্থায় ফরযে 'আইন' হয়ে যায়।

জিহাদ বিধিবদ্ধ হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপ :

১. জুলুম ও অত্যাচারের প্রতিউত্তর দেয়া।[১]
২. অত্যাচারিত মুসলিমদের সাহায্য করা।
৩. অঙ্গীকার ভঙ্গের শাস্তি প্রদান করা।[২]
৪. ফিতনা-ফাসাদ নির্মূল করা[৩] এবং ন্যায় ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা।
৫. কুফরের কর্তৃত্ব নির্মূল করা[৪] ও আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করা।' (হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ), ২০০৪)।

'দ্বীন প্রতিষ্ঠার সকল প্রচেষ্টাই কি জিহাদ?' এই প্রশ্নের জবাবে মাওলানা আব্দুল

[১] সর্বপ্রথম বদরের যুদ্ধ ছিল এই পর্যায়ের যুদ্ধ (২২:৩৯)।
[২] মক্কা বিজয়।
[৩] রিদ্দাহ্‌যুদ্ধ র'
[৪] ইসলামে শাসন ক্বায়েম (২২:৪১)

মালেক বলেন, 'কোনো কোনো বন্ধুকে বলতে শোনা যায় যে, ই'লায়ে কালিমাতুল্লাহ, দ্বীন প্রতিষ্ঠা বা দ্বীনের প্রচার প্রসারের নিমিত্ত যেকোনো কর্ম-প্রচেষ্টাই জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। বলা বাহুল্য 'জিহাদ' আভিধানিক অর্থে শারীয়াত সম্মত সকল দ্বীনি প্রচেষ্টাকেই বোঝায় এবং শারয়ী নুসুসসমূহের (কুরআন-হাদীসের ভাষা) কোথাও কোথাও এই শব্দটি জিহাদ ছাড়া অন্যান্য দ্বীনি মেহনতের ব্যাপারেও ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু জিহাদ যা শারীয়াতের একটি বিশেষ পরিভাষা এবং যার অপর নাম 'কিতাল ফী সাবিলিল্লাহ' তা কখনো সাধারণ কর্ম-প্রচেষ্টার নাম নয়; বরং এই অর্থে 'জিহাদ' হলো, 'আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার জন্য, ইসলামের হিফাজত ও এর মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য, কুফরের শক্তিকে চুরমার করার জন্য এবং এর প্রভাব প্রতিপত্তিকে বিলুপ্ত করার জন্য কাফির-মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করা।'

ফিকহের কিতাবসমূহে এই জিহাদের বিধিবিধানই উল্লিখিত হয়েছে। সীরাত গ্রন্থসমূহে এই জিহাদেরই নববি যুগের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে, কুরআন-হাদীসে জিহাদের ব্যাপারে যে বড় বড় ফযীলাতের কথা বলা হয়েছে, তা এই জিহাদের ব্যাপারেই বলা হয়েছে এবং এই জিহাদে শাহাদাতের মর্যাদায় বিভূষিত ব্যক্তিই হলেন প্রকৃত 'শহীদ'।

শারয়ী নুসুস এবং শারয়ী পরিভাষাসমূহের ওপর নেহায়েত জুলুম করা হবে যদি আভিধানিক অর্থের অন্যায় সুযোগ নিয়ে পারিভাষিক জিহাদের আহকাম ও ফাযাইল দ্বীনের অন্যান্য মেহনত ও কর্ম প্রচেষ্টার ব্যাপারে আরোপ করা হয়। এটা এক ধরনের অর্থগত বিকৃতি সাধন, যা থেকে বেচে থাকা ফরয। তা'লীম, তাযকিয়া, দাওয়াত ও তাবলীগ, ওয়ায-নসীহত বা দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনৈতিকভাবে কোনো কর্মপ্রচেষ্টা (যদি শারয়ী নীতিমালা ও ইসলামি নির্দেশনা মোতাবেক হয়...) এসবই স্ব স্ব স্থানে কাম্য; বরং এসব কর্মপ্রচেষ্টার প্রত্যেকটাই খিদমতে দ্বীনের এক একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। এসবের ভিন্ন ফাযাইল, ভিন্ন আহকাম এবং ভিন্ন মাসাইল রয়েছে এবং কোনটিকেই খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। কিন্তু এসবের কোনোটাই এমন নয়, যাকে পারিভাষিক জিহাদের অন্তর্ভুক্ত করা যায় এবং যার ব্যাপারে জিহাদের ফাযাইল ও আহকাম আরোপ করা যায়। এই বিষয়টি ভালোভাবে অনুধাবন করা ও মনে রাখা নেহায়েত জরুরি। কেননা, আজকাল জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ইসলামের বহু পরিভাষার মধ্যে পূর্ণ বা আংশিক তাহরিফের (বিকৃতি সাধন) প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

কেউ তাবলীগের কাজকে 'জিহাদ' বলে চালিয়ে দিচ্ছেন, কেউ তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধির কাজকে, আবার কেউ রাজনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টা বরং ইলেকশনে অংশগ্রহণ করাকেও জিহাদ বলে দিচ্ছেন। কারও কারও কথা থেকে তো এ-ও বোঝা যায় যে,

পাশ্চাত্য রাজনীতির অন্ধ অনুসরণও জিহাদের শামিল।[১] আল্লাহর পানাহ!

জিহাদে আকবর কীসের নাম?

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে নিশ্চয়ই ঐসব লোকের ভ্রান্তি স্পষ্ট হয়ে গেছে যারা 'জিহাদ মাআল কুফফার' ও 'ক্বিতাল ফী সাবিলিল্লাহ'র গুরুত্বকে খাটো করার জন্য জিহাদে আকবর (বড় জিহাদ) ও জিহাদে আসগরের (ছোট জিহাদ) দর্শন ব্যবহার করেন। তাদের বক্তব্য হলো, নফসের (প্রবৃত্তি) বিরুদ্ধে জিহাদই বড় জিহাদ এবং ক্বিতাল ফী সাবিলিল্লাহ হলো ছোট জিহাদ!

এই ভুল ধারণার ভ্রান্তি প্রমাণের জন্য আমি[২] নিজের পক্ষ থেকে কিছু বলার পরিবর্তে হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ)-এর একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। হযরত বলেন—

'আজকাল সাধারণভাবে মানুষের ধারণা এই যে, কাফেরদের সাথে লড়াই করা জিহাদে আসগর (ছোট জিহাদ) এবং নফসের মুজাহাদা (কুপ্রবৃত্তির দমন ও আত্মশুদ্ধি) জিহাদে আকবর (বড় জিহাদ)। যেন তারা নিভৃতে নফসের মুজাহাদায় নিমগ্ন হওয়া থেকে কাফিরদের সাথে লড়াই করাকে সকল ক্ষেত্রেই নিম্নমানের মনে করে। এই ধারণা ঠিক নয় বরং বাস্তব কথা হলো, কাফিরদের সাথে লড়াই করা ইখলাসশূন্য হলে বাস্তবিকপক্ষেই তা নফসের মুজাহাদা থেকে নিম্নস্তরের কাজ। এ ধরনের লড়াইকেই জিহাদে আসগর এবং এর বিপরীতে নফসের মুজাহাদাকে জিহাদে আকবর বলা হয়েছে। কিন্তু কাফিরদের সাথে লড়াই যদি ইখলাসপূর্ণ হয় তবে এই লড়াইকে জিহাদে আসগর বলা গাইরে মুহাক্কিক (অগভীর জ্ঞানের অধিকারী) সুফিদের বাড়াবাড়ি এবং এই লড়াই অবশ্যই জিহাদে আকবর এবং তা নিভৃতে নফসের মুজাহাদায় নিমগ্ন হওয়া থেকে উত্তম। কেননা, যে লড়াই ইখলাসপূর্ণ হবে তাতে নফসের মুজাহাদাও বিদ্যমান থাকবে। সুতরাং, এতে উভয় জিহাদের ফযীলতই একত্রিত হচ্ছে।'

জিহাদ কি ইক্বদামী (আক্রমণমূলক) না শুধুই দিফায়ী (প্রতিরোধমূলক)?

এই শেষ জামানার কোনো কোনো লেখকের রচনা থেকে—যা তারা জিহাদ বিধিবদ্ধ হওয়ার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং জিহাদের তাৎপর্য, উপকারিতা ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করার জন্য লিখেছেন—এই ধারণা জন্মায় যে, ইসলামে শুধু দিফায়ী জিহাদ (প্রতিরোধমূলক জিহাদ) অনুমোদিত, ইক্বদামী জিহাদের (আক্রমণমূলক জিহাদ) অনুমোদন ইসলামে নেই। তাদের এ জাতীয় কথাবার্তার কারণ হয়তো জিহাদ সম্পর্কীয় কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও খুলাফায়ে রাশিদীনের

[১] পাঠ্যবইতে যেমন করে আল্লাহর রাসূল ﷺ এর সঙ্গে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে, ঠিক তেমনি করে গণতন্ত্রকেই অনেকে জিহাদ বলে প্রচার করেন।

[২] মাওলানা আব্দুল মালেক (হাফিঃ)

বরকতময় জীবনচরিত সম্পর্কে অজ্ঞতা অথবা পাশ্চাত্যের অন্যায় আপত্তিসমূহের কারণে ভীত কম্পিত মানসিকতা।

বাস্তবতা হলো, জিহাদের মূল উদ্দেশ্য ই'লায়ে কালিমাতুল্লাহ বা ইসলামের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং কুফরের প্রভাব প্রতিপত্তি চুরমার করা। এতদুদ্দেশ্যে ইক্বদামী বা আক্রমণমূলক জিহাদ শুধু অনুমোদিতই নয়; বরং কখনো কখনো তা ফরয ও প্রভূত সাওয়াবের কারণও বটে। কুরআন-সুন্নাহর দলীলসমূহের পাশাপাশি পুরো ইসলামি ইতিহাস (রাসূলুল্লাহ ﷺ ও খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগ থেকে) এ ধরনের ঘটনায় পরিপূর্ণ। মুফতী তকী উসমানী (দা.বা.) এর ভাষায়—

'অমুসলিমদের আপত্তিতে ভীত হয়ে এসব বাস্তব বিষয়কে অস্বীকার করা বা এতে ওজরখাহীমূলক উত্তর দেয়ার চেষ্টা করা একটি অর্থহীন কাজ। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, একজন ব্যক্তিকেও জবরদস্তি করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হয় নাই এবং এর অনুমোদনও শারীয়াতে নেই। অন্যথায় জিযিয়ার পুরো ব্যবস্থাপনাই অর্থহীন হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ইসলামের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অবশ্যই তরবারি উঠানো হয়েছে। কোনো ব্যক্তি ব্যক্তিগত পর্যায়ে কুফরের অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকতে চায় থাকুক। কিন্তু আল্লাহর বানানো এই পৃথিবীতে বিধান আল্লাহরই চলা উচিত এবং মুসলিম আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার জন্য এবং আল্লাহদ্রোহীদের প্রভাব প্রতিপত্তিকে চুরমার করার জন্যই জিহাদ অরে। আমরা এই বাস্তব সত্য প্রকাশ করতে ঐসব লোকের সামনে কেন লজ্জাবনত হব, যাদের পুরো ইতিহাস সাম্রাজ্য বিস্তারের উন্মত্ত নেশায় হত্যাযজ্ঞ সংঘটনের ইতিহাস এবং যারা শুধু নিজেদের প্রবৃত্তির জাহান্নাম পূর্ণ করার জন্য কোটি কোটি মানুষের প্রাণ সংহার করেছে! যাদের নিক্ষিপ্ত গোলামির জিঞ্জিরে এশিয়া ও আফ্রিকার অধিকাংশ জাতির দেহ আজও রক্তাক্ত।' (হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.), ২০০৪)।

মুফতী তাকী উসমানী (দা.বা.) এর ভাষায়, *'যে উদ্দেশ্যে ইক্বদামী জিহাদ অতীতে জায়েয ছিল, ঠিক সেই একই উদ্দেশ্যে আজও তা জায়েয এবং শুধু এজন্য এই বৈধতাকে আড়াল করার কোনো অর্থ নেই যে, 'এটম বোমা' ও 'হাইড্রোজেন বোমা' আবিষ্কার ও উৎপাদনকারী শান্তি প্রিয়(!) ব্যক্তিবর্গ একে নিতান্তই অপছন্দ করেন এবং এতে ঐসব মহান(!) ব্যক্তিবর্গের নাক-মুখ কুঁচকে যায়, যাদের নিক্ষিপ্ত গোলামির জিঞ্জিরে এশিয়া ও আফ্রিকার অধিকাংশ জাতির শরীর রক্তে রঞ্জিত।*

মূলত এই বিষয়টিও কুফরের প্রভাব প্রতিপত্তিরই অবাঞ্ছিত ফলাফল বলে আমার বিশ্বাস যে, মানুষ ভালো-মন্দ নির্ধারণের মাপকাঠিও এই বিশ্বব্যাপী প্রচারণাকেই বানিয়ে নিয়েছে, যা দিনকে রাত ও রাতকে দিন করে মানুষের মন-মগজে স্থাপন করেছে এবং শুধু অমুসলিমই নয়, খোদ মুসলিমরাও এই প্রচারণায় কাবু হয়ে

নিজেদের দ্বীন ও ধর্মের বিধানাবলীর ব্যাপারে ওজরখাহীর পথ অবলম্বন করতে আরম্ভ করেছে। যদি অন্যায়, অসত্যের এই প্রতিপত্তিকে চুরমার করা 'সাম্রাজ্যবাদের' সংজ্ঞায় আসে, তবে এ জাতীয় সাম্রাজ্যবাদের অভিযোগ পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে মাথা পেতে গ্রহণ করা উচিত।' (আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, ২০০৪)

মাওলানা আব্দুল মালেক বলেন, 'জিহাদের উভয় প্রকার, (ইক্বদামী ও দিফায়ী) ইসলামের চিরন্তন ফরযসমূহের অন্যতম। যতদিন পর্যন্ত ভূপৃষ্ঠে কুফর ও শিরকের প্রভাব প্রতিপত্তির ফিৎনা বিদ্যমান থাকবে, ততদিন পর্যন্ত সত্য-ন্যায়ের বিজয় নিশ্চিত করার জন্য জিহাদের দায়িত্বও অবশ্যপালনীয় থাকবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন—

'আমার প্রেরিত হওয়ার সময় থেকে নিয়ে আমার উম্মাতের শেষ ভাগ দাজ্জালের সাথে লড়াই করা পর্যন্ত জিহাদ চলমান থাকবে। কোনো ন্যায়পরায়ণ শাসকের ন্যায়পরায়ণতা এবং কোনো জালিমের জুলুম একে রহিত করবে না।' (সুনানু আবী দাউদ, ১/৩৪৩)' (হযরত আব্দল্লাহ ইবনল মবারক (রহ.). ২০০৪)।



অর্থাৎ, জিহাদের ব্যাপারে লেখকগণ নিজেদেরই কোনো জ্ঞান নেই, তার ওপর তারা এ বিষয়ে একটা জাতির ভবিষ্যৎ কাণ্ডারিদের শেখানোর দায়িত্ব হাতে নিয়েছেন। এখানে তারা বেশ কিছু মারাত্মক তথ্যবিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন—

১. জিহাদের আভিধানিক অর্থকে পারিভাষিক অর্থ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

২. 'জান ও মাল' দিয়ে করা সর্বোত্তম জিহাদকে 'ছোট জিহাদ' হিসেবে সাব্যস্ত করে এর গুরুত্ব ফুটিয়ে তুলতে 'ব্যর্থ' হয়েছেন।

৩. রাজ্য জয় ও ক্ষমতা দখলকে জিহাদ থেকে আলাদা করার বিভ্রান্তিতে নিপতিত হয়েছেন। তাদের মতে, ব্যাপারটা যেন এরকম যে, জিহাদ শেষে কাফির শাসকদেরই ক্ষমতায় বহাল রাখতে হবে, যেন তারা তাদের অপকর্ম পুনরায় চালিয়ে যেতে পারে। বদরের যুদ্ধের অনুমতি প্রদানের (২২ : ৩৯) পর আল্লাহ বলেন, 'আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং সৎকাজের আদেশ করবে ও অসৎ কার্য হতে নিষেধ করবে। সকল কাজের পরিণাম আল্লাহর ইখতিয়ারে' (২২ : ৪১) খুলাফায়ে রাশিদীনের অধীনে যখন মুসলিম মুজাহিদরা এশিয়া পেরিয়ে পূর্ব ইউরোপ থেকে আফ্রিকা পর্যন্ত কাফিরদের পরাজিত করে তাদের রাজ্যকে ইসলামি খিলাফতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, তখন তারা কেন কাফির শাসকদের অপসারণ করে মুসলিম শাসককে ক্ষমতায় নিয়োগ দিয়েছেন, সে ব্যাপারে পরিষ্কার কোনো ধারণা বইতে দেয়া হয়নি।

৪. বর্তমান কুফফার রাষ্ট্র, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতে কাফিরদের তাঁবেদার শাসকগণ এবং কুফফার মিডিয়া ইসলামের সাথে সম্পর্কহীন হামলাকে যে জিহাদ হিসেবে উল্লেখ করে এবং জিহাদকে যে 'জঙ্গিবাদ' বলে অভিহিত করে, অন্যদিকে সেক্যুলার শাসকদের আগ্রাসনকে তারা কী কারণে বৈধতা প্রদান করে, সে ব্যাপারে ছাত্রছাত্রীদেরকে কোনো সতর্কবার্তা দেয়া হয়নি।

জিহাদের ব্যাপারে আজ আমাদের আচার-আচরণ হয়ে গেছে কাফিরদের মতো। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন যে, জাহিলিয়াতের আমলে কাফিররা বলত, হাজীদের পানি পান করানো ও মসজিদুল হারাম আবাদ করা ঈমান আনা ও জিহাদ করা থেকে উত্তম (০৯: ১৯)। আজ আমাদেরকেও জিহাদ এমনভাবে শিখানো হচ্ছে, যেন জিহাদ বলতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ কাফিরদের বিপক্ষে জিহাদকে বোঝাননি; ইসলামি বিধিবিধানে জিহাদ বলতে শুধু মসজিদের খেদমত করা আর সারাজীবন নফসের সঙ্গে জিহাদ করা।

অন্যদিকে, তৃতীয় শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত কোনো একটি বইতেও ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার মধ্যকার সম্পর্কের ব্যাপারে বলা নেই। নৈতিকতার সঙ্গে ইসলামের কী সম্পর্ক, কতটুকু 'নৈতিকতা' ইসলাম অনুমোদন দেয়, নৈতিকতার প্রচলিত ধারণার সঙ্গে ইসলামের কোনো বিধানের সংঘর্ষ বাঁধলে ছাত্রছাত্রীরা কিভাবে সেই সমস্যার সমাধান করবে—এই ধরনের বহু অত্যাবশ্যকীয় প্রশ্নের উত্তর লেখকগণ এড়িয়ে গেছেন।

এভাবেই ছোটবেলা থেকেই বাচ্চাদেরকে সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন ইসলাম-বিরোধী অপকর্মকে 'সামাজিক' রূপ দিয়ে সেগুলোকে কোনো প্রকার দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই সহজে গ্রহণ করার মানসিকতা তাদের ভিতর তৈরি করে দেয়া হয়। কিন্তু, পাশ্চাত্য অপসংস্কৃতির প্রভাবে প্রতিনিয়ত যেসব ফিতনার ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে এই ভূখণ্ডে, সেসব বিষয় প্রতিরোধ করার ব্যাপারে শিক্ষার কোনো বালাই নেই। আজ দেশের লক্ষ-লক্ষ তরুণ বাস্তব জীবনে পশ্চিমা সাংস্কৃতিক আগ্রাসন আর পৌত্তলিক উপাদানে ভরপুর 'বাঙালি সংস্কৃতি'র হামলার শিকার হয়ে প্রতিনিয়ত যেসব সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে, সেগুলোর ব্যাপারে কোনো সতর্কবার্তা নেই। বর্তমানে এ-দেশের বাবা-মা'রা সন্তানের চাকরির শিক্ষার ব্যাপারে যতটা গুরুত্ব দেন, সন্তানের ইসলামি শিক্ষার ব্যাপারে তাদের ততটা—বলতে গেলে কোনো মাথাব্যথাই নেই। নতুবা শিক্ষা ব্যবস্থায় ক্রমবর্ধমান এইসব ঈমান বিধ্বংসী উপাদান নিয়ে তারা বহু আগেই সচেতন হতো। আর যারা দেশের উদীয়মান তরুণ মুসলিম প্রজন্মকে নিয়ে চিন্তা করেন, তারা এ ব্যাপারে দীর্ঘমেয়াদী কিছু করার পরিকল্পনা হাতে নিলে কতই না উত্তম হতো। দেশে কি এরকম কোনো উদ্যমী চিন্তাবিদ নেই, যারা দ্বীনি শিক্ষার

সঙ্গে দুনিয়াবি[১] শিক্ষার মিশেলে মুসলিমদের জন্য স্পেশাল একটা শিক্ষাব্যবস্থা দাঁড় করাবে? শুরুতেই ইউনিভার্সিটি না হলেও, অন্তত প্রাথমিক পর্যায় নিয়ে তো কাজ শুরু করা উচিত।

ইসলামি শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক এই সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থার দ্রুত প্রসারে মুসলিমদের মাঝে আজ এমন এক প্রজন্ম তৈরি হয়েছে, দ্বীন সম্পর্কে যাদের জ্ঞানের ভিত্তি মজবুত নয়। বর্তমানে ইসলামি শারীয়া-ভিত্তিক শাসন-ব্যবস্থা ও তার সুফলের দুর্লভতা; সমগ্র পৃথিবী জুড়ে মুসলিমদের দুর্দশা দ্বীন সম্পর্কে তার সুধারণার ভিত্তি আরও দুর্বল করে দেয়। সে তখন নিজের দ্বীনকে আর অদ্বিতীয় ভাবতে পারে না; ইসলামের অনেক বিষয় নিয়ে তার অন্তরে প্রশ্নের উদ্রেক ঘটে। বর্তমান শিক্ষা ও সমাজব্যবস্থা সে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়ার বদলে সেগুলোকে আরও ঘনীভূত করে। একটা সময় দেখা যায়, ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় যেমন : শাসনব্যবস্থা, অর্থনীতি, নারী-পুরুষের অধিকার ও কর্তব্যের সীমারেখা, আইনব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে সেক্যুলারিজমের সঙ্গে ইসলামের যে বিরোধ, সেখানে সে ইসলামের নিরঙ্কুশ সমর্থক হওয়ার বদলে লিবারেলিজম আর সেক্যুলারিজমের গুণমুগ্ধ হয়ে পড়ে। অবস্থা এমন হয়ে যায় যে, কুরআনের অনেক বিষয়েও সে সন্দেহের সুরে প্রশ্ন উত্থাপন করতে শুরু করে। ঈমান ধ্বংসের এই পথে একবার চলতে শুরু করলে জাহান্নামে পৌঁছার আগ পর্যন্ত অনেকেই আর পিছু ফিরে আসতে পারে না; যদি না আল্লাহর খাস রহমত তার ওপরে নাযিল হয়।

দ্বীনবিরোধী কুশিক্ষার এই কালো ধোঁয়া আজ যেন আমাদের চতুর্দিক থেকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে; যারা ছোটবেলা থেকেই ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থায় ছিলেন, তারা এই ভয়াবহতার পুরোটা সহজে আঁচ করতে পারে না। সভ্যতার এ চলমান সংঘাতে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক হামলা ঠেকাতে মুসলিম জনপদে প্রয়োজন একদল তরুণ কর্মী, যারা লিবারেল-সেক্যুলারদের 'মূলধারার' প্রচলিত কুপ্রথা এবং কুযুক্তিগুলোকে পালটা আক্রমণ করে স্তব্ধ করে দেবে। সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে— আমাদের প্রতিপক্ষ এমন একটি দল, যারা শত বছর ধরে রাজনৈতিক মদদপুষ্ট; লেখনী, চলচ্চিত্র, বক্তব্য, মিডিয়া আর রাষ্ট্রীয় সহযোগিতায় মুসলিমদের মাঝে শক্তিশালী অবস্থান গড়ে নিয়েছে, কিন্তু তাদের সে অবস্থান মুসলিমদের ঈমানের ক্ষতি-বৃদ্ধি ব্যতীত আর কোনো কাজেই আসেনি। তাই, দীর্ঘস্থায়ী প্রোপাগান্ডার মোকাবিলায় দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা এবং ঐক্য খুবই জরুরি।

[১] অঙ্ক, রসায়ন, পদার্থ ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান

Bibliography

Prothom Alo. (2021, September 1). তালেবান যোদ্ধারা বন্দুক নিয়ে টহল দিচ্ছেন, গা মানুষের মধ্যে ভয়ের সৃষ্টি করছে... Retrieved November 22, 2021, from https://bit.ly/3HN6495

Al-Munajjid, S. M. (2001, 03 21). Greater and lesser jihaad. Retrieved from Islam Question & Answer: https://islamqa.info/en/answers/10455/greater-and-lesser-jihaad

anonymous. (2021, April 28). বসুন্ধরার এমডি: কথিত একটি 'আত্মহত্যার' মিডিয়া কভারেজ নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় তোলপাড়. Retrieved November 22, 2021, from BBC News বাংলা: https://www.bbc.com/bengali/news-56920651

Channel i. (n.d.). About Us. Retrieved November 22, 2021, from www.channelionline.com: https://www.channelionline.com/about-us/

Impress Group. (2019). Our Subsidiaries. Retrieved November 22, 2021, from impress-group.org: https://www.impress-group.org/

Legislative and Parliamentary Affairs Division. (2019). নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০. Retrieved from Laws of Bangladesh: http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-835/section-32523.html

Macaulay, T. B. (1835, February 2). Minute by the Hon'ble T. B. Macaulay, dated the 2nd February 1835. Retrieved November 23, 2021, from Columbia University: http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00generallinks/macaulay/txt_minute_education_1835.html

News Desk. (2021, September 13). Taliban claim seizing $6 million, gold bricks from Amrullah Saleh's residence. Retrieved November 23, 2021, from Geo Television: https://www.geo.tv/latest/370318-taliban-claim-to-seized-up-to-six-million-dollars-and-about-15-bricks-of-gold

Staff Correspondent. (2016, September 22). DBC News begins its journey. Retrieved November 22, 2021, from The Daily Star: https://www.thedailystar.net/city/dbc-news-begins-its-journey-1287730

Transcom Limited. (2014). Mediaworld Ltd. Retrieved November 22, 2021, from http://www.transcombd.com/: http://www.transcombd.com/mediaworld-ltd.html

অনলাইন ডেস্ক. (2021, September 7). মেয়েদের পড়াতে সচ্চরিত্রের বৃদ্ধ চায় তালেবান! Retrieved November 23, 2021, from যুগান্তর: www.jugantor.com/international/462437/মেয়েদের-পড়াতে-সচ্চরিত্রের-বৃদ্ধ-চায়-তালেবান

অনলাইন ডেস্ক. (2021, September 4). যৌনকর্মীদের 'হত্যার জন্য' তালিকা করছে তালেবান! Retrieved November 23, 2021, from যুগান্তর: www.jugantor.com/international/461416/যৌনকর্মীদের-হত্যার-জন্য-তালিকা-করছে-তালেবান

আজাদুর রহমান. (2014, March 14). সময় গেলে সাধন হবে না. Retrieved November 23, 201, from Daily Ittefaq: archive.ittefaq.com.bd/index.php?ref=MjBfMDNfMTRfMTRfNF8yNF8xXzExNTUxMg==

আদমদীঘি (বগুড়া) প্রতিনিধি. (2014, May 13). আ.লীগ নেতার নেতৃত্বে সন্ত্রাসী হামলা. Retrieved November 22, 2021, from প্রথম আলো: www.prothomalo.com/bangladesh/আ.লীগ-নেতার-নেতৃত্বে-সন্ত্রাসী-হামলা

আবদুল আজিজ. (2020, September 29). রামু বৌদ্ধ বিহারে হামলার আট বছর: বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে সংশয়. Retrieved November 22, 2021, from Bnagla Tribune: www.banglatribune.com/644780/রামু-বৌদ্ধ-বিহারে-হামলার-আট-বছর-বিচার-প্রক্রিয়া

আবূ মুহাম্মাদ আবদুল মালিক ইবনে হিশাম মুআফিরী (র.). (2007). সীরাতুন নবী (সা) দ্বিতীয় খণ্ড.

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ.

আবদুল কুদ্দুস. (2018, September 29). আসামিরা প্রকাশ্যে, সাক্ষীরা ভয়ে. Retrieved from প্রথম আলো: www.prothomalo.com/bangladesh/আসামিরা-প্রকাশ্যে-সাক্ষীরা-ভয়ে

আরটিভি নিউজ. (2021a, April 27). তরুণীর ফ্ল্যাট ভাড়া ১ লাখ টাকা, ফেসবুকে পাঠকের প্রতিক্রিয়া. Retrieved November 22, 2021, from RTV: www.rtvonline.com/social-media/128582/তরুণীর-ফ্ল্যাট-ভাড়া-১-লাখ-টাকা-ফেসবুকে-পাঠকের-প্রতিক্রিয়া

আরটিভি নিউজ. (2021b, April 27). ময়নাতদন্ত শেষে মুনিয়ার নিথর দেহ যাচ্ছে কুমিল্লা. Retrieved November 22, 2021, from RTV: www.rtvonline.com/bangladesh/128588/ময়নাতদন্ত-শেষে-মুনিয়ার-নিথর-দেহ-যাচ্ছে-কুমিল্লা

ইসলাম, ফ. (2013, October 20). বেসরকারি টেলিভিশনের রাজনৈতিক লাইসেন্স. Retrieved November 22, 2021, from প্রথম আলো: www.prothomalo.com/bangladesh/বেসরকারি-টেলিভিশনের-রাজনৈতিক-লাইসেন্স

ওয়েব ডেস্ক. (2021, April 27). লাখ টাকার ভাড়া ফ্ল্যাটে একাই থাকতেন তরুণী. Retrieved November 22, 2021, from Somoy News: www.somoynews.tv/pages/details/275695/লাখ-টাকার-ভাড়া-ফ্ল্যাটে-একাই-থাকতেন-তরুণী

কলমাকান্দা সংবাদদাতা. (2019, january 27). মন্দিরের প্রতিমা ভাঙচুরের অভিযোগে আ'লীগ নেতার ছেলে আটক. Retrieved November 22, 2021, from সমকাল: www.samakal.com/whole-country/article/19011883/প্রতিমা-ভাঙচুরের-অভিযোগে-আলীগ-নেতার-ছেলে-আটক

কামাল, স. (2021, October 17). বিয়ে পাগল তালেবানদের আতঙ্কে ঘুম হারাম বিধবাদের. Retrieved November 23, 2021, from যুগান্তর: www.jugantor.com/todays-paper/ten-horizon/476877/বিয়ে-পাগল-তালেবানদের-আতঙ্কে-ঘুম-হারাম-বিধবাদের

কুষ্টিয়া ও কুমারখালী প্রতিনিধি . (2020, December 19). বাঘা যতীনের ভাস্কর্য ভাঙচুর: মূলপরিকল্পনাকারী যুবলীগ নেতাসহ গ্রেফতার ৩. Retrieved November 22, 2021, from যুগান্তর: www.jugantor.com/country-news/375533/বাঘা-যতীনের-ভাস্কর্য-ভাঙচুর-মূলপরিকল্পনাকারী-যুবলীগ-নেতাসহ-গ্রেফতার-৩

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি. (2020, December 19). ভাস্কর্য ভাঙচুরের ঘটনায় আটক যুবলীগ নেতাকে বহিষ্কার. Retrieved November 22, 2021, from Bangla Tribune: www.banglatribune.com/658240/ভাস্কর্য-ভাঙচুরের-ঘটনায়-আটক-যুবলীগ-নেতাকে-বহিষ্কার

জাহাঙ্গীর, ড. খ. (2002/2017). হাদীসের নামে জালিয়াতি. আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স.

তমীযুদ্দীন, অ. ম., মিয়া, অ. এ., & আলী, ম. ক. (2019). ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা পঞ্চম শ্রেণি. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড.

দে, স. ক. (2016, November 10). 'গোবিন্দগঞ্জে জমি দখলের জন্য পরিকল্পিতভাবে গুলি করা হয়'. Retrieved November 22, 2021, from ডয়চে ভেলে: https://p.dw.com/p/2SULB

নওগাঁ প্রতিনিধি. (2017, November 18). নওগাঁয় প্রতিমা ভাংচুর, আ. লীগ নেতাসহ আটক ৬. Retrieved November 22, 2021, from বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম: bangla.bdnews24.com/samagrabangladesh/article1423104.bdnews

নওগাঁ প্রতিনিধি; আত্রাই সংবাদদাতা. (2017, November 19). নওগাঁয় মন্দিরে প্রতিমা ভাঙচুর, আওয়ামী লীগ নেতাসহ আটক ৬. Retrieved November 22, 2021, from দৈনিক ইত্তেফাক: archive1.ittefaq.com.bd/print-edition/first-page/2017/11/19/237465.html

নাসরীন, ড. ম., মালেক, ড. আ., চক্রবর্তী, ড. ই., & আক্তার, ড. স. (2020a). বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় ইবতেদায়ি চতুর্থ শ্রেণি. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড.

নাসরীন, ড. ম., মালেক, ড. আ., চক্রবর্তী, ড. ই., & আক্তার, ড. স. (2020b). বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় ইবতেদায়ি পঞ্চম শ্রেনি. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড.

নিউইয়র্ক টাইমস. (2017, January 24). পাঠ্যবইয়ে পরিবর্তন ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশির কাছে

অশনিসংকেত. Retrieved November 23, 2021, from প্রথম আলো: www.prothomalo.com/bangladesh/পাঠ্যবইয়ে-পরিবর্তন-ধর্মনিরপেক্ষ-বাংলাদেশির-কাছে

নিজস্ব প্রতিবেদক. (2013, October 20). বিক্রি হয়ে যাচ্ছে টিভি চ্যানেলের মালিকানা. Retrieved November 22, 2021, from প্রথম আলো: www.prothomalo.com/bangladesh/বিক্রি-হয়ে-যাচ্ছে-টিভি-চ্যানেলের-মালিকানা

নিজস্ব প্রতিবেদক. (2021, April 27). গুলশানের ফ্ল্যাট থেকে কলেজছাত্রীর লাশ উদ্ধার. Retrieved November 22, 2021, from NTV Online: www.ntvbd.com/bangladesh/গুলশানের-ফ্ল্যাট-থেকে-কলেজছাত্রীর-লাশ-উদ্ধার-896657

নিজস্ব প্রতিবেদক. (2021, April 27). গুলশানের ফ্ল্যাট থেকে তরুণীর মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় মামলা. Retrieved November 22, 2021, from জাগোনিউজ২৪.কম: https://www.jagonews24.com/national/news/662409

নিজস্ব প্রতিবেদক. (2021, April 27). গুলশানের ফ্ল্যাট থেকে তরুণীর লাশ উদ্ধার. Retrieved November 22, 2021, from প্রথম আলো: www.prothomalo.com/bangladesh/গুলশানের-ফ্ল্যাট-থেকে-তরুণীর-লাশ-উদ্ধার#:~:www.prothomalo.com/bangladesh/গুলশানের-ফ্ল্যাট-থেকে-তরুণীর-লাশ-উদ্ধার#:~:text=মোসারাত%20জাহান%20(মুনিয়া)%20নামের%20ওই,মোসারাত%20জাহানের%20বাড়ি%20কুমিল্লা%20শহরে।

নিজস্ব প্রতিবেদক. (2021, September 1). চন্দ্রনাথ পাহাড়ে আজানের ছবি ফেসবুকে, মাদ্রাসার ২ শিক্ষার্থী গ্রেফতার. Retrieved from Bangla Tribune: www.banglatribune.com/699313/চন্দ্রনাথ-পাহাড়ে-আজানের-ছবি-ফেসবুকে-মাদ্রাসার-২

পাটোয়ারী, অ. ম., হোসেন, অ. ড., হোসেন, অ. আ., শাহনেওয়াজ, অ. ড., আক্তার, ড. স., হক, ফ., দাশ, ড. উ., হক, আ., & ইমাম, স. স. (2020). বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় দাখিল ষষ্ঠ শ্রেণি. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বাংলাদেশ.

পাবনা প্রতিনিধি. (2021, March 29). সাঁথিয়ায় সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর হামলার অভিযোগে মামলা. Retrieved November 22, 2021, from Bangla Tribune: www.banglatribune.com/673493/সাঁথিয়ায়-সংখ্যালঘু-পরিবারের-ওপর-হামলার-অভিযোগে

পাবনা প্রতিনিধি. (2021, March 28). সাঁথিয়ায় হামলা-ঘরবাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় থানায় মামলা. Retrieved November 22, 2021, from Somoy News: www.somoynews.tv/pages/details/270995/সাঁথিয়ায়-হামলা-ঘরবাড়ি-ভাঙচুরের-ঘটনায়-থানায়-মামলা

পীরগঞ্জে হামলায় র‍্যাবের হাতে আটক সৈকত মণ্ডল ছাত্রলীগ নেতা. (2021, October 23). Retrieved November 22, 2021, from প্রথম আলো: www.prothomalo.com/bangladesh/district/পীরগঞ্জে-হামলায়-র‍্যাবের-হাতে-আটক-সৈকত-মণ্ডল-ছাত্রলীগ-নেতা

প্রথম আলো ডেস্ক. (2021a, August 19). এক আফগান দোভাষীর আকুতি. Retrieved November 23, 2021, from প্রথম আলো: www.prothomalo.com/world/asia/এক-আফগান-দোভাষীর-আকুতি

প্রথম আলো ডেস্ক. (2021b, September 16). 'নারীদের মানুষ মনে করে না তালেবান'. Retrieved November 22, 2021, from প্রথম আলো: www.prothomalo.com/world/asia/নারীদের-মানুষ-মনে-করে-না-তালেবান

বড়ুয়া, স. ক. (2020, May 4). লোহাগাড়ার বৌদ্ধ মন্দিরে হামলা ও ভাঙচুর. Retrieved November 11, 2021, from The Daily Star: www.thedailystar.net/bangla/node/148318

বর্মন, ত. (2021, October 3). কাশবনে কী এমন অশ্লীলতা হতে পারে. Retrieved from প্রথম আলো: www.prothomalo.com/bangladesh/কাশবনে-কী-এমন-অশ্লীলতা-হতে-পারে

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট. (2020, October 28). কালের কণ্ঠ সম্পাদককে আইনি নোটিশ. Retrieved from Bangla Tribune: www.banglatribune.com/649976/কালের-কণ্ঠ-সম্পাদককে-আইনি-নোটিশ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট. (2016, November 17). সাঁওতাল উচ্ছেদ: নেতৃত্বে ভূমি কর্মকর্তা ও রাজনৈতিক নেতারা. Retrieved November 22, 2021, from Bangla Tribune: www.banglatribune.com/157971/সাঁওতাল-উচ্ছেদ-নেতৃত্বে-ভূমি-কর্মকর্তা-ও-

রাজনৈতিক

প্রথমআলো প্রতিনিধি. (2021, October 5). ভোট না দিলে উচিত শিক্ষা দেওয়ার ঘোষণা আ.লীগ নেতার. Retrieved November 22, 2021, from প্রথম আলো: www.prothomalo.com/bangladesh/district/বাগমারায়-আলীগকে-ভোট-না-দিলে-হিন্দুদের-উচিত-শিক্ষা-দেওয়ার-ঘোষণা-দলীয়-নেতার

বিনোদন ডেস্ক . (2021, October 25). কনর্সাটে হজরে তালবিয়া অবমাননায় সামাজিক মাধ্যমে প্রতিবাদের ঝড়. Retrieved from Daily Inqilab: m.dailyinqilab.com/article/428646/কনর্সাটে-হজরে-তালবিয়া-অবমাননায়-সামাজিক-মাধ্যমে-প্রতিবাদের-ঝড়

মতিন, স., হাওলাদার, ড. অ., মণ্ডল, ড. অ., কুতুবউদ্দিন, শ., বেগম, হ. ব., শহীদুল্লাহ্, এ., & সিরাজ, ম. শ. (2020). গণিত দাখিল অষ্টম শ্রেণি. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড.

মহানগর সময় ডেস্ক. (2021, April 27). অভিজাত ফ্ল্যাটে তরুণীর ঝুলন্ত মরদেহ, যাতায়াত ছিল এক শিল্পপতির. Retrieved November 22, 2021, from Somoy News: www.somoynews.tv/pages/details/275657/অভিজাত-ফ্ল্যাটে-তরুণীর-ঝুলন্ত-মরদেহ-যাতায়াত-ছিল-এক-শিল্পপতির

মালেক, ম. আ., রশীদ, ড. ম., & ইউছুফ, ড. ম. (2020a). ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা দশম শ্রেণি. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড.

মালেক, ম. আ., রশীদ, ড. ম., ইউছুফ, ড. ম., শেখ, ম. ই., & শরীফ, ই. ম. (2020b). ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণি. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড.

মালেক, ম. আ., রশীদ, ড. ম., ইউছুফ, ড. ম., শেখ, ম. ই., & শরীফ, ই. ম. (2020c). ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা ষষ্ঠ শ্রেণি. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড.

মালেক, ম. আ., রশীদ, ড. ম., ইউছুফ, ড. ম., শেখ, ম. ই., & শরীফ, ই. ম. (2020d). ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা সপ্তম শ্রেণি. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড.

মাসুদ, হ., হক, ম. দ., & মাসুদুজ্জামান, ড. (2020). আমার বাংলা বই ইবতেদায়ি পঞ্চম শ্রেণি. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড.

মিনার, ম. ম. (2018, 10 16). জিজিয়া কি আসলেই শোষণমূলক বিধান? Retrieved from ইসলাম-বিরোধীদের জবাব - ইসলামের বিরুদ্ধে উত্থাপিত প্রশ্নসমূহের জবাব ও সংশয় নিরসন: response-to-anti-islam.com/show/জিজিয়া-কি-আসলেই-শোষণমূলক-বিধান--/197

মুহাম্মদ আবদুল কাহহার. (2016, February 18). হিন্দুত্ববাদ ও ভুলে ভরা পাঠ্যবই. Retrieved November 23, 2021, from Daily Inqilab: www.dailyinqilab.com/article/5236/হিন্দুত্ববাদ-ও-ভুলে-ভরা-পাঠ্যবই-

যুগান্তর ডেস্ক. (2021, September 6). চাকরি-স্মার্টফোনের লোভ দেখিয়ে তরুণদের দলে টানছে তালেবান. Retrieved November 22, 2021, from যুগান্তর: www.jugantor.com/todays-paper/ten-horizon/461927/চাকরিস্মার্টফোনের-লোভ-দেখিয়ে-তরুণদের-দলে-টানছে-তালেবান

যুগান্তর ডেস্ক. (2021, August 24). তালেবানের বিরুদ্ধে মৃত নারীদের ধর্ষণের অভিযোগ (ভিডিও). Retrieved November 23, 2021, from যুগান্তর: www.jugantor.com/international/457175/তালেবানের-বিরুদ্ধে-মৃত-নারীদের-ধর্ষণের-অভিযোগ-ভিডিও

যুগান্তর ডেস্ক. (2021, August 30). বিশ্ব বিবেককে নাড়া দেওয়া শিশুর সেই দৃশ্য নিয়ে যা বললেন এরদোগান. Retrieved November 23, 2021, from যুগান্তর: www.jugantor.com/international/459479/বিশ্ব-বিবেককে-নাড়া-দেওয়া-শিশুর-সেই-দৃশ্য-নিয়ে-যা-বললেন-এরদোগান

যুগান্তর ডেস্ক. (2021d, August 25). যৌনদাসী হওয়ার আতঙ্কে আফগান নারী ফুটবলাররা. Retrieved November 23, 2021, from যুগান্তর: www.jugantor.com/todays-paper/ten-horizon/457411/যৌনদাসী-হওয়ার-আতঙ্কে-আফগান-নারী-ফুটবলাররা

যুগান্তর প্রতিবেদন. (2021, April 27). গুলশানের ফ্ল্যাট থেকে তরুণীর লাশ উদ্ধারের ঘটনায় মামলা. Retrieved November 22, 2021, from যুগান্তর: www.jugantor.com/

capital/416027/গুলশানের-ফ্ল্যাট-থেকে-তরুণীর-লাশ-উদ্ধারের-ঘটনায়-মামলা

বনো, হ. আ. (2017, March 2). পাঠ্যবইয়ে সাম্প্রদায়িকতা. Retrieved November 23, 2021, from প্রথম আলো: www.prothomalo.com/opinion/column/পাঠ্যবইয়ে-সাম্প্রদায়িকতা

রিয়াজ, ড. র. (2017, January 25). 'ঋষি' 'রথ' নয়, যত দোষ 'ওড়না'র. Retrieved November 23, 2021, from Daily Inqilab: www.dailyinqilab.com/article/60456/ঋষি-রথ-নয়-যত-দোষ-ওড়নার

শেরপুর প্রতিনিধি. (2020, November 1). প্রতিমা ভাঙচুর করে পালানোর সময় আ'লীগ নেতার ছেলে আটক. Retrieved November 22, 2021, from সমকাল: samakal.com/todays-print-edition/tp-khobor/article/201164029/প্রতিমা-ভাঙচুর-করে-পালানোর-সময়-আলীগ-নেতার-ছেলে-আটক

সমকাল প্রতিবেদক. (2021, April 27). গুলশানের ফ্ল্যাট থেকে কলেজছাত্রীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার. Retrieved from সমকাল: samakal.com/capital/article/210460137/গুলশানের-ফ্ল্যাট-থেকে-কলেজছাত্রীর-ঝুলন্ত-মরদেহ-উদ্ধার

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি. (2020, April 16). প্রতিমা ভাঙচুর ও সংখ্যালঘু পল্লীতে হামলা, আ.লীগ নেতা বহিষ্কার. Retrieved November 22, 2021, from ডিবিসি নিউজ: dbcnews.tv/news/প্রতিমা-ভাঙচুর-ও-সংখ্যালঘু-পল্লীতে-হামলা-আলীগ-নেতা-বহিষ্কার

সোনারগাঁ প্রতিনিধি. (2019, October 17). সোনারগাঁয়ে আ'লীগের দুই পক্ষের দ্বন্দ্বে প্রতিমা ভাংচুর. Retrieved November 22, 2021, from সমকাল: samakal.com/index.php/todays-print-edition/tp-upakhantho/article/19103242/সোনারগাঁয়ে-আলীগের-দুই-পক্ষের-দ্বন্দ্বে-প্রতিমা-ভাংচুর

স্টাফ রিপোর্টার. (2021, April 27). কী ঝামেলায় পড়েছিল মেয়েটি, নানা রহস্য. Retrieved November 22, 2021, from Manab Zamin: mzamin.com/article.php?mzamin=271869

স্বপন, হ. উ. (2016, December 12). সাঁওতালদের বাড়িতে পুলিশের আগুন দেয়ার ভিডিও প্রকাশ. Retrieved November 22, 2021, from ডয়চে ভেলে: www.dw.com/bn/সাঁওতালদের-বাড়িতে-পুলিশের-আগুন-দেয়ার-ভিডিও-প্রকাশ/a-36739771

হক, র. (2021, May 3). একজন গণমাধ্যম কর্মীর অস্বস্তি. Retrieved November 22, 2021, from Bangla Tribune: www.banglatribune.com/679084/একজন-গণমাধ্যম-কর্মীর-অস্বস্তি

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ). (2004). কিতাবুল জিহাদ. মাকতাবাতুল আশরাফ.

হৃদয়, ম. (2021, October 13). নাসিরনগরে সাম্প্রদায়িক হামলায় অভিযুক্ত ৩ জনকে আ. লীগের মনোনয়ন. Retrieved November 22, 2021, from The Daily Star: www.thedailystar.net/bangla/সংবাদ/বাংলাদেশ/রাজনীতি/নাসিরনগরে-সাম্প্রদায়িক-হামলায়-অভিযুক্ত-৩-জনকে-আ-লীগের-মনোনয়ন-271521

হোড়, গ. (2021, May 8). কর্পোরেট-রাজনৈতিক চক্রে মিডিয়া, বের হওয়ার পথ নেই. Retrieved November 22, 2021, from ডয়চে ভেলে: https://p.dw.com/p/3t7cZ

হোসেন, আ. (2017, January 3). বাংলাদেশে পাঠ্যবই: 'ও-তে ওড়না' বিতর্ক. Retrieved November 23, 2021, from বিবিসি বাংলা: www.bbc.com/bengali/news-38495657

হোসেন, জ. (2021, August 27). আলেকজান্ডারের আমল থেকেই হারেনি পঞ্জশির. Retrieved November 23, 2021, from যুগান্তর: www.jugantor.com/todays-paper/ten-horizon/458177/আলেকজান্ডারের-আমল-থেকেই-হারেনি-পঞ্জশির

অধ্যায় ১০

প্রোপাগান্ডার কমন কিছু পদ্ধতি

বর্তমান সময়ে প্রোপাগান্ডা এতটাই বিস্তৃত রূপ ধারণ করেছে যে, এটিকে গুটিকয়েক সাধারণ পদ্ধতির মাঝে সীমাবদ্ধ করা রীতিমতো অসম্ভব। তবুও, প্রোপাগান্ডা সম্পর্কে প্রায়োগিক ধারণা পেতে নির্দিষ্ট কিছু পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। মার্কিন জনগণকে প্রোপাগান্ডার স্বরূপ অনুধাবনে সহায়তা করতে ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে ইন্সটিটিউট ফোর প্রোপাগান্ডা এনলাইসিস[১] বা আইপিএ প্রতিষ্ঠিত হয়; তাদের প্রকাশিত বইগুলোর মাঝে প্রোপাগান্ডার পদ্ধতি নিয়ে লেখা *The Fine Art of Propaganda* (১৯৩৯) বইটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। বইটিতে সর্বমোট 'প্রোপাগান্ডার সাতটি মৌলিক কৌশল'[২] আলোচনা করা হয়, আজ এত বছর পর অত্যাধুনিক প্রযুক্তির এ যুগে এসেও প্রোপাগান্ডা চিহ্নিতকরণে সেই কৌশলগুলো সমানভাবে কার্যকর।

মানুষ যেভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মাতৃভাষা ব্যবহার করে, আজকের পৃথিবীর পরিস্থিতি সচেতন দৃষ্টিতে অবলোকন করলে শুধু সচেতন মুসলিম নয়, বরং অনেক অমুসলিম ব্যক্তিদেরও এটি মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, প্রোপাগান্ডার এই বেসিক ডিভাইসগুলো যেন মাতৃভাষার মতোই আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আইপিএ উল্লিখিত প্রোপাগান্ডার মৌলিক ডিভাইসগুলো হলো—

- ১. নেইম কলিং
- ২. গ্লিটারিং জেনারেলিটি
- ৩. ট্রান্সফার
- ৪. টেস্টিমনিয়াল
- ৫. প্লেইন ফোকস
- ৬. কার্ড স্ট্যাকিং
- ৭. ব্যান্ড ওয়াগন

[১] Institute for Propaganda Analysis বা IPA
[২] Basic Propaganda Device

১. নেইম কলিং :

নেইম কলিং প্রোপাগান্ডা ব্যবহৃত হয় কোনো আইডিয়াকে যাচাই করা ছাড়াই সেটিকে বাতিল করা ও সেটির সমালোচনা করার উদ্দেশ্যে[১]।

নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি/গোষ্ঠী/জাতিকে বিশেষ কোনো নেগেটিভ শব্দ/টার্ম/বিশেষণে বিশেষিত করার মাধ্যমে কোনো প্রকার যুক্তি প্রমাণ ছাড়াই তাদের হীন সাব্যস্ত করা, এবং অন্যান্য ট্যাকটিক্স ব্যবহারের মাধ্যমে যাচাই বাছাই ছাড়াই তাদেরকে বাতিল প্রতীয়মান করা—এসব উপায়ে নেইম কলিং প্রসেস কাজ করে। বর্তমানে প্রায় প্রতিদিনই ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় নেইম কলিং প্রোপাগান্ডার ব্যাপক প্রয়োগ চলে। যেমন ধরুন—Radical/'মৌলবাদী', 'উগ্রবাদী', 'মধ্যযুগীয়' 'কঠোর' শারীয়া আইন, 'জিহাদপন্থী', Reactive/প্রতিক্রিয়াশীল, চরমপন্থী মুসলিম, ইসলামিস্ট, হোমোফোব, সশস্ত্র গ্রুপ, 'সন্ত্রাসবাদ', 'জঙ্গি'—ইসলাম ও মুসলিমদের অনেক অপরিহার্য বিষয়কে নাকচ করতে এরকম বহু পরিভাষা ব্যবহার করা হয় ইসলামকে বর্তমান জমানায় 'অপাঙ্‌ক্তেয়' ঘোষণা করতে। সেক্যুলার, কাফির, মুরতাদদের বিপরীতে মুসলিমদের 'অসহিষ্ণু' প্রমাণ করতে ব্যবহার করে থাকে।

এই টার্মগুলো ওয়েস্টার্ন সেক্যুলারিস্টদের বহুল ব্যবহৃত পরিভাষা। মুসলিমদের মাঝে যারা ওয়েস্টার্ন প্রোপাগান্ডার প্রতি এক্সপোসড—বিশেষত যারা সেক্যুলার কারিকুলামের শিক্ষা বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করে, কিন্তু ইসলামের মৌলিক শিক্ষার সঙ্গে লিবারেল সেক্যুলার মতাদর্শ থেকে উদ্ভূত বিশ্বাসসমূহের সংঘর্ষ সম্পর্কে অবগত নয়; কিংবা, ইসলাম বনাম পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রশ্নে যারা পশ্চিমা সভ্যতা, সংস্কৃতিকে বেছে নিয়েছে—তাদেরকেও এই টার্মগুলো যথেচ্ছ ব্যবহার করতে দেখলে আফসোসের সঙ্গে বলতে হয়, এই পথভ্রষ্ট ব্যক্তিরা ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের প্রশ্নে সকল যুক্তি প্রমাণকে যাচাই বাছাই ছাড়াই বিনা প্রশ্নে খারিজ করে দেয়; কিংবা ইসলামের ব্যাপারে তাদের হৃদয়ে সন্দেহ বাসা বেঁধে রয়েছে।

বাংলাদেশে ঘটা এক ঘটনা বলি, দেশে নির্দিষ্ট ঘরানার ভাইদের নিকট জনপ্রিয় একজন শাইখকে বিশ্বখ্যাত এক শহীদ আলিম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি সেই শহীদকে নিয়ে প্রথমে কিছুক্ষণ ঠাট্টা-বিদ্রূপ করলেন। অতঃপর তাঁকে প্রতিক্রিয়াশীল[২] হিসেবে আখ্যায়িত করে সরাসরি বাতিলের খাতায় ফেলে দিলেন। এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে সাধারণ মুসলিমরা যখন এমন রুচিহীন আচরণ নিয়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখায়, তখন তিনি তার এই আচরণের পেছনে যুক্তি দেখাতে গিয়ে বলেন, 'এটা তো একটা বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই।' অর্থাৎ, মুসলিম ভাইকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করা, তাঁকে পশ্চিমা

[১] "Name calling is used to make us reject and condemn the idea without examining the evidence." (Lee & Lee, 1939).

[২] Reactive

ট্যাগ দেওয়া—এসব উনার কাছে বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই।

এই ঘটনা প্রমাণ করে, সিংহের বীরত্বের ব্যাপারে বেড়ালের মন্তব্য জানার চেষ্টা করা মূর্খের কাজ। এই ঘটনার ঠিক পরপরই ইতিপূর্বে 'আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির'[১] সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রোগ্রামে উনার যোগদানের ব্যাপারটাও সোশ্যাল মিডিয়ায় উঠে আসে। সেই ঘটনার যৌক্তিকতা হিসেবে এবার তিনি বলেন, তিনি এই ব্যাপারে জানতেন না, তিনি শুধুই একটি স্টাডি ট্যুরের দাওয়াত পেয়েছিলেন[২]। দেশখ্যাত মিডিয়া ব্যক্তিত্বরা মুসলিম উম্মাহর সিংহপুরুষদের ওয়েস্টার্ন ট্যাগ লাগাতে দুইবার চিন্তা করে না, সেটাকে বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই হিসেবে দাবি করে। অথচ ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড-এর প্রোপাগান্ডার বেসিক এক্টিভিটি সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যায়, তার ওপর ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সেক্যুলারিস্টদের বহুল চর্চিত নেইম কলিং পরিভাষা ব্যবহার করেন, তখন বাকি সাধারণ জনগণের কী হাল, সেটা তো সহজেই অনুমেয়[৩]।

❁ ২. গ্লিটারিং জেনারেলিটি :

গ্লিটারিং জেনারেলিটি প্রোপাগান্ডার ব্যবহার হয় প্রমাণাদি 'পরীক্ষা' করা ছাড়াই কোনো বিষয়কে গ্রহণ ও অনুমোদন করানোর লক্ষ্যে[৪]।

প্রোপাগান্ডার এই ডিভাইসটি বিশেষ কোনো দল/মত/ব্যক্তির ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের গ্রহণযোগ্যতাকে প্রশ্নের ঊর্ধ্বে নিয়ে যায়। যার ফলে টার্গেটকৃত অডিয়েন্সরা কোনোপ্রকার যাচাইবাছাই ছাড়াই তা গ্রহণ করে নেয়। এটি মূলত নেইম কলিং প্রোপাগান্ডার বিপরীত প্রসেস। নেইম কলিং যেমন আমাদেরকে প্রমাণ যাচাই ব্যতীত কোনো বিষয় পরিত্যাগ করার চেষ্টা করে, তেমনি গ্লিটারিং জেনারেলিটি প্রোপাগান্ডা পদ্ধতি প্রমাণ যাচাই ব্যতীতই কোনো বিষয়কে অনুমোদন ও গ্রহণ করানোর চেষ্টা করে। আর এতে ব্যবহৃত বিমূর্ত পরিভাষাগুলো 'ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে ভিন্ন ভিন্ন মানুষের কাছে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে' ব্যবহার করা যায়।

এই প্রোপাগান্ডায় বহুল ব্যবহৃত কিছু পজিটিভ ভার্চুয়াল শব্দ—যেমন : স্বদেশপ্রেম, স্বাধীনতা, শান্তিরক্ষা, নারী স্বাধীনতা, প্রগতি, বিশিষ্টজন, বুদ্ধিজীবী,

---

[১] Interfaith Love

[২] একজন আলিম অন্য একজন আলিমের বিপক্ষে বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই করছে, অথচ ইন্টারফেইথ প্রোগ্রামের ব্যাপারে তার কোনো ধারণাই নেই।

[৩] আশার ব্যাপার হলো, সাধারণ লোকজনের মাঝে প্রোপাগান্ডার ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে, নতুন প্রজন্মের মাঝে শৈশবেই সুস্পষ্ট সেক্যুলারিজমের যে বীজ রাষ্ট্রীয় স্পন্সরশীপের সাহায্যে বপন করা হচ্ছে, তাতে আশঙ্কা হয়, আল্লাহ না করুন, অনেক ভাই-বোন হয়তো অচিরেই ইরতিদাদের দিকে পা বাড়াবেন।

[৪] Glittering Generality is used to make us accept and approve the thing without examining the evidence.

সুশীল সমাজ, চেতনা, সংস্কৃতি—ইত্যাদি পরিভাষাগুলো প্রতিদিন খবরের পাতায় কিংবা টিভির পর্দা খুললেই চোখে পড়ে, কানে যায়। এই শ্রেণির প্রোপাগান্ডা ব্যবহার করে সাম্রাজ্যবাদী আর ডেমোক্রেটিক শাসকেরা জনগণের চোখে মিথ্যা ঠুলি পরিয়ে রাখে। একদিকে আমাদের ঘাড়ে জোয়ালের মতো চাপিয়ে দেয়া হয়েছে পুঁজিবাদের ঘানি। আর অন্যদিকে 'সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ'—এই স্লোগানকে পুঁজি করে গণতন্ত্র নামক মতবাদের দ্বারা সৃষ্ট জুলুমের স্বর্গরাজ্যে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে জালিমরা তখন অবিরত শোষণ করে চলেছে জনগণের রক্ত-ঘাম পানি করা সম্পদ।

আজ সংস্কৃতির নামে পহেলা বৈশাখে যেসব কর্মকাণ্ড করা হয়, সেগুলোর অধিকাংশের শেকড় প্রোথিত রয়েছে পৌত্তলিকতায়। ইসলামের মৌলিক বিধানের সঙ্গে সংস্কৃতির যে অংশের সাংঘর্ষিকতা থাকবে, যে সংস্কৃতির সঙ্গে কুফরি বা শিরকি মতবাদের সম্পর্ক অধিক। সেই আচার-আচরণ-উৎসবকে জীবন থেকে চিরতরে বিদায় করে দেয়াটাই ঈমানের পরিচয়। এ উদ্দেশ্যে আমরা দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা স্মরণ করতে চাই।

- **এক**, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদীনায় গেলেন, তখনকার এক ঘটনা, আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন হিজরত করে মদীনায় আসলেন তখন মদীনাবাসীর দুটি উৎসবের দিবস ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের জিজ্ঞেস করলেন, এ দুটি দিবস কী? (কী হিসেবে তোমরা এ দু'দিন উৎসব পালন করো?) তারা বলল, জাহিলিয়াত তথা ইসলামপূর্ব যুগে আমরা এ দিন দুটিতে উৎসব পালন করতাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহ তোমাদেরকে এ দুটি দিনের পরিবর্তে এরচেয়ে উত্তম দুটি দিন দান করেছেন—ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতর[১] (বারী, ২০১৭)।
- **দুই**, আবু ওয়াকিদ আল-লাইসী ﷺ থেকে বর্ণিত, হুনাইনের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ যাত্রা শুরু করলেন। তিনি মুশরিকদের একটি গাছের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই গাছটিকে 'যাতু আনওয়াত' বলা হতো। তারা এর মধ্যে তাদের অস্ত্রসমূহ লটকিয়ে রাখত। সাহাবিগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাদের যাতু আনওয়াতের মতো আমাদের জন্য একটা যাতু আনওয়াতের ব্যবস্থা করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সুবহানাল্লাহ! এটা তো মূসা ﷺ-এর উম্মাতের কথার মতো হলো। তারা বলেছিল, কাফিরদের যেমন অনেক উপাস্য রয়েছে তদ্রূপ আমাদেরও উপাস্যের ব্যবস্থা করে দিন। সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীগণের নীতি অবলম্বন করবে (at-Tirmidhi, 864, Hadith no. 2180; n.d.)।

[১] সুনানু আবী দাউদ, ১১৩৪; সুনানুন নাসায়ী, ১৫৫৬; মুসনাদু আহমাদ, ১২০০৬।

সংস্কৃতি, দেশপ্রেম, মানবতা, চেতনা, নারীর ক্ষমতায়ন—সাংস্কৃতিক জমিদার আর সেকুলাররা তাদের স্ট্যান্ডার্ডে তাদের ডিফাইন করা সংজ্ঞাকে যখন মুসলিম তরুণ প্রজন্মের মস্তিষ্কে গেঁথে দিতে চায়, তখন প্রোপাগান্ডার এ শব্দজাল তাদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরে। ইসলামি শিক্ষার অভাব নতুন প্রজন্মকে সেই আক্রমণ ঠেকানোর ঢালটাই হাতে নেয়ার সুযোগ দেয় না। আজকালকার পিতামাতা তো সন্তানকে ন্যূনতম কুরআন তিলাওয়াতের শিক্ষা দেয়াও সময়ের অপচয় মনে করে, এমন পরিস্থিতিতে এসব আদর্শিক লড়াইয়ে মুসলিম সন্তানেরা কিভাবে ইসলামি সভ্যতা আর পাশ্চাত্য সভ্যতার পার্থক্য অনুধাবন করতে সক্ষম হবে?

❁ ৩. ট্রান্সফার :

ট্রান্সফার বা স্থানান্তর প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য, সম্মানের দাবিদার একটি বিষয়ের সাথে অন্য একটি বস্তু বা বিষয়কে সংযুক্ত করে প্রথম বিষয়টির গ্রহণযোগ্যতাকে দ্বিতীয় বস্তু/বিষয়ের মাঝে ট্রান্সফার করা হয়।[১]

এই ধরনের প্রোপাগান্ডা প্রতিনিয়তই জনগণের ওপর প্রয়োগ করা হয়, কিন্তু ইসলামের সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনগণ এ ব্যাপারে ধোঁকায় পতিত হয়। বর্তমানে বেশিরভাগ কমার্শিয়াল বিজ্ঞাপনেই কোনো-না-কোনো উপায়ে তাদের প্রোডাক্টের সাথে দেশপ্রেমের একটা সম্পর্ক ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। শৈশবে দেশপ্রেমের জাল হাদীস পড়ে বড় হওয়া জাতীয়তাবাদী জনগণও সেই শুভঙ্করের ফাঁকি ধরতে পারে না। চায়ের কাপ থেকে শুরু করে ক্রিকেট পর্যন্ত, সব জায়গায় একই চিত্র, একই প্রচেষ্টা। অপরদিকে, সঙ্গীত-নৃত্য-অঙ্কন-সাহিত্য—এসকল বিষয়কে সম্পৃক্ত করে দেয়া হয় কলকাত্তাই বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে। তাদের ভাষায়—এক শ্রেণির নর্তক-নর্তকীদের স্ট্যান্ডার্ড যদি আপনি দেহমনে ধারণ করেন, তবে আপনি বাঙালি হয়ে উঠতে পারলেন। নতুবা আপনাকে শুনতে হবে 'আপনি অমুক স্থানে চলে যান'।

❁ ৪. টেস্টিমনিয়াল :

টেস্টিমনিয়াল বা সাক্ষ্যমূলক প্রোপাগান্ডা হচ্ছে ট্রান্সফার প্রোপাগান্ডার মানবীয় ভার্শন। বিখ্যাত/কুখ্যাত কোনো ব্যক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত করে প্রোপাগান্ডিস্টদের টার্গেটকৃত কোনো আইডিয়া/প্রোডাক্ট/ব্যক্তি/গোষ্ঠীকে গ্রহণযোগ্য বা বাতিল সাব্যস্ত করা।[২]

---

[১] "Transfer carries the authority, sanction and prestige of something respected and revered over to something else to make the latter acceptable."

[২] "Testimonial consists in having some respected or hated person say



একটা চমকপ্রদ বিষয় মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। আমাদের দেশে প্রভাবশালী ব্যক্তি কখনো কখনো মুখ ফসকে ইসলাম নিয়ে অবমাননাকর বক্তব্য দিয়ে ফেলেন। তারপর বাংলাদেশের জনগণ তার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। যারা খাঁটি সেক্যুলার, তারা ছাড়া বাকিরা ওই মুহূর্তে বিশেষ এক ট্রিকস খাটান। এই ধরনের ভুলের পর তারা যেমন ইসলামি বিভিন্ন ব্যাপারে পজিটিভ বক্তব্য বা পোস্ট দিয়ে থাকেন, অনেকে আবার মুসলিমদের মাঝে জনপ্রিয় কোনো ইসলামি ব্যক্তিত্বের সঙ্গে কোনো প্রোগ্রামের আয়োজন করেন কিংবা পূর্বের প্রোগ্রামের ভিডিও পুনরায় প্রচার করেন। যার উদ্দেশ্য, জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি, বা বিষয়ের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করে নিজের হারানো গ্রহণযোগ্যতা ফিরে পাওয়া। অর্থাৎ, জনপ্রিয়তার ড্যামেজ কন্ট্রোলের জন্য তারা ইসলামকে ব্যবহার করে থাকেন। বাংলাদেশে এই 'কাজে' ব্যবহৃত সবচেয়ে জনপ্রিয় ইসলামি ঘটনাটি হলো মদীনা সনদ। আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে এ সনদের প্রচারই সবচে সুবিধাজনক। কারণ, শারীয়া আইনের কথা বললে তো আবার নিজের ফাঁদে নিজেই পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তাই, শারীয়া পূর্ণতা পাবার আগে ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ের

---

that a given idea/program/product/person is good or bad."

মদীনা সনদের কথা বলে ইসলামের মৌলিক বিষয়াদি সম্পর্কে না জানা সংখ্যাগুরু মুসলিমদের আবেগ কাজে লাগানো সহজ আর 'লাভজনক' ও বটে।

এই ধরনের প্রোপাগান্ডা চালানোর জন্য খ্যাতিমান ব্যক্তিটির অনুমতির কোনো প্রয়োজন নেই। কাল্পনিক চরিত্র দিয়েও এই শ্রেণির প্রোপাগান্ডা চালানো সম্ভব। যেমন : ১ম, ২য় বিশ্বযুদ্ধে অ্যামেরিকা তাদের কমিক ক্যারেক্টার 'ক্যাপ্টেন অ্যামেরিকা', 'আঙ্কেল স্যাম'-কে ব্যবহার করে সাধারণ নাগরিকদের যুদ্ধে সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়ে পোস্টার তৈরি করত।

ফেব্রুয়ারি ১৫, ২০১৩, দেশবাসীর প্রিয় বাংলাদেশ ক্রিকেট টিমের 'মুক্তিযোদ্ধারা' মোমবাতি প্রজ্বলিত করে গণজাগরণ মঞ্চের সাথে 'যুদ্ধাপরাধীদের' ফাসির দাবিতে একাত্মতা ঘোষণা করেন। দেশব্যাপী তাদের যে জনপ্রিয়তা, রাজনৈতিক বিরোধীপক্ষকে দমনের কৌশলে প্রহসনের বিচারে ক্রিকেট টিমের জনপ্রিয়তাকে ব্যবহার করা হয়।

এই সেই তথাকথিত 'গণজাগরণ' মঞ্চ, যার নেতৃত্বে ছিল কিছু শাতিমে রাসূল। সেই মঞ্চকে ব্যবহার করে তারা ইসলাম-বিদ্বেষ আর রাসূলুল্লাহ ﷺ ও উম্মুল মুমিনীনদের নিয়ে সর্বনিকৃষ্ট অশ্লীল গালি, নোংরা ছবি আর চরম পর্যায়ের মিথ্যাচার ছড়াতে থাকে। আর তাদের সেইসব কর্মকাণ্ডের ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট দেয়ার জন্য তৎকালীন প্রতিষ্ঠিত শক্তি শোলাকিয়ার ইমাম সাহেবকে তৎকালীন সময়ে সেখানে উপস্থিত করে। যথারীতি তিনি সেখানে উপস্থিত হলেন, শাতিমদের গুণগান গাইলেন, শাতিমদের বিরুদ্ধে তোলা সুস্পষ্ট প্রমাণ ও অভিযোগকে মিথ্যাচার ও হলুদ মিডিয়ার কারসাজি হিসেবে দাবি করলেন। এত বড় একজন ব্যক্তিত্ব যখন এহেন কুকর্ম করে, দেশের সাধারণ জনগণ তখন দিশেহারা, কেউই কিছু বুঝে উঠতে পারছে না, ঠিক যেন অ্যামেরিকার ইরাক আক্রমণের পূর্ব মুহূর্তের পরিস্থিতি। এভাবে ঘোলা পানিতে মৎস্য শিকারে সফল হয় স্টেট-স্পন্সরড প্রোপাগান্ডা।

ট্রান্সফার আর টেস্টিমনিয়াল, এই দুটি প্রোপাগান্ডা পদ্ধতি কখনো কখনো একইসাথে ব্যবহৃত হয়। বর্তমান পশ্চিমা মুসলিম কমিউনিটিতে এর ভূরিভূরি উদাহরণ দেখা যায়। অধুনা LGBTQ কমিউনিটিগুলো প্রধান পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোর প্রতিটি স্তরে—মুসলিম কমিউনিটিসহ—তাদের গ্রহণযোগ্যতা ও প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি করতে প্রকাশ্যে/গোপনে নিরন্তর চেষ্টা করে যাচ্ছে। এমন এক ক্রান্তিকালীন সময়ে ওমর সুলাইমানের মতো কিছু পশ্চিমা 'স্কলার' দাবি করছে, 'LGBT কমিউনিটিও যেহেতু "নির্যাতিত", তাই মুসলিমদের উচিত নিজেদের "রাজনৈতিক" অধিকার আদায়ে "মজলুম" LGBT কমিউনিটির সাথে যোগদান করা এবং তাদের সাথে কোয়ালিশন গঠন করা।' এসব 'স্কলাররা' সেখানকার মসজিদ-ভিত্তিক কমিউনিটিকে

কাজে লাগিয়ে LGBTQ কমিউনিটির সমর্থনে প্রোগ্রাম করে। LGBT কমিউনিটির প্রোগ্রামে উপস্থিত হয়ে সেই 'ইমাম' বলেন, 'আমরা একই সাথে কাঁদব, একই সঙ্গে ইবাদত করব (!), একসাথে দাঁড়াব—স্ট্রেইট[১], গে, ফ্লোরিডান ও টেক্সান[২] (সকলেই)।' প্রো-এলজিবিটি ওমর সুলাইমানের মতে, 'স্বাধীনতা এখানে আছে—এই অ্যামেরিকায়, তাকিয়ে দেখুন, এখানে কোনো ধর্মান্ধ ও সন্ত্রাসী নেই' (FOX 4 News, 2016)।

অন্য একটি সাক্ষাৎকারে ওমর দাবি করেন, '(অ্যামেরিকায়) গে মুসলিম রয়েছে, তারা আমাদেরই একটি অংশ। তারা যেসব মসজিদে যাবে, সেসব মসজিদের ওপর নির্ভর করে যে, মসজিদগুলো তাদের মেনে নিবে কি না। এসব মসজিদ কতটা 'অ্যামেরিকান', মসজিদগুলো নিজেদেরকে দেশের সাথে কতটা খাপ খাইয়ে নিতে পারে, এসব বিষয়ে অনেক কাজ করতে হবে'[৩] (DiFurio, 2016)।

আল্লাহ তাআলার ঘর মসজিদকে ব্যবহার করে কওমে লুতের আপডেটেড ভার্সনকে মুসলিমদের মাঝে প্রোমোট করার এই প্রচেষ্টায় তারা নিজেদের 'সেলেব্রিটি' 'কম্পেশনেট (দয়াশীল) ইমাম'-এর ইমেজটাকে ব্যবহার করছে নিকৃষ্ট উপায়ে[৪]। সামাজিক, রাষ্ট্রীয় চাপের পাশাপাশি নেতৃস্থানীয় খতিবদের এহেন কর্মকাণ্ডে মুসলিমদের মাঝেও এর চরম প্রভাব পড়ছে। Pew Research Centre-এর এক পাবলিক পোলের রেজাল্টে দেখা যায়, বর্তমানে অ্যামেরিকার অর্ধেকের বেশি মুসলিম এই LGBTQ কমিউনিটিকে নৈতিকভাবে মেনে নিয়েছে (Pew Research Center, 2017)।

❁ ৫. প্লেইন ফোকস :

পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট তিনি। একজন সঙ্গীকে সাথে নিয়ে হঠাৎ করেই রাস্তার পাশের মিডল ক্লাস কোয়ালিটির একটি রেস্টুরেন্টে ঢুকে পড়লেন। তারপর সেখানে সাধারণ মানুষের সাথে বসে অর্ডার করলেন একটা নর্মাল পিৎজা। এতটুকুতেই শেষ নয়, কখনো কখনো তিনি বড়শি হাতে মাছ ধরতে বসে

---

[১] যারা বিপরীত জেন্ডারের কাউকে বিয়ে করে।

[২] "We are determined to cry together, to pray together, to stand together-straight, gay, Floridian and Texan."

[৩] "Gay Muslims exist, and they are a part of our community. It depends on the mosques they are going to, whether the mosques are going to accept them or not. A lot of that has to do with how American those mosques are, how acclimated they are to the country they are in."

[৪] যেসব মুসলিম গে, কিংবা লেসবিয়ান, তাদের চিকিৎসার ব্যাপারে মুসলিম কমিউনিটি ভূমিকা রাখতে পারে, সেটি বরং মুসলিমদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু, তাদের কৃতকর্মকে মুসলিমদের মাঝে 'norm' বা স্বাভাবিক করাটা চূড়ান্ত পর্যায়ের ঘৃণিত অপকর্ম।

পড়েন লেকের পাড়ে; কিংবা প্রিয় কুকুরকে সাথে নিয়ে কখনো কখনো পাবলিক পার্কে কয়েক চক্কর ঘুরেও আসেন।

এই ঘটনাগুলো দেখে অনেকেই আবগের ঢেউয়ের তোড়ে ভেসে যায়, 'আহা! খাঁটি মাটির মানুষ!' পশ্চিমা দেশগুলোতে এ ধরনের ঘটনা খুবই কমন। সেখানকার শাসকরা প্রায়ই জনগণের সঙ্গে পাবলিক ট্রান্সপোর্টে চড়েন। পলিটিশিয়ানদের মাঝে জনগণের সাথে মিশে যাওয়ার এই যে এক পরিকল্পিত আচরণ, এটিকে বলা হয় প্লেইন ফোকস প্রোপাগান্ডা কৌশল, সাধাসিধা নাগরিক সেজে ঘুরে বেড়ানো[১]। এই কৌশলের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি/লিডার তাঁর টার্গেট দর্শক/শ্রোতা/পাঠককে এটি উপলব্ধি করানোর চেষ্টা করে যে, সে 'তাদেরই অন্তর্ভুক্ত' একজন 'সাধারণ মানুষ'; সাধারণ মানুষের সাথে তাঁর চাওয়া পাওয়ার কোনো পার্থক্য নেই[২]।

এই ধরনের প্রোপাগান্ডা এপ্লাই করতে চাইলে আপনাকে কিছু কায়দা-কানুন রপ্ত করতে হবে। যখন যে পরিবেশে, যাদেরকে টার্গেট করে 'মাঠে' নামবেন, তখন সেই পরিবেশে তাদের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের প্রেসিডেন্ট বা পিএমরা প্রায়ই গির্জায় গিয়ে প্রার্থনা করেন, বাইবেল হাতে নিয়ে ছবি তোলেন। আবার যখন মুসলিমদের সাথে রাজনৈতিক প্রয়োজনে একাত্মতা ঘোষণা করার দরকার পড়ে, তখন সেখানকার নারী শাসকরা মুসলিম নারীদের মতো মাথায় কাপড় দেন। সাম্প্রতিক সময়ে আমাদের দেশেও এই কৌশল চর্চার বহু নজির রয়েছে। কখনো দেখা যায়, অমুক নেতা গণপরিবহনে চড়ে বসেছেন, আবার কখনো দেখা যায়, তৃণমূল নেতারা হঠাৎ করেই (ক্যামেরাম্যান-সহ) কাস্তে হাতে মাঠে নেমে কৃষককে ধান কাটায় সহযোগিতা শুরু করলেন। অথচ, জাতির বড়-ছোট অধিকাংশ চুরি-ডাকাতি আর দুর্নীতির পিছনে এইসব 'জনদরদী' ব্যক্তিদের সম্পৃক্ততা থাকে। প্রকৃতপক্ষে, পশ্চিমা রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে এই কৌশলটাও তারা পশ্চিমা দেশগুলো থেকেই শিখেছেন। সচরাচর এ দেশের কর্তাব্যক্তিরা নিজেদের ভিআইপি পরিচয় দিতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে, তাদের গাড়ির বহর গেলে মুমূর্ষু রোগী-সহ অ্যাম্বুলেন্স জ্যামে আটকে যায়। তবে, পশ্চিমের হাতেগোনা কয়েকটি রাষ্ট্রে প্রকৃতপক্ষেই সাধারণ জীবনযাপন করা শাসক রয়েছেন, সেটি নিতান্তই ব্যতিক্রম।

❁

[১] এমনটি যেন কেউ ধারণা না করে যে, যে শাসক বা ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা এই কাজ করে, তাদের প্রত্যেকেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এরকমটি করে থাকে। তবে, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ক্ষেত্রে তাদের এলিট মনোভাব আর রাজনৈতিক অপকর্মের সঙ্গে এই ধরনের আচরণ খাপ খায় না।

[২] "The method by which a speaker attempts to convince his audience that he and his idea are good because they are 'off the people', the 'plain folks'."

❁ ৬. কার্ড স্ট্যাকিং :

অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর মতো বাংলাদেশেও টকশো বেশ জনপ্রিয় একটি প্রোগ্রাম। রাজনৈতিক ও অন্যান্য বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য জানতে উল্লেখযোগ্য নাগরিক টকশো দেখেন। তো, কিছু টকশোতে কখনো কখনো দেখা যায়, কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা বা বিতর্কের জন্য কয়েকজন অতিথিকে নিয়ে আসা হয়। কখনো-বা দুই পক্ষের একজন বা দুজন করে আলোচককে এক টেবিলে নিয়ে আসা হয়। তবে, এ ব্যাপারটা অনেকেই হয়তো খেয়াল করেন না যে, ইসলামের কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যখন আলোচনা করা হয়, তখন তিন-চারজন সেক্যুলারদের বিপরীতে একজন আলিম উপস্থিত থাকে। সেইসাথে সঞ্চালকও থাকেন ছদ্ম-সেক্যুলার, যদিও তারা চাতুরতার সঙ্গে সে কথা গোপন রাখেন। দেখা যায়, উপস্থিত আলিমের কথার মাঝখানে তাকে চুপ করিয়ে সঞ্চালক অন্য একজনকে কথা বলতে অনুরোধ করেন। অতঃপর সবাই মিলে বাঘের মতো সেই আলিমের ওপর ঝাপিয়ে পড়ে তাকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়েন। 'ম্যাচ' শেষে ফলাফল : 'দ্বিপাক্ষিক' আলোচনার নামে সেক্যুলারদের নিজস্ব মতবাদের সফল প্রচার। যারা আলোচ্য বিষয়ে ইসলামের প্রকৃত নীতি জানেন না, তাদের অনেকে প্রোগ্রাম শেষে সঠিক তথ্য জানার পরিবর্তে অর্ধসত্য বা মিথ্যাটাই 'সত্য' হিসেবে ভেবে নেন।

এই কৌশলটি হলো কার্ড স্ট্যাকিং প্রোপাগান্ডা কৌশল। এই পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা আইডিয়ার ব্যাপারে কৌশলী কিছু তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়ে সে সম্পর্কে খুবই ভালো বা খারাপ ধারণা সৃষ্টি করা হয়।[১]

লিবারেল-সেক্যুলাররা যখন তরুণ প্রজন্মের মাঝে তাদের মতাদর্শ প্রচার করে, তখন তারা তাদের শেখায়—তাদের মতাদর্শের মাঝেই রয়েছে স্বাধীনতা, মুক্তি, প্রগতি, স্বচ্ছতা। কিন্তু, নিজেদের 'নিরপেক্ষ' দাবি করা সেক্যুলারদের কখনোই দেখা যায় না তাদের সেক্যুলারিজমের রক্তাক্ত ইতিহাসের কথা খুলে বলতে। ময়ূরপুচ্ছ লাগানো কাকের মতোই বঙ্গীয় লিবারেলরা মুসলিম নারীদের স্বাধীনতা শেখাতে গিয়ে কখনো বলে না যে, পশ্চিমা সমাজে আজ অনেক রাষ্ট্রে জন্ম নেয়া অধিকাংশ সন্তানই জারজ[২]। তাদের পরিবারের অবস্থা তথৈবচ। এখনো পর্যন্ত সেখানে নারীরা

---

[১] "Card stacking involves the selection and use of facts or falsehood, illustrations or distortions, and logical or illogical statements in order to give the best of the worst possible case for an idea, program, person or product."

[২] আমেরিকায় মোট জন্মের ৪১% শিশু এই বিয়ে ছাড়া বাবা-মায়ের সন্তান, যাকে বলা হচ্ছে fragile family. দেখুন ২০১৬ সালে ইউরোপ-আমেরিকার অর্ধেক শিশু বিবাহ-ছাড়া (out-of-wedlock) জন্ম।

দেশ	মোট জন্মের কত শতাংশ	দেশ	মোট জন্মের কত শতাংশ

জীবনে স্থিতিশীলতা খোঁজে। আজীবন পাশে থাকবে—এমন একজন পুরুষ সঙ্গী খুঁজতে খুঁজতে অনেকের জীবন চলে যায়। আর আমরা চকচকে সেক্যুলারিজম, লিবারেলিজমের মোহে পড়ে অন্ধের মতো মরীচিকার পেছনে ছুটে চলি, দিন শেষে হিসাবের খাতায় রয়ে যায় শুধুই দেনার গল্প।

❁ ৭. ব্যান্ড ওয়াগন :

ব্যান্ড ওয়াগন প্রোপাগান্ডার থিম হলো, 'সকলেই—অন্তত আমাদের সবাই এটি করছে'[১], তাই আমাদেরকেও 'জনতার স্রোতে' গা ভাসিয়ে দেয়া উচিত। সবাই যেদিকে যাচ্ছে, আমাদেরকেও সেদিকে চলা উচিত। এত ভালো-মন্দ যাচাই করে লাভ নেই।

ব্যান্ড ওয়াগন প্রোপাগান্ডার সফলতার পিছনে সাইকোলজিকাল কারণও রয়েছে। মানুষের বৈশিষ্ট্যই এটা যে, সে সবসময় বিজয়ী দলে থাকতে চায়। অধিকাংশ পলিটিশিয়ানই এই বৈশিষ্ট্য কাজে লাগিয়ে তাদের বিজয় নিশ্চিত করতে চান। প্রতিটি নির্বাচনের পূর্বেই দেখা যায়, সব প্রতিযোগীই নিজেদের সম্ভাব্য বিজয়ী হিসেবে প্রচার করছেন। কারণ, বেশিরভাগ ব্যক্তিই পরাজিত প্রার্থীকে ভোট দিয়ে নিজের ভোটকে অপচয় করতে অনিচ্ছুক।

অর্থনীতিতে এই প্রোপাগান্ডা কাজ করার পিছনের কারণটা একটু ভিন্ন। যেকোনো প্রোডাক্টের গুণগত মান যাচাইয়ের জন্য যে শ্রম আর সময় প্রয়োজন, সবাই সেই কষ্ট স্বীকারে আগ্রহী নয়। তাই, অপরের কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্যেই তারা নির্ভর করতে পছন্দ করে। এই আচরণের সাথে আবার প্রদর্শনমূলক ভোগেরও[২] যোগসূত্র আছে। কন্সপিকিউয়াস কনসাম্পশন বলতে শুধু সামাজিক 'স্ট্যাটাস' বজায় রাখতে একজন ভোক্তার মূল্যবান সব ভোগ্যপণ্য ক্রয় করাকে বোঝানো হয়।

তাই, কিছু সংখ্যক লোক থেকে শুরু করলেও পরবর্তীকালে নিরন্তর অধ্যবসায়ের

France	59.7%	USA	48%
Bulgaria	58.6%	Spain	45.9%
Sweden	54.9%	Ireland	36.6%
Portugal	52.8%	Germany	35.5%
Netherlands	50.4%	Romania	31.3%
Belgium	49%	Italy	28%
UK	47.9%	Poland	25%
Hungary	46.7%	Croatia	18.9%
Spain	45.9%	Greece	9.4%

সূত্র: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Family Database UPDATED: SEPTEMBER 2020

[১] "Everybody—at least all of us doing it."

[২] Conspicuous Consumption

মাধ্যমে ভোগবাদীতাকে সমাজের 'প্রথা' বানিয়ে ফেললে বস্তুবাদী পৃথিবীর হর্তাকর্তাদের লাভ। বিয়েতে সারা গ্রামের মানুষকে লক্ষ লক্ষ টাকা না খাওয়ালে অনেকেই লজ্জার সম্মুখীন হন। বিয়েতে খরচের কারণে তাই 'প্রতিষ্ঠিত' হওয়া পর্যন্ত পিছিয়ে যায় অনেকের বিয়ে। অনেক বাপ-মা শুধু এ কারণে মেয়েকে মাস্টার্স পাসের পূর্বে বিয়ে দেন না যে, 'সব বাবা-মা-ই তো মেয়েদেরকে পড়াচ্ছে, আমি বিয়ে দিলে মানুষ কী বলবে।' ইসলাম কী বলে, সেটা আর কেউ খোঁজে না।

এখানে কেবল কমন কয়েকটি প্রোপাগান্ডা কৌশল আলোচনা করা হলো, এছাড়াও আরও অনেক কৌশলই প্রোপাগান্ডা ছড়ানোর কাজে ব্যবহৃত হয়, বইটিতে সুবিধামত স্থানে সেগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ আরও কিছু কৌশল ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

❁ Bibliography

at-Tirmidhi, M. i. (864)। Jami' al-Tirmidhi.

DiFurio, D. (2016, June 16). Q&A: Islamic scholar Omar Suleiman on the Quran and homosexuality. Retrieved from The Dallas Morning News: www.dallasnews.com/opinion/commentary/2016/06/16/qa-islamic-scholar-omar-suleiman-on-the-quran-and-homosexuality/

FOX 4 News. (2016, June 13). Local Muslim leaders call for solidarity with the LGBT community. Retrieved from KDFW: www.fox4news.com/news/local-muslim-leaders-call-for-solidarity-with-the-lgbt-community

Lee, A. M., & Elizabeth Briant Lee. (1939). The Fine Art of Propaganda: A Study of Father Coughlin's Speeches. Harcourt Brace.

Pew Research Center. (2017, July 26). U.S. Muslims Concerned About Their Place in Society, but Continue to Believe in the American Dream. Retrieved from Pew Research Center: https://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/11/2017/07/25171611/U.S.-MUSLIMS-FULL-REPORT.pdf

বারী, ম. ফ. (2017, August). ঈদুল আযহা ও কুরবানী বিষয়ক কিছু হাদীস. Retrieved from মাসিক আলকাউসার: https://www.alkawsar.com/bn/article/2091/

অধ্যায় ১১

প্রোপাগান্ডা বিশ্লেষণ এবং আত্মরক্ষার উপায়

প্রোপাগান্ডার বিশ্লেষণ বেশ জটিল একটি বিষয়—এর জন্য ঐতিহাসিক তথ্য, প্রোপাগান্ডা ম্যাসেজ ও মিডিয়ার পোস্টমর্টেম, গ্রাহকের প্রোপাগান্ডা গ্রহণ করার ধরন এবং পুরো প্রোপাগান্ডা সিস্টেমের ওপর দখল থাকা জরুরি। প্রোপাগান্ডার স্বল্পমেয়াদী প্রভাব যাচাই করার চাইতে দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব চিহ্নিতকরণ প্রোপাগান্ডা বিশ্লেষণে বেশি কাজে লাগে। আর স্বল্পমেয়াদী প্রোপাগান্ডার চাইতে দীর্ঘমেয়াদী প্রোপাগান্ডা শনাক্ত করা শক্ত কাজ। তেমনিভাবে গ্রাহককে এই শ্রেণির প্রোপাগান্ডা সম্পর্কে সতর্ক করা তার চাইতেও কঠিন (Jowett & O'Donnell, 1986/2012)।

প্রফেসর জোয়েট এবং ওডনেল প্রোপাগান্ডা বিশ্লেষণে দশ স্তরের একটি প্রসেস প্রস্তাবনা পেশ করেছেন, যেগুলো প্রোপাগান্ডার গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলো শনাক্ত করতে সহায়তা করবে। প্রোপাগান্ডা এনালাইসিসের এ দশটি স্টেপ হলো—

- ১. প্রোপাগান্ডা ক্যাম্পেইনের (প্রচারিত) মতবাদ এবং লক্ষ্য
- ২. যে প্রেক্ষাপটে প্রোপাগান্ডা পরিচালিত হয়
- ৩. প্রোপাগান্ডিস্ট-এর পরিচয় শনাক্তকরণ
- ৪. প্রোপাগান্ডা (পরিচালনার) সংগঠনের কাঠামো
- ৫. প্রোপাগান্ডার টার্গেটকৃত দর্শক
- ৬. মিডিয়া ব্যবহারের পদ্ধতি
- ৭. সর্বোচ্চ প্রভাব অর্জনে বিশেষ টেকনিক
- ৮. বিভিন্ন পদ্ধতির বিপরীতে দর্শকের প্রতিক্রিয়া
- ৯. বিপরীত প্রোপাগান্ডা, যদি (এর অস্তিত্ব) থাকে
- ১০. প্রভাব এবং মূল্যায়ন

❁ ১. প্রোপাগান্ডা ক্যাম্পেইনের (প্রচারিত) মতবাদ এবং লক্ষ্য

প্রোপাগান্ডার পেছনে থাকা মতবাদ বা মতাদর্শ নির্ধারণে আমাদেরকে প্রোপাগান্ডায় প্রচারিত বিশ্বাস, মূল্যবোধ, আচার-আচরণ এবং চিন্তা করার পন্থা

খুঁজে বের করতে হবে—যা একটি সমাজে গ্রহণীয়-বর্জনীয়ের মাঝে পার্থক্য তৈরি করে দিতে চায়। এছাড়াও ব্যক্তির ধারণকৃত মতাদর্শই ঠিক করে দেয় কোনো নির্দিষ্ট সমাজব্যবস্থার প্রতি তার আনুগত্য কেমন হবে। এটি ধর্মীয়, বর্ণীয়, লিঙ্গভিত্তিক ও সামাজিক বিভিন্ন গোষ্ঠীর দায়িত্বও ঠিক করে দেয় (Jowett & O'Donnell, 1986/2012)।

প্রোপাগান্ডার লক্ষ্য হতে পারে জনগণকে প্রোপাগান্ডিস্টদের বেঁধে দেয়া বিশ্বাস ও মনোভাবের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো কিংবা কোনো নির্দিষ্ট আচার-আচরণ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা। যেমন : ফ্রি-সেক্সের প্রচার, সমকামিতার আদর্শ গ্রহণ, প্রয়োগ, সমর্থন ও প্রচার ইত্যাদি। বস্তুত, প্রোপাগান্ডার উদ্দেশ্যই হলো প্রোপাগান্ডিস্ট-এর মতাদর্শ বা মতবাদের গ্রহণযোগ্যতা অর্জন।

❁ ২. যে প্রেক্ষাপটে প্রোপাগান্ডা পরিচালিত হয়

সফল প্রোপাগান্ডা সময়ের গতিবিধিকে কাজে লাগায়; তাই প্রোপাগান্ডা বিশ্লেষণে এটি পরিচালনা করার সময়কার পরিস্থিতি অনুধাবন করা জরুরি। প্রোপাগান্ডার পেছনে কোনো ঘটনাচক্র থাকলে আমাদের সতর্কতার সঙ্গে দেখতে হবে, কী 'ঘটনা' ঘটেছিল এবং প্রোপাগান্ডিস্টরা সেটির কী 'ব্যাখ্যা' করছে। জনগণ কেমন রাষ্ট্রব্যবস্থা ও বিশ্বব্যবস্থা চায়? বিশ্বে চলমান 'সমস্যাগুলো' কী কী? সমস্যাগুলো সমাধানের পিছনে 'বাধা' কী কী? প্রোপাগান্ডা বিশ্লেষণের জন্য এই প্রশ্নগুলোর সমাধান জানা প্রয়োজন। এছাড়াও ঘটনার পেছনে থাকা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বিশদ ধারণা রাখা জরুরি। কোন কোন ঘটনাবলি কোন বিশেষ অবস্থাকে আজকের পর্যায়ে নিয়ে এসেছে? কোন বিশ্বাসগুলো দীর্ঘদিন ধরে পরিব্যাপ্ত ছিল? প্রোপাগান্ডার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রোপাগান্ডিস্টদের প্রচারিত মিথগুলো কী কী? সেইসব মিথের উৎস কী? মিথ বলতে শুধু মিথ্যা কল্পকাহিনি নয়; বরং সামাজিক কার্যক্রমের অনেক ধারণাকেও মিথ হিসেবে ধরা যায়। মিথ হলো এমন এক গল্প, যা কিছু ঘটনা ও প্রতীকের সঙ্গে বন্ধনে আবদ্ধ (Jowett & O'Donnell, 1986/2012)। যেমন ধরুন, মার্কিনীরা হলিউডে তাদের চলচ্চিত্রগুলোতে অ্যামেরিকার করা যুদ্ধগুলোকে 'মহান' ও 'বীরত্বসূচক' যুদ্ধ হিসেবে উপস্থাপন করে। ঘটনাবহুল যুদ্ধগুলোর সঙ্গে যুক্ত হয় অ্যামেরিকান পতাকার মতো প্রতীক, উভয়ের সম্মেলনে তারা সৃষ্টি করে 'গুড অ্যামেরিকা' অর্থাৎ অ্যামেরিকাকে মহান হিসেবে উপস্থাপন করার প্রোপাগান্ডা।

❁ ৩. প্রোপাগান্ডিস্টের পরিচয় শনাক্তকরণ

প্রোপাগান্ডার উৎস হতে পারে কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন—আর প্রোপাগান্ডিস্টরা এর অগ্রনায়ক বা এজেন্ট। কখনো প্রোপাগান্ডার পেছনের

প্রতিষ্ঠানের পরিচয় থাকে পুরোপুরি প্রকাশ্য—যেমন, বাংলাদেশে সেক্যুলারিজম প্রোমোটকারী শেকড়কাটা[১] বাম দলগুলোর নেতা-কর্মী-সমর্থকরা প্রকাশ্যেই ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা ছড়াতে ওস্তাদ। আবার কখনো প্রোপাগান্ডা সফল করতে প্রধান প্রতিষ্ঠানটির পরিচয় গোপনের প্রয়োজন হয়। আর সেই মুহূর্তে প্রোপাগান্ডা বিশ্লেষণের দায়িত্ব বেড়ে যায়। যেমন, ব্ল্যাক প্রোপাগান্ডার ক্ষেত্রে সকল তথ্য প্রকাশিত হওয়ার আগে এটি শনাক্ত করা বেশ কঠিন কাজ।

প্রোপাগান্ডার মতাদর্শ, উদ্দেশ্য ও প্রসঙ্গ নির্ধারণে সফল হলে প্রোপাগান্ডিস্ট-এর পরিচয় শনাক্তের কাজ কিছুটা এগিয়ে যায়। আমরা তখন প্রশ্ন রাখতে পারি—কে বা কারা প্রোপাগান্ডার সফলতা থেকে সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে? একই ক্যাটাগরির ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোও আমাদেরকে এই সমস্যা সমাধানে খুবই মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করতে সক্ষম। প্রোপাগান্ডা বিশ্লেষক ছোট ঘটনার পেছনে থাকা বৃহৎ চিত্রের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারেন। কারণ, অনেক সময়ই প্রোপাগান্ডার আপাত লক্ষ্যের পরিবর্তে এটির উৎসের—ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন—বৃহৎ কোনো উদ্দেশ্য অপ্রকাশ্য, গোপন থেকে যায়।

❁ ৪. প্রোপাগান্ডা (পরিচালনার) সংগঠনের কাঠামো

সাধারণত প্রোপাগান্ডাগুলো বেশ শক্তিশালী, কেন্দ্রীয় কোনো কর্তৃপক্ষ থেকে উৎসারিত হয়, যারা পরস্পর সঙ্গতিপূর্ণ কিছু বার্তা এর পুরো কাঠামো জুড়ে প্রবাহ করে। প্রোপাগান্ডা প্রচার করার জন্য যে সর্বদা একটি সংগঠন আবশ্যক, বিষয়টি সেরকম নয়। তবে, প্রোপাগান্ডার উৎস সাধারণত নির্দিষ্ট এক বা একাধিক অভিন্ন-লক্ষ্য সংগঠনই হয়ে থাকে। সংগঠনে দৃশ্যমান অগ্রনায়ক হয়তো-বা প্রকৃত নেতা নন, তবে প্রকৃত নেতার আদর্শ প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় তিনিই কাজ করেন। দৃশ্যমান ব্যক্তি কিভাবে তার পদবি অর্জন করেছেন এবং কিভাবে তার 'আনুগত্য' ও 'সততা' প্রমাণ করেন—সেগুলো জানা প্রোপাগান্ডা বিশ্লেষকের জন্য আবশ্যক। মঞ্চে উপস্থিত নায়কের কিছু বিশেষ স্টাইল থাকে যেগুলোর মাধ্যমে সে বা তারা সংগঠনটির সদস্যদের আকর্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করেন।

এছাড়াও প্রোপাগান্ডা ছড়ানো সংগঠনটির কিছু নির্দিষ্ট লক্ষ্য[২] ও বেশ কিছু স্বল্পমেয়াদী উদ্দেশ্য[৩] থাকতে পারে। যেমন : গর্ভপাত বৈধকরণ, 'লিভ-টুগেদার'-এর ব্যাপক প্রচলন বঙ্গীয় পশুসভ্যতা প্রচারকারী লিবারেল নারীবাদীদের মূল লক্ষ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য। তাদের প্রধান লক্ষ্য দেশে দীর্ঘমেয়াদে পশ্চিমাদের মতো ওপেন সেক্সকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার মাধ্যমে তাদের কাঙ্ক্ষিত 'স্বর্গরাজ্য' প্রতিষ্ঠা।

[১] সোভিয়েতের পতনের পর লিবারেল সেক্যুলারিজমের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়া
[২] goals
[৩] objectives

প্রোপাগান্ডা সংগঠনের মেম্বারশিপ বা সদস্যপদ নির্ধারণ করাটাও প্রোপাগান্ডা বিশ্লেষণে প্রয়োজনীয়। অনুসারী আর সদস্যের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। যেমন ধরুন হিটলার তার বই *মাইন কাম্ফ*-এ বলেন,

'প্রোপাগান্ডার কাজ হলো অনুসারীদের আকর্ষণ করা; পার্টির (সংগঠনের) কাজ হলো সদস্যদের (হৃদয়) জয় করা। কোনো আন্দোলনের অনুসারী সেই ব্যক্তি যে এর উদ্দেশ্যসমূহের সঙ্গে একমত হয়; একজন সদস্য হলো সেই ব্যক্তি যে এর জন্য লড়াই করে।'

বিশ্লেষক এখানে বেশ কিছু প্রশ্ন রাখতে পারেন। যেমন : সদস্যপদ কিভাবে অর্জন করা যায়? সদস্যপদ কি সর্বদাই আনুষ্ঠানিক, নাকি তা অনানুষ্ঠানিকও হতে পারে? সদস্যপদের কি কোনো দৃশ্যমান প্রতীক রয়েছে? নব্য সদস্য হতে হলে কি নতুন কোনো প্রতীক—যেমন নির্দিষ্ট কোনো পোশাক, ভাষা, কার্যক্রম—এর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়া[১] জরুরি? কোনো প্রথা পালন করার মাধ্যমে কি সংগঠনে যোগ দিতে হয়? বিষয়টি হয়তো এমন নয় যে, কেবল নির্দিষ্ট কোনো ফর্ম ফিলাপ করে ওই সংগঠনে যোগ দিতে হবে। অনেক সময় প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম ছাড়াও সংগঠনের মূলনীতিসমূহের সাথে ঐকমত্য পোষণ করা সম্ভব।

❁ ৫. প্রোপাগান্ডার টার্গেটকৃত দর্শক

সম্ভাব্য কার্যকারিতা যাচাই করে এর টার্গেট নির্বাচিত করে প্রোপাগান্ডিস্টরা। শুরুর দিকে প্রোপাগান্ডার টার্গেট ছিল জনসাধারণ, কিন্তু আধুনিক প্রোপাগান্ডার ক্ষেত্রে এই চিত্র অনেকটাই বদলে গেছে। কার্যকারিতা বৃদ্ধি করতে কিছু ক্ষেত্রে সর্বস্তরের জনগণের ওপর প্রোপাগান্ডা প্রয়োগ হয় বটে। কিন্তু এর সাথে সাথে কোনো রাজনৈতিক দল, 'সাংস্কৃতিক' প্রভাবশালী এলিট, নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী, জনমত তৈরিতে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম ব্যক্তিদেরকেও প্রোপাগান্ডার টার্গেট করা হয়। USIA-এর মতে, 'একজন সাংবাদিকের কাছে পৌঁছানো পাঁচজন ডাক্তার কিংবা দশজন গৃহিণীর কাছে পৌঁছানোর চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ[২]।' (Jowett & O'Donnell, 1986/2012) প্রাপ্তবয়স্কদের ধ্যান-ধারণা বদলানোর ক্ষেত্রে অবশ্য প্রোপাগান্ডিস্টদের অনেক ঝক্কি ঝামেলা পোহাতে হয়। অন্যদিকে শিশুদের মন হয় কাদামাটির মতো, একে যেভাবে খুশি গড়ে নেয়া যায়। তাই, বর্তমানে শিশুদেরকে 'শিক্ষা'র সঙ্গে সূক্ষ্মভাবে সংযুক্ত করা হয় প্রোপাগান্ডা, যার ফলে ছোট থেকেই বাচ্চারা প্রোপাগান্ডিস্টদের কাঙ্ক্ষিত চিন্তাধারা নিয়ে বড় হচ্ছে।

---

[১] যেমন : বাংলাদেশের এক গোষ্ঠীর সদস্যদের প্রতীক হিসেবে দেখা যায়—বিশাল বড় লাল টিপ, ছেলেদের মতো পোশাক, গাঁজা খাওয়া, আর পুরুষ জাতিকে গালাগাল।

[২] ডাক্তাররাও অনেক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। যেমনঃ LGBTQ+ এর প্রসার।

কখনো কখনো মিডিয়ার কন্টেন্ট, এর নিজস্ব দর্শক শ্রেণি তৈরি করে। টেলিভিশন প্রোগ্রাম, চলচ্চিত্র, ওয়েবসাইট, সংবাদপত্র এক শ্রেণির নয়া প্রোপাগান্ডা-সমর্থকদের আকর্ষণ করে। এই নির্দিষ্ট শ্রেণিকে চিহ্নিত করতে পারলে তাদেরকেও সহজে প্রোপাগান্ডার জন্য টার্গেট করা যায়।

❁ ৬. মিডিয়া ব্যবহারের পদ্ধতি

প্রোপাগান্ডায় মিডিয়া ব্যবহারের পদ্ধতি শনাক্তকরণ তেমন কঠিন কোনো কাজ নয়। প্রোপাগান্ডা বিশ্লেষককে দেখতে হবে—কোন কোন মিডিয়া প্রোপাগান্ডা প্রচারে ব্যবহৃত হয়। মডার্ন প্রোপাগান্ডা দৃশ্যমান সকল মিডিয়াগুলোকে ব্যবহার করে—প্রেস, রেডিও, টিভি, মুভি, ইন্টারনেট, পোস্টার, মীটিং, শোভাযাত্রা, ক্যানভাস, হ্যান্ডবিল, বিলবোর্ড, বক্তৃতা, পতাকা, সড়কপথের নামসমূহ, মনুমেন্ট বা স্মৃতিস্তম্ভ, অর্থ[১], বই, খেলাধুলো, কবিতা, সঙ্গীত, প্রথা, 'সাংস্কৃতিক' প্রোগ্রাম, এ্যাওয়ার্ড, পুরস্কার ইত্যাদি।

প্রোপাগান্ডার আপাত লক্ষ্যের সামঞ্জস্য নির্ধারণে একই উৎস থেকে মিডিয়ায় প্রচারিত বিভিন্ন সংবাদ পরস্পর যাচাই করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে তথ্য-প্রবাহ এবং মাধ্যম থেকে ব্যক্তি বা দলের নিকট তা কিভাবে পৌঁছায়—সেটি জানা বেশ জরুরি। সেই সাথে এক মিডিয়ার সঙ্গে অন্য মিডিয়া এবং মিডিয়া-জনগণের মধ্যকার সম্পর্কের স্বরূপ নির্ণয় করতে হবে। তবে, বিশ্লেষকের প্রধান টার্গেট হবে মিডিয়া বা মাধ্যম কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে সেটি নির্ণয় করা।

তথ্য প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ প্রোপাগান্ডার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জন-মত ও আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী ও প্রভাবিত করতে সক্ষম ব্যক্তি বা সংগঠন তাদের আওতাধীন যোগাযোগ মাধ্যমের সর্বোত্তম ও বুদ্ধিদীপ্ত ব্যবহার নিশ্চিত করার চেষ্টা রাখে। তারা একটি তথ্যের সঙ্গে অন্য আরেকটি তথ্য এমনভাবে সংযুক্ত করে, যার ফলে উভয়ের মাঝে এক কাল্পনিক সম্পর্ক তৈরি হয়। প্রোপাগান্ডা এমন কোনো মাধ্যমে দৃশ্যমান হতে পারে, যেখানে কোনো নির্দিষ্ট এলাকা বা জনগোষ্ঠীর ওপর প্রোপাগান্ডিস্টদের একক আধিপত্য রয়েছে। ফলে, সেখানে প্রকৃত সত্য উপস্থাপনের কোনো সুযোগ নাও থাকতে পারে[২]।

প্রোপাগান্ডা বিশ্লেষণের জন্য দেখতে হবে—ছবি, প্রতীক, রঙ বা বর্ণ[৩], চলচ্চিত্র, ইন্টারনেট, বই, সংবাদপত্রের মাধ্যমে কী কী দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এছাড়াও স্লোগান, বক্তৃতার মতো মৌখিক পদ্ধতিগুলোও বিশ্লেষণ করতে হবে।

[১] টাকায় মুদ্রিত চিত্র
[২] উদাহরনঃ শিক্ষা ব্যবস্থার কারিকুলাম।
[৩] যেমনঃ LGBTQ+ এর রংধনুর রঙকে ব্যবহার, দেশের পতাকার বর্ণগুলোকে কৌশলে ব্যবহার।

কখনো কখনো বিশ্লেষককে মিডিয়ায় ফুটিয়ে তোলা চিত্রের ব্যাখ্যার বাইরে গিয়ে এর প্রকৃত অর্থ অনুসন্ধানে সমর্থ হওয়া আবশ্যক।

❁ ৭. সর্বোচ্চ প্রভাব অর্জনে বিশেষ টেকনিক

যেহেতু প্রোপাগান্ডা প্রচারের ক্ষেত্রে ধরাবাঁধা কোনো পদ্ধতি নেই, সেহেতু প্রোপাগান্ডার বিশেষ পদ্ধতিসমূহের লিস্ট করা সহজ ব্যাপার নয়[১]। তবে বহুল ব্যবহৃত কিছু পন্থা উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন :

❁ ৮. বিভিন্ন পদ্ধতির বিপরীতে দর্শকের প্রতিক্রিয়া

প্রোপাগান্ডার সফলতার প্রমাণস্বরূপ প্রোপাগান্ডার প্রতি টার্গেট দর্শক বা শ্রোতার আচরণ পরীক্ষা করা যেতে পারে। মিডিয়ায় দেখানো রিপোর্টের ওপর যেহেতু সর্বদা ভরসা করাটা বোকামি, তাই দর্শকদের চিন্তাধারা ও আচরণের পরিবর্তন নিরপেক্ষ স্থান থেকে পরীক্ষা করতে হবে। স্বল্প মেয়াদে ও দীর্ঘ মেয়াদে প্রোপাগান্ডার সফলতা কতটুকু, সেটি টার্গেট শ্রেণির বিশ্বাস ও আচরণ পরীক্ষা করার মাধ্যমে জানা সম্ভব।

❁ ৯. বিপরীত প্রোপাগান্ডা, যদি (এর অস্তিত্ব) থাকে

যুদ্ধ শুরুর পর নির্দিষ্ট কিছু কৌশল খাটানো জায়েয হলেও ইসলাম যুদ্ধের ময়দানের কৌশলের সীমাও নির্ধারণ করে দিয়েছে। তথাপি, বর্তমানে অনেক মুসলিমই এ বিষয়ে ধারণার ঘাটতি থাকায় কুফফারের প্রোপাগান্ডার বিপরীতে কাউন্টার প্রোপাগান্ডা প্রচারের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে, যেটি নিতান্তই দুঃখজনক। তবে, প্রতিটি মুসলিমকে এই কথাটিও মনে রাখা জরুরি যে—আজকের পৃথিবীতে মুসলিমরা হলো মজলুম, আর সেক্যুলার-কুফফার শাসকরা হলো জালিম। মজলুম তার সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে থেকে জুলুম নিপীড়ন সইতে না পেরে অনেক সময়ই ভুলত্রুটি করা স্বাভাবিক, বিষয়টাকে সেভাবেই দেখতে হবে। জটিল এই ভারসাম্য রক্ষা করতে না পারলে নিদেনপক্ষে চুপ থাকা উচিত, নতুবা কুফফারের পক্ষাবলম্বন করে নিজের অজান্তেই হয়তো-বা অনেকে জালিমদের সহযোগী হয়ে পড়বেন। নতুবা মুসলিমদের বিপক্ষে ঢালাওভাবে প্রোপাগান্ডার অভিযোগ তোলা নিতান্তই বিদ্বেষপ্রসূত; সচরাচর ইসলাম-বিদ্বেষী সেক্যুলার ও মুরতাদরাই এই অপকর্মের নেতৃত্ব দেয়।

প্রায়শই দেখা যায়, বিশ্বের কোথাও মুসলিম নির্যাতন হলে বঙ্গীয় 'শিক্ষিত' মুসলিমরা সে বিষয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায় না—যেন এমনটাই হওয়ার কথা। অপরদিকে, দেশে কোনো রাজনৈতিক নেতা বা অন্য কেউ কোনো বিধর্মী ব্যক্তি বা

[১] তবে, Chapter ১১-এ কিছু প্রচলিত পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

দলের ওপর অত্যাচার চালালেও সেটাকে সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের 'দায়' হিসেবে স্বীকার করে নিয়ে এই শ্রেণিটি 'মুসলিম হিসেবে আমি লজ্জিত', 'নির্যাতন বন্ধ করো', 'ইসলাম আমাদের এসব শেখায় না', 'ইসলাম হলো শান্তির ধর্ম' ইত্যাদি স্লোগানে যোগাযোগ মাধ্যমগুলো প্লাবিত করে ফেলে। এ প্রসঙ্গে সোনালী দিনের একটি গল্প শোনা যাক। একবার হারাম মাসে সাহাবিরা ভুলবশত কাফিরদের ওপর হামলা চালায়। ওই ঘটনার পর কাফিররা মুসলিমদেরকে এই ঘটনা নিয়ে অনবরত অভিযোগ করে যাচ্ছিল— মুসলিমরা পবিত্র মাসকে সম্মানের কথা বলে নিজেরাই পবিত্র মাসের সম্মান নষ্ট করেছে ইত্যাদি। অতঃপর আল্লাহ তাআলা কুরআনের আয়াত নাযিল করেন,

> 'তারা তোমাকে হারাম মাস সম্পর্কে, তাতে লড়াই করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে; বলো, তাতে লড়াই করা পাপ; কিন্তু আল্লাহর পথে বাঁধা প্রদান, তাঁর সাথে কুফরি করা, মসজিদুল হারাম থেকে বাধা দেয়া এবং তার অধিবাসীদেরকে তা থেকে বের করে দেয়া আল্লাহর নিকট অধিক বড় পাপ...'[১]

বস্তুত, কুরআনের এই শিক্ষাটা মুসলিমদের বিপর্যয় সম্পর্কে সচেতন মুসলিম এবং কাফিরদের দ্বারা প্রভাবিত মুসলিম—উভয় দলের জন্যই অনুসরণীয়। আমাদের উচিত, নিজেদের ভুল স্বীকার করা, এবং ভুল সংশোধনের উদ্দেশ্যে নিজেদের ভিতর সমালোচনার দ্বার রুদ্ধ না করা এবং, যেসকল মুসলিম ভাই মিডিয়া ও ইসলাম-বিরোধী মতাদর্শ প্রভাবিত কিন্তু ইসলামকে এখনো ভালোবাসেন, তাদের উচিত মন্দ আর অধিক মন্দের পার্থক্য নির্ণয় করতে শেখা। তারা এই কাজটা করে মূলত তাদের ওপর মিডিয়ার শক্তিশালী প্রভাব থাকার কারণে। এসকল ঘটনায় মুসলিমদের পক্ষ থেকে কাউন্টার প্রোপাগান্ডার অস্তিত্ব না থাকলেও ক্ষমা-চাওয়া শ্রেণির কারণে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, যেখানে দিনশেষে মুসলিমদের ওপরই সকল অপকর্মের অভিযোগ পতিত হয়। পাঠ্যবইয়ের বাইরে গোটা জীবনে ইসলাম সম্পর্কে একটি সিঙ্গেল বই না-পড়া ব্যক্তিরা যখন এই কাজগুলো করে, তখন অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের এই ধারণা আরও পোক্ত হয় যে, প্রকৃত ইসলাম মেনে চলা ব্যক্তিরাই দেশের সকল অপকর্মের মূল। ক্ষমা চাওয়ার জন্য সদাপ্রস্তুত এই শ্রেণির লোকেরা মূলত মুসলিম সম্প্রদায়ের লাভের চাইতে ক্ষতিই বেশি করে থাকে।

❁ ১০. প্রভাব এবং মূল্যায়ন

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, প্রোপাগান্ডা কতটুকু সফল হয়েছে, প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছে। অনেক সময়ই সম্পূর্ণ প্রোপাগান্ডা সফল না হলেও, কিছু উদ্দেশ্য হয়তো-বা বাস্তবায়িত হয়। প্রোপাগান্ডা যখন ব্যর্থ হয়, তখন প্রোপাগান্ডিস্টরা

[১] সূরা বাকারাহ, ২ : ২১৭।

ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধানে তাদের কর্মপদ্ধতি ও পরিকল্পনা পুনঃযাচাই করার চেষ্টা করে। প্রোপাগান্ডা প্রচারকারী দলের 'সদস্য' ও 'অনুসারীগণের' সংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রোপাগান্ডার সাফল্য নির্ণয়ের একটি পদ্ধতি। আর প্রোপাগান্ডা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এর উদ্দেশ্যসমূহ নির্ণয়ের সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে টার্গেট দর্শকবৃন্দ প্রোপাগান্ডার উদ্দেশ্যগুলোর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছে—সেটিও দেখা আবশ্যক। নির্দিষ্ট কিছু মিডিয়া আর অন্যান্য প্রোপাগান্ডা টেকনিক কিভাবে এই পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে? প্রোপাগান্ডিস্টরা কিভাবে সংশ্লিষ্ট প্রেক্ষাপট আর পরিবেশকে কাজে লাগিয়েছে?

প্রোপাগান্ডা বিশ্লেষণকারী যখন এই দশটি প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর খুঁজে পাবে, তখন প্রোপাগান্ডার সার্বিক একটি চিত্র ও ব্যাখ্যা তার সামনে ফুটে উঠবে। প্রোপাগান্ডার প্রতিটি ঘটনার ক্ষেত্রে হয়তো সম্পূর্ণ দৃশ্য উন্মোচন সম্ভব নয়, কখনো কখনো পুরো চিত্রটি ফুটিয়ে তুলতে বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হয়। তবে, পূর্ববর্তী প্রোপাগান্ডার ঘটনাগুলো বিবেচনায় রেখে প্রোপাগান্ডা বিশ্লেষণ করলে প্রোপাগান্ডার একটি আনুমানিক কাঠামো উন্মোচিত করা সম্ভব।

***

❁ প্রোপাগান্ডা থেকে আত্মরক্ষা

আধুনিক প্রোপাগান্ডার এই সময়ে এসে প্রোপাগান্ডার প্রায় অবশ্যম্ভাবী প্রভাব থেকে নিজেকে রক্ষা করার পরামর্শ দিতে গিয়ে চমস্কি বলেন, যেকোনো সমাজের নাগরিকদের উচিত প্রোপাগান্ডা ও ম্যানিপুলেশন থেকে নিজেদের রক্ষা করতে বুদ্ধিবৃত্তিক আত্মরক্ষার পথ অনুসরণ করা (Chomsky, 1989, p. viii)। কারণ, এই দায়িত্ব মূলত যে মিডিয়া নিজেদের বলে প্রচার করে, সে কর্পোরেট মিডিয়া নিজেদের এই দায়িত্ব সম্পর্কে 'সচেতন'ভাবেই অসচেতন। বুদ্ধিবৃত্তিক আত্মরক্ষার বিভিন্ন ধরন রয়েছে। যেমন : বিকল্প সংবাদ উৎস ও মতাদর্শের অনুসন্ধান, সংবাদ উৎসের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংবাদের গভীরে পৌঁছানোর প্রচেষ্টা ইত্যাদি। নিজেদের রক্ষা করতে আমাদের জন্য খুবই সতর্কতার সঙ্গে পর্যায়ক্রমিক তিনটি কাজ বাস্তবায়ন করা আবশ্যক—

- ১. প্রোপাগান্ডা শনাক্তকরণ
- ২. প্রোপাগান্ডা বিশ্লেষণ
- ৩. প্রোপাগান্ডা প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ

এর মধ্যে প্রথম দুটি বিষয়ে ইতিমধ্যেই আলোচনা করা হয়েছে, বাকি রইল প্রোপাগান্ডা প্রতিরোধ। এ কথা সত্যি যে, রাষ্ট্রের সকল জনগণ কখনোই বুদ্ধিবৃত্তিক ঐশ্বর্যের অধিকারী হবে না। হাতেগোনা গুটিকয়েক ব্যক্তি-দল ছাড়া বাকি প্রায় পুরো

জনপদই নির্দিষ্ট কিছু প্রোপাগান্ডার সামনে সর্বদাই থাকে অরক্ষিত। তাই, এই বিশাল জনপদকে প্রোপাগান্ডার হাত থেকে রক্ষার দায়িত্ব স্বয়ংক্রিয়ভাবে এসে পড়ে সেই গুটিকয়েক সচেতন ব্যক্তি ও দলের ওপর। সে জন্য, মুসলিম জনপদকে ইসলাম-বিরোধী ও কুফফারদের মতাদর্শ প্রচারকারী প্রোপাগান্ডা থেকে রক্ষা করতে হলে বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যক্রমে সক্রিয় চিন্তাশীল এই ছোট্ট অংশটিকে যথাযথ পরিকল্পনা অনুযায়ী নিজেদের সকল কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করা আবশ্যক। স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী প্ল্যান করে সেগুলোর বাস্তবায়ন এবং নির্দিষ্ট পর্যায় পরপর সেগুলোকে যাচাই-বাছাই ও নবায়ন করতে হবে। জনসাধারণ এবং চিন্তাশীল (আলিম এবং সেক্যুলারদের মতাদর্শের ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন) ব্যক্তি ও গোষ্ঠীদের মাঝে যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে হবে এবং যোগাযোগের প্রতিবন্ধকতা দূর করার চেষ্টা করতে হবে।

প্রোপাগান্ডা কিভাবে প্রতিরোধ করব

এ প্রশ্নটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এত এত থিওরি, হিস্ট্রি কপচিয়ে দিনশেষে যদি প্রোপাগান্ডাকে প্রতিরোধই করতে না পারি, তাহলে এসবের কোনো ফায়দা নেই। তবে, এখানে একটি কথা স্পষ্টভাবে বলে নেওয়া ভালো। প্রোপাগান্ডা খুবই জটিল একটি বিষয়, এর বিস্তৃতিও বিশাল। সামান্য কয়েক পাতায় যেমন এর মৌলিক বিষয়গুলোই কেবল উল্লেখ করা যাবে, তেমনি এর প্রতিরোধ, প্রতিকারও অল্প কিছু বাক্যে তুলে ধরা রীতিমতো অসম্ভব। তাই, আমি আমার স্বল্প জ্ঞানে যতটুকু সম্ভব, এর সমাধানের বিষয়ে অল্প আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। অনেক বর্ষীয়ান লোক রয়েছেন যারা এ ফিল্ডে ইতিমধ্যেই অনুসরণযোগ্য কাজ করেছেন। এ পরিচ্ছেদের বিভিন্ন অংশে আমি তেমনই কয়েকজন শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তির নাম ও তাদের হাতে গড়া কিছু রিসোর্স উল্লেখ করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

প্রোপাগান্ডা প্রতিরোধী প্রজেক্টকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি[১]

- ১. ব্যক্তিগত ও পারিবারিক প্রতিরোধ
- ২. সামাজিক প্রতিরোধ
- ৩. রাষ্ট্রীয় প্রতিরোধ

❁ ব্যক্তিগত ও পারিবারিক প্রতিরোধ

প্রোপাগান্ডার সর্বপ্রথম ধাক্কাটা এসে পড়ে ব্যক্তির ওপর। ব্যক্তি যখন এতে

[১] এই পরিচ্ছেদটির উল্লেখযোগ্য তথ্য অভিজ্ঞ সাংবাদিক মাওলানা শরীফ মুহাম্মদের 'গণমাধ্যমের বিচিত্র ভ্রষ্টাচার' (২০১৬) বইটি থেকে নেওয়া হয়েছে; সংগত কারণে শ্রদ্ধেয় শায়েখকে ধন্যবাদ দেয়ার মতো স্পর্ধা আমার নেই, মহান রব আল্লাহ তাআলা তাকে উত্তম জাযা দান করুন।

আক্রান্ত হয়, তারপর সেটা সমাজে প্রভাব ফেলে। তাই, আমাদের সর্বপ্রথম ব্যক্তিগতভাবে প্রোপাগান্ডা মোকাবিলা করতে সক্ষম হতে হবে। এটা কিভাবে বাস্তবায়ন হবে? সব কিছু হয়তো আমার পক্ষে জড়ো করা সম্ভব নয়, তবুও কিছু বিষয় পয়েন্ট আকারে বলি,

- **নিজেকে প্রস্তুত করা :** প্রোপাগান্ডা যে বর্তমান পৃথিবীতে অবিচ্ছেদ্য এক অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেটার স্বীকারোক্তি দেওয়াই প্রথম প্রস্তুতি। উটপাখির মতো বালিতে মুখ গুঁজে থাকা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। প্রোপাগান্ডা কী, কেন এটি ব্যবহৃত হয়, কিভাবে এটি প্রয়োগ করা হয়; এছাড়া মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের কোন কোন অংশে ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী প্রোপাগান্ডা চলছে, সেগুলো সম্পর্কে ন্যূনতম পর্যায়ের জ্ঞান সবারই রাখা উচিত। আমার নিজের কাছে ইসলাম কী দাবি করে, আর প্রোপাগান্ডিস্টরা সে দাবির বিপরীতে কী অপব্যাখ্যা দেয়, সেগুলো না জানা থাকলে বিপদে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। সর্বোপরি, নিজের ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে সেক্যুলারিস্টদের প্রোপাগান্ডার অনুপ্রবেশ ঠেকাতে অন্তত এই ইচ্ছাটা পোষণ করা জরুরি যে, আমি প্রোপাগান্ডার অংশ হতে ইচ্ছুক নই।
- **আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখা :** ব্যক্তিগত আবেগকে নিয়ন্ত্রণে রাখা বেশ কঠিন একটা কাজ। ইসলাম মানুষের আবেগকে অস্বীকার করে না, কিন্তু আবেগের রশি টেনে ধরতে শেখায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় সন্দেহজনক, উত্তেজনাকর কোনো তথ্য দেখলেই সেটি শেয়ার করার তীব্র ইচ্ছা কিংবা অমুক বিধর্মী ইসলাম অবমাননা করেছে শুনেই তমুক দলীয় নেতার নেতৃত্বে মূর্তি ভাঙার অদম্য আকাঙ্ক্ষা দমিয়ে রাখা দরকার। নতুবা আবেগকে ভুল জায়গায় ব্যবহারের দৃষ্টান্ত সাম্প্রতিক সময়ে বিরল কোনো বিষয় নয়। অতীতে বহুবার দেখা গেছে, মিডিয়া নিজেদের কাটতি বাড়ানোর লক্ষ্যে উল্টাপাল্টা শিরোনাম দিয়ে কিংবা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে এমন সব অবিশ্বাস্য আর বিস্ময়কর তথ্য 'প্রসব' করেছে। এর কিছুদিন–কখনো বহুদিন, মাস, এমনকি বছরও পেরিয়ে যায়–পর বের হয়ে আসে, আসলে পুরো বিষয়টাই মিডিয়ার হাতসাফাই।

এ প্রসঙ্গে কুরআনের সেই অমূল্য আয়াতটি আবারও বলতে চাই,

> 'হে ঈমানদারগণ, যদি কোনো ফাসিক তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ নিয়ে আসে, তাহলে তোমরা তা যাচাই করে নাও। এ আশঙ্কায় যে, তোমরা অজ্ঞতাবশত কোনো কওমকে আক্রমণ করে বসবে, ফলে তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে।'[১]

[১] সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ৬।

- **নিজের দুর্বলতা সম্পর্কে ধারণা রাখা :** শত্রুপক্ষ জানার আগেই নিজের দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করা প্রয়োজন। কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের প্রাথমিক ধারণার ঘাটতি রয়েছে, সেসব বিষয়ে ধারণা ও জ্ঞান বাড়ানোর চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। অতঃপর ইসলামের মানদণ্ডে যাচাই করে দেখতে হবে, শত্রুপক্ষের প্রচারিত আদর্শ সত্য না মিথ্যা।

আমাদের অন্যতম দুর্বলতা মিডিয়ার অভাব এবং নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের ব্যক্তি-সংগঠনের ওপর আমাদের প্রভাবহীনতা। এ বিষয়কে সামনে রেখে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যেমন কাজের অবকাশ আছে, তেমনি ব্যক্তিগতভাবেও কিছু কাজ করা যায়। প্রভাবশালী ব্যক্তি-গোষ্ঠীর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও প্রভাব কাজে লাগিয়ে ইসলামপন্থীদের পক্ষে নানান ভূমিকা রাখতে পারেন।

- **শত্রুপক্ষের টার্গেট করা বিষয়ে সতর্ক থাকা :** আপনার বিপক্ষে যে প্রোপাগান্ডা চলছে, সে সম্পর্কে আপনি ওয়াকিবহাল না থাকলে সেটা শত্রুর জন্য সোনায় সোহাগা। তাই শত্রু কোন লক্ষ্য হাতে নিয়ে ছোট ছোট উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করছে সেগুলো চিহ্নিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ধরুন, পশ্চিমা ওয়ার্ল্ড চায় সমকামিতা, ফ্রি-সেক্স, ওয়েস্টার্ন সেক্স-এডুকেশন ছড়িয়ে পড়ুক সবখানে। এখন, আপনি কিংবা আমি যদি মনে করি, তারা শুধু 'অধিকার' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই এর প্রচার করছে, তাহলে সেটি হবে চরম পর্যায়ের ভুল। আপাতদৃষ্টে যা দেখা যায়, সব সময় সেটি ধরে বসে থাকলেই চলবে না। বরং, শত্রু তার পা ফেলার আগে আমাদের ধারণা রাখতে হবে, সে কি করতে চাচ্ছে, কেন করতে চাচ্ছে।
- **প্রশ্ন করতে শিখুন :** শত্রুপক্ষ বা তাদের প্রতি সফট কর্নার রাখা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে সংশয় রাখা প্রয়োজন। তাদের সব তথ্যই বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করা যাবে না। মিথ্যার চর্চা কাফিরদের মাঝে ইসলামের প্রারম্ভিক কাল থেকেই প্রসিদ্ধ। আপনার কিংবা আপনার ভাইবোনের সন্তানকে তারা 'শিক্ষা'র নামে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে কী পড়াচ্ছে, সেটি যাচাই করুন। যদি মনে হয়, ইসলাম-বিরোধী কিছু নেই, তাহলে ঠিক আছে। আর যদি দেখতে পান, 'ডালমে কুছ কালা হ্যায়', তবে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিন। সেক্যুলারদের পদক্ষেপ খুব দ্রুত বদলাচ্ছে, তাই এই সতর্কতা সার্বক্ষণিক কাম্য। আজ স্কুল কলেজের কারিকুলাম একটু সহনীয় পর্যায়ে আছে, কাল সেটা বদলে কোনো পাতালপুরিতে নিয়ে যাওয়া হবে সেটি খেয়াল রাখুন। মনে রাখা দরকার, আমাদের শিক্ষা যতটুকু কর্মমুখী আছে, সেটি এর সিকিভাগও 'ধর্মমুখী' নয়।
- **বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানার্জন :** শাহবাগে বামদের জাগরণের পর অনলাইন তারা

প্ল্যানমাফিক কিছু কাজ করেছিল। যেমন- মুসলিমদের কাছে শ্রদ্ধেয় ভাজন রাসূল ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম, ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লাগাতার আক্রমণ ও মিথাচার। মিথ্যাগুলো তরুণ প্রজন্মের সামনে উপস্থিত করা ও তাদের ঈমানকে সংশয়ের মুখে ফেলার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, কুরআন-হাদিসের ভুল অনুবাদ ও ব্যাখ্যা-সহ অনেক বিষয়েই তারা বেশ 'মুনশিয়ানা' দেখিয়েছে। পরবর্তীকালে বেশ কয়েকজন যোগ্য ভাই কাফিরদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে কলম হাতে তুলে নিয়েছেন, তরুণ প্রজন্মকে দেখিয়েছেন আশার আলো। এই ঘটনায় মুসলিমদের জন্য রয়েছে বিশাল এক শিক্ষা। এক আল্লাহর ওপর ভরসা করে আমরা যদি চেষ্টা করি, তাহলে আল্লাহ চাহে তো কোনো পরিকল্পনাই এই দ্বীনের বিপরীতে বিজয়ী হতে পারবে না, আর আল্লাহর পরিকল্পনাই বড় পরিকল্পনা।

এক দশক আগেও ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের মনে যেসব প্রশ্ন উদয় হতো, সেসব প্রশ্নের জবাব সচরাচর আমরা কোথাও খুঁজে পেতাম না। আলহামদুলিল্লাহ্ এখন পরিস্থিতি বদলেছে। কারো মনে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন জাগলে তার জন্য যথেষ্ট রিসোর্স এখন সহজলভ্য। এছাড়াও বিষয়ভিত্তিক কয়েকজন লেখকের বই তরুণদের জিজ্ঞাসার জবাব দিতে সক্ষম হয়েছে[১]। ইসলাম নিয়ে সংশয়বাদী ও ইসলাম-বিদ্বেষীদের প্রশ্নের সঠিক জবাব জানতে এভাবে বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানার্জনের কোনো বিকল্প নেই।

- **মূলধারার মিডিয়া বর্জন :** দেশে নিজেদের অনুকূলে যেসব সেক্যুলার 'আগাছা' মিডিয়া আজ বিশাল বটবৃক্ষে পরিণত হয়েছে, তাদের প্রভাব থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ রক্ষা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। কারণ, সেক্যুলাররা যে বিষ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করায়, সেই ইঞ্জেকশন পুশ করার প্রধান সিরিঞ্জ হলো মিডিয়া। হয়তো-বা বাংলাদেশে 'মূলধারা'র কোনো ইসলামি মিডিয়া নেই বা থাকতে দেওয়া হয়নি। তাই বলে বিনা প্রশ্নে সেক্যুলার মিডিয়াকে গ্রহণ করা সমীচীন হবে না। যেটুকু মিডিয়া নিজেদের কাজে ব্যবহার না করলেই নয়, সেটুকুর ক্ষেত্রেও পূর্ণ সতর্ক থাকতে হবে। যেন দুধ ভেবে মদ ঘরে না ঢোকে। এছাড়া, মূলধারার না হলেও হাতেগোনা কয়েকটি নির্ভরযোগ্য মুসলিম মিডিয়া রয়েছে, সেগুলোর অধিক প্রচার ও প্রসার জরুরি।

[১] যেমনঃ পাশ্চাত্য ও ইসলামের দ্বন্দ্ব সম্পর্কে আসিফ আদনান, বিজ্ঞানবাদ সম্পর্কে রাফান আহমেদ, ইসলাম ও বিজ্ঞানের বিস্ময়কর যোগসূত্র ও সামগ্রিকভাবে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে ডাঃ শামসুল আরেফিন, জেনারেল পাঠকদের মাঝে ইসলাম সম্পর্কে আগ্রহ তৈরি এবং তাদেরকে বইমুখি করতে অদ্বিতীয় আরিফ আজাদ; এ ছাড়াও আরও অনেক দায়ী ভাই, আলীম, শাইখ-ই দ্বীনকে সহজবোধ্য ও সহজলভ্য করতে নিরলস পরিশ্রম করে চলেছেন। তাদের এক একটি বই মানে এক একটি বিপ্লব, নতুন কোনো জাগরণ। মহান রব, দয়াময় প্রভু আল্লাহ তাআলা তাদের কাজকে কবুল করে নিন।

সেক্যুলার মিডিয়া মুসলিমদের বিভিন্ন বিষয়ে বিষোদ্‌গার করে, এ ব্যাপারে আমরা প্রায় সবাই জ্ঞাত। তবে, অনেক সময় দেখা যায়, নিজ 'ঘরানা'র বাইরের কারো বিপক্ষে মিডিয়ার কোনো নিউজ দেখলে আমরা সেগুলো কোনো সন্দেহ প্রয়োগ ছাড়াই গ্রহণ করে ফেলি। এটি বেশ অদূরদর্শী পদক্ষেপ। কারণ, যে মিডিয়া তাদের স্বার্থের জন্য আপনার বিরুদ্ধে নিউজ করতে পারে, সে মিডিয়া তাদের স্বার্থ রক্ষায় আপনার অন্য ভাইদের বিপক্ষে-ও মিথ্যাচার করতে সক্ষম[১]। তাই, নিজেদের মিত্রের ব্যাপারে মিডিয়ার অবস্থানই যেন আমাদের অবস্থান হয়ে না দাঁড়ায়, সে ব্যাপারে সতর্ক থাকা জরুরি।

❁ সামাজিক প্রতিরোধ

এতক্ষণে গণমাধ্যমের কপটতা নিশ্চয়ই সবার সামনে স্পষ্ট, এখন প্রশ্ন হলো– এর প্রতিরোধে সামাজিকভাবে আমাদের কি করণীয়? বাংলাদেশের মুসলিমরা কি চিরকাল শুধুই পক্ষপাতিত্বের শিকার হয়ে বসবাস করতে বাধ্য হয়ে থাকবে? বর্তমান সময়ে আমাদের নতুন প্রজন্মের ইসলাম বিষয়ক ধ্যান-ধারণা কিংবা দ্বীনদারিতার একটা অংশও মিডিয়ার মাধ্যমে প্রভাবিত হয়। তাছাড়া, 'তিল'কে যারা 'তাল' করে আর 'তাল'কে করে 'তিল', খোদ সেই মিডিয়া কর্মীদেরকে এই আত্মবিধ্বংসী মিথ্যার অন্ধকূপ থেকে উদ্ধার করাও তো মুসলিমদেরই ঈমানী দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। এসব সমস্যার সমাধানে আমরা প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিকভাবে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিতে পারি–

- এক. লেখা, বলা, প্রচার করার যত জায়গা আছে, সবকিছুই আমাদের ব্যবহারযোগ্য হাতিয়ার। দৈনিক পত্রিকার 'মতামত' থেকে শুরু করে ইসলামি সাময়িকী, মাসিক পত্রিকা, মসজিদের মিম্বার, এমনকি স্বয়ং দৈনিক পত্রিকাকে কিভাবে ব্যবহার করা যায়, আমাদেরকে সেই ফিকির করা প্রয়োজন। এর জন্য একঝাঁক তরুণ প্রয়োজন, যারা বিষাক্ত সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ইসলামি মননে সুস্থ ধারার সাংবাদিকতাকে সামনে তুলে ধরবে। বিভিন্ন স্থানে লেখালেখির সুযোগটা তাদেরকে কৌশলের সঙ্গে কাজে লাগাতে হবে। নিজেদের হাত পাকাতে হবে, যেন যখনই কোনো ইসলামি প্লাটফর্ম তৈরির সুযোগ আমাদের

[১] উদাহরণস্বরূপ, ধরুন, সর্বজনগৃহীত কোনো আলিমের বিপক্ষে সেক্যুলার মিডিয়া যখন মানহানিমূলক সংবাদ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে প্রচার করে, তখন সকলেই এর প্রচার করে, তখন আপামর জনতা মিডিয়ার বিরুদ্ধে নিজেদের ক্ষোভ উগড়ে দেয়। কারণ, তারা জানে মিডিয়ার এ বিদ্বেষের উৎস কি। কিন্তু, যখন দেখা যায় নির্দিষ্ট কোনো ঘরানার কিংবা স্বল্প পরিচিত কোনো আলিমের বিপক্ষে মিডিয়া উল্টাপাল্টা সংবাদ প্রচার করছে, তখন সেটা অনেকেই বিশ্বাস করে ফেলে। এই চিন্তাটা তাদের মাথায় আসে না যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি স্বল্প পরিচিত হলেও, এমনটিও তো হতে পারে যে, উক্ত ব্যক্তিটিও মিডিয়ার কোনো স্বার্থে আঘাত করেছে, তারা মিডিয়া এভাবে ফলা তুলেছে ছোবল মারার আশায়।

সামনে আসবে, তখন যোগ্য কর্মীদের অভাব যেন কারো মনে অনুভূত না হয়। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের টগবগে তরুণরা–যাদের আছে অদম্য উদ্যম আর সময়ের প্রাচুর্য–সংগঠন তৈরি করে তার মাধ্যম নিজেদের কাজকে একীভূত করে শক্তিশালী করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। তবে দক্ষতা অর্জন করতে গিয়ে যেন কাফিরদের অন্ধ অনুকরণ হয়ে না যায়, সে বিষয়ে সদা সতর্ক থাকা প্রয়োজন, নতুবা অনুসরণের সেই সিদ্ধান্ত আত্মঘাতী প্রমাণিত হবে।

- দুই. আমাদের নিজেদের মাঝে একতা বৃদ্ধির অন্য কোনো বিকল্প নেই। কোথাও কোনো সেক্যুলার বা ব্রাহ্মণবাদী অপরাধী ইসলামের কোনো বিষয়ে অবমাননা করে জনগণের রোষের মুখে পড়লে, সেক্যুলাররা যেভাবে এক হয়ে যায়–সেটা আমাদের জন্য বড় দৃষ্টান্ত। তার সমর্থনে সব সেক্যুরা শাহবাগে জড়ো হয়, স্লোগান দেয়, ইলেকট্রিক বাল্বের নিচে মোমবাতি প্রজ্বলিত করে। আমাদেরকেও ঐক্যবদ্ধ হবার পাঠ শিক্ষা নেওয়া জরুরি।কখনো কোনো মুসলিম সেক্যুলারদের রোষানলে পড়লে সকলের উচিত তার সমর্থনের কথা উচ্চকিত কণ্ঠে প্রকাশ করা। সেক্যুলারদের বুঝিয়ে দেওয়া—আমরা কেউই একা নই, সবাই মিলেই আমরা 'এক উম্মত'।

মিডিয়ার কিছু কাজ আছে, যা অবশ্যই প্রশংসনীয়। নাগরিক অধিকার আদায় এবং নানাবিধ দুর্নীতি রোধে বামপন্থী মিডিয়া কর্তা-কর্মীরা 'সীমিত' পর্যায়ে যেসব প্রচেষ্টা চালায়। সেসব কাজের প্রশংসা করায় কৃপণতা প্রদর্শন আমাদের কাম্য নয়। তবে, আদর্শের প্রশ্নে কখনো কখনো ইসলামের বিরুদ্ধে মিডিয়া ও মিডিয়া ব্যক্তিত্বরা মুখোমুখি অবস্থান গ্রহণ করে। সেই ক্রান্তিকালীন সময়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ে মুসলিমরা যদি একতাবদ্ধ থাকতে না পারে, তাহলে অল্প সময়ে প্রতিপক্ষ অনেক বেশি ফায়দা তুলে নেয়। তাই, সংবেদনশীল মুহূর্তে সেক্যুলারদের চক্রান্তের ব্যাপারে সকলের উচিত সবাইকে সতর্ক করা।

- তিন. সেক্যুলার মিডিয়া এবং তার পুরাধা ব্যক্তিত্বরা প্রায়শই ইসলামের বিভিন্ন বিধান কিংবা ইসলামি সংগঠন ও সমমনা ব্যক্তি-দলের বিভিন্ন কাজ, মতামত নিয়ে একচোখা চুলচেরা 'বিশ্লেষণ' করে থাকে। বলা চলে এই কাজটা তাদের বেশ প্রিয়। এর প্রতিরোধে আমাদেরও কিছু কাজ করার আছে। প্রতিটি সেক্যুলার মিডিয়া ও তাদের কাণ্ডারি 'সুশীল'রা অতীতে ইসলাম-বিরোধী যেসব কুকর্ম করেছে, মুসলমানদের কাছে তাদের দাবি করা স্ট্যান্ডার্ডগুলো নিজেদের জীবনে তারা কিভাবে প্রতিনিয়ত সেসবের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা বজায় রেখে চলে–সেগুলোর ফিরিস্তি জনগণের সামনে ঘোষণা করা। এই ক্ষেত্রে দল-মত-ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা সর্বদা জরুরি নয়, মুখে নাম না নিয়েও বহু হাতি-ঘোড়া ঘায়েল করা যায়।

এসব সাংবাদিকদের মাঝে অনেকেই আছে, যারা ইসলামের গণ্ডি থেকে ইতিমধ্যেই বেরিয়ে গেছে, নিজেদের গণ্ডদেশ থেকে প্রকাশ্যেই খুলে ফেলেছে ঈমানের রজ্জু। চিন্তা চেতনা আর কর্মে দৈন্যদশার শিকার সেই ব্যক্তিরা কিভাবে ইসলামি শিক্ষা ও আদর্শের সংস্কারের দাবি তুলে—সেই উদ্ভট চিত্রটা সুস্পষ্ট ও বিশালাকারে সবার সামনে তুলে ধরা যায়। ভূমিদস্যুদের কোম্পানিগুলো কিভাবে পত্রিকা, টিভি চ্যানেল খুলে জাতির নৈতিকতার মানদণ্ড উন্নতির 'প্রকল্প' হাতে নিয়েছে, সেসব বিষয়ে আলোচনা প্রকাশ্যে নিয়ে আসা যেতে পারে। বিভিন্ন সময়ে তাদের করা অসঙ্গতি আর বহুরূপী চেহারার জলছবির আর্কাইভ সংরক্ষণ করে রাখতে হবে। যেন কিছুকাল নিরব থেকে পুনরায় কোনো অর্বাচীন তাদের অপকর্ম পুনঃপরিচালনা আরম্ভ করতে সাহস না পায়। আর এসবের জন্য চাই নিজস্ব শক্তিশালী গণমাধ্যম।

এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে আমাদেরকেও কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে। ওরা বলে, আদর্শ ইসলাম হলো সুফিবাদি ইসলাম। ধর্ম পবিত্র জিনিস, এর সাথে রাজনীতি মেশানো ধর্মের জন্য অপমানজনক। আমাদের ওস্তাদরা বলবে, 'দেখুন। ইসলাম আপনি কার কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করবেন, সেটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেসব ব্যক্তিরা নিজেদের ব্যক্তি জীবনে লিভ টুগেদার, মাদক দ্রব্যের মতো অপকর্মে জড়িত থাকে, তাদের কাছ থেকে ইসলাম শেখাটা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায়। দেশের প্রভাবশালী গণমাধ্যমগুলোর দিকে লক্ষ্য করুন। এদের কোনটির মালিক ভূমিদস্যু, কোনটির মালিক যিনার পর নারী হত্যার অভিযোগে জড়িত। কিন্তু সেসব বিষয়ে এরা কখনো রা করে না। এমন ডাবল স্ট্যান্ডার্ড মেনে চলা ব্যক্তিরা কিভাবে ইসলামের ব্যাপারে "গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল" হতে আসে? এভাবে চললে আপনাদের ঈমান আমলের হেফাজত করা অসম্ভব হয়ে পড়বে।' এদের ব্যাপারে সাধারণ জনগণকে সতর্ক করতে হবে, মসজিদে মিম্বারে ইমাম-খতীবরা কৌশলে মিডিয়ার বিষবাষ্পের ব্যাপারে জনগণকে সতর্ক করলে ইনশাআল্লাহ অবস্থার পরিবর্তন হবে।

- চার. সেক্যুলারদের কাছ থেকে প্রশংসা শুনে আনন্দিত হওয়ার মতো কাঁচা কাজের ব্যাপারে আরও সতর্কতার অবকাশ রয়েছে। "আবহমান কাল থেকে এ দেশের মুসলিম 'মধ্যমপন্থী', উদার। তারা ধর্মের নামে উন্মাদ নয়; এ দেশের মুসলিমদের রক্তের সাথে মিশে আছে 'লোকজ' ইসলাম। কওমি মাদ্রাসাগুলোই জঙ্গি তৈরির কারখানা। তাই 'অমুক সংরক্ষণ' দলের মতো কট্টরপন্থী, মৌলবাদী ইসলামের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই।"—এ দেশে এই ধরনের কথা বলার মতো লোক কিংবা মিডিয়ার অভাব নেই। তাদের এসব কথাবার্তা ইসলামের সুরক্ষাকারী সংগঠন ও আপামর জনসাধারণের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির এজেন্ডা ব্যতীত আর কিছুই নয়। তারা চায়, সম্মানিত আলেম শ্রেণির সংস্পর্শ থেকে সাধারণ মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে, তাহলেই তাদের অভীষ্ট লক্ষ্য

পুরণ সহজতর হবে; যদিও তারা নিজেরাই সাধারণ জনগণের সেই 'ইসলাম'কে ধারণ করে না।

শহুরে শিক্ষিত মানুষগুলো সচরাচর এ ধরনের কথা শুনে বেশ প্রভাবিত হয়। তারা ভাবে, কথা তো মিথ্যা বলেনি। আমরা মসজিদে যাই, নামাজও পড়ি। আমরাই আদর্শ মুসলিম। নিশ্চয়ই মাদ্রাসাগুলোতে সমস্যা আছে, নয়তো সব পত্রিকাগুলোতে তাদের বিরুদ্ধে লেখালেখি করবে কেন? কিন্তু, তারা এভাবে ভেবে দেখে না যে, এই কথাগুলো যেসব ব্যক্তি আর মিডিয়া প্রচার করে, তাদের অনেকে ব্যক্তিজীবন থেকে ইসলাম থেকেই খারিজ করে দিয়েছে। তারা ঐসব মুসলিমকে আদর্শ বলে, যারা শুধু কিছু ইবাদতের মধ্যে নিজেদের ইসলাম পালনকে সংকীর্ণ করে রাখে। আর যারা চায় মুসলিম উম্মাহর সকল সদস্য পুরো জীবনকেই ইসলামের রঙে রঙিন করুক, তারাই মিডিয়ার চোখের বালি। তাই, নাস্তিক্যবাদীরা তারা মডারেট মুসলিমদের আদর্শ মুসলিম হিসেবে প্রচার করে বেড়ায়। ওদের টার্গেট, উম্মাহর নেতৃত্ব দানকারী ত্যাগী আলেম সমাজের সাথে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মুসলিমদের ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করা।

তাই এ ধরনের 'স্বতঃসিদ্ধ'(?) কথাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে হবে, এর বিপরীতে আলিমদের সাথে সাধারণ জনতার চিরায়ত আত্মিক সম্পর্কের কথা আলেম শ্রেণি এবং জনসাধারণের প্রতিনিধি—উভয় পক্ষকে দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করতে হবে। সেই সঙ্গে সেক্যুলারদের সঙ্গে জনতার বিচ্ছিন্নতার কথা ব্যক্ত করে তাদের অলীক স্বপ্নময় ঘুমে পানি ঢেলে দেওয়ার ব্যবস্থা সর্বদা জারি রাখা জরুরি, যেন তাদের সার্বজনীন মিথ্যা কথায় কেউ বিভ্রান্ত না হয়, আর মুসলিমদের মাঝে নতুন করে কোনো ফাটল কিংবা দেওয়াল সৃষ্টি হতে না পারে।

তবে, সত্য প্রকাশের পাশাপাশি এখনকার প্রতিকূল পরিবেশে যুদ্ধাংদেহি মিডিয়ার সঙ্গে মুসলিমদের 'সমঝোতা'র চেষ্টা অব্যহত রাখা যেতে পারে। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ইসলামের প্রতি আবেগ ভালোবাসা মিডিয়ার হর্তা-কর্তাদের অজানা নয়, তারাও এখন সরাসরি ইসলামের ওপর আঘাত হানতে ভয় পায়। তাই, মিডিয়া কর্মীদের সঙ্গে সমঝোতার সম্ভাবনা একেবারেই বাতিল না করে তাদের সাথে মতবিনিময়, শুভেচ্ছা আদান-প্রদানের সম্পর্ক চালু রাখা যেতে পারে।

- পাঁচ. আমাদের নিজেদের আরও কিছু প্রকাশনা আসা দরকার, খুবই দরকার। কোনো প্রকাশনী কাজ করবে শিশুদের নিয়ে, কোনটা গল্প-উপন্যাস প্রকাশ করবে কিশোরদের জন্য। ইসলামি বইয়ের জগতে খেদমত আঞ্জাম দেওয়ার মতো যথেষ্ট প্রকাশনী আমাদের আছে আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু, দুঃখের বিষয় হলো, শিশু-কিশোরদের নিয়ে আমরা তেমন চিন্তা করি না। সেক্যুলাররা কিন্তু বসে নেই, শিশু-কিশোরদের নিজেদের চিন্তার ছাঁচে ফেলে গড়তে তারা অমুক

'আলো', তমুক'চিন্তা' ইত্যাদি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করে চলেছে। আর সেসব প্রকাশনায় সেক্যুলাররা ইসলাম-বিরোধী কাজগুলোকে 'সাহসী', 'স্বাধীন' হিসেবে অভিহিত করে চালিয়ে যাচ্ছে স্লো-পয়জনিং। আজ যদি আমরা এর সমাধানে এগিয়ে না যাই, কাল হয়তো দেখতে পাব, ভবিষ্যতে যেই ছোট্ট কিশোর হতে পারত এই উম্মাহর কর্ণধার, হতে পারত উমর মুখতারের মতো সিংহ-পুরুষ, যেসব কোমলমতি নারীরা জন্ম দিত খালিদ বিন ওয়ালিদের মতো বীর সেনানী, সেক্যুলারদের ফাঁদে পড়ে সেই ছেলেটা মিছিলে শাড়ি আর টিপ পরে লিপস্টিক লাগিয়ে সমকামিতার পক্ষে স্লোগান দিচ্ছে, আর সেই মেয়েটার গর্ভের সন্তান পড়ে আছে ভার্সিটির ডাস্টবিনে।

- ছয়. যারা প্রোপাগান্ডা বিশ্লেষণে সক্ষম, তাদের উচিত সম্মুখসারিতে থেকে সবাইকে প্রোপাগান্ডা প্রতিরোধে নেতৃত্ব দেওয়া। আমাদের মাঝে এমন একটা দল থাকা প্রয়োজন, যারা হবে মিথ্যার জগতের বাসিন্দাদের কাছে গলার কাঁটার মত। তাদের কাজ হবে সিস্টেম্যাটিক ধারায় প্রোপাগান্ডিস্টদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কর্মপ্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করা। অতঃপর সবচে কার্যকরী উপায়ে তাদের গোমর ফাঁস করতে হবে দ্রুততম সময়ে। তবে, এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে, সত্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে যেন কোনো পদস্খলন না হয়; কিংবা অপরের ওপর মিথ্যা অপবাদের জুলুম না হয়ে যায়। প্রতিবাদের ভাষা ও পদ্ধতিতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু করে বসলে দুইটা ক্ষতি হয় :

ক) প্রতিবাদের নিরপেক্ষতা ও আন্তরিকতার ব্যাপারে সংশয়ের সৃষ্টি হয়; স্বপক্ষের অনেক লোকজনও প্রতিপক্ষের প্রোপাগান্ডা মিথ্যা হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহে পড়ে যায়।

খ) দীর্ঘমেয়াদে দল বা সংগঠনটির গ্রহণযোগ্যতা হ্রাস পায়।

আবার, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রোপাগান্ডা ফাঁসকারী ব্যক্তিদেরকে প্রতিষ্ঠিত শক্তি নিজেদের চক্ষুশূল হিসেবে দেখে। তাই, প্রোপাগান্ডা এক্সপোজ বা ফাঁস করে দেওয়ার ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম সতর্কতা এবং হেকমত প্রয়োগ কাম্য।

- সাত. প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন একদল তরুণ থাকা প্রয়োজন, যারা ইসলামকে অন্তরে ধারণ করবে এবং এই মহৎ কাজেরর পেছনে নিজেদের নিয়োজিত রাখবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেই বেশিরভাগ মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা সুযোগ পায়। কিন্তু তাদের অধিকাংশের মেধাই দুঃখজনকভাবে মননশীল কোনো কাজে আসে না। কারণ, পাঠ্যপুস্তকের বাইরের দুনিয়ায় সরব আর উৎসাহী অনেক ছাত্রকে নিজেদের জালে আবদ্ধ করে ফেলে রাজনৈতিক অঙ্গসংগঠনের সন্ত্রাসী 'ছাত্র'রা। গোড়াতেই এই পথ বন্ধ করার উদ্যোগ প্রয়োজন। মেধাবীদের জন্য

ইসলামি চিন্তা-চর্চা করার প্লাটফর্ম তৈরি প্রয়োজন। তারা কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে না, তবে ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের ক্ষেত্রে তারা হবে কঠোরপ্রাণ। শত শত দ্বীনি বৈঠক, ক্যাম্পেইন হবে। খ্যাতনামা লেখক, শাইখরা ভার্সিটি থেকে ভার্সিটিতে গিয়ে প্রোগ্রাম করবে। কয়েক বছর পর আমাদের ছাত্ররা সেক্যুলার ইসলামোফোব প্রফেসরদের টেক্কা দেওয়ার মতো সক্ষমতা অর্জন করবে, এটি আমাদের বিশ্বাস এবং দুআয় স্থান দখল করুক। নতুন প্রজন্মের নবীনেরা মিডিয়া, এডুকেশন কারিকুলাম, কালচারের নামে চলা অসঙ্গতিকে সবার সামনে দিনের আলোর মতো ফুটিয়ে তুলে ধরবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হবে ঈমানের ফুলে সুরভিত, মস্তিষ্কের ক্যানভাসে পড়বে অরুণ প্রাতের তরুণদের হাজারও চিন্তার তরতাজা তুলির আঁচড়।

- আট. সাধারণ মানুষের অনুধাবনযোগ্য পোস্টার, ব্যানার, লিফলেট ইত্যাদি তৈরি করে জনগণের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। হিটলার এ ব্যাপারে সঠিক ছিলেন যে, অধিকাংশ জনগণই প্রফেসরদের মতো মেধা কিংবা চিন্তা নিয়ে বসবাস করেন না। তাই তাদেরকে তাদের চিন্তার দক্ষতা অনুসারে টোটকা দেওয়ার পদক্ষেপ নিতে হবে। এ ধরনের কাজের ব্যাপারে লস্ট মডেস্টি গ্রুপ ইতিমধ্যেই দেশব্যাপী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, আল্লাহ তাদের কাজে আরও বারাকাহ দান করুন। আমরা তাদের কাছ থেকে এই শ্রেণির কাজের ব্যাপারে পরামর্শ গ্রহণ এবং তাদের সাথে সমন্বিত কাজের আয়োজন করতে পারি।

প্রোপাগান্ডা স্বল্পমেয়াদী বা দীর্ঘমেয়াদী উভয় প্রকারই হতে পারে। কোনো প্রোপাগান্ডার স্থায়িত্ব হয় অল্পকালব্যাপী, যেগুলোর উদ্দেশ্য—স্বল্প সময়ে শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে অধিক লাভ অর্জন। আবার কিছু প্রোপাগান্ডা হয় দীর্ঘমেয়াদি; ধীরে ধীরে, অল্প অল্প করে বিষ শত্রুপক্ষের মস্তিষ্কে পুশ করা হয়, যার প্রভাব সহজে চোখে পড়ে না, কিন্তু সূক্ষ্মবোধ, ওজনদার অভিজ্ঞতা, সুতীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টি আর শক্ত পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি বা দল যদি পূর্বাপর পরিস্থিতি বিচার-বিশ্লেষণ করেন, তাহলে তার অন্তর্চক্ষুতে পরিবর্তন ধরা পড়তে বাধ্য। ছোট্ট একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ধরুন, কোনো এক বর্ষীয়ান আলেমের বিপক্ষে মিডিয়া কর্মীরা মিথ্যা প্রতিবেদন প্রকাশ করলেন। এটি মিথ্যা হবার ব্যাপারে শতভাগ নিশ্চিত ইসলামপন্থীরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানালেন, সঠিক তথ্য অনলাইনে প্রকাশ করা হলো, সেক্যুলার মিডিয়া তাদের প্রতিবেদন সরিয়ে ফেলতে বাধ্য হলো। এটি হলো ক্ষণস্থায়ী প্রোপাগান্ডা—যদিও তা দীর্ঘস্থায়ী প্রোপাগান্ডারই একটি অংশ। আবার ধরুন, কয়েক বছর আগে জেনারেল শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইতে ইসলাম-বিদ্বেষী নাস্তিকদের লেখা বাতিল করে ইসলামের শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিছু সংস্কার করা হয়। এর মাঝে প্রাথমিক শিক্ষার কোনো এক বইতে অক্ষর চেনাতে গিয়ে লেখা হয়, 'ও-তে ওড়না চাই'।

এ নিয়ে বাংলা মিডিয়া-কর্মীদের সেকি কান্না! একাত্তরের যুদ্ধে 'বিশেষ' ভূমিকা রাখা শাহরিয়ার কবির তো বলেই বসলেন, অ তে অযু, আ তে আল্লাহ—এসব যে প্রতিষ্ঠানে শেখানো হয়, সেসব প্রতিষ্ঠানের শিশুরাই বড় হয়ে জঙ্গি হয়।

এখন, এই যে ক্ষণস্থায়ী প্রোপাগান্ডা, এর প্রভাব এবং এটির বিরোধিতা করার ফলাফল তাৎক্ষণিক উপলব্ধিযোগ্য। কিন্তু, আপনি যদি শিক্ষাব্যবস্থা ও মিডিয়ায় ইসলামি পোশাকের ব্যাপারে সেক্যুলারদের মিথ্যা তথ্য প্রচারের কথা চিন্তা করেন, তাহলে দেখতে পাবেন—তারা খুব দ্রুত সফলতা পায় না, সেটি তারা আশাও করে না। আপনি আজ পত্রিকায় পড়লেন, বোরকা-হিজাব ইসলামে আবশ্যক নয়। আপনি জানেন, পত্রিকায় মিথ্যা বলা হয়েছে, তাই আপনার মাঝে কোনো ভাবান্তর হলো না। কিন্তু, হয়তো আপনার ছোট ভাই অথবা বোন, কিংবা আপনার ভবিষ্যৎ প্রজন্ম একসময় বারবার এই কথাটি দেখতে দেখতে ভাববে—'ঠিকই তো, বোরকা হিজাব না পড়লেও তো চলে। পর্দা হয়তো এত জরুরি না।' এভাবেই তারা আমাদের মস্তিষ্কে বিষ ঢুকায়; যার প্রভাব দীর্ঘমেয়াদে সমাজে দৃশ্যমান হয়। তাই, স্বল্পমেয়াদে প্রোপাগান্ডার বিরুদ্ধে যেমন তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিয়ে ময়দানে সক্রিয় হওয়া জরুরি, তেমনি দীর্ঘমেয়াদী প্রোপাগান্ডাকে প্রতিরোধ করতে যথাযথ পর্যালোচনার মাধ্যমে একতাবদ্ধ, শক্তিশালী পদক্ষেপ নেওয়া সময়ের দাবি। মুসলিম কমিউনিটির সময় এসেছে আরও বড় কাজের দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে নেওয়ার। আপনি রক্ষা পেয়েছেন, আপনার পরবর্তী প্রজন্মকেও রক্ষার ব্যবস্থা আপনাদেরই নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে নিরাশ-হতাশ হবার কোনো সুযোগ নেই। চেষ্টা করার দায়িত্ব আমাদের; সফলতা, কবুল করার দায়িত্ব আমাদের রবের।

❁ রাষ্ট্রীয় প্রতিরোধ

বর্তমান সময়ে 'মুসলিম'রা যেহেতু ক্ষমতাচ্যুত, তাই রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রোপাগান্ডা প্রতিরোধের ক্ষমতার চাবিকাঠি আমাদের হাতে নেই। তবে, এর একটি আদর্শ চিত্র আমরা সদ্য বিজয়ী ইমারতে ইসলামিয়ার ছাত্রভাইদের গৃহীত পদক্ষেপগুলোতে দেখতে পাই, যেখানে মিথ্যা প্রচার করা সাংবাদিকদের চাবুক পেটা করা হয়। আমাদের হাতে যেহেতু সে সুযোগ নেই, তাই আমাদের ভিন্নভাবে এগোতে হবে।

আমাদের দেশে ইসলামপন্থিদের বলার মতো কোনো মিডিয়া নেই। আগামীকাল যদি কোনো দেশবরেণ্য আলেম ঘোষণা করেন, 'আমাদের মাদ্রাসা জালেমদের আক্রমণে অস্তিত্ব সংকটে ভুগছে। এই মুহূর্তে তাদের প্রতিহত করার শক্তি আমাদের নেই, তাই আমরা অন্য জায়গায় কালকের মধ্যে আমাদের মাদ্রাসার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে চাই, যেন ইসলাম-বিরোধী শক্তিরা নিজেদের বিজয়ী পক্ষ ভাবতে না পারে। এই মাদ্রাসা আপনাদের সকলের, আমি চাই দেশের সবাই, বিশেষ করে

আল্লাহর নিয়ামতপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা যেন দরাজ হস্তে আমাদের এই সংকট দূর করতে দরাজ দিলে এগিয়ে আসেন'।

এ ঘোষণা করার এক দিনের মাথায় ঢাকায় কয়েক কোটি টাকা খরচ করে মাদ্রাসা তৈরি করার অর্থ সম্মানিত আলেমের হাতে পৌঁছে যাবে ইনশাআল্লাহ। এটা আমার আশা নয়, বরং এটিই বর্তমানে শহুরে সমাজের ইতিবাচক বাস্তবতা। কোনো দুর্যোগকালীন মুহূর্তে যদি দেশের সকল মুসলিম এভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে, তাহলে দেশে মুসলিমদের পক্ষে বলিয়ের অভাবে দিনের পর দিন আমাদের আওয়াজগুলো যে মাটিচাপা পড়ে যাচ্ছে। আমাদের কথাগুলোর জায়গা দখল করছে বিষাক্ত ইসলাম-বিদ্বেষীদের চিৎকার, সেটি কি দুর্যোগ হিসেবে বিবেচিত হবার যোগ্যতা রাখে না?

এ দেশের আলেম সমাজ যদি সমাজের বিত্তশালী ইখলাসপূর্ণ মুসলিমদের সাথে নিয়ে বসেন, কয়েকটি বড় মাপের শক্তিমান মিডিয়া প্রতিষ্ঠা করার মতো টাকা জোগাড় করা তেমন কঠিন কোনো বিষয় না। এক্ষেত্রে আমাদের অনেক কাজ করা বাকি রয়েছে। সাধারণত একটি মসজিদ কিংবা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করতে আমাদের আবেগ ও কর্মের যে সক্রিয়তা দেখা যায়, মিডিয়ায় নিজেদের শক্তিশালী অবস্থান তৈরির উদ্যেগের ক্ষেত্রে সেরকম তৎপরতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। অথচ একটি শক্তিশালী প্রিন্ট মিডিয়া কিংবা টিভি চ্যানেল শত শত মসজিদ-মাদ্রাসা এবং এদের পরিচালিত সামাজিক কর্মকাণ্ডের ভাবমূর্তি উন্নয়নে অভাবনীয় ভূমিকা রাখতে সক্ষম, এ দেশের বৈরি আবহাওয়ায় যেটি অত্যন্ত কার্যকরী উপায় হতে পারতো। যদিও এটি একদিনে বাস্তবায়নের কোনো বিষয় নয়; ব্যাপারটা বেশ আলোচনা-সমালোচনার দাবি রাখে।

আপাতদৃষ্টিতে বিষয়টা হতাশাজনক মনে হলেও হতাশার কোনো কারণ নেই। আমাদের নেতৃত্ব দেবার মতো আকাবির আর মেধাবী টগবগে এক ঝাঁক তরুণ আছে; উদ্যম, শক্তি, দৃঢ় সংকল্প আর আল্লাহর ওপর সীমাহীন আস্থায় যারা অতুলনীয়। তাই, এখন প্রয়োজন সমন্বয়, ইচ্ছা ও সামর্থ্যকে পুঁজি করে ময়দানে হাতে কলমে কাজে নেমে পড়া। এ জন্য নেতৃস্থানীয় ওস্তাদদের দৃষ্টি আকর্ষণ আশু জরুরি বলেই আমার বিশ্বাস।

সর্বশেষ[১] যে পদক্ষেপটি গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল আনতে সক্ষম হতে পারে, সেটি হলো প্রোপাগান্ডা ছড়ানোর 'নেতাকর্মী'দের মাঝে দাওয়াতি কাজ অব্যহত রাখা। এটি আদতে তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে না হলেও দুআর প্রভাব ও ক্ষমতা সেই সীমা পর্যন্ত, আমার রবের ক্ষমতার সীমা যতটুকু। কারণ, আমাদের ভুলে গেলে চলবে না,

[১] আমার অল্পজ্ঞানে হয়তো সবকিছু বইয়ের পাতায় তুলে আনতে পারিনি। আমি নিশ্চিত অনেকেই আমার চাইতে এসব বিষয়ে অধিক ইলম রাখেন আলহামদুলিল্লাহ। তাই, এ বিষয়ে কারো কোনো যৌক্তিক পরামর্শ, উপদেশ, আলোচনা, সমালোচনা সাদরে গ্রহণযোগ্য ও কাম্য।

হিদায়াত দান করার একমাত্র মালিক সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলা। তিনি কখন তাঁর কোনো বান্দার দুআ কবুল করে নেন, বলা তো যায় না। তাই আমাদের বিশেষ কর্তব্য হলো, একদিকে সেক্যুলার গোষ্ঠীর নেতাকর্মীদের মাঝে কৌশলের সঙ্গে দাওয়াতি কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা; আর এর সাথে আল্লাহর কাছে তাদের জন্য দুআ অব্যহত রাখা। এমনটি হওয়া অসম্ভব নয় যে, আজ যে নেতা-কর্মী ইসলামের বিরুদ্ধে, কাল সে ইসলাম-বিদ্বেষীদের চক্ষুশূলে পরিণত হয়েছে। আর শত্রু শিবিরের সেনাপতিরা যখন যুদ্ধের ময়দানে প্রকাশ্যে দল বদলে ফেলে, তার প্রভাব নিশ্চয়ই কারো অজানা নয়।

দুটি বিষয় আমাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আনতে হবে। এক, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী; দুই, গণমাধ্যম। এর একটি কাজ করে শিশু-কিশোরদের কোমল মস্তিষ্ক নিয়ে; অপরটি ছোট-বড় সবার চিন্তা-চেতনাকে বদলে দেওয়ার সার্বক্ষণিক চেষ্টায় লিপ্ত। এই দুটি জিনিসকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা যতদিন আমাদের হাতে না আসবে, ততদিন প্রোপাগান্ডা প্রতিরোধের সব চেষ্টাই অপ্রতুল বিবেচিত হবে। কারণ, যুদ্ধের ময়দানে তলোয়ার ফেলে শুধু ঢাল হাতে বেশিক্ষণ টিকে থাকা সম্ভব নয়। আপনি দাওয়াতের মাধ্যমে প্রতিবছর এক-দু হাজার অমুসলিমকে ইসলামের পথে ফিরিয়ে আনলেন, ভালো কথা। কিন্তু মিডিয়া আর পাঠ্যসূচির প্রভাবে মুসলিম দম্পতির ঘরে ঘরে কিশোর তরুণরা যেভাবে মুরতাদ হয়ে যাচ্ছে, সেটিকে আটকানোর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ কোথায়? আল্লাহ না করুক, পরিস্থিতি যেদিকে এগুচ্ছে, মুসলিম নামধারী নাস্তিকদের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে একসময় ব্যাপারটা স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়াবে, তখন সেটি আমাদের জন্য কতটা বেদনাদায়ক হয়ে দাঁড়াবে—সেটি নিয়ে কয়জন চিন্তা করি? সময় থাকতে এই দিকগুলো নিয়ে ফিকির করা দরকার, নিজে মুমিনদের দুর্গের বাসিন্দা হয়ে নিশ্চিন্ত হবার কোনো সুযোগই আমাদের সামনে নেই।

আরও একটি কথা না বললেই নয়, প্রোপাগান্ডার প্রতিরোধে করণীয় বিষয়গুলো বিশদ আলোচনার দাবি রাখে। ক্ষুদ্র এক অধ্যায়ে পুরোটা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রায় অসম্ভবই বলা যায়। বইয়ের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় অনেক কিছুই অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয় না। তাই, গোটা একটি বই মিডিয়া প্রোপাগান্ডা প্রতিরোধের বিষয়ে পড়তে পারলে তা ভালো কাজে আসবে। এ বিষয়ে খোঁজাখুঁজি করে আমি এমন এক অমূল্য রত্নের খোঁজ পাই, যেটিকে এ টপিকে 'দেশসেরা' বই বললেও অত্যুক্তি হবে না। মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ বাস্তবিকভাবেই একজন শরীফ মানুষ, ব্যক্তিজীবনে তিনি একজন সাংবাদিক, লেখক, সম্পাদক; এবং উনার সবচে বড় পরিচয়, উনি একজন আলেমে দ্বীন। লেখালেখিতে সিদ্ধহস্ত এই বর্ষীয়ান আলেম সেই ২০১৬ সালেই *মিডিয়ার হঠকারিতা* নিয়ে মাস্টারপিস এক বই লিখেছেন, যার শিরোনাম, *'মিডিয়ার*

বিচিত্র ভ্রষ্টাচার'[১]।

অল্পজ্ঞান নিয়ে এ বিষয়ে আমি যখন লিখতে বসলাম, তখন একটা সময়ে এসে আমার মাথায় হাত পড়ে, প্রোপাগান্ডার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তো হলো, কিন্তু এর প্রতিরোধ, প্রতিকারের ব্যাপারে সমাধান কোথায় পাব? ঠিক ঐ মুহূর্তে আল্লাহর অশেষ কুদরতে আমি এই বইটির খোঁজ পাই। আর অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করি, যে বিষয়ে আমরা আজ ভাবছি, সে বিষয়ে তিনি আরও ছয় বছর আগেই পূর্ণাঙ্গ কাজ করে ফেলেছেন। বইটিতে তিনি বর্তমানের করণীয় এবং নিজেদের মিডিয়া প্রতিষ্ঠার কর্মকৌশল এবং মূলনীতি সম্পর্কে সাবলীল আলোচনা রেখেছেন।

অভিজ্ঞতা আর দূরদৃষ্টিতে সম্মানিত শায়েখের কোনো তুলনা নেই, সেই তুলনায় আমি বলতে গেলে ধর্তব্যই না। তাই, কেউ যদি 'প্রোপাগান্ডার সমাধান' সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে এবং সে অনুযায়ী কাজ করতে উদ্যোগ নিতে চান, তাহলে তার উচিত উনার এই বইটি অধ্যয়ন করা; এটি আমার সবিনয় নিবেদন। এছাড়াও দেশের আপামর জনসাধারণের মাঝে পড়তে সক্ষম এমন সকলের উচিত এই বইটির মতো একটি বই অধ্যয়ন করা, যা তাদের চশমাটির ময়লা সাফ করে দিবে। আমার বিশ্বাস, সহজবোধ্য ভাষায় লেখা বইটি সব বয়সের মানুষই অনুধাবন করতে পারবে, এবং এটি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিতে সক্ষম হবে, ইনশাআল্লাহ।

❁ Bibliography

Hitler, A. (1926/1939)। Mein Kampf - The Official 1939 Edition. Coda Publishing Ltd.

Jowett, G. S., & O'Donnell, V. J. (1986/2012)। Propaganda & Persuasion. SAGE Publications.

[১] ইউটিউবে Risalatul Islam BD নামক চ্যানেলে শায়েখের "সময়ের পাঠ" নামক একটি প্লেলিস্ট রয়েছে। ইসলাম, দেশীয় রাজনীতি ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তার মূল্যবান মতামত [illegible] আপনার কাজে আসবে ইনশাআল্লাহ।

শেষ কথা

ইটটার জবাব পাটকেলেও হয়

মিডিয়াতে প্রায়ই দেখতে পাবেন, তাদের নির্ধারিত কিছু মানদণ্ডে মুসলিমরা কিভাবে 'ফেইল' করে, এর সচিত্র প্রতিবেদন তারা প্রচার করে বেড়ায়। কখনো ইসলাম বনাম বাঙালিয়ানা, কখনো-বা দেশপ্রেম–এ ধরনের প্রশ্ন উত্থাপনের মাধ্যমে কেন যেন তারা মুসলিমদের অবস্থানকে বারবার প্রশ্নবিদ্ধ করতে চায়। তাদেরকে বিব্রত করে মিডিয়া ব্যক্তিত্বরা বেশ সুখ অনুভব করেন। ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই।

ধরুন, কোনো এক 'অসাম্প্রদায়িক' মিডিয়ার অর্বাচীন এক সাংবাদিক হঠাৎ করে এক কওমি মাদ্রাসায় গিয়ে উদয় হলো। সেখানে ক্যামেরা হাতে মাদ্রাসার শিক্ষককে প্রশ্ন করল,

'আপনি এই মাদ্রাসার শিক্ষক?'

সম্মানিত শাইখ বিব্রত হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ। আমি এখানে ছাত্রদের পড়াই'।

' হুজুর, দয়া করে জাতীয় সঙ্গীত পুরোটা বলুন তো'।

এই উদ্ভট প্রশ্নে শাইখ যখন বিব্রত, তখন কামান থেকে দ্বিতীয় 'গোলা' ছোড়া হয়, 'আচ্ছা হুজুর, মুক্তিযুদ্ধে আমাদের কয়টি সেক্টর ছিল', 'সাতজন বীরশ্রেষ্ঠের নাম বলুন তো'।

যে অর্বাচীন প্রশ্ন প্রস্তুত করে নিয়ে এসেছে, মুক্তিযুদ্ধে তার জেলা কোন সেক্টরে ছিল সেটাই তো সে বলতে পারবে না। কিন্তু পরের দিন সংবাদপত্রে সচিত্র প্রতিবেদন,'মাদ্রাসাগুলোতে কী শেখানো হচ্ছে'! নিচে ছোট্ট করে লিখে দেয়া হয়, 'তোয়াক্কা নেই মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের'।

এরপর শুরু হয় ধারাবাহিক অপপ্রচার। অমুক সংগঠন মাদ্রাসা রাষ্ট্রযন্ত্রের করায়ত্ত্বে নেওয়ার দাবি করেন তো তমুক গোষ্ঠী মাদ্রাসা নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব রাখেন। চারদিক থেকে মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার ব্যবচ্ছেদ শুরু হয়। এ ধরনের ধারাবাহিক প্রোপাগান্ডার বিপরীতে দেশের আলেম সমাজের প্রতিনিধি সচরাচর রক্ষণাত্মক ভূমিকায় থাকেন। আমাদের ওস্তাদদের পক্ষ থেকে সাধারণত জবাব আসে, মাদ্রাসার ব্যাপারে ভুল ধারণা ছড়িয়েছে, সকলের প্রতি আহ্বান মাদ্রাসা ভ্রমণ করে সঠিক তথ্য জানার, মাদ্রাসায় কখনোই দেশবিরোধী কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় না ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সকল

উত্তর যারা মাদ্রাসার বিরোধী, তারা সকলেই জানে; তাদের এমন উত্তরের কোনো প্রয়োজন নেই। জবাব দেওয়া হয় আপামর জনতার প্রশ্ন ভাষা চোখগুলোর জন্য, যার প্রয়োজন অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। তবে, এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই যে, আমাদের এই দুর্বল অবস্থা দেখে অনেক মুসলিম ভাইয়ের অন্তরে ব্যথা অনুভূত হয়।

এসব অনাচার দেখলে হতাশ লাগাটাই স্বাভাবিক। আমরা তো সত্য নবির উম্মত, তবু কেন আমরা এত দুর্বল? এক মুমিন ভাইয়ের ব্যথায় অপর ভাইয়ের ব্যথিত হওয়ার দরকার আছে, তবে সেটাকে বেঁচে থাকার অবলম্বন বানানো যাবে না। ঈমানের কালিমা যে বুকে ধারণ করেছে, তার তো হতাশ হওয়া মানায় না। মুমিন তো চিরকালই শক্তিশালী, তার সাথে তো আছেন মহান রব, আমাদের সৃষ্টিকর্তা রহমান আল্লাহ; যিনি সকল পরিকল্পনাকারীর মহাপরিকল্পনাকারী। তাই চলুন, দশ বছর পর আমরা কোন কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌছাতে চাই, সেই মঞ্জিলের দৃশ্যটা একবার মনের চিলেকোঠার জানালাটা খুলে দিয়ে তাকিয়ে দেখি–

চিন্তা করুন, দশ বছর পরের কোনো একদিন। দেশের প্রধান ও প্রভাবশালী দশটা মিডিয়ার কয়েকটা আমাদের। তখন কিন্তু 'খেলার' কৌশল আর রক্ষণাত্মক থাকবে না; তখন আমরা গোলবারে শট নিব, তারা নাকেমুখে সেই শট ঠেকাতে ব্যস্ত থাকবে, খাবি খাবে। সেটা কিভাবে হবে?

ধরুন, আগের দিন পত্রিকায় মাদ্রাসা বন্ধের জোর দাবি জানানো 'লক্ষণ সেন বিশ্ববিদ্যালয়ে'র ভিসির কাছে কোনো মাদ্রাসার সদ্য ফারেগ হওয়া তরতাজা টগবগে তরুণ সাংবাদিক ক্যামেরাম্যান হিসেবে সেই ভার্সিটিরই ছাত্র সহ হাজির হয়ে বলল,

'স্যার আসসালামু আলাইকুম। আমরা "মোল্লা টিভি"র পক্ষ থেকে এসেছি। শোনা যাচ্ছে, দেশের মাদ্রাসাগুলোতে লেখাপড়ার মান ক্রমশ অধঃপতিত হচ্ছে। আমরা মনে করি মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ হওয়া উচিত, এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কি'?

উত্তরে স্যার তো অবশ্যই হ্যাঁ বলবে। তারপর তরুণ বলবে,'স্যার, গোসলের ফরজগুলো কি কি বলুন তো'।

এ প্রশ্নে ভিসি যখন হতভম্ব হয়ে চোখ রাঙিয়ে জিজ্ঞেস করবে, 'কী বলতে চাচ্ছ তোমরা'? তখন তরুণ জানাবে, 'স্যার, গতকাল আপনি ইসলাম শিক্ষার ঠিক-ভুল সম্পর্কে পেপারে বিশাল প্রবন্ধ লিখেছেন। সেখানে আপনি দেখিয়েছেন, দেশের সম্মানিত আলেমরা ইসলামের শিক্ষা কী, সেটাই বুঝে না। কোনটা পড়ানো প্রয়োজন, কোনটি পড়ানো বন্ধ হওয়া উচিত, সেসব নিয়েও অনেক কিছু লিখেছেন। তার মানে আপনি নিশ্চয়ই ইসলামের বড় এক পণ্ডিত। স্যার প্লিজ, একটু যদি বলতেন গোসলের ফরজগুলো কী কী'?

এ সম্ভাবনা কোনোমতেই উড়িয়ে দেয়া যায় না যে, এসকল সুশীলদের অধিকাংশই

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন না, লেজেগোবরে করে ফেলবে। তারপর প্রশ্ন হবে, 'স্যার, আপনি কি পঞ্চাশোর্ধ/ষাটোর্ধ নন'? ইতিবাচক উত্তর আসলে বলা হবে, 'তাহলে দেশীয় আইন অনুযায়ী আপনি এত বছর ধরে প্রাপ্তবয়স্ক'। এর উত্তরও 'হ্যাঁ' হলে পরের প্রশ্ন হবে, 'তাহলে স্যার আপনি এতগুলো বছর ধরে নাপাক হয়ে ঘুরাঘুরি করছেন'!

তারপর ভিসি যতই চিৎকার চেঁচামেচি করুক, পরের দিন সবগুলো পত্রিকায় হেডলাইন হবে, **'অমুক ভার্সিটির ভিসি এত বছর ধরে নাপাক'**! সাথে ছোট্ট করে লেখা, 'একই অবস্থা আরও দশ জনের'।

বিষয়টা কেমন হবে ভাবতে পারছেন? ইসলাম-বিদ্বেষী মহল্লায় আগুন ধরে যাবে, সবাই মিলে ইসলামি পত্রিকাগুলোর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার শুরু করবে। কিন্তু ততক্ষণে গ্রীষ্মের তীব্র দাবদাহে গুল্মবনে আগুন লেগে গেছে, দাউদাউ করে জ্বলছে দাবানল। 'নেভানোর' ক্ষমতা সেক্যুলারদের নেই। ক্ষমতা আর প্রভাবের কারণে কেউ ইসলামিস্টদের টুপিটাও ছুতে পারবে না। ,কলকাতামুখী, পুঁজিবাদী সেক্যুলাররা তখন নিজেদের নষ্ট হওয়া ইমেজ উদ্ধারের আশায় নানাভাবে তাদের অবস্থানকে ব্যাখ্যা করবে। এসব সুশীলদের হাল দেখে ইসলাম-বিরোধী, ভূমিদস্যু আর পুঁজিবাদী রক্তচোষা কর্পোরেট কোম্পানির প্রসব করা মিডিয়াগুলোও সতর্ক হয়ে যাবে, মুসলিমদেরকে সমঝে চলবে। নাস্তিকদের ইসলাম-বিরোধী গল্প কবিতা প্রবন্ধ আর শিক্ষাক্রমে প্রবেশ করানো হবে না।

আমরা কখনোই ইসলাম-বিদ্বেষীদের মতো এমন নিচুশ্রেণির কাজে লিপ্ত হবো না। কিন্তু তাদেরকে তাদের ওষুধ দিয়ে নাজেহাল করার সক্ষমতা আমাদের অর্জন করতে হবে। এই সক্ষমতার পরিবেশ সৃষ্টি করার লক্ষ্যেই আমাদের কাজ করতে হবে, দ্বীনের প্রচারের জন্য এমন একটি পরিবেশ জরুরি, জরুরি এমন ক্ষমতা। মোট কথা, আমাদের বলার, লেখার, বক্তব্য দেওয়ার প্লাটফর্মের সাথে সাথে প্রভাব ও প্রতিপত্তি অর্জন করতে হবে, যে প্লাটফর্ম জনসাধারণের দৃষ্টিসীমার আওতাধীন; আর জনগণ যে প্রভাবের আওতাধীন।

আজ তারা আমাদের ওস্তাদ, হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসনে বসা আলেমদের নিয়ে যেভাবে অপপ্রচার করে, আমাদের হাতে যদি শক্তিশালী মিডিয়া থাকত, তাহলে আমরাও তাদেরকে ঠিক একইভাবে ঘায়েল করার শক্তি হাতে রাখতাম। হয়তো এভাবে মুসলিমরা এভাবে নিকৃষ্ট পন্থায় আক্রমণ করত না, তবে বিরোধীরা সর্বদা ভয়ে থাকত, মুসলিমদের হালকাভাবে নেওয়া যাবে না। বাড়াবাড়ি করার আগে প্রতিটি দুশ্চরিত্র দুবার ভেবে নিত, কারণ তখন মুসলিমদের সম্মানের চাদরে হাত দিলে নিজের লজ্জা নিবারণের হাফপ্যান্ট খুলে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা।

আমি সেই দিনটার স্বপ্ন দেখি। যেদিন আমরা অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে সেই গন্তব্যে পৌঁছুব। সেদিন আর কোনো অর্বাচীন আমাদের রব, দ্বীন, রাসূল ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে টিটকারি করার সাহস পাবে না। সেদিন আর কোনো ইমামকে মসজিদ সভাপতি, রাজনৈতিক-প্রশাসনিক নেতৃবৃন্দ অকারণে অপমান করার আগে দশ বার ভাববে। যারা তখনো ইসলামের বিপক্ষে বাড়াবাড়ি করবে, তাদের মুখোশ সেদিন খুলে ফেলা হবে সকলের সামনে। তারপরও যারা সেদিন ইসলামের ওপর কুফরের ঝাণ্ডা উড়াতে চাইবে, তাদেরকেও নিজ অবস্থানে নিরপেক্ষ করে রাখার উদ্যেগ গ্রহণ করা হবে।

প্রশাসন, শিক্ষা-সহ গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরে তথাকথিত অভিজাত সাংস্কৃতিক জমিদার আর ইসলাম-বিদ্বেষীরা বসে থাকবে? থাকুক, দ্বিতীয় 'প্রশাসন' তখন আমাদের আয়ত্বে, আমরা ইচ্ছা করলে তাদের জায়গায় উঠাতে পারব, আবার ইচ্ছা করলে তাদের যথাযোগ্য স্থানে ধরে নিয়ে বসাতে পারব। এর জন্য দরকার মিডিয়ার লাগামের নিয়ন্ত্রণ। আসুন, আমরা সবাই সেই দিনটির স্বপ্ন দেখি, সেই স্বপ্নটাকে বাস্তবায়িত করতে কাজ করি। যেদিন নতুন এক সতেজ আকাশের নিচে স্নিগ্ধ ভোরের বিশুদ্ধ নিঃশ্বাস বুকভরে টেনে নিবে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। নাস্তিকতার কালো মেঘে আর ঢাকা পড়বে না কোনো কিশোরের আকাশে উদিত হওয়া ইসলামের রাঙা প্রভাতের সূর্যটা। এতটুকু আশা করা তো বাতুলতা নয় নিশ্চয়ই; সেই সোনালী দিনের স্বপ্ন তো দেখাই যায়, তাই না?